৮ম বর্ষ। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ। ১ম, ও ২য়, সংখ্যা
১৮২৩, ১৩০৮।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৩।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-পত্রিকার উপহার।

হিন্দু-পত্রিকার বহু সংখ্যক গ্রাহকের অনুরোধে আমরা এইরূপ নিয়ম করিলাম যে যাঁহারা ১৩০৮সালের ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে হিন্দু-পত্রিকার মূল্য পাঠাইবেন ; তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকার বিশেষ উপহার ভগবদ্ভাবোপদর্শক প্রকরণম্ ।০ আনা মূল্যে পাইবেন। ঐ গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণকার্য্য প্রায় শেষ হইল, গ্রাহকগণ আগামী সংখ্যা হিন্দুপত্রিকার সহিত উহা পাইবেন

হিন্দু-পত্রিকার মূল্য

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান ১৩০৮ সালের প্রথম সংখ্যা হিন্দু-পত্রিকা পাইয়া মূল্য না পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের নিকট ১৩০৮ সালের ৩য় ও ৪র্থসংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। কারণ বৎসরের প্রথমে মূল্য আদায় করিলে আমাদের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। কোন কোন গ্রাহক ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে আপত্তি করেন, কিন্তু তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি জানিনা। কেননা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইলে দুইআনা অধিক খরচ হয়, মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে হইলেও ৵০আনা অধিক খরচ হইয়া থাকে। কার্য্যের সুবিধার জন্যেই ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাঠান হয় ইহাতে কাহারও কোন গ্লানির কারণ নাই। পিওসপিট্ এবং অন্যান্য পত্রিকা এইরূপ বৎসরের প্রথমেই ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩০৮সালের মূল্য ভিঃ পিঃ র দ্বারা আদায় করা হইবে, তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগকেও হিন্দু-পত্রিকার উপহার ।০ চারিআনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি সুলভ মূল্যে উপহার দেওয়া হইয়া থাক।

১। অগ্নিমন্ত্রের প্রসার ৸০ স্থলে ॥০ ২। শাণ্ডিল্যসূত্র ১৲ স্থলে ৸০

৩। ৺প্রভাবতীদেবীর কৃত অমলপ্রসূন ১৲ স্থলে—৸০ ৪। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় কৃত দার্শনিক মীমাংসা ১৲ স্থলে ৸০ ৩৸০ ২৸০

যাঁহারা ৪খানি পুস্তক একসঙ্গে লইবেন, তাঁহারা ২৲ টাকা মূল্যে পাইবেন। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য প্রেরণের সময় সহৃদয় গ্রাহকগণ দরিদ্র আশ্রমকেও যেন স্মরণ করেন।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টরী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।	বৈশাখ।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ দেবদেব করুণামৃতবারিবাহ!
নিঃসীমমঙ্গলময় প্রণতৈকবন্ধো!
কামং ভবন্ত্বিহ নরাঃ সুবিচক্ষণশ্চ
মন্ত্রেষ এব নিতরামসি তৎসমীপে। ১

যাবন্তি সন্তি নিগমাগমদর্শনানি
পুংসঃ সুখৈকসদনান্যপি ধীপ্রদানি
সর্ব্বাণি তানি ভগবান্! তব সন্নিধানে
বাচং নিয়ম্য মনসা স্তুতিমাচরন্তি। ২

জানাতি কেবলমসীতি নরস্ত্বমীশ!
এবং ভবান্ বিবিধ শক্তিভিরারচয্য
সৃষ্টের্জনি স্থিতিলয়ান্নরমঙ্গলায়
তাঃ স্বীয়মঙ্গলময়স্পৃহয়া নিযুংক্তে। ৩

নমামি পাদপঙ্কজং সুরার্চ্চিতং শিবং সদা
সমাশিষং সদামুদা বিধেহি বিশ্বকামদাং
সুমঙ্গলপ্রদায়িকা ভবৎকৃপা-সুধারিকা
জগদ্ধিতেহি পূর্ব্ববৎ রতাহস্তু হিন্দুপত্রিকা। ৪

পুনঃ সমাশিষং দিশ প্রমুক্তলোভহিংসনাঃ
পরস্পরং সুমঙ্গলপ্রসাধনৈকতৎপরাঃ
ধরামরা নরা যথা ভবেয়ুরত্র সর্ব্বদা
তথাদয়াং বিধায় নো সমার্চ্চনং গৃহাণবৈ।

বিচিত্রজাতিমাশ্রিতা বিভিন্নবর্ণসংশ্রিতা
বৃথাভিমানকাপিতাঃ পরস্পরং নিরন্তরং
নরাঃ সুশান্তিশালিনঃ সহোদরত্রতঙ্করা
যথা ভবেয়ুরত্রবৈ তথাশিষং দদস্ব নঃ। ৬

সুরদ্বর্ষমস্মিন্নবীনেতু বর্ষে, সদানন্দসান্দ্রং
সুভিক্ষাসুরক্তং
তথা ব্যাধিমুক্তং পরেশ! ক্ষমায়িন্! কুরুষ্ব
প্রকামং ধিয়া সঙ্গতং বৈ॥ ৭

অয়ং হিন্দুসার্থঃ সমস্তান্নিতান্তং কৃতিং পূর্ব্ব-
জানাং তথাসং তনোতু
যথাদর্শকার্য্যং বিধাতা জগত্যামশেষেষু
কার্য্যেষ্বপি স্থান্নরেষু। ৮

ভবৎ পাদপঙ্কেরুহাগ্রং চিরংবৈ মধুপ্রাশয়ন্তো
মনঃষট্পদো মে
সদীয়ং সমস্তানপি প্রেমমত্তান্ বিদধ্যাৎ
যথাবৈ তথা মাং প্রসীদ। ৯

বয়মিহ মনুজাস্তাং সাদরং প্রার্থয়ামঃ।
কুশলদ পরমাত্মন্! মঙ্গলং নো বিধেহি,
সততমভিরতান্তে পাদসেবাসুকার্য্যে
চরণকমললীনান্ পাহি দীনান্ পরেশ! ১০

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদেব! হে কৃপামৃতবর্ষণকারী মেঘ! হে অনন্ত কল্যাণময়! হে প্রণতগণের একমাত্র বন্ধু! মনুষ্য যতই না কেন বিচক্ষণ হউক, তথাপি তুমি তাহার নিকট অজ্ঞেয়। ১

হে ভগবন্! সুখপ্রদ ও জ্ঞানপ্রদ যে সকল নিগম ও আগম ও দর্শনশাস্ত্রাদি আছে, তাহারা সকলেই তোমার সমীপে নীরবে অবস্থিতি করে। ২

মানব জানে যে, তুমি আছ এবং তুমি নিজের বিবিধ শক্তিদ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সাধন করিয়া, স্বকীয় মঙ্গলময় ইচ্ছাদ্বারা সেই সকল শক্তিকে মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়াছ। ৩

সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত মঙ্গলকর তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি। আনন্দের সহিত সর্ব্বদা জগতের কামনাপূর্ণকারী আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। তোমার করুণা ধারণ করিয়া কুশলদায়িনী "হিন্দু-পত্রিকা" পূর্ব্বের ন্যায় জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত হউক। ৪

পুনর্ব্বার এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, মনুষ্যগণ যেরূপে পরস্পর লোভ-হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়া পৃথিবীর দেবতার ন্যায় হয়, আমাদিগকে সেই ভাবে দয়া করিয়া পূজা গ্রহণ কর। ৫

সর্ব্বদা পরস্পর অনর্থক অভিমানে তাপপ্রাপ্ত নানা বর্ণের বিভিন্ন জাতীয় নরগণ যাহাতে সহোদরবৎ গ্রহণ করিয়া শান্তিশালী হইতে পারে, আমাদিগকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। ৬

হে পরমেশ্বর! হে মায়ারহিত! এই নববর্ষে ভারতবর্ষকে আনন্দপূর্ণ, সুভিক্ষসুখী এবং পীড়াশূন্য ও বুদ্ধিযুক্ত কর। ৭

মনুষ্যসমাজে বহুবিধ কার্য্যের মধ্যে যাহাতে হিন্দুগণ সকলের আদর্শকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এবং পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিতে পারে, সেইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। ৮

এই আশীর্ব্বাদ কর, আমার মন-মধুকর তোমার চরণ-কমলের মধু পানোন্মত্ত হইয়া যেন সকলকে ঐ মধুপানে মত্ত করাইতে পারে। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৯

হে কুশলপ্রদাতা! হে পরমাত্মন্! আমরা সাদরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের কল্যাণ বিধান কর। হে পরমেশ! তোমার চরণ-সেবারূপ সুকর্ম্মে যাহারা সতত নিরত, সেই পাদপদ্মলীন দীন জনগণকে রক্ষা কর। ১০

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২য় পাদ। (৫ম)

১। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।
২। বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ।
৩। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।
৪। কর্ম্মকর্ত্তৃ ব্যপদেশাচ্চ।

৫। শব্দ বিশেষাৎ।

৬। স্মৃতেশ্চ।

৭। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ন নিচায্যত্বা দেবং ব্যোমবচ্চ।

৮। সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ।

১। "মনোময়"ই যে ব্রহ্ম,ইহা সর্ব্বোপনিষদ্-প্রসিদ্ধ।

২। "মনোময়"এর যে সমস্ত গুণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই উপপন্ন হয়।

৩। "মনোময়"এর গুণাদি জীবাত্মায় প্রযুক্ত হইলে অনুপপত্তি দোষ ঘটে।

৪। কর্ম্ম ও কর্ত্তার ব্যপদেশ থাকাতেও "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৫। শব্দের প্রভেদ থাকাতেও, "মনোময়" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

৬। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারাও উহাই প্রতিপাদ্য।

৭। অধিষ্ঠান ও আকারের ক্ষুদ্রত্ব বিষয়িণী আপত্তির উত্তর এই যে, আকাশবৎ ব্রহ্ম চিন্তনীয়।

৮। তত্ত্বতঃ জীব-ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও, ব্রহ্মের বিশেষত্ব হেতু জীবের ন্যায় ব্রহ্মের সম্ভোগপ্রাপ্তি হয় না।

প্রথমসূত্র ও তৎপরবর্ত্তী সপ্ত সূত্র ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ১৪শ প্রপাঠক অবলম্বনে রচিত। উক্ত প্রপাঠকের বিষয় "শাণ্ডিল্য বিদ্যা" নামে সাধারণতঃ অভিহিত। উহাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুং কুর্ব্বীত। ১

এই সমস্তই ব্রহ্ম—ব্রহ্মেতে জনিত।
ব্রহ্মে বিসর্জ্জিত বিশ্ব—ব্রহ্মেই পালিত।
শান্ত সমাহিত চিত্তে সাধন যাহার।
ব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার তার॥
মানব কর্ম্মের জীব—কর্ম্মবশে সৃষ্ট।
ইহজন্ম-কর্ম্ম পরজন্মের অদৃষ্ট॥
অতএব কর্ম্মফলবিধানজ্ঞ যাঁরা।
শাস্ত্রমর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করিবেন তাঁরা॥ ১

অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাহাকে বলা যায়?—যিনি নিরতিশয় মহৎ। (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি লয় হইতেছে। (তজ্জলানি—তজ্জঞ্চ—তল্লঞ্চ—তদঞ্চ—তজ্জলান—অবয়বলোপশ্ছান্দসঃ। সেই ব্রহ্ম হইতে জাত "তজ্জং"—তাঁহাতে লীন "তল্লং"—তাঁহাদ্বারা রক্ষিত—তদনং। তস্মাদ্ জাত", তস্মিন্ লীয়তে, তস্মিন্নেব স্থিতিকালে অনিতি প্রাণিতিইতি।) জিতেন্দ্রিয়—জিতচিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে চিত্তে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাঁহার উপাসনা, এইজন্যই মানবকে "ক্রতুময়" বলে। ইহলৌকিক কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক অদৃষ্টফল নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব কর্ম্মফলজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। (যথা ক্রতু যথা অস্য পুরুষস্য ক্রতু, প্রেত্য—মৃত্বা

—স ক্রতুং কুর্ব্বীত, স এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীত।)

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্ব গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ। ২

মনোময় জ্যোতিরূপ, সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ,
প্রাণদেহ, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা যিনি।
সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বগ্রাস,
অবাক্য ও অনাদর ব্রহ্ম হন তিনি॥ ২

সেই ব্রহ্ম মনোময়—অর্থাৎ মনঃপ্রায়। (যদ্দারা মনন করা যায়, তাহাই মন; কিন্তু মন যখন কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত, তখন আত্মাও প্রবৃত্তবৎ উপলব্ধ হন; তদ্রূপ মন কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে, আত্মাও নিবৃত্তবৎ উপলব্ধ হন; এইরূপে আত্মা মনের ন্যায় প্রতীয়মান হন বলিয়াই মনঃপ্রায়—সুতরাং "মনোময়"। তিনি প্রাণশরীর—অর্থাৎ প্রজ্ঞাশরীর (যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা, স প্রাণ, ইতিশ্রুতেঃ) তিনি চৈতন্যস্বরূপ (ভা দীপ্তিশ্চৈতন্য লক্ষণং) তিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম—রূপাদিবিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, অর্থাৎ বিশ্ব-জগৎ তাঁহারই কার্য্য। (স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেতি শ্রুতেঃ) তিনি সর্ব্বকাম—(ধর্ম্মা-বিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মীতি—গীতা।) তিনি সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, (রসোঽহমপ্সু—পুণ্যো-গন্ধঃ পৃথিব্যাশ্চ, ইত্যাদি—গীতা) তাঁহারারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অবাকী (বাক্য এস্থলে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বোধক রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-বিরহিত—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ) তিনি অনাদর, অর্থাৎ কোন বস্তুতে তাঁহার আদর বা অনুরাগ নাই।

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্ত-র্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়া-ন্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ॥ ৩

ব্রীহি-যব-সর্ষপ বা শ্যামাশস্যকণ,
সব হতে অণু মম অন্তরাত্মা হন।
পৃথিবী-আকাশ-স্বর্গ—বিশ্বচরাচর,—
সব হতে মম অন্তরাত্মা বৃহত্তর। ৩

এ স্থলে অধিক কিছু বলিবার নাই। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" শ্রুতির এই ব্রহ্মতত্ত্বোক্তিই এই শাণ্ডিল্য-উপদেশ ব্যক্ত হইয়াছে। অতি সূক্ষ্ম ও অতি বৃহৎ, উভয়ই উপলব্ধির অযোগ্য। ব্রহ্মতত্ত্ব এত সূক্ষ্ম—যে অনুভবে আসে না, এবং এত বৃহৎ—যে ধারনাই হয় না।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্ব-মিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভি সম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ। ৪

"সর্ব্বকর্ম্মা-সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস সর্ব্বগ্রাণ,
এ বিরাট বিশ্বব্যাপী যিনি।
অবাকী ও অনাদর, আমার হৃদয়েশ্বর
পরাৎপর পরব্রহ্ম তিনি।
এ দেহের পরিহারে, অবশ্য পাইব তাঁরে,
এ দৃঢ় বিশ্বাস যার হয়।
শাণ্ডিল্যের উক্তি সার—স্বকর্ম্মের ফলে তার
ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে নিশ্চয়। ৪

২য় উক্তির ব্যাখ্যাস্থলে "অবাক্য" ও "অনাদর" পদের তাৎপর্য্য আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তৎপুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব। অন্যান্য অংশ পদ্যানুবাদেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, আশা করি। "শাণ্ডিল্য" পদের দ্বিরুক্তি-প্রয়োগ কেবল গৌরব প্রকাশ বা আদরার্থক মাত্র। যদিও ব্রহ্ম এস্থলে "মনোময়" ইত্যাদি পদে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তথাপি সমগ্র প্রপাঠকটীই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-প্রাসঙ্গিক, পরন্তু জীবাত্মা-প্রাসঙ্গিক নহে। এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মে যেখানে মনের বা প্রাণের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, (যথা—মুঃ উঃ ২—১২) সেখানে উপরোক্ত শ্রৌত বাক্য ব্রহ্মবাচক হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং উহা জীবাত্মাবাচকই বটে। এস্থলে উত্তরপক্ষে ইহাই বক্তব্য যে, ব্রহ্মতত্ত্বই যেস্থলে মূল বিচার্য্য বিষয়, সেস্থলে নববিষয়ান্তরের আলোচনা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। যদিও চিত্তশুদ্ধির আদেশ-উপদেশই উক্ত প্রপাঠকে পরিব্যক্ত, কিন্তু সেই চিত্তশুদ্ধি সাধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ উপাসনা ও ধ্যান-ধারণার বিষয় ব্রহ্মতত্ত্বই এস্থলে ব্যক্ত বা বিবৃত,পরন্তু উপাসনাদির অবিষয় জীবাত্মতত্ত্ব কদাচ নহে। সমগ্র বৈদান্তিক সন্দর্ভের সারভূত সিদ্ধান্তই এই যে, ব্রহ্মই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ এবং ব্রহ্মতত্ত্বের এই অসাধারণ বিশেষ লক্ষণ এখানেও বিস্পষ্ট ব্যক্ত।

২য় সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈদান্তিক উক্তিতে যে সমস্ত লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলেই সুসঙ্গত ও সমুপপন্ন হয়, কিন্তু জীবাত্মায় তৎসমুদায়ের প্রয়োগ কল্পনা করিলে, উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়, সন্দেহ নাই।

এ স্থলে এইরূপ লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে যথা—ইনি পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, ইনি শস্যকণা হইতে সূক্ষ্মতর, ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, ইনি সর্ব্বকাম, ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্রহ্মেরই লক্ষণ। ব্রহ্মই "অণোরণীয়ান্—মহতো মহীয়ান্।" ব্রহ্মেই অবাধিত বিশ্বকর্ত্তৃত্ব ও বিশ্বকারণত্ব। ব্রহ্মেই বিশ্বের সত্তা, ব্রহ্মেই বিশ্বের সমাধান। ব্রহ্মই বিশ্ব। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা—

> ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
> কুমার উত বা কুমারী।
> ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
> ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

> তুমিই পুরুষ, তুমিই রমণী।
> তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী।
> তুমিই প্রাচীনরূপে দণ্ডপাণি,
> তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বজন্মধারী।

এতাবতা দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী পরমাত্মায়ও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার বিশেষ লক্ষণাবলী কদাচ জীবাত্মায় প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মুণ্ডকোপনিষদের উক্তিমতে পরমাত্মা অমনঃপ্রাণসত্ত্ব, শুদ্ধ, শান্ত ইত্যাদি বটে, কিন্তু উহা তাঁহার নির্গুণ সত্তার স্বরূপ লক্ষণ, আর তাঁহার সগুণ সত্তার তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ জীবাত্মার সর্ব্বলক্ষণসমন্বিতই বটেন। অতএব জীবাত্মার লক্ষণে পরমাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু পর-

স্মার লক্ষণে জীবাত্মা কদাচ লক্ষিত হইতে পারেন না।

৩য় সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণিত লক্ষণাবলী ব্রহ্মের প্রযোজ্য এবং এই বক্ষ্যমাণ ৩য় সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত লক্ষণাবলী জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য—অনুপপন্ন। যেহেতু "আকাশাত্মা" "সর্ব্বকর্ম্মা" "সর্ব্বব্যাপী" প্রভৃতি বিশেষণ উপাধ্যবচ্ছিন্ন সসীমগুণ জীবাত্মায় কদাচ সম্ভাবিত নহে। যদি বলা যায় যে, পরমাত্মা ত জীবদেহেও অবস্থিত; তদুত্তর এই যে, তাহা হইলেও তিনি কেবল মাত্র জীব-দেহেই অবস্থিত নহেন, তিনি সর্ব্বস্থিত। "পৃথিবী হইতে বৃহত্তর" 'আকাশ হইতে বৃহত্তর" "সর্ব্বাধার" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই বাচ্য, কিন্তু জীবাত্মার অস্তিত্ব দেহ বা উপাধি-অবচ্ছিন্নই বটে; সুতরাং জীবাত্মা কদাচই উক্ত উক্তিসমূহের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না।

৪র্থ সূত্র।—"মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণে এ স্থলে জীবাত্মা লক্ষিত হইতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে বিষয়-বিষয়ীভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। প্রথম সূত্রের আলোচনায় এইরূপ ঔপনিষদী উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—"ইনিই সেই ব্রহ্ম" "ইহলোকান্তরে আমি ইহাকে প্রাপ্ত হইব" ইত্যাদি। এই "ইনি" কে? "ইনি" যদি জীবাত্মা হন, তবে ইহাকে পাইবে যে, সে আবার কে? যে প্রাপক, সে-ই প্রাপ্য হইবে কিরূপে? পূর্ব্বোক্ত "মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণের বিষয়ীভূত বস্তুকে "আমি পাইব" এরূপ উক্তি জীবাত্মার ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে? অদ্বৈততত্ত্বে পরমার্থতঃ জীবাত্মা পরমাত্মার (প্রাপ্য-প্রাপকের) একত্বসিদ্ধ হইলেও "শাণ্ডিল্য বিদ্যার" লক্ষ্যীভূত সগুণ ব্রহ্মোপাসনাস্থলে দ্বৈততত্ত্বেই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধরূপে পরমাত্মা-জীবাত্মার (প্রাপ্য-প্রাপকরূপে) পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। অতএব উপাসক জীবাত্মাই ইহ-লোকান্তরে সেই "মনোময়" "প্রাণ-শরীর" "আকাশাত্মা" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য উপাস্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

৫ম সূত্র।—পরমাত্মা ব্রহ্মই যে উপাসনার বিষয়, এস্থলে অপর একটি হেতুবাদে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০—৬।৩।২) এই ভাবের উক্তি দৃষ্ট হয় যে,—"তণ্ডুল বা যবশস্য-কণার তুল্য কিম্বা শ্যামাক-শস্য বা শ্যামাক-তুষ তুল্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে এই হিরণ্ময় পুরুষ আত্মায় অধিষ্ঠিত„ ইত্যাদি। এ স্থলে "আত্মা" পদ অধিকরণ কারকরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে, উহা জীবাত্মাবাচক এবং কর্ত্তৃপদ "হিরণ্ময়" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্য পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেছেন। অতএব জীবাত্মাতে পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত, এই তাৎপর্য্য বোধনার্থ কারকার্থ-ভেদে স্পষ্টতঃই শব্দ-বিভিন্নতায় জীবাত্মা-পরমাত্মায় বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

৬ষ্ঠ সূত্র।—কেবলমাত্র শ্রুতি বা বেদই জীবাত্মা-পরমাত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদ প্রতিপাদন করেন নাই; পরন্তু স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতাশাস্ত্রেও (১৮—৬১) উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

অর্জ্জুন! ঈশ্বর হয়ে সর্ব্বভূত-হৃদিগত।
মায়ায় ঘুরান সবে কলের পুত্তলী মত॥

বস্তুতঃপক্ষে কোন আত্মাই পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩—৭২৩) এইরূপ বলেন——

দ্রষ্টা কেহ নাহি আর সেই এক ভিন্ন।
সেই এক ভিন্ন আর শ্রোতা নাহি অন্য॥

ফলে যদি আমরা অদ্বৈতবাদের কৈবল্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, আমরা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অধিকারী হইতে পারি, তবেই আমরা উক্ত তত্ত্বোপলাভে শক্ত হই। কিন্তু যাবৎ আমরা উক্ত চরম-পরমার্থ-সত্য সম্বোধে সমর্থ না হই, তাবৎ আমাদিগের নিকট সর্ব্বসারতম সত্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর অভিন্ন; স্রষ্টা ও সৃষ্ট স্ব স্ব সত্তায় স্বতন্ত্র! আকাশ অনন্ত, ঘটাদিরূপ উপাধির অবচ্ছিন্নতাকালে উহা "ঘটাকাশ" প্রভৃতি অভিধানে সান্তরূপে প্রতিপন্ন। যতদিন ঘট, ততদিন ঘটাকাশ; সেই ঘটের অস্তিত্ব হত, সেই ঘটাকাশ মহাকাশগত! মনের সগুণত্ব, দেহের সাকারত্ব এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যগত সান্তত্ব ইত্যাদির সমষ্টিই উপাধি। এই উপাধিই অনবচ্ছিন্ন অনন্ত আত্মার সান্তত্ব-সাধক অবচ্ছেদ। বস্তুতঃ তোমাতেও যে আত্মা, আমাতেও সেই আত্মা। আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদিই এস্থলে ঘটতুল্য। এই ঘট সংপূর্ণ ভাঙ্গিতে পারিলে—অর্থাৎ সাধন-বলে মানসেন্দ্রিয়াদিসমন্বিত সূক্ষ্ম দেহ পর্য্যন্ত নিরস্ত করিয়া সিদ্ধি-সমাধি লাভ করিতে পারিলে, আমাদের জীবাত্মারূপ ঘটাকাশ পরমাত্মারূপ মহাকাশে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

ভেদ-বোধ বিদূরিত হউক, জীবাত্মার প্রসার প্রবর্দ্ধিত হউক, সর্ব্বভূতাত্মায় জীবাত্মার আত্মসমর্পণ হউক, তখন কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ম্!"

ভেদ-বুদ্ধির নিরাকরণার্থে কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন নাই, সাংসারিক কর্ত্তব্য-অবহেলারও আবশ্যকতা নাই, অথবা (তথাকথিত) বৈরাগ্যাবলম্বনেরও কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। সব দিক্ বজায় রাখিয়াই আমিত্বের প্রসার-সাধন চলে এবং তদ্দ্বারাই উক্তরূপ ভেদবোধ নিরাকৃত হয়। তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতায় সমর্পণ কর, তোমার সংকীর্ণ স্বার্থসমূহের উপসংহার কর, তোমার সমগ্র কর্ত্তব্য ভেদ-বোধ-নিরাকরণে বা আমিত্বের সম্প্রসারণে কেন্দ্রীভূত কর। ইহাই যথার্থ যোগ-সাধন।

অনেক লোক মোক্ষসাধনার্থী হইয়া কেবল অহঙ্কারের দম্ভ প্রদান করেন। তাঁহারা অনেকেই নানারূপ দৈহিক তপস্যা দ্বারা দেহকে কষ্ট দিয়াই মোক্ষাধিকার লাভের আশা করেন; কিন্তু ওরূপ ধারণা ও সাধনা সমীচীন নহে। মোক্ষার্থী মানব যথাবিহিত "শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে" নিরত রহিবেন ও পূর্ণপরার্থপরায়ণ হইবেন।

উপনিষদের অনন্ত সত্য সমূহ স্বীয় জীবনে জীবন্ত ও জাগ্রত কর। বেদান্তবিচারে নিযুক্ত রও, বেদান্তবিজ্ঞানে আসক্ত হও। ফলে যতদিন তুমি পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন অথবা পর-আমিত্বে আত্ম আমিত্বের সম্প্রসারণ না করিতে পারিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। আমিত্বের প্রসার সাধনেই তোমার সংকীর্ণ জীবাত্মসত্তা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মসত্তায় উৎসর্গীকৃত হইবে এবং তাহা হইলেই তোমার উপাধি-ঘট ভাঙ্গিবে।

তোমার সোপাধিক আত্মারূপী ঘটাকাশ নিরুপাধিক পরমাত্মারূপ মহাকাশে পরিণত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

৭ম সূত্র।—"আত্মা আমার অন্তরস্থ, আত্মা শস্য-কণা হইতে সূক্ষ্ম" ইত্যাদি বাক্যে যে আত্মার ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশিত হইতেছে, সে আত্মা ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারেন?" এইরূপ তর্কোক্তি উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে এই বলা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে সান্ত বা ক্ষুদ্র পদার্থকে আবার "সর্ব্বব্যাপী" বলা হইয়াছে কিরূপে? ফলে নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপীকে সান্ত অবচ্ছেদাত্মক ভাবেও স্থলবিশেষে উপলক্ষিত করা যাইতে পারে। উহা কেবল সাধকের ধারণার কবিবার অনুকূলতা মাত্র।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাণ্ডিল্য-বিদ্যার ১ম উক্তিতেই ব্রহ্মের ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপ-লক্ষণে নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণাতীত; কিন্তু তটস্থ লক্ষণে সগুণ ব্রহ্মই ধ্যান-ধারণাধিগম্য—অতএব উপাস্য। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত—সুতরাং হৃদয়েও উদিত। অতএব হৃদয়স্থ অন্তরাত্মারূপে তাঁহার উপাসনায় কোন অসঙ্গতি বা আপত্তির অবকাশ নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম আকাশাত্মা; অনন্তবিস্তারিত আকাশ ধারণাতীত হইয়াও ঘটাকাশরূপে সান্ত,আয়ত্তীভূত ও ধারণাধিগত।

৮ম সূত্র।—৮ম সূত্রের আলোচ্য বিষয় এই যে, যদি ব্যক্তিগত আত্মা জীব ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ একই হন, তেবেত ব্রহ্মেরও কর্ম্মফল-ভোগ স্বীকার ঘটিয়া উঠে! কিন্তু জীবই সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা, পরম নহেন। পরম সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র, ইহাই বেদোক্তি। অথচ "জীব-পরম এক" বলিলে, পরমের সুখ-দুঃখ-ভোগ কিসে নিরাকৃত হয়? ফলকথা, জীব ও পরমে একত্ব কখন? না যখন সর্ব্বোপাধির অপগম। কর্ম্ম-ফল-ভোগ কতদিন? না জীবের অবিদ্যোপাধি যতদিন। এই বাসনা-বিকারে ভবরোগী কর্ম্মফলভোগী জীবের কর্ম্মভোগ সেই নির্গুণ নির্লেপ নিরুপাধিক ব্রহ্ম কিরূপে স্পৃষ্ট হইবে? ব্রহ্ম "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্মে পাপ-মলিন জীবের কর্ম্মকলঙ্ক কিরূপে লাগিবে? অনন্ত আকাশ-ঘটাধারে সান্ত, তাই ঘটের অস্তিত্বকাল ব্যাপিয়া, নিত্যমুক্ত অনন্ত বহিরাকাশ হইতে সাময়িকভাবে বদ্ধ সান্ত ঘটাকাশ অবশ্যই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য যতদিন, অবশ্য একত্বও অসিদ্ধ ততদিন। ঘটত্বের বিনাশেই একত্ব, সুতরাং সেই অনন্ত একে সান্ত ঘটের গুণ বা ঘট-ধর্ম্ম কিরূপে বর্ত্তিবে? জীবের কর্ম্মফলভোগ তাহার অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানতার ফল মাত্র; কিন্তু পরমে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা সম্ভবে না, যেহেতু নিরুপাধিকতায় তিনি উহার অতীত; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মফলভোগ ফলিতার্থে সম্ভাবিত নহে।

অজ্ঞান-চক্ষু আকাশকে গাঢ় নীলবর্ণ দেখে, কিন্তু বিজ্ঞান-চক্ষু অবর্ণই দেখে। বর্ণের হেতু অন্য—বিষয় অন্য। বিজ্ঞানমতে উহা বৈদ্যুতিক ব্যাপারের বিকার বিশেষ, ইত্যাদি। ফলে সূত্রের সার সিদ্ধান্ত এই যে, পারমার্থিক একত্ব সত্ত্বেও ঐহিক ভিন্নত্ব অনুসারে জীবের ঐহিক কর্ম্মাদির ফলভোগ কখনও ব্রহ্মসংস্পৃষ্ট হইতে পারে না; যেহেতু উপাধিগত বিভিন্নতা বিস্পষ্ট বিদ্যমান। এই বিভিন্নতা কি [illegible]

বিদ্যা ও অবিদ্যা, এ দুয়ের পার্থক্য-সিদ্ধান্ত কিসে সিদ্ধ? এতদুত্তরে বক্তব্য, পার্থক্যের অবস্থায় ফলভোগই অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য, আর একত্ব-জ্ঞান বা বিদ্যার কার্য্যই ভোগাতীতত্ব বা মোক্ষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যম্
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

অন্বয়ঃ।—যঃ একঃ (দেবঃ) যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি। যস্মিন্ (দেবে) ইদং সর্ব্বং সম্-এতি চ, বি-এতি চ। (সাধকঃ) তম্ ঈশানং বরদং ঈড্যং দেবং নিচায্য ইমাং শান্তিং অত্যন্তং এতি।

বিশদ পদব্যাখ্যা।—"একঃ" মায়াবিনির্ম্মুক্তঃ অনন্যৈকঘনঃ। "দেবঃ" দ্যুতিমান্ পরমেশ্বরঃ। "যোনিং যোনিং" মায়াময়ং কারণং কারণং প্রতিকারণে; (বীপ্সয়া বিভক্তিঃ)। "অধিতিষ্ঠতি" অন্তর্য্যামিরূপেণ অধিষ্ঠায় বর্ত্ততে,—অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বর্ত্তমান রহিয়াছেন। "যস্মিন্"—মায়াধিষ্ঠাতরি পরমেশ্বরে, মায়াপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা যে পরমেশ্বরে। "ইদং সর্ব্বম্" এই সমগ্র জগৎ। "সম্-এতি"—উপসংহার কালে প্রলীয়তে, অন্তকালে প্রলয় প্রাপ্ত হয়। "চ" অত্র প্রথম চকারঃ ধাতু-সমুচ্চয়ার্থঃ, দ্বিতীয়শ্চকারঃ স্থিতিপ্রলয়য়োঃ কারণসমুচ্চয়ার্থঃ—ইতি শঙ্করানন্দঃ। "বি-এতি চ" বিবিধ রূপেণ প্রকাশতে—পুনরায় সৃষ্টিকালে বিবিধরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। "ঈশানম্" নিয়ন্তারং নিয়মকর্ত্তা। "বরদং" মোক্ষপ্রদ। "নিচায্য"—নিশ্চয়েন 'ব্রহ্মাহমস্মীতি' সাক্ষাৎ কৃত্বা, নিশ্চয়রূপে "আমিই—ব্রহ্ম" এই প্রকারে দর্শন করিয়া। "ইমাং" সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তাং সুখস্বরূপাং—সর্ব্বদুঃখরহিত নিরবচ্ছিন্ন সুখময়ী। 'শান্তিং' স্বরূপের নির্ব্বিকল্প আনন্দভোগ। "অত্যন্তং" পুনরাবৃত্তিরহিতং 'চিরদিনের মত', এতি'—প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থঃ।—যে অদ্বিতীয়, দ্যুতিমান্, পরম পুরুষ জগতের মায়াময় প্রত্যেক কারণে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মায়ার অধিষ্ঠাতা যে পরম পুরুষে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উপসংহার সময়ে অর্থাৎ প্রলয় কালে বিলীন হয়, এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় বিবিধ আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্ব নিয়ন্তা, মোক্ষপ্রদ, বেদাদি পূজিত সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরকে নিশ্চয়রূপে 'তিনিই আমি" এইভাবে প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারিলে, সাধক সর্ব্ববিধ দুঃখবিনির্ম্মুক্তা নিরন্তর সুখস্বরূপিণী চিরন্তনী শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে আর সংসার যাতনা ভোগ করিতে হয় না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি.

ন্নাত্রঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।" প্রলয়-কালে যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই আদি কারণে পুনর্লীন হয় ইহা শাস্ত্রান্তরেও এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—যথা,—

"সংহৃত্য সর্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥

সমগ্র ভূতগ্রাম আত্মায় সংহৃত করিয়া, জগতকে এক মহা সমুদ্রে পরিণত করিয়া যে বালকমূর্ত্তি পরম দেবতা নিদ্রিত হয়েন, সেই কৃষ্ণাত্মার উদ্দেশে নমস্কার। ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

গীতা ৯—১৮

আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, স্রষ্টা সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং অব্যয় বীজ অর্থাৎ অক্ষয় মূলকারণ।

১২

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়।—যঃ (পরমেশ্বরঃ) দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবশ্চ। "যঃ" বিশ্বাধিপঃ, রুদ্রঃ, মহর্ষিশ্চ, (ভো মুমুক্ষবঃ!) হিরণ্যগর্ভং জায়মানং (তম্) পশ্যত (অবলোকয়ত) স নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু॥ এই শ্রুতি তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থী শ্রুতির সমরূপা তাহাই দেখ।

বঙ্গার্থঃ।—যে অনন্ত শক্তি মহিমময় পুরুষ শক্তিশালী দেববৃন্দেরও শক্তির কারণ, যিনি জগতের যাবতীয় অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও জগতের সংহর্ত্তা বা রুদ্র, হে মুক্তি লিপ্সুগণ, তে মরা সেই সনাতন পুরুষকে অবলোকন কর; আত্মায় তাঁহার সত্তা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। তিনি আমাদিগকে মোক্ষাভিমুখী শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

১৩

যো দেবানামধিপো
যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

অন্বয়ঃ—যঃ (দেবঃ) দেবানাং অধিপঃ। যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ। যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ চ (জীবস্য) ঈশে, ঈষ্টে ইত্যর্থঃ, অত্র "তলোপশ্ছান্দসঃ" ইতি ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যাঃ) (তস্মৈ) কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

বিষম পদব্যাখ্যা।—"দেবানাম্" ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দের। যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ" সর্ব্ব কারণস্বরূপ যে পরমেশ্বরে "ভূঃ" প্রভৃতি সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে। "যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদশ্চ ঈশে" যে পরমেশ্বর মনুষ্য প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণি সমূহের এবং চতুষ্পদ পশ্বাদির প্রতি স্বীয় ঐশী শক্তির পরিচালনা করিতেছেন অর্থাৎ ইহাদিগকে প্রতিনিয়ত নিয়মিত করিতেছেন। "কস্মৈ"—আনন্দ রূপায়—আনন্দ স্বরূপকে এখানে ক শব্দের অর্থ আনন্দ, বৈদিক নিয়মানুসারে চতুর্থীর এক বচনে "কৈ" হইয়াছে, অন্যথা "কায়"

হইক। "হবিষা" চরুপুরোডাশাদি পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্যদ্বারা। "বিধেম"—পরিচরেম—পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা এবং অনুসন্ধান করিব ॥

বঙ্গার্থঃ।—যে পরম ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দেরও অধিপতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহারি অনন্ত সত্তায় আশ্রিত রহিয়াছে, কি দ্বিপদ মনুষ্যাদি কি চতুষ্পদ পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীই যে সর্ব্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব নিয়মে প্রতিনিয়ত নিয়মিত হইতেছে, সেই চিরানন্দময় পরম দেবতাকে পরম পবিত্র যজ্ঞীয় চরু এবং পুরোডাশাদিদ্বারা পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করিব।

বিশেষ ব্যাখ্যা।—যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক "আমার" বলিতে যাহা বুঝায়, তৎ সমস্তই সেই যজ্ঞে তাঁহার উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বস্ব তাঁহাতে উৎসর্গীকৃত করিয়া,আমি দিবানিশি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। একটু অনুধাবন করিলে এই শ্রুতির আরও মধুরতার উপলব্ধি করা যায়।—অনন্ত শক্তিশালী অচিন্ত্য-প্রভাব দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার অধীন, সমগ্র জগৎ যাঁহার বিরাট্ সত্তায়—আশ্রিত, জগতের যাবতীয় জীবই যাহার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী,আনন্দ যাহার প্রতিকৃতি, সৎ যাহার স্বভাব এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রকাশিকাদ্যুতি যাহার সত্তা, তাঁহাকে যদি আমি আমার যথা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারি, কায়মনোবাক্যে যদি তাঁহার দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর তদীয় চিন্তায় আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারি, তবে জগতে আমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী কে? যাহার ভাণ্ডারে কোন বিষয়েরই অপ্রতুল নাই, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক,যদি "আমার" বলিয়া ধরিতে পারি, তবে আর আমার—দুঃখ কি? অপ্রমেয় আনন্দ নির্ঝর,যে মহোচ্চ পুরুষ হইতে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, যদি সেই চিরানন্দ নিকেতনের চরণে মন প্রাণ বলি দিতে পারি, তবে আর আমার অভাব কিসের? আনন্দের জন্যই ত জগৎ উদ্ভ্রান্ত! সদ্যোজাত শিশু মায়ের স্তন্য প্রার্থী, শুধু আনন্দের জন্য। মাতা পুত্রগত-জীবনা, শুধু আনন্দের জন্য। বালা দরিদ্র প্রার্থিনী, শুধু আনন্দের জন্য। প্রাপ্তাধিকার পুরুষ বনিতাভিলাষী, শুধু আনন্দের জন্য। শুধু মনুষ্য কেন, অপরাপর তির্য্যগ্ জাতির মধ্যেও আনন্দস্রোতঃ নিরন্তর প্রবাহিত। অতএব আনন্দই যখন জীবনের প্রধান লক্ষ্য পদার্থ,তখন,যাহার—আশ্রিত হইতে পারিলে আমার অভিপ্রেত পরিমিত ক্ষুদ্র আনন্দ অপেক্ষা কোটি গুণে অধিক অমরা অধিক অপরিমিত অনন্তকাল স্থায়ী অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতে পারিব, যে করুণাময়ের কারুণ্য কল্প-লতিকার ছায়ায় সংসারতাপ দগ্ধ দেহখানি বিশ্রান্ত করিতে পারিলে হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ যাতনা চিরদিনের মত তিরোহিত হইবে, আমি আনন্দের কমনীয় অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িব তাঁর এতাদৃশ মহনীয় পুরুষের চরণে যদি আশ্রয় প্রার্থী না হই তবে আমার ন্যায় ধৃষ্ট, আত্মদ্রোহী আর কে আছে? এমন সনাতন আনন্দে কখন অভিমান্ আমার চরণে "অহং" জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক যদি সর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান না করি তবেআমার ন্যায় অভাগ্য আর কে? সম্মুখে প্রজ্বলিত

পতিতপাবনী মন্দাকিনী প্রবাহিতা, তুমি যদি তাহাতে অবগাহন না কর,বল দেখি তোমার তুল্য পাষণ্ড তোমার তুল্য হৃদয় বিহীন দুরদৃষ্ট পুরুষ আর কে? তাই তত্ত্বদর্শী সাধক বলিতেছেন, "আমার সর্ব্বস্ব বক্ষার চক্ষু এবং পুত্রভার্য্যাদির ন্যায় সেই পরম দেবতার চরণে অর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে নিয়ত অনুধ্যান করিব।" ইহাই বোধহয় এই শ্রুতির গূঢ় অর্থ।

১৪

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

অন্বয়ঃ।—সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে (বর্ত্তমানম্) বিশ্বস্য স্রষ্টার অনেকরূপম্, বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারং, শিবম্ জ্ঞাত্বা (সাধকঃ) অত্যন্তম্ শান্তিম্ এতি।

বিবরণকব্যাখ্যা।—"কলিলস্য মধ্যে" অবিদ্যাতৎ কার্য্যাত্মকদুর্গস্য গহনস্য মধ্যে" ইতি ভগবচ্ছঙ্করঃ অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত অতীব দুর্গম গহনের মধ্যে।

"নারী বীর্য্যেণ সঙ্গতং পৌরুষং বীর্য্যং অল্পকালস্থং কলিল মিত্যুচ্যতে, অথবা জগদারম্ভকানাং অপাং বুদ্বুদস্য পূর্ব্বাবস্থা কলিল মিত্যুচ্যতে,কোনঅপি উদকানি ইত্যর্থঃ ইতি শঙ্করানন্দঃ। শঙ্করানন্দ নামক ব্যাখ্যাতা বলেন যে নারী বীর্য্যের সহিত পুংবীর্য্য মিশ্রিত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থানের পর কলিল সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অথবা জগদারম্ভক কারণ বারির বুদ্বুদ সংঘটনের পূর্ব্বাবস্থার নাম কলিল, অর্থাৎ কেন বুদ্ধ যে কারণ বারি, তন্মধ্যে।

"কলিলস্য মধ্যে"—"তমসো মধ্যে গূঢ়ং" ইতি—নারায়ণঃ। নারায়ণ বলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অনন্ত তিমির থাকে, সেই তিমির মধ্যে নিগূঢ়।

"প্রকৃতি-প্রাকৃতাখ্যস্য সংসারদুর্গস্য গহনস্য মধ্যে অন্তঃসাক্ষিত্বেন অবস্থিতং" ইতি বিজ্ঞানভগবৎ। বিজ্ঞান ভগবৎ বলেন যে "প্রকৃতি এবং তৎসমুৎপন্ন সংসার গহনের মধ্যে সাক্ষিরূপে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, এই ব্যাখ্যাই ভগবান্ শঙ্করের সম্মত সমীচীনও বটে।

"শিবম্"—মঙ্গলস্বরূপ।

বঙ্গার্থঃ।—যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সাক্ষিরূপে যিনি নিরন্তর প্রকৃতির অতীব গহন কার্য্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, যাহার অধ্যক্ষতা ব্যতীত প্রকৃতির কার্য্য সমাহিত হইতে পারে না, সমস্ত পদার্থের উৎপাদক, উপাদান উপাদেয় এবং নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রভৃতি ভেদ বিশিষ্ট অতএব অনেকরূপ জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ পরিব্যাপক সেই পরম মঙ্গল নিধানকে জানিতে পারিলে, সাধক চিরদিনের মত শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি যে অধ্যক্ষরূপে প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা গীতায় এইভাবে উক্ত হইয়াছে।—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
সেণ্ট্ পলিটান কলেজ, কলিকাতা

পঞ্চদশী।

ভূতবিবেক ৭২ শ্লোক হইতে ১০৩ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা।

এই ভূতবিবেকের প্রথমেই কথিত হইয়াছে যে অদ্বৈত সৎ পদার্থ পঞ্চভূত বিচার দ্বারা হৃদয়াঙ্গম হয়, এই জন্য পঞ্চভূত বিচার আবশ্যক। এক্ষণে কি প্রকারে পঞ্চভূত বিচারদ্বারা অদ্বৈত সৎপদার্থ হৃদয়াঙ্গম হইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে।—

ইতিপূর্ব্বে উপরোক্ত ভূতবিবেকের ৫৪ শ্লোক হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকের সমালোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে নিরাকার একমাত্র সত্তা জ্ঞানই সৎ পদার্থ বা ব্রহ্ম চৈতন্য, ঐ চৈতন্যোপরি ভাসমানা কল্পনারূপিণী মায়া (শক্তি) কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান হয় ‡। প্রকৃতপক্ষে সত্যজ্ঞানের ছায়াবলম্বনে অব্যক্তা শক্তি এক একটী ব্যক্তভাবে পরিণত হইয়া আকাশ, বায়ু, তেজাদিরূপে ক্রমে বিকাশিত হয়, ভাবান্তরে বলিতে হইলে প্রকৃত জ্ঞানের ছায়াবলম্বনে অব্যক্তা প্রকৃতি বিকৃতভাবে (অর্থাৎ আকাশাদি ভূত ও ভৌতিকাদি ভৌতিক পদার্থ) প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়েন। যে জ্ঞান বা চৈতন্যে ভূত বা ভৌতিক জগৎ ভাসমান হয় সেই চৈতন্য বা জ্ঞানই সত্য। উপলব্ধভাবসমূহ (অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক জগৎ) বিকৃত বা মিথ্যা। ইতি পূর্ব্বে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মিথ্যা ভাব বিমিশ্রিত সত্যের ছায়াই জীব চৈতন্য। উহা ঐ বিকৃত ভাব সংসৃষ্ট অর্থাৎ ভৌতিক দেহ সংসৃষ্ট * হইয়া ঐ ভাবের মধ্যে (ভৌতিক দেহে) স্ফুরিত হওয়ায় তাহার নিকট ঐ বিকৃত ভাব সমূহ স্থূল জগদাকারে একত্রিত এবং সত্যের ন্যায় উপলব্ধ হয়। উপরোক্ত বিকৃতভাবের প্রথম বিকাশই আকাশ অর্থাৎ শূন্য কিছুই নাই এইরূপ ভাবের উপলব্ধি। অতএব ঐ শূন্য বা আকাশ একটি ভাবের উপলব্ধি মাত্র হওয়ায় আকাশ যে সত্য পদার্থ নহে তাহা ইতিপূর্ব্বে (অর্থাৎ উপরোক্ত ৫৪ শ্লোক হইতে ৭১ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা কালে) বিশদরূপে প্রদর্শিত ও প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে যুক্তি প্রমাণদ্বারা আকাশ মিথ্যা সৎ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে সেই যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সৎ পদার্থ ভিন্ন পৃথক বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি কোন ভূত বা ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব নাই প্রমাণিত হইবেক। সত্য জ্ঞান অনন্ত তাহার সীমা নাই ঐ জ্ঞানে গর্ভে বা জ্ঞানের মধ্যে যে ভাব কল্পিত বা স্ফুরিত হয় তাহা জ্ঞানের অন্তর্ভূত বা সীমাবদ্ধ কিন্তু জ্ঞান তাহার অন্তর্ভূত বা সীমাবদ্ধ নহে। জীবের জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ বলিয়া কথিত হয় তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে জ্ঞানের ছায়াধারী বিকৃত বুদ্ধি কর্ত্তৃক মায়াচ্ছন্ন জীবের নিকট নানাপ্রকার ভাবের বিকাশ হয় মাত্র, সত্য জ্ঞানের বিকাশ হয় না। যখন জীবের স্বভাবরূপ আবরণ ছেদ করিয়া সত্য জ্ঞানের বিকাশ হয় তখন ঐ ভাব সমূহ (অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক জগৎ) এবং তাহা-

‡ হিন্দু-পত্রিকা ষষ্ঠবর্ষ ষষ্ঠ খণ্ড ৮ম সংখ্যা ২২৩ পৃঃ হইতে ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিবিধ শরীরই ভৌতিক দেহ।

বিশ্বের জননী মায়া জ্ঞান গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে মায়া শক্তি অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী নহে এক দেশ বর্ত্তিনী। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে সত্তা জ্ঞানাবলম্বনে জগৎ কল্পনা কারিণী যে শক্তির বিকাশ হয় অর্থাৎ জ্ঞানের ছায়াধারিণী যে অব্যক্তা শক্তি ব্যক্ত বা ভাসমানা হইয়া ভূত বা ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয় সেই শক্তির নামই মায়া।

অতএব মায়াশক্তি অনন্ত সত্তা জ্ঞানের ছায়াবলম্বিনী, সুতরাং অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী নহে যে অব্যক্তা শক্তি ব্যক্ত ভাব (অর্থাৎ আকাশাদি ভাব) রূপে প্রকটিতা হয়েন সেই শক্তি কখন অনন্ত জ্ঞান ব্যাপিনী হইতে পারেন না বা অনন্ত সত্তা জ্ঞান কখন জগৎ কল্পনা কারিণী মায়া শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে যে হেতু মায়ার অতীত সত্তা জ্ঞানই শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য, কেবল সেই সত্তা জ্ঞানের উপরি ভাগে মায়া শক্তি ঐ জ্ঞানের ছায়াবলম্বনে একের পর অন্য ভাবরূপে স্তরে স্তরে প্রকটিত হয় মাত্র যেমন কল্পনারূপিণী মায়া শক্তি অনন্ত সত্তা জ্ঞানের এক দেশ ব্যাপিনী সেইরূপ ঐ কল্পনা শক্ত্যুদ্ভূত ভাবরূপ শূন্য বা আকাশ সমগ্র শক্তি ব্যাপী নহে ঐ শক্তির অন্তর্ভূত এক দেশ ব্যাপী মাত্র। যদিও কল্পনা শক্তিই কল্পিত ভাবে বিবর্ত্তিত হয় তথাচ সমগ্র কল্পনা শক্তি কখন একটী কল্পিত ভাবে বিবর্ত্তিত ও প্রকটিত হইয়া নিঃশেষিত হয় না অতএব মায়ার এক দেশ ব্যাপী আকাশ—অর্থাৎ কল্পিত ভাব কল্পনা শক্তির এক দেশ ব্যাপী—প্রমাণিত হইল।

আবার ঐ আকাশ ব্যতীত গতি বা বেগের প্রসার হইতে পারে না যেমন অন্তর্জগৎ অবকাশ (Vacant.) না থাকিলে কল্পনার বিস্তার বা তাহার গতির প্রসার হয় না বাহ্য জগতেও তদ্রূপ অবকাশ বিনা গতির উপলব্ধি অসম্ভব সুতরাং আকাশরূপ ভাবের মধ্যেই বায়ু প্রকল্পিত হয় ঐ বায়ু সমস্ত আকাশ ব্যাপী নহে ঐ আকাশের মধ্যে যথায় গতি (Motion.) উৎপন্ন হয় তথায় বায়ুর বিকাশ হয় অতএব বায়ু আকাশের একদেশ ব্যাপী গতি বিশিষ্ট কোন বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষণ (Friction.) উপস্থিত হইলে উষ্ণতার বা তেজের বিকাশ হয় সুতরাং বায়ুর আণবিক সংঘর্ষণে উষ্ণতা বা তেজ বায়ুর মধ্যে ব্যাপী নহে বায়ুর মধ্যে যথায় আণবিক সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তথায় অগ্নি বা তেজের বিকাশ হয় ঐ তেজ বা অগ্নির মধ্যে অণু সকল দ্রব ও দ্রবীভূত হওয়ায় ঐ তেজের মধ্য হইতে জল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উষ্ণতা হইতে বিয়োজিনী শক্তির বিকাশ হয় তৎপ্রভাবে যে সকল অণুদ্রব ও দ্রবীভূত হয় তাহাই জলে পরিণত হয়। পূর্ব্ব সংঘর্ষণহেতু ঐ জলের মধ্য হইতে উষ্ণতা বা তৈজসাংশ বাষ্পীভূত এবং উর্দ্ধে বিকীরিত (Evaporuted.) হওয়ায় ঐ জলের—নিম্নাংশ শীতল ও আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতি বা মৃত্তিকায় পরিণত হয় এতাবতায় প্রমাণিত হইতেছে যে আকাশের একাংশে বায়ু বায়ুর একাংশে তেজ, তেজের

হিন্দু-পত্রিকা ৭ম খণ্ড ৮ম সংখ্যার ২২৫ পৃষ্ঠা হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৩০৬ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ।

একাংশে জল, জলের একাংশে মৃত্তিকা পরিকল্পিত হইয়াছে। সত্য জ্ঞানই সৎ পদার্থ, সৎ অর্থে অস্তিত্ব যাহা চিরকাল আছে, এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে কোন ভাবেরই বিকাশ হয় না অতএব চৈতন্য বা জ্ঞানই চির অস্তিত্বশীল্‌ এ সত্য জ্ঞানাবলম্বনে যে যে ভাবের বিকাশ হয় সেই সেই ভাব এক একটী গুণের বিকাশক এ প্রথম ভাবের বিকাশই আকাশ বা অবকাশ এ আকাশে শব্দগুণ আছে কিন্তু সৎপদার্থে তাহা নাই ইহার তাৎপর্য্য এই যে চির অস্তিত্ববান্‌ চৈতন্য সমুদ্রে এক একটী ভাব বা গুণ ভাসমান হয় চৈতন্যই তাহা অনুভব করেন সুতরাং অনুভাবক বা জ্ঞাতা কখন অনুভূত বা জ্ঞাত পদার্থ নহেন এ ভাবময় পদার্থ চৈতন্য বা জ্ঞান সমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞাতার নিকট অনুভূত হয়। যে চৈতন্যের শক্তি কর্ত্তৃক ভাবের বিকাশ হয় তাহাই চিচ্ছক্তি বা জ্ঞান শক্তি যে চৈতন্য বা জ্ঞানের নিকট ঐ ভাব অনুভাব হয় সেই জ্ঞানই জ্ঞাতা অতএব স্বয়ং চৈতন্যই—জ্ঞান ও জ্ঞাতা উহাই সৎ পদার্থ শব্দাদি গুণ চৈতন্যে ভাসমান হইয়া ঐ চৈতন্যের নিকট অনুভূত হয়।

যে সৎ পদার্থ অবলম্বনে শক্তির বিকাশ হয় ঐ শক্তি বিকাশের পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় সৎ বা সত্তামাত্রই থাকেন সেই সৎ বা সত্তাং নির্গুণ ব্রহ্ম। ঐ সৎ পদার্থে শক্তির বিকাশ হইলে চিৎ সমুদ্রেরও গুণময় হইয়া উঠে এ গুণময় চিৎ সমুদ্রই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যখন এ গুণময় চৈতন্য সমুদ্রে জ্ঞানবিকাশিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও ভাব বিকাশক সঙ্কল্পাত্মক মন, ভাসিয়া উঠে তখন এ মন কর্ত্তৃক সৃষ্টি কল্পনা সূচক এক একটী ভাবের বিকাশ হয় এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক তাহা উপলব্ধ ও সুব্যবস্থিত হয় যে চৈতন্য, এভাব উপভোগ করেন সেই সমষ্টি চৈতন্যই জীব ঘনহিরণ্যগর্ভ, ব্যষ্টি, চৈতন্যই তৈজস জীবাত্মা। এ হিরণ্যগর্ভরূপ পূর্ব্বোক্ত চিৎসমুদ্রে গুণ সকল ভাসমান ও স্থূল ভাবাপন্ন হইয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড রূপে পরিণত হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম ও জীব সাকার। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সূক্ষ্ম চৈতন্যে যখন কোন ভাবের বিকাশ না হয় তখন চৈতন্য নিষ্ক্রিয় নির্গুণ কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত থাকেন যখন চৈতন্যে গুপ্ত বা নিদ্রিত ক্রিয়াশক্তি জাগরিত হয় তখন এ শক্তি প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য করেন বলিয়া প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়েন এ প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃই মহত্তত্বের অর্থাৎ-সমষ্টি বুদ্ধি তত্বের বিকাশ হয় এ মহত্তত্ব ভাবময়মানসাকারে (Jdeal form এ) পরিণত হয় এবং প্রকৃতির গর্ভে নানাভাব প্রকটিত হয়। মনে করুন যখন আপনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন তখন কোন ভাবেরই বিকাশ থাকে না কিন্তু অব্যক্ত শক্তি কর্ত্তৃক নিদ্রোত্থিত হইলে স্মৃতিও জাগরিত এবং তৎসহ যে কোন প্রকার একটি মনোভাব (Idea.) অন্তরে গঠিত হইতে থাকে এবং তাহা মানসাকারে——পর্য্যবসিত হয় এ মানসাকার কখন নিরাকার নহে এ সূক্ষ্ম মানসাকারই স্থূল আকারে বা রূপের [illegible] উহা সাকার ঐ মানসিক ভাব বা মানসাকারের মধ্যে গুণের স্ফূর্ত্তি হয় গুণ ব্যতীত ভাবের

এবং জ্ঞান ব্যতীত তাহার স্ফুরণ অসম্ভব, অর-
ই নিম্নোল্লিখিত কারণে আপনার মস্তিষ্ক মধ্যে
মনোভাবের স্ফুরণ বা মানসিক ক্রিয়া হইতে
থাকে এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক ঐ সকল ভাবের
নিশ্চিত জ্ঞান বা উপলব্ধিও হয় কিন্তু স্বয়ং
মস্তিষ্ক ঐ সকল ভাবের বা বোধের জনক নহে
নিরাবলম্বন প্রকৃতির এবং প্রাকৃতিক পঞ্চ-
ভূতের ভৌতিক পদার্থের মধ্যেও মন বুদ্ধি
আছে। অতএব চৈতন্য নাই তাহার আ
জনক, শক্তিই জননী, মস্তিষ্ক মন বুদ্ধি প্রকা-
শের যন্ত্র মাত্র ঐ মস্তিষ্কস্নায়বীয় পদার্থ উহা
দেহের উত্তমাংশ হইলেও দৈহিক পদার্থ।
দেহ পিতা মাতার শুক্র শোণিত সংযোগে
উৎপন্ন হয় ঐ শুক্র শোণিত অন্ন (খাদ্যদ্রব্য)
উদ্ভিদ ও খনিজ প্রভৃতি পদার্থ হইতে, ঐ
সকল পদার্থ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ও আকাশ
এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয় আকাশ বা
অবকাশ ব্যতীত কোন বস্তুর সংশ্লেষণ বিশ্লে-
ষণ হইতে পারে না। যদি কোন বস্তুর মধ্যে
ছিদ্র বা অবকাশ না থাকে তবে সেই বস্তুর
যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ অসম্ভব ইহা বোধ হয়
প্রমাণ করিতে হইবেক না যেমন একটী
রেখাকে দুই বা বহু বিন্দে পরিণত করিতে
হইলে ঐ উভয় বিন্দুর বা বিন্দু সমূহের মধ্যে
ছেদ বা অবকাশ আবশ্যক সেইরূপ কোন
বস্তু বিশ্লেষণ দ্বারা দুই বা বহু উপাদানে পরি-
ণত করিতে হইলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের
পার্থক্যসূচক ব্যবচ্ছেদ অবশ্যই আবশ্যক
উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মাণ্ডের
প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক উপাদান ক্ষিত্যপ-
তেজ মরুৎ হইতেছে ঐ চতুর্বিধ উপাদানের
মধ্যে ছিদ্র বা আকাশ আছে অতএব সমস্ত
বস্তুই পঞ্চভূতোৎপন্ন পদার্থ যখন এই পঞ্চভূত
বা পঞ্চ ভৌতিক পরমাণু সমষ্টি হইতে সমস্ত
জগৎ ও জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে
তখন জীবের প্রাণ মন প্রভৃতির সূক্ষ্ম উপা-
দান যথাক্রমে শুক্র শোণিতের মধ্যে এবং ঐ
শুক্র শোণিতের মূল উপাদান পঞ্চভূতের
মধ্যে লুক্কায়িত আছে বীজের মধ্যে বৃক্ষ না
থাকিলে বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ অসম্ভব
এবং অবৈজ্ঞানিক। ঐ জীবের দৈহিক
দৈবিক এবং মানসিক উপাদান এরূপ অবি-
চ্ছিন্ন ওতপ্রোত ভাবে সংসৃষ্ট যে তাহা কোন
ক্রমে পৃথক বা বিশ্লেষ করা যায় না দেহের
সপ্ত ধাতুর মধ্যে জীবাণুসকল ওতপ্রোতভাবে
আছে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা এক বিন্দু রক্তের
মধ্যে সহস্র জীবাণু দৃষ্ট হয় অথবা ঐ সহস্র
জীবাণুসমষ্টিই একবিন্দু রক্ত, জীবাণুর ক্রিয়া
রুদ্ধ হইলে বায়ুর গতি রোধ, উষ্মতার অভাব
ও ধাতু বিকৃত হয় এবং রক্ত জলীয় ভাগ মাত্র
পর্য্যবসিত হইয়া শরীরের পোষণ ক্রিয়াও
রহিত হয়। অন্ন হইতে জৈবোপাদান প্রস্তুত
হয় এবং তদ্দ্বারা ধাতু সকল পুষ্ট, শরীর
পোষিত ও বলশালী হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা-
নিকগণ স্থির করিয়াছেন যেমন বীজের মধ্যে
একজাতীয় সূক্ষ্ম আটাল পদার্থ (যাহাকে
প্রটোপ্লাজম্ কহে) থাকায় সরসমৃত্তিকার
মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত এবং পোষিত হইয়া ক্রমে
বৃক্ষাকারে পরিণত হয় সেইরূপ শুক্র শোণি-
তের মধ্যে জীবাণু থাকায় মাতৃগর্ভে জীবদেহ
অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়া মনুষ্য গো প্রভৃতি
আকারে বিবর্ত্তিত হয়) এখন বুঝিলাম যে
পঞ্চভূতের মধ্যে জীবাণু বা জৈবোপাদান
রূপা প্রকৃতির মধ্যে পোষণ শক্তি আছে।

জৈবোপাদান বা পোষণশক্তি দ্বারা দেহ পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়; কিন্তু জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্লীহা, যকৃৎ, অণ্ড, ধমনী, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্র (Organs) প্রভৃতি যেখানে যাহা আবশ্যক, তাহার গঠন এবং তন্মধ্যে শারীরিক শক্তি এবং মানসিক জ্ঞানের বিকাশ, মস্তিষ্ক মধ্যে কল্পনা, চিন্তা, বিবেক, যুক্তি প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি কেবল জৈবোপাদান বা প্রকৃতির পোষণশক্তি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। সংকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যতীত উপরোক্ত মত সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব; এতাবতা সাব্যস্ত হইতেছে, প্রকৃতির মধ্যে মানসাকারে (Ideal fomএ) সৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে কল্পিত হইয়া প্রকৃতির পোষণশক্তি কর্ত্তৃক স্থূলে পরিণত হয়। প্রকৃতির মধ্যে যাহা আছে, প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেও তাহা আছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে চৈতন্য সূক্ষ্ম মানসাকারে সূক্ষ্মরূপে কল্পিত হইয়া স্থূলে পরিণত হয়। সমুদ্র যেমন আবর্ত্ত, ফেন ও বুদ্‌বুদে পরিণত হয়, তদ্রূপ সৎ পদার্থই সূক্ষ্ম মানসাকারে পরিণত হইয়া ভূত ও ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। যেমন সমুদ্রের স্রোত আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত, ঘূর্ণিত ও মন্দীভূত হইয়া ফেন-বুদ্‌বুদে পরিণত হয় এবং ঐ বুদ্‌বুদ ও ফেনরাশি ক্রমে ঘনীভূত হওয়ায় সমুদ্র-গর্ভে মৃত্তিকার সঞ্চার হইতে থাকে, পরে উহা দ্বীপরূপে বিবর্ত্তিত হয়।

সেইরূপ চিৎশক্তি মায়াবর্ত্তে নিপতিত ও ঘূর্ণিত হইয়া মানসাকারে—পরে সূক্ষ্মাকারে পঞ্চতন্মাত্রে বা পাঞ্চভৌতিক পরমাণুময় সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়েন এবং তাহাই ঘনীভূত হইয়া স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। অনেকেই অবগত আছেন যে, হাইড্রজন্ ও অক্‌সিজন, এই দুই জাতীয় অদৃশ্য বাষ্প যন্ত্র-বিশেষে একত্রিত করিয়া তন্মধ্যে তড়িৎ পাস্ করিলে, ঐ অদৃশ্য বাষ্প দ্রব পদার্থে অর্থাৎ জলাকারে পরিণত হয় এবং ক্রিয়া-বিশেষদ্বারা ঐ জল এক এক খানি বরফে পরিণত করা যাইতে পারে; অতএব অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে স্থূল পদার্থের বিকাশ অবৈজ্ঞানিক নহে। যেমন আবর্ত্ত, ফেন, বুদ্ বুদ্, জল ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে এবং ঐ আবর্ত্ত মধ্যে উহাদিগের মৃণ্ময় দ্বীপে বিবর্ত্তনও জলের বিকার মাত্র, সেইরূপ মানসাকারে কল্পিত (পঞ্চতন্মাত্র বা পাঞ্চভৌতিক পরমাণুময়) সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্য ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে এবং উহাদিগের এই দৃশ্য স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তনও চৈতন্যের বিকার মাত্র; অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের নিকট ভ্রান্ত বা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মাত্র।

এতাবতা প্রমাণিত হইতেছে যে, আবর্ত্ত, ফেন, বুদ্ বুদ্ প্রভৃতির ন্যায় পঞ্চভূত বা ভৌতিক জগৎ মিথ্যা। পরমার্থ-জ্ঞানে ভূত ও ভৌতিক জগৎ মিথ্যা হইলেও, লৌকিক ব্যবহারে মিথ্যা নহে; যেহেতু পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধনাদ্বারা উহা লাভ করিতে হয়। ঐ সাধনা কর্ম্ম ও বিচারমূলক এবং তাহাতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে না; অতএব সাধনাদ্বারা বিষয় জ্ঞান, পরমাত্ম-জ্ঞানে এবং জীবচৈতন্য, অনন্তব্রহ্মচৈতন্যে লীন না হইলে, ভূত বা ভৌতিক জগৎ যে

মিথ্যা, ইহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি হয় না। ঐরূপ পরমাত্ম জ্ঞানের উদয় হইলে, জীব জীবন্মুক্ত হয় এবং ভাবী কর্ম্মের বীজ নষ্ট ও বিদেহ-মুক্তি লাভ হয়। ঐ মুক্ত পুরুষের দেহ-ত্যাগ যেরূপেই হউক, তাঁহার পরমাত্ম-জ্ঞানের ধ্বংস হয় না। সাধনা দ্বারা পরমাত্ম-অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই জগৎ মিথ্যা—মায়াময় বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতি সর্ব্বদা অনাস্থা প্রদর্শন আবশ্যক। যাহা সর্ব্বদা চিন্তা করা যায় এবং যুক্তি ও বিবেক দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, কার্য্যও তদনুবর্ত্তী হয়। একাগ্র-চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে মনও তদাকার ধারণ করে এবং অন্তরে তাহা বদ্ধমূল হয় দেহ-ত্যাগ দ্বারা এ বদ্ধমূল অদ্বৈত জ্ঞান নষ্ট হয় না। এজন্য সর্ব্বদা দ্বৈত জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা ও শোকতাপপূর্ণ মায়াময় মিথ্যা জগতের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন আবশ্যক; তদ্দ্বারা হৃদয়ে শান্তিলাভ ও অদ্বৈত জ্ঞান বদ্ধমূল হয়। অতএব পঞ্চভূত বিচার দ্বারা যে ভূত এবং ভৌতিক জগৎ মিথ্যা, একমাত্র পরমাত্মজ্ঞানই সত্য, তাহা প্রমাণিত হইল।

শ্রীশশিভূষণবন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চদশী

পঞ্চকোষ বিবেক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুহাহিতং ব্রহ্ম যৎতৎ পঞ্চকোষ বিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোষপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥১

তৈত্তিরীয়োপনিষত্তাৎপর্য্যব্যাখ্যানরূপং পঞ্চকোষ বিবেকস্য প্রকরণমারাভমাণ গুহাহিতমিতি। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমব্রহ্মন্নিত্যাদি শ্রুত্যা গুহাহিতত্বে—নাভিহিতং যদ্ ব্রহ্মাস্তি তদ্ গুহা শব্দ—বাচ্যানুময়াদি কোষপঞ্চকবিবেকেন জ্ঞাতুং শক্যতে যতঃ ততস্তেষাং কোষাণাং পঞ্চকং প্রত্যাগাত্মনঃ সকাশাত্ বিভজ্য প্রদর্শ্যত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। গুহাগত যে ব্রহ্ম, তাঁহা পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা বুঝাযায়; তদ্ধেতু পঞ্চ-কোষ বিচার করা আবশ্যক।

তাৎপর্য্যার্থ। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পঞ্চ-কোষ রূপ গুহাগত অদ্বৈত পরম ব্রহ্মকে জানিয়া, সেই অনাদি সর্ব্বময় পরম পিতা পরম পুরুষের সহিত ঐক্যভাবে অনির্ব্ব-চনীয় অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু "গুহা" শব্দবাচ্য পঞ্চকোষ বিবেকদ্বারা তাহারি স্বরূপ জ্ঞাত হওয়াযায়। অতএব এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষবিবেক কথিত হই-তেছে; যেহেতু পঞ্চকোষরূপ গুহাগত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান আবশ্যক হইলে, সেই পঞ্চকোষ বিচার আবশ্যক।

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা। ২।

নন্বু কেয়ং গুহা যস্যা নিহিতং ব্রহ্ম কোষপঞ্চকবিবেকেনাবধুধ্যাত ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুত্যা গুহা শব্দেন বিবক্ষিতমর্থমাহ দেহাদভ্যান্তর প্রাণ ইতি। দেহাদন্নময়াৎ প্রাণঃ প্রাণময়ঃ অভ্যন্তরঃ আন্তরঃ। প্রাণাৎ প্রাণময়াৎ মনঃ মনোময়ঃ অভ্যন্তরঃ আন্তরঃ। ততো মনোময়াৎ কর্ত্তা—বিজ্ঞানময়ঃ আন্তরঃ ইত্যনুবর্ত্ততে। ততো বিজ্ঞানময়াৎ ভোক্তা আনন্দময়ঃ সোহপি পূর্ব্ববদান্তর ইত্যর্থঃ।

সেয়ং অন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তানাং পরম্পরা গুহা শব্দে নোচ্যত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরে মন, তদভ্যন্তরে কর্ত্তা এবং তদভ্যন্তরে ভোক্তা, এই সকলই গুহা-পরম্পরা।

তাৎপর্য্যার্থ। এই অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ আছে। সেই প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে মনোময় কোষ, মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ আছে। এইরূপে পরম্পরা ক্রমে বর্ত্তমান অন্নময়াদি পঞ্চকোষ গুহা শব্দের বাচ্য, অর্থাৎ এইস্থলে "গুহা" শব্দদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে বুঝাইতেছে।

পিতৃ ভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোহন্নেনৈব বর্দ্ধতে। দেহঃ সোহন্নময়ো নাত্মা প্রাক্‌চোর্দ্ধ্বং তদভাবতঃ॥৩

ইদানীমন্নময়স্য স্বরূপং তদনাত্মত্বশ্চ দর্শয়তি পিতৃভুক্তান্নজাৎইতি। পিতৃভুক্তান্নজাৎ পিতৃ মাতৃভ্যাং ভুক্তাদ্‌ব্রীহ্যাদি লক্ষণাদন্নাজ্জায়মানং যদ্ বীর্য্যং তস্মাদ্ বীর্য্যাদ্ যোদেহঃ জাতঃ যশ্চ জননানন্তরং অন্নেনৈব বর্দ্ধতে সদেহোহন্নময়োহন্নস্য বিকারঃ স আত্মা ন ভবতি। কুতঃ ইত্যত আহ প্রাক্ চোর্দ্ধমিতি। জন্মনঃ প্রাক্ মরণাদূর্দ্ধ্বঞ্চ তদভাবিতত্বস্য দেহস্য-অভাবাদিত্যর্থঃ। দেহ আত্মা ন ভবতি কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ—ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়; সেই বীর্য্যোৎপন্ন দেহ অন্নদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়; সেই অন্নময় দেহ পূর্ব্বে ছিল না; পরেও থাকিবে না, তদ্ধেতু উহা আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে পঞ্চকোষের নাম মাত্র উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই কোষপঞ্চকের প্রত্যেকের স্বরূপ ও তাহাদিগের অনাত্মত্ব প্রকাশ মানসে প্রথমতঃ অন্নময় কোষের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মত্ব নিরূপণ করিতেছেন। পিতা মাতা যে সকল অন্ন আহার করেন, সেই সকল অন্ন পরিপাক পাইয়া, পরিণামে শুক্র-শোণিত হইতে শরীর উৎপন্ন হইয়া, অন্নময় রসদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শরীর—অর্থাৎ স্থূল দেহ, এইরূপে অন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারাই বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সেই স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে, কিন্তু এই স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষ জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না এবং মরণের পরেও থাকিবে না, অতএব এই কোষকে নিত্যশুদ্ধ অবিনাশী বা আত্মার স্বরূপ বলাযায় না, অর্থাৎ উহা অনিত্য।

পূর্ব্বজন্মন্যসত্ত্বে তজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্

ভাবিজন্মগ্রসৎকর্ম্ম স ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪

এতদ্দেহরূপস্যাত্মনঃ পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি অসত্বাৎ এতজ্জন্ম-হেত্বদৃষ্টাসম্ভবেঽপি অস্য জন্মনোঽপ্যঙ্গীক্রিয়মানত্বাদকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যেত তথা ভাবিজন্মন্যপি অস্য দেহরূপস্যাত্মনোঽসত্বাদত্রাবাদিহানুষ্ঠিতয়োঃ পুণ্যাপাপয়োঃ ফলভোক্তৃত্বাভাবেন ভোগমন্তরেণাপি কর্ম্মণঃ প্রসজ্যেতায়ং কৃতনাশ এবং অকৃতাভ্যাগমকৃতনাশরূপ বাধক সদ্ভাবাদাত্মনঃ কার্য্যত্বং নাঙ্গীকর্ত্তব্যমিতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বজন্ম অভাবহেতু তাহার কি প্রকারে জন্ম হইতে পারে? ভাবী জন্মের অভাবহেতু ইহজন্মের কর্ম্মফল ভোগ অসম্ভব।

তাৎপর্য্যার্থ। যদি বল, উৎপত্তি-বিনাশশালী স্থূল দেহ অনিত্য হইলেও তাহাকে আত্মা স্বীকার করিলে হানি কি আছে? তদ্বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিতেছেন,—পূর্ব্ব জন্মে যে স্থূল দেহ অসৎ ও অনিত্য ছিল, ইহজন্মে সেই অনিত্য স্থূল দেহের কিপ্রকারে জন্ম হইতে পারে? যে বস্তু একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহার জন্ম কথনই হইতে পারে না। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলভোগার্থ ইহকালে জন্ম হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত কর্ম্মভোগের অনুরোধ ব্যতিরেকে কাহারও ইহকালে জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। আর পর জন্মে যে পদার্থ অসৎ হইবে, সে ইহকালে যে সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাহাও অসম্ভব। কারণ জন্মান্তরের স্বাঙ্গীকৃত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্তই পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিয়া ইহজন্মে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্য বর্জ্জনাৎ ॥৫

এবমন্নময় কোষস্যানাত্মত্বং প্রদর্শ্য প্রাণময় কোষ স্বরূপং তদনাত্মত্বঞ্চ দর্শয়তি পূর্ণো দেহে বলমিতি। যো বায়ুঃ দেহে পূর্ণঃ পাদাদি মস্তক পর্য্যন্তং ব্যাপ্তঃসন্ বলং যচ্ছন্ ব্যানরূপেণ সামর্থ্যং প্রযচ্ছন্নক্ষাণাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকঃ প্রেরকো বর্ত্ততে স বায়ুঃ প্রাণময় ইত্যুচ্যতে। অসাবপ্যাত্মা ন ভবতি। জড়ত্বাৎ ঘটবদিতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত যে বায়ু দেহের বল প্রদান করে এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক হয়, সেই বায়ু প্রাণময় কোষ; ঐ বায়ু চৈতন্যাভাব হেতু আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইরূপে স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রাণময় কোষের অনাত্মত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু অন্নময় কোষরূপ শরীরের বলাধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে নিয়োজিত করে, সেই পরিপূর্ণ স্বভাব বিশিষ্ট প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে প্রাণময় কোষ বলে। সেই প্রাণময় কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু সেই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু জড় পদার্থ, তাহাদিগের চৈতন্য নাই।

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।

কামাদ্যাবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬

ইদানীং মনোময়স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বকং তস্যাপ্যনাত্মত্বমাহ অহন্তাং মমতামিতি। দেহে অহন্তাম্ অহম্ভাবং গৃহাদৌ মমতাং মদীয়ত্বাভিমানং চ যঃ করোতি অসৌ মনোময় আত্মা ন ভবতি। কুত ইত্যত আহ কামাদ্যাবস্থয়া ভ্রান্ত ইতি হেতু দর্শিতং বিশেষণং কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিমত্ত্বে—নানিয়ত স্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ মনোময় আত্মা ন ভবতি বিকারিত্বাদ্দেহবদিতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহ আমি,গৃহাদি আমার, যে বোধ করে এবং যে কামাদি অবস্থাদ্বারা ভ্রান্ত, সেই মনোময় আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইক্ষণ মনোময় কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অহঙ্কারের বশীভূত যে মন, তাহাকে মনোময় কোষ বলে। সেই মন ভ্রান্তিজ্ঞানের বাধ্য হইয়া অন্নময় কোষ স্বরূপ শরীরকে অহং জ্ঞান করে এবং পুত্র-মিত্র-গৃহ-ধনাদিরূপ অসার সংসারে আত্মবোধ করে, কিন্তু সেই মনোময় কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা সেই মনোময় কোষের বিকার জন্মিয়া থাকে। আত্মা নির্ব্বিকার ও অভ্রান্ত, তাহার কোন কারণে বিকার হয় না বা ভ্রান্তি-জ্ঞানও জন্মে না। সুতরাং ভ্রান্ত ও বিকৃত পদার্থ মনোময় কোষ কখনই আত্মা হইতে পারে না।

লীনা সুপ্তৌ বপুর্ব্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।

চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময় শব্দভাক্। ৭

অনন্তরং কর্ত্তৃ শব্দাবাচ্যস্য বিজ্ঞানময়স্য স্বরূপং প্রদর্শয়ন্ তদনাত্মত্বং দর্শয়তি লীনাসুপ্তাবিতি। যা চিচ্ছায়োপেতা ধীঃ চিদাভাসসহিতা বুদ্ধিঃ সুপ্তৌ সুষুপ্তিকালে লীনা বিলীনা সতী বোধে জাগরণকালে আনখাগ্রগা নখাগ্র পর্য্যন্তং বর্ত্তমানা সতী বপুঃ শরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ সংব্যাপ্য বর্ত্ততে সা বিজ্ঞানময় শব্দভাক্ বিজ্ঞানময় শব্দেনোচ্যমানা অসাবপ্যাত্মা অসৌ-অপি আত্মা ন ভবতি। বিলয়াদ্যবস্থাবত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে সুপ্তিকালে লীনা জাগরণ কালে নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, সেই চিচ্ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ কহে। ঐ বিজ্ঞানময় কোষ আত্মা নহে।

তাৎপর্য্যার্থ। এইক্ষণ বিজ্ঞানময় কোষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যে বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং পুনরায় জাগ্রদবস্থায় নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে, এই বুদ্ধি চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট। উক্ত প্রকারে এই বুদ্ধির উৎপত্তি-বিনাশ হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি উৎপত্তি বিনাশ বা প্রলয়শীল পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে ঘটাদি জড় পদার্থকেও আত্মা বলিতে পার।

কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েত্যান্তরিন্দ্রিয়ম্

বিজ্ঞান মনসী অন্তর্ব্বহিশ্চৈতে
পরস্পরম্। ৮

নন্থ মনোবুদ্ধ্যোরন্তঃকরণাখ্যা বিশেষাৎ মনোময় বিজ্ঞানময় স্বরূপেণ কোষদ্বয় কল্পনানুপপন্না ইত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং ভেদসদ্ভাবাৎ ঘটত এব মনোময়ত্বাদি ভেদ ইত্যাহ কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যামিতি। অন্তরিন্দ্রিয়মন্তঃকরণং কর্ত্তৃত্ব করণত্বাভ্যাং কর্ত্তৃরূপেণ করণরূপেণচ বিক্রিয়েত পরিণমত ইত্যর্থঃ। এতে কর্ত্তৃকরণে বিজ্ঞানমনসী বিজ্ঞানমনঃ শব্দ বাচ্যে ভবতঃ। এতেচ পরস্পরমন্তর্ব্বাহ্য ভাবেন বর্ত্তেতে অতঃ কোষদ্বয়মুপপন্নত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তৃত্ব ও করণত্ব দ্বারা অন্তর-ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়—বিজ্ঞান অন্তর মন বাহ্যে পরস্পর বিকৃত হয়।

তাৎপর্য্যার্থ। মন এবং বুদ্ধি, উভয়ই অন্তঃকরণ হইতে বিভিন্ন হইলেও, সামান্যতঃ উক্ত পদার্থদ্বয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হয়। অতএব এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্যার্থ কি? যদি উভয়ই এক পদার্থ হইল, তবে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিলেন কেন? উভয় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্য এইযে, একই অন্তঃকরণ কর্ত্তৃত্বরূপে ও করণত্বরূপে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি কর্ত্তৃত্বরূপে বিকৃত হইয়া বিজ্ঞানময় শব্দে অভিহিত হয় এবং মন বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময় কোষ শব্দের বাচ্য হয়। আপাততঃ উভয়ের একত্বরূপে প্রতীতি হইলেও, কর্ত্তৃত্ব ও করণত্ব রূপে বিভিন্নতা আছে।

কাচিদন্তর্ম্মুখা বৃত্তিরানন্দ প্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে। ৯

কাদাচিত্কত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতে॥ ১০

ইদানীং ভোক্তৃ শব্দ বাচ্যস্যানন্দময়স্যানন্দত্বং দর্শয়িতুং তস্য স্বরূপমাহ কাচিদন্তর্ম্মুখাবৃত্তিরিতি। পুণ্যভোগে পুণ্যকর্ম্মফলানুভব কালে কাচিদ্ধ বৃত্তিরন্তর্ম্মুখা সতী আনন্দ প্রতিবিম্ব ভাক্ অন্তস্বরূপস্য আনন্দস্য প্রতিবিম্বং ভজতে সৈব ভোগশান্তৌ পুণ্যকর্ম্মফলভোগোপরমে সতি নিদ্রা রূপেণ লীয়তে বিলীনা ভবতি সা বৃত্তিরানন্দময় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

অস্যানাত্মত্বমাহ কাদাচিৎ কত্বত ইতি। অথমানন্দময়োঽপি কাদাচিৎকত্বাৎ আত্মা ন স্যাদভ্রাদি পদার্থবৎ ইত্যর্থঃ নন্থ বিজ্ঞমানানামানন্দ ময়াদীনাং সর্ব্বেষাম্ আত্মত্ব নিরাশে নৈরাত্ম্যং প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্যাহ বিম্বভূতো য ইতি। বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতস্য অবস্থিতস্য প্রিয়াদি শব্দ বাচ্য স্যানন্দময়স্য বিম্বভূতঃ কারণভূতো য আনন্দ অসাবেবাত্মা অসৌ এব আত্মা ভবতি কুত ইত্যাত আহ সর্ব্বদা স্থিতেরিতি। নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ বিবাদাধ্যাসিত আনন্দ আত্মা ভবিতুমর্হতি নিত্যত্বাৎ য আত্মা ন ভবতি নাসৌ নিত্যো যথা দেহাদিঃ। গগনাদেরুৎপত্তিমত্ত্বেনানিত্যত্বাৎ নৈকান্তিকতেতিভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে অন্তর্মুখা বৃত্তি পুণ্য-ভোগকালে আনন্দের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগান্তে নিদ্রারূপে বিলীনা হয়, তাহা-কেই আনন্দময় কোষ কহে।

আনন্দময় কোষও আত্মা নহে; উহা অন্নাদিবৎ—উহার বিম্বভূত যে আনন্দ, সেই আনন্দই নিত্য আত্মা রূপে স্থিত।

তাৎপর্য্যার্থ। আনন্দময় কোষকে ভোক্তা বলা যায়, এ ভোক্তৃ শব্দবাচ্য আনন্দ-ময় কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনা-ত্মত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যে বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যকর্ম্মের ফল-ভোগ কালে আত্মার অন্তর্গত সুখ স্বরূপ হইয়া সেই চিদানন্দময় আত্মাস্বরূপের প্রতি-বিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগাবসান কালে নিদ্রারূপা প্রকৃতিতে লীন থাকে, সেই আন্ত-রিক বুদ্ধিবৃত্তিকে আনন্দময় কোষ বলিয়া থাকে। এই আনন্দময় কোষ ক্ষণভঙ্গুর, চিরকালস্থায়ী নহে। এই নিমিত্ত উক্ত আনন্দময় কোষকে আত্মা বলাযাইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষীভূত অন্নময় কোষাদির মধ্যে কোন একটীকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তবে আত্মাও স্বীকার করিও না; এই আশঙ্কায় আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। যিনি অন্নময়াদি পঞ্চ কোষের অতিরিক্ত আনন্দময়ের প্রতিবিম্ব-ভূত সৎস্বরূপ অখণ্ড চিদানন্দময় বুদ্ধ্যাদির আশ্রয়, তিনিই আত্মা। সেই আত্মা নিত্য দেহাদির ন্যায় তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যং ।২৩

পদব্যাখ্যা। দ্রব্যাণাং—দুই কিম্বা বহু অবয়বরূপ দ্রব্যের। দ্রব্যং—অবয়বিস্বরূপ দ্রব্য। কার্য্যং—জন্য। সামান্যং—এক।

অনুবাদ। দুইটী অবয়ব হইতে অথবা ততোধিক অবয়বসমষ্টি হইতে একটী অব-য়বী স্বরূপ দ্রব্য জন্মে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, একটী পদার্থে নানাকার্য্যের আরম্ভকত্ব আছে। এক্ষণে এক জাতীয় একাধিক পদার্থে যে একটি মাত্র কার্য্যের আরম্ভকত্ব থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। দুইখানি কপালের সংযোগে যেমত একটি মাত্র ঘট জন্মে, তদ্রূপ কতকগুলি তন্তু-সমষ্টি হইতে একখানা মাত্র বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে জন্য দ্রব্য মাত্রেই দুই বা ততোধিক অবয়বা-শ্রিত হইয়াথাকে।

গুণবৈধর্ম্ম্যান্ন কর্ম্মণাং কর্ম্ম ॥ ২৪

পদব্যাখ্যা। গুণবৈধর্ম্ম্যাৎ—গুণেতে না থাকে, এতাদৃশ ধর্ম্ম থাকাপ্রযুক্ত। ন—নয়। কর্ম্মণাং—দুই বা বহু কর্ম্মের। কর্ম্ম—গম-নাদি ক্রিয়াপদার্থ (এস্থলে পূর্ব্বানুষঙ্গিক কার্য্য পদের অন্বয় হইবে।)

অনুবাদ। কর্ম্মেতে গুণের বৈধর্ম্ম্য আছে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সাধর্ম্ম্য নাই, এনিমিত্ত সজাতী-

সারত্ব্য-গুণের ন্যায় কর্ম্ম যে অন্যান্য কর্ম্ম-জনিত নয়, তাহা অসঙ্গত নহে।

তাৎপর্য্য। নানা অবয়বের নানারূপ হইতে অবয়বীর একটী মাত্র রূপ জন্মে; যেমত কপালদ্বয়ের রূপ হইতে ঘটীয় রূপ; এ ঘটীয় রূপ গুণ-পদার্থের অন্তর্গত; সুতরাং গুণে যে সজাতীয় অনেক জন্যত্ব আছে, ইহা স্থিরীকৃত। ঐ গুণ এবং কর্ম্ম, উভয়ে একমাত্র দ্রব্যাশ্রিত বলিয়া পরস্পর সমানধর্ম্মীও হইয়াছে। সধর্ম্মীদের মধ্যে একে যে ধর্ম্মটী থাকে, অন্যেতেও অবশ্য সেই ধর্ম্মটী থকিবার সম্ভাবনা; তাই গুণের ন্যায় সজাতীয় জন্যত্বটী কর্ম্মেতে না থাকিবে কেন? এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তর স্থলে সূত্রে বলা হইতেছে যে, কর্ম্মেতে গুণের কেবল সাধর্ম্ম্যই আছে, এমত নহে, গুণ-ধর্ম্ম-কর্ম্মত্ব নামক ধর্ম্মটী যে কর্ম্মে থাকে, তাহা কেহই অস্বীকার করেনা। এমত অবস্থায় কর্ম্মে সজাতীয় জন্যত্ব নামক অর্থাৎ সজাতীয় জন্যত্বাভাব রূপ গুণবিরুদ্ধ ধর্ম্মটি থাকা দোষবহ নহে, কারণ একটী ধর্ম্মের আশ্রয়ে বৈধর্ম্মান্তর থাকার কোন আপত্তি কিম্বা অনুপপত্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। কর্ম্মকে সর্ব্বাংশে গুণের সমান বলিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। কর্ম্মের প্রতি ক্রিয়ান্তরের যে জনকতা নাই, তাহা পূর্ব্বেই "কর্ম্ম কর্ম্ম সাধ্যং নবিদ্যতে" এই সূত্রে বলা হইয়াছে; এই স্থলে তাহারই সুস্পষ্টতার নিমিত্ত কর্ম্মেতে গুণের ধর্ম্ম থাকাকেও হেতুরূপে বর্ণন করিয়া উল্লিখিত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল।

দ্বিত্ব প্রভৃতয়ঃ সংখ্যাঃ পৃথকত্ব সংযোগবিভাগাশ্চ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। দ্বিত্ব ত্রিত্ব প্রভৃতি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা, দ্রব্যদ্বয়োস্থিত পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ, ইহারাও অনেক দ্রব্যারব্ধ অর্থাৎ প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে আশ্রিত।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্যের ন্যায় গুণের মধ্যেও অনেকাশ্রিত গুণ আছে। একটী মাত্র দ্রব্যে দুই কিম্বা তিন বলিয়া ব্যবহার হয়না। দ্রব্যদ্বয়ে কিম্বা দ্রব্যত্রয়ে যথাক্রমে দুই কিম্বা তিন বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যার অবস্থিতিই উক্ত ব্যবহারের কারণ; সুতরাং দ্বিত্বাদি সংখ্যাকে অনেকাশ্রিত বলিতে হইবে। সূত্রে উল্লিখিত পৃথকত্ব পদটী দ্বিপৃথকত্বপর, যেমন পশু ও পক্ষী, মনুষ্য হইতে পৃথক্, এস্থলে মনুষ্যকে অপেক্ষা করিয়া পৃথকত্ব গুণটী পশু ও পক্ষী, এই দুইনিষ্ঠ হওয়াতে, ঐ দ্বিগত পৃথকত্বকে অনেকাশ্রিত বলিতে হইবে। সংযোগ এবং বিভাগ, এই গুণদ্বয় অনেকাশ্রিত বলিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দুই কিম্বা ততোধিক দ্রব্য একত্রিত হইলে সংযোগ জন্মে এবং সংযুক্ত পদার্থদিগেরই পরস্পর বিভাগ হইয়া থাকে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, লম্বায়মান রজ্জু প্রভৃতির এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তকে সংযুক্ত করিয়া, পরে বিভক্তও করা যায়; ঐ সংযোগ ও বিভাগ একমাত্র রজ্জুতেই থাকে; সুতরাং সকল সংযোগ কিম্বা সকল বিভাগ অনেকাশ্রিত গুণ নহে। এতৎপক্ষে সমাধান এই, রজ্জু প্রভৃতির এক প্রান্তকে অপর প্রান্তে সংলগ্ন করিতে যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ঐ সকালনাদি

বশতঃ রজ্জুর অবয়বদিগের পরস্পর বিশ্লেষজন্মে; একপ্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের যে সংযোগ কিম্বা বিভাগ অনুমান যায়, তাহা ক্রিয়ান্বিতরজ্জুর বিশ্লিষ্ট এক অবয়বের সহিত অবয়বান্তরেরই হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন একমাত্র রজ্জুতেই তাদৃশ ভাবে সংযোগ কিম্বা বিভাগ হইতেছে বলিয়া প্রত্যয়টী সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অসমবায়াৎ সামান্যকার্য্যং কর্ম্ম নবিদ্যতে ॥ ২৬ ॥

পদব্যাখ্যা। অসমবায়াৎ—সমবায়সম্বন্ধে অভাব থাকা প্রযুক্ত। সামান্যকর্য্যং—সাধারণের জন্য অর্থাৎ দুই কিম্বা বহুদ্রব্যের কার্য্য। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়া। নবিদ্যতে হয় না।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়াপদার্থের কোন একটীও সাধারণের (দুই কিম্বা বহু দ্রব্যের) কার্য্য নয়, যেহেতু প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্য ও সংযোগ প্রভৃতি গুণের ন্যায় কর্ম্মপদার্থও অনেক দ্রব্যারব্ধ কিনা? এতাদৃশ প্রশ্ন মূলক স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্ম্ম সাধারণের কার্য্য নহে, কারণ একাধিক দ্রব্যে একটী ক্রিয়ার সত্তা নাই। মনুষ্যদিগের গমনসময়ে প্রত্যেক পুরুষে পৃথক্ পৃথক্ প্রযত্ন হইতে ভিন্ন ভিন্ন চলন ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধনই একের স্থৈর্য্যে সকলের স্থিতি কিম্বা একের চলনে সকলের গমন তৎকালে দৃষ্ট হয়না।

সংযোগানাং দ্রব্যং ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। বহু সংযোগ স্বরূপ কারণ হইতে একটী দ্রব্য স্বরূপ কার্য্য জন্মে।

তাৎপর্য্য। পুনরায় গুণান্তর্গত বহু ব্যক্তির একটী দ্রব্য স্বরূপ কার্য্য দেখান হইতেছে। তন্তুদিগের পরস্পর বহু বহু সংযোগ ব্যক্তি হইতে এক একখানি বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

রূপাণাং রূপং ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। একটী রূপ নানারূপের কার্য্য অর্থাৎ নানা অবয়বের নানাবিধরূপ হইতে অবয়বীর একটী মাত্র রূপ জন্মিয়া থাকে।

তাৎপর্য্য। কিয়দংশ চূণের সহিত কিয়ৎ পরিমিত হরিদ্রার গুঁড়া মিশাইলে ঐ মিশ্রিত পদার্থে যে অভিনব লোহিত রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার প্রতি চূণের এবং হরিদ্রার রূপই কারণ; এই প্রকার সর্ব্বত্রই অবয়বের নানারূপ রস গন্ধ প্রভৃতি হইতে অবয়বীর এক একটী রূপ রস গন্ধাদি জন্মে ইহা অনুভব সিদ্ধ। সূত্রোক্তরূপ পদদ্বয় উপলক্ষক হইয়া রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, স্বতঃসিদ্ধ দ্রবত্ব, একত্ব, পৃথকত্ব, পরিমাণ, বেগ, স্থিতিস্থাপক সংস্কার এবং গুরুত্বকেও বুঝাইতেছে, তাহাতে নানারূপ হইতে যেমত একটী রূপ জন্মে, সেইপ্রকার নানা গন্ধ হইতে একটী গন্ধ, নানা গুরুত্ব হইতে একটী গুরুত্ব জন্মিয়া থাকে। এতাদৃশভাবে উল্লিখিত গুণের প্রত্যেক লইয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

গুরুত্বপ্রযত্নসংযোগানামুৎক্ষেপণম্। ২৯ ॥

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাত্মক একটী কর্ম্ম-পদার্থ, গুরুত্ব, প্রযত্ন ও সংযোগ, এই ত্রিবিধ গুণের কার্য্য।

তাৎপর্য্য। যখন কোন পুরুষ লোষ্ট্রা-দিকে উৎক্ষিপ্ত করে তখন লোষ্ট্রের গুরুত্ব, পুরুষের যত্ন এবং হস্তের সহিত লোষ্ট্রের নোদন [শব্দের অজনক সংযোগ] এই গুণত্রয় লোষ্ট্রের ঐ উৎক্ষেপণের হেতুভূত হয়। এস্থলে উৎক্ষেপণ পদটী অবক্ষেপণাদির উপ-লক্ষক। পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদিত একটী গুণে বহু গুণ-জন্যত্বের ন্যায় একটী কর্ম্মেও বহু গুণ জন্যত্বদেখান, এই সূত্রের উদ্দেশ্য।

সংযোগ বিভাগাশ্চ কর্ম্মণাং। ৩০

অনুবাদ। সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কর্ম্মের কার্য্য; অর্থাৎ চলনাদি ক্রিয়া পদার্থ হইতে সংযোগ বিভাগ ও বেগ জন্মে।

তাৎপর্য্য। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করা হয়; যেমন ধূম দেখিলে বহ্নির অনুমান করাযায়, সেইরূপ গৃহস্থিত পুরুষ ঘন-গর্জ্জন শুনিয়া মেঘের, এবং বাহিরে খাত প্রভৃতিতে জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টিরও অনুমনি করিয়া থাকেন, যে পদার্থের কোন কার্য্য দেখাযায় না, তাহার অনুমান করাও সুকঠিন এ নিমিত্ত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির যে অতীন্দ্রিয় গতি আছে, তাহাতে প্রমাণ কি? ঐ গতির কোন কার্য্যবিশেষ প্রত্যক্ষীভূত না হওয়ায় অনুমানের সম্ভাবনা নাই। এই আশঙ্কার নিরাসের জন্য সংযোগ বিভাগ প্রভৃতিকে কর্ম্মের কার্য্য বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত "সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম্ম" এই সূত্রের বিষয়টীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সংযোগ বিভাগরূপ কার্য্য দেখিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গতি অবধারণ করাযায়। গগনমণ্ডলে চন্দ্রকে আজ ভরণী নক্ষত্র সমীপে দেখিতেছি, গত কল্য তাহাকে অশ্বিনী নক্ষত্রে দেখিয়াছিলাম; আগামীকল্য তাহাকে কৃত্তিকা নক্ষত্র সমীপে দেখিব, এই ভাবে তত্তৎ স্থলীয় সংযোগ-বিভাগদ্বারা চন্দ্রের গতি অবধারিত হয়। দিনে সূর্য্য-কিরণে নক্ষত্রমালা অদৃশ্য হইলেও, অস্তের পরক্ষণেই পশ্চিম গগনে একদিন যেন নক্ষত্রটীকে দেখা-গেল কিম্বা পূর্ব্বগগনে উদয়ের পূর্ব্বক্ষণেই যে নক্ষত্রটী দৃষ্ট হইল, কিছুদিন পরে ঐ সময় পূর্ব্ব পশ্চিম গগনে আর সেই সেই নক্ষত্রকে দেখা গেল না; তৎ পরিবর্ত্তে নক্ষত্রান্তরের পরিদর্শন হইল এইরূপে তত্তৎ নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তিস্থানে সূর্য্যের সংযোগ কিম্বা বিভাগ অনুভূত হওয়ায়, তাহাহইতে সূর্য্যের গতি-ক্রিয়া অবধারণকরা অসম্ভব নহে।

কারণ সামান্যে দ্রব্য কর্ম্মণাং কর্ম্মা-কারণমুক্তম্। ৩১॥

পদব্যাখ্যা। কারণ সামান্যে—কার-ণের সাধারণপক্ষে অর্থাৎসমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত, এই তিনপ্রকার কারণপক্ষেই। দ্রব্য কর্ম্মণাং—দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের প্রতি। কর্ম্ম —ক্রিয়াপদার্থ। অকারণম্—কারণ নয় অর্থাত্‌ কারণ ভিন্ন বলিয়া। উক্তম্—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ। দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মকারণ নয় বলিয়া পূর্ব্বে যে কথিত হই-য়াছে, তাহা সর্ব্ববিধ কারণ পক্ষে বুঝিতে হইবে, অর্থাত্‌ ক্রিয়া পদার্থনিচয় দ্রব্য কিম্বা

কর্ম্মান্তরের প্রতি [সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ এবং নিমিত্তকারণ এই ত্রিবিধ কারণের মধ্যে] কোনরূপ কারণই হয় না॥

তাৎপর্য্য। সংযোগ নিচয় কর্ম্মজনিত বলিয়া স্থিরীকৃত। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে যে,চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে যেমত স্বজনিত সন্নিকর্ষকে [ঘটাদি বস্তুর সহিত চক্ষুরাদির সংযোগকে] দ্বার করিয়া কারণ হয়, সেইপ্রকার ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও কপালাদি অবয়বের ক্রিয়া, অবয়বদিগকে সুযুক্ত করিয়া দিয়া, তদ্দ্বারা কারণ হইতে পারে এবং হস্তের ক্রিয়া হস্তের সহিত লোষ্ট্রের সংযোগ জন্মাইয়া লোষ্ট্রোৎক্ষেপণে হেতুভূত হইতেছে বলাযায় ; তবে কর্ম্মকে যে দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের অকারণ বলা হইয়াছে,তাহাকি অসমবায়ি কারণপর ? অর্থাৎ কর্ম্মেতে দ্রব্যের কিম্বা কর্ম্মের অসমবায়ি কারণতা নাই বটে, কিন্তু নিমিত্ত কারণতা থাকিবার বাধা নাই ; এই কি তাহার তাৎপর্য্য ? যেহেতু সমবায়ি কিম্বা অসমবায়ি করণনাশে কার্য্য নষ্ট হওয়া নিয়ম থাকিলেও নিমিত্ত কারণ নাশে কার্য্যের নাশ হয় না ; সুতরাং অবয়বের ক্রিয়ার নাশ হইলেও অবয়বী থাকাতে, অবয়ব ক্রিয়াকে অবয়বীর নিমিত্ত কারণ বলাতে কোন বাধা দেখাযায় না,এইরূপ জিজ্ঞাসামূলক ভাবে বলা হইতেছে যে,দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মের নিমিত্তকারণত্ব নাই। প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ চক্ষুর ব্যাপার, যেহেতু চক্ষুকে নিমীলিত করিলে ঐ সন্নিকর্ষও থাকে না এবং প্রত্যক্ষও জন্মে না; কিন্তুদ্রব্যোৎপত্তি বিষয়ে অবয়ব সংযোগটী আবার ক্রিয়ার ব্যাপার হইতে পারে না; কারণ অবয়বদ্বয়ের সংযোগ জন্মিবার পরক্ষণে অবয়বে আর ক্রিয়া থাকে না। অথচ অবয়ব সংযোগ এবং তদারব্ধ অবয়বী দ্রব্যটী বাচিকাই থাকে, তাই প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারদ্বারা চক্ষুরাদির অন্যথা সিদ্ধত্ব হয় না সত্য, কিন্তু দ্রব্য কিম্বা কর্ম্মের উৎপত্তিতে স্বজনিত সংযোগই ক্রিয়াকে অন্যথাসিদ্ধ করিয়া দেয় কারণ কারণের কারণ নহে,পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং ব্যবহার সিদ্ধও বটে।

ইতি বৈশেষিক দর্শনে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

বালাকি অজাতশত্রু সংবাদ।

পুরাকালে অজাতশত্রু নামে কাশীর এক নরপতি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় বিভূষিত ছিলেন, ভারতবর্ষের বিবিধ স্থান হইতে মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার জন্য তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। একদা বালাকি নামক এক ঋষি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিব। বালাকি নিজে ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন, এবং তজ্জন্য বড়ই গর্ব্বিত ছিলেন। অজাতশত্রু বলিলেন,আপনি ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করুন আপনি সহস্র গাভী দক্ষিণা পাইবেন।

বালাকি বলিলেন আমি আদিত্যান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, ব্রহ্মকে জানিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব করিওনা। আমি তাঁহাকে সর্ব্বভূতের মূর্দ্ধ

দিগের রাজা বলিয়া তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নয়,বালাকি বলিলেন আমি চন্দ্রান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া, তাহাকে বৃহৎ, শুক্লবাস, সোম রাজা অন্নদাতা বলিয়া উপাসনা করি। বালাকি বলিলেন আমি বিদ্যুতান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তেজস্বী রূপে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্মবলিয়া নয়। বালাকি বলিলেন আমি আকাশান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে পূর্ণ বলিয়া উপাসনা করি, কিন্তুব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি অনিলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে জয়শীল ইন্দ্র বলিয়া উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি অনলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি, অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে ধ্বংস শক্তিরূপে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে, বালাকি বলিলেন আমি সলিলান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন যে আমিও তাহাকে উপাসনা করি, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে বালাকি বলিলেন আমি হৃদয়ান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি শব্দান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত-শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি দিগন্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি ছায়ান্তর্গত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, কিন্তু অজাতশত্রু বলিলেন আমিও তাহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। বালাকি বলিলেন আমি জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজাত শত্রু বলিলেন আমিও তাঁহাকে উপাসনা করি কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া নহে। অজাতশত্রু বলিলেন তোমার ব্রহ্মজ্ঞান কি এই পর্য্যন্ত? বালাকি বলিলেন হা এই পর্য্যন্ত। অজাতশত্রু বলিলেন এই জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম বিদিত হন না; বালাকি বলিলেন আমি তোমার শিষ্য হইব।

অজাতশত্রু বলিলেন ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, এ রীতি প্রতিলোম, যাহাহউক আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিদ্যায় উপদেশ দিব। অজাত শত্রু বালাকির হস্ত ধরিয়া একটি নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলেন, এবং তাহাকে ডাকিলেন, সে জাগৃত না হওয়ায়, তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে জাগাইলেন। সুপ্ত অবস্থায় এই বিজ্ঞানময় পুরুষ কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতে আসিল বালাকি এ তত্ত্ব জানিবেন না। অজাত শত্রু বলিলেন বিজ্ঞানময় পুরুষ ব্রহ্মে সুপ্ত ছিলেন, যখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইন্দ্রিয়াদি বহিঃপ্রদেশ হইতে অন্তরের দিকে আকর্ষণ করেন, তখন তিনি নিদ্রিত হয়েন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি মহারাজার ন্যায় হয়েন। তিনি ইচ্ছানুসারে অনু-

চর বর্গকে দেহ রাজ্য মধ্যে প্রেরণ করেন। যখন তিনি সুষুপ্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মে লীন হয়েন, এবং ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন। এই ব্রহ্ম হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা সকল ভূত উদ্ভূত হয়েন তিনি সত্যের সত্য।

ভূ-গোল পরিচয়।

৭ম পাঠ।

প্রদর্শন। (১)

মণ্ডল (২) নক্ষত্র (৩) তারা (৪)

ভগোলের উজ্জ্বলতর তারাগণ ও গণিত শাস্ত্রের কীলকভূত তারাগণ এবং অসাধারণ রূপ গুণ সম্পন্ন তারাগণ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা— লুব্ধক, শতভিষক, ধ্রুব ইত্যাদি। এই নাম গুলি জাতীয় প্রবাদজনিত, ইতিহাসমূলক, অথবা তারার অবস্থিতিস্থানসূচক। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মণ্ডলে বা রাশিতে অবস্থিত তারাগুলির স্থূলত্বের তারতম্য অনুসারে মণ্ডলস্থ প্রত্যেক তারা ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। যথা— মেষ রাশির ১ তারা বলিলে, মেষ রাশিস্থ তারাগণ মধ্যে সর্ব্ব উজ্জ্বল তারা অমলতারা বুঝাইবে। বৃষ রাশিস্থ ২ তারা বলিলে, বৃষ রাশিস্থ তারাগণ মধ্যে উজ্জ্বলতায় ২য় তারা অগ্নি তারক বুঝাইবে।

১। শিশুমার মণ্ডল।

রাত্রিকালে ভগোলের তারকামালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দর্শক দেখিবেন যে,সমস্ত তারাগণ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ধাবমান রহিয়াছে ; কিন্তু উত্তরাস্যে দণ্ডায়মান হইয়া সরলভাবে নেত্রপাত করিলে দর্শক দেখিবেন যে, একটী পীতবর্ণ মধ্যমাকৃতি অনুজ্জ্বল তারা স্থিরভাবে অচল ও অটল রহিয়াছে। ভগোলের অবশিষ্ট জ্যোতিষ্কগণ মণ্ডলাকার পথে ঐ তারা প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই পীতবর্ণ তারাটীর নাম ধ্রুব, কারণ এই তারা অটল ও অচল।

---

(১) কলিকাতাস্থ দর্শক ও মধ্য রেখাস্থ তারা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবের লিখিত দূরত্ব-পরিমাণ প্রযোজ্য।

(২) মণ্ডল শব্দ তারা-সংহতি অর্থে ব্যবহার করিতে কেহ কেহ আপত্তি করেন। কিন্তু তদর্থে বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—

রবে রূর্দ্ধং স্থিতঃ সোমঃ সোমান্নক্ষত্র মণ্ডলং।
তস্য ৎ শনৈশ্চর শ্চোর্দ্ধং তস্যোর্দ্ধং ঋষিমণ্ডলং॥
ইতি দেবীপুরাণে গ্রহগতিঃ

নক্ষত্র মণ্ডলং কৃৎস্নংউপরিষ্টাৎ প্রকাশতে।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৭৬

(৩) কেহ কেহ তারা ও নক্ষত্র শব্দদ্বয় একই অর্থে অভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র শব্দ ২৭টী বা ২৮টী নির্দ্দিষ্ট তারানিচয় বোধক, এবং এই পারিভাষিক অর্থের প্রতি কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। যথা—

পূর্ব্বাদিশবাস্থানং দ্বিভক্তং রাশিসংজ্ঞকং
নক্ষত্ররূপিণং ভূয়ঃ সপ্তবিংশাত্মকংবশী।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।২৫

গ্রহনক্ষত্র তারাণাং ভূমে র্বিশ্বস্য বা বিভুঃ।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।২৮

পুরাণে ও কাব্যে নক্ষত্র শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। যথা—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রানি গ্রহৈঃ সহঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।৩

নক্ষত্র তারা গ্রহ সঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চান্দ্রমসীব রাত্রিঃ।
রঘুবংশ ৬।২২

নক্ষত্রগণ চন্দ্র গৃহ। চন্দ্র ১ দিন এক নক্ষত্রে বাস করেন; কবিকল্পনায় নক্ষত্র চন্দ্র-গৃহিণী ও দক্ষসুতা বলিয়া বর্ণিত। যথা—

অশ্বিন্যাদ্যাস্তু দক্ষস্য উপযেমে সুতাবিধুঃ
পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে।

(৪) তারাগণ দেবনিবাস ও সিদ্ধ পুরুষগণের স্থূল দেহ বলিয়া বর্ণিত হয়।

আধুনিক লোকপ্রবাদে তারাগণ দ্যুলোকগত পুরুষের চক্ষু এবং খদ্যোতগণ পৃথিবীচর গতাসুগণের চক্ষু বলিয়া কথিত।

যেকোন ঋতুতে রাত্রিকালের যে কোন সময়ে দর্শক যথাস্থানে দৃষ্টিপাত করিলে,দর্শকের সম্মুখে ধ্রুব তারা থাকিবে। ধ্রুব তারা যে মণ্ডলে অবস্থিত, ঐ মণ্ডলে ১০টী তারা প্রধান। তন্মধ্যে ৮টী তারা হলদী (হ'লদী) পাছের পাতার আকৃতি গঠন করিয়াছে। অবশিষ্ট ২টী তারা হলদী পত্রের অগ্র ভাগের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। এই দুইটী তারার মধ্যে দক্ষিণস্থ তারাটী উজ্জ্বলতর। সমস্ত মণ্ডল অবলোকন করিলে দেখাযায় যে, ১০টী তারারদ্বারা একটী শিশুমারের আকৃতি গঠিত হইয়াছে। এই শিশুমার দৈর্ঘ্যে ৮ হাত প্রস্থে প্রায় ৪ হাত। প্রাচীন হিন্দুগণ এইজন্য এই মণ্ডলকে শিশুমার নাম দিয়াছেন। (৫) ধ্রুব তারা তারাময় শিশুমারের পুচ্ছদেশে অবস্থিত। (৬)

শিশুমার মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দর্শক দেখিবেন যে, ভূপৃষ্ঠস্থ শিশুমারের পুচ্ছদেশ বিদ্ধ করিয়া একখানি শড়কী মাটিতে পুতিলে শিশুমার যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সড়কী প্রদক্ষিণ করে, ভগোলস্থ শিশুমার ধ্রুব তারায় বদ্ধ হইয়া তৈলী চক্রবৎ ধ্রুব তারাকে সেইরূপ প্রদক্ষিণ করিতেছে। (৭)

শিশুমার মণ্ডলস্থ ১—১০ তারা = শিশুমার আকৃতি।

এই মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম ক্ষুদ্র ভল্লুক [Eng] The little bear. [Lat] Ursaminor. [Gr] Arctos.

চিত্র শিখণ্ডিমণ্ডল।

শিশুমার মণ্ডলের দক্ষিণে চিত্র শিখণ্ডি মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলস্থ ৪উজ্জ্বল তারাদ্বারা একটী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই তারাময় চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বমান। উত্তর বাহু ৬হাত এবং দক্ষিণ বাহু ৫ হাত দীর্ঘ। পূর্ব্ব বাহু ২॥০ হাত ও পশ্চিম বাহু ৩ হাত দীর্ঘ। এই চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ঈশান কোণে বক্রভাবে ৩টী তারা অবস্থিত। বক্র রেখার পরিমাণে ৯ হাত। এই সমস্ত তারা একটী ময়ূর আকৃতি গঠন করিয়াছে।

তারাময় এবং বক্র রেখা ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ" চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের বায়ু কোণস্থ তারার নাম ক্রতু, নৈঋত কোণস্থ তারার নাম পুলহ। অগ্নি কোণস্থ তারার নাম পুলস্ত্য এবং ঈশান কোণস্থ তারার নাম অত্রি। ময়ূরের শিখাগ্রে ক্রতু, কণ্ঠে পুলহ, নাভিদেশে পুলস্ত্য এবং পৃষ্ঠে অত্রি তারা। ময়ূরের পুচ্ছাগ্রস্থিত তারার নাম মরীচি, পুচ্ছ মধ্যস্থিত তারার নাম বশিষ্ঠ এবং পুচ্ছমূলস্থ তারার নাম অঙ্গিরা। বশিষ্ট তারার ঈশানকোণে দুই অঙ্গুলি দূরে একটী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষুদ্র তারা আছে, ঐ ক্ষুদ্র তারার নাম অরুন্ধতী। (৮)

(৫) তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবিরূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।১

(৬) সতারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৯।৫

(৭) মেধীভূত সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্যবৈধ্রুবঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৭।১০

যাবন্ত্যশ্চৈব তারা স্তাস্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তিতম।
বিষ্ণু ২।১২।২৬

(৮) আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি ধ্রুব তারা ও অরুন্ধতী তারা এবং কৃত্তিকা নক্ষত্র দেখিতে পান না, ইহাই প্রাচীন প্রবাদ। যথা—

অরুন্ধতীং ধ্রুবংচৈব বিষ্ণো স্ত্রীণি পদানিচ।
আসন্নমৃত্যু র্ন পশ্যেৎ চতুর্থং মাতৃমণ্ডলং।
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ১২।১৩

বিবাহকালে বর কন্যাকে এই তারা প্রদর্শন করেন। যথা—

প্রাচীনকালে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য তারা অত্রির ন্যায় অত্যুজ্জ্বল ছিল।

ক্রতু ও পুলহ তারা যোগ করিয়া ঐ যোগ রেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে, বর্ত্তমান ধ্রুবতারা স্পর্শ করে, এই জন্য এই দুই তারাকে "প্রদর্শক" বলে (৯)

চিত্রশিখণ্ডি মণ্ডলস্থ ১—৬। ১১ তারা-চিত্রশিখণ্ডি আকৃতি (১০)

চিত্রশিখণ্ডি মণ্ডলের অপর নাম ঋক্ষ (১১)
সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং পরমর্ষি মণ্ডল (১২)
এই মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎ ভল্লুক।
[Eng] The great bear. [Lat] Ursa maior [Gr] Arctos magus.

ব্রহ্মমণ্ডল।

অত্রি ও ক্রতু তারা যোগ করিয়া ঐ যোগ রেখা পশ্চিমাভিমুখে প্রসারিত করিলে, একটী প্রথম শ্রেণীর গাঢ় পীতবর্ণ অত্যুজ্জ্বল তারা স্পর্শ করিবে। ঐ তারাটীর নাম ব্রহ্মহৃৎ। ব্রহ্মহৃৎ যে মণ্ডলে অবস্থিত, ঐ মণ্ডলের নাম ব্রহ্মমণ্ডল [১৩]। তারাব্রহ্মের হৃৎপদ্মে অবস্থিত বলিয়া উহাকে ব্রহ্মহৃৎতারা বলে। ব্রহ্মহৃৎ তারার ২ ফুট অন্তরে নৈর্ঋত কোণে একটী ক্ষুদ্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া ৩টী ক্ষুদ্র তারা অবস্থিত আছে। ঐ তারা ত্রিভুজ "রামবাণ" নামে খ্যাত। ব্রহ্মহৃৎ তারার ৪ ফুট পূর্ব্বে উরঃ তারা তারা ব্রহ্মের ফুস্‌ফুস্ স্থানে অবস্থিত। তারা ত্রিভুজের ভূমি রেখার পূর্ব্ব ভাগের কোণস্থ তারা ও ব্রহ্মহৃৎ তারা যোগ করিয়া ঐ যোগরেখা ঈশানকোণে প্রসারিত করিলে প্রজাপতি তারা স্পর্শ করিবে। প্রজাপতি তারাব্রহ্মের শিরোদেশে অধিষ্ঠিত।

ব্রহ্মমণ্ডলস্থ ১-৭ তারা = তারাব্রহ্ম দেহ। ব্রহ্মমণ্ডলের অপর নাম ব্রহ্মরাশি (১৪) ব্রহ্মমণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম শকটবাহক। [Eng] wagonner [Lat] Auriga. (Gr) Heniocleus. তারা ত্রিভুজের পাশ্চাত্য নাম The kids.

বৃষরাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্র।

ইদানীন্তন কালে রাশিচক্রের আদি রাশি মেষ এবং আদি নক্ষত্র অশ্বিনী। কিন্তু প্রাচীন কালের রাশি চক্রের আদি রাশি। এবং আদি নক্ষত্র কৃত্তিকা ছিল এবং কার্ত্তিকাদিমাস গণনা হইত (১৫) এই জন্য আমরা বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে পরিচয় আরম্ভ করিলাম।

ব্রহ্মহৃৎ তারা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রামবাণ নামক তারা ত্রিভুজের শীর্ষ কোণস্থ বাণমুখ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা নৈর্ঋত কোণে প্রসারিত করিলে একটী মনোহর তারাগুচ্ছে দর্শকের নেত্র-নীত হইবে। ঐ তারাগুচ্ছের আকার ক্ষুর সদৃশ। এইজন্য তারাগুচ্ছের নাম কৃত্তিকা। তারাক্ষুর দৈর্ঘে ১ফুট এবং ভগোলে উত্তরাস্য নাপিত দক্ষিণাস্য যজমানকে ক্ষৌরী করিতে বসিলে, যে ভাবে ক্ষুর অবস্থিত থাকে কৃত্তিকা ঠিক সেই

ততো জামাতা অমুং মন্ত্রং পাঠয়ন্ বধূমরুন্ধতীং দর্শয়তি প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ নক্ষত্রদেবতা অরুন্ধতী দর্শনে বিনিয়োগঃ ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।

(৯) Pointers. ভবদেবঃ।

(১০) সপ্তর্ষয়ো মরীচ্যাত্রিমুখাঃ চিত্র শিখণ্ডিনঃ। ইতি অমরঃ।

(১১) অমীয ঋক্ষাঃ। ঋক্ ১।২৪।১০
ভল্লুক
শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৪।

(১২) সপ্তর্ষি মণ্ডলং তস্মাৎ নক্ষমেকং দ্বিজোত্তম। বিষ্ণুপুরাণ।

(১৩) গুহ্যান্ত পরমর্ষরঃ। বাল্মীকি ৬।৪।৪৮

মহাত্মা রামানুজ স্বামীর মতে ব্রহ্মরাশি অর্থে ধ্রুব তারা বাল্মীকি ৬।৪।৪৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যে মণ্ডলের শিরোভাগে "প্রজাপতি" তারা, মধ্যভাগে ব্রহ্মহৃৎ তারা সেই মণ্ডলই ব্রহ্মমণ্ডল।

(১৪) রাশি শব্দ মণ্ডল অর্থে ব্যবহৃত।

(১৫) অথর্ব্ব ১৯।৭।২

ভাবে অবস্থিত দৃষ্ট হয়; এই তারাগুচ্ছ অতি সুন্দর ও তড়িন্ময়। ইহার তারা-সংখ্যা প্রায় ৪০০। তন্মধ্যে প্রধান ৭টী দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহত্তম তারাটীর নাম দেবসেনা (১৬) অপর ৬টী তারা কৃত্তিকা নক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

সাধারণতঃ এই তারাগুচ্ছের তারাগুলি ঝাপ্‌সা দেখায়; কিন্তু শরদাগমে এই গুচ্ছ অতি মনোহররূপ ধারণ করে এবং কৃষ্ণ-রাত্রিতে কৃত্তিকা ঝলকে ঝলকে তড়িৎ বিকীর্ণ করিতে থাকে। এই নক্ষত্র তারাবৃষের ককুদ্ [ঝুট]।

বৃষরাশিস্থ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১ তারা = কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং ২০ তারা—যোগ-তারা কৃত্তিকা।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের অপর নাম বহুলা (১৭) মাতরঃ [১৮] এবং মাতৃমণ্ডল [১৯] এই নক্ষত্রের গ্রাম্য নাম সাতভেয়া। গ্রীসে কৃত্তিকাগণ Pleiades নামে অভিহিত [২০]।

রোহিনী নক্ষত্র (Hyades)

কৃত্তিকা নক্ষত্রের অগ্নিকোণে—৭ ফুট অন্তরে রোহিণী নক্ষত্র অবস্থিত। এই নক্ষত্রস্থ ৫টী তারা শকটাকৃতি। আরোহিণী [শকট] শব্দ হইতে এই নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে [২১] শকটের বাহুযুগল লম্বে ১ ফুট, শকট-পৃষ্ঠ প্রস্থে ১ বিতস্তি [বিঘৎ] শকট শীর্ষে "শকটমুখ তারা"। শকট ধুর-দ্বয়ের [ধুরা] প্রান্তদ্বয়ে ২ তারা এবং শকটের পশ্চাৎভাগের পার্শ্বদেশে ২ তারা। শকট নৈঋত্‌কোণাভিমুখ।

শকটের পশ্চাৎভাগের পূর্ব্বকোণস্থ তারার নাম হলদ্দীবর্ণ। এই তারাটী গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং প্রথম শ্রেণীর তারা, অপর ৪টী ক্ষুদ্র তারা।

পাশ্চাত্য বৃষরাশিস্থ ১।৫।৭।১২।১৮ তারা = রোহিণী নক্ষত্র

১ তারা = যোগতারা।

পাশ্চাত্যে রোহিণী নক্ষত্র Hyades নামে খ্যাত। (২২)

এই নক্ষত্র তারা বৃষের মুণ্ড।

---

(১৬) প্রধানাংশ স্বরূপা সা দেবসেনাচ নারদ
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সাচ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিত
শিশূনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিণী
তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্ত্তিকেয়স্য কামিনী।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ১।৭৩-৪

কার্ত্তিক শুক্ল ষষ্ঠী তিথি হইতে বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত।

(১৭) প্রাচীনকালে নক্ষত্র মধ্যে বহুতারকময় কৃত্তিকা নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা অধিকতম ছিল, এজন্য কৃত্তিকার বহুলা নাম।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।৬
শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।২।

(১৮) প্রাচীনকালে কৃত্তিকা ভ-চক্রের আদি নক্ষত্র ছিল। কৃত্তিকা বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থানীয়। বিশ্ব-জগৎ কৃত্তিকা প্রদক্ষিণ করে। ইহাও অনুমিত হয়।

ষট্ কৃত্তিকা ও অরুন্ধতি সপ্তর্ষি-জায়া। এই কারণে কৃত্তিকা লোকমাতরঃ ও মাতৃমণ্ডল বলিয়া বর্ণিত। যথা—

সংভূতি রনুসূয়াচ ক্ষমা প্রীতিশ্চ সন্নতিঃ
অরুন্ধতিঃ তথা লজ্জা তৎপত্ন্যো লোকমাতরঃ
ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে। ১১

(১৯) অপবাদ বশতঃ ষট্ কৃত্তিকা পতি পরি-ত্যক্ত হইয়া স্বামী সহবাসে বঞ্চিত এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলে স্থান পান নাই। যথা—

অথ সপ্তর্ষয়ঃ প্রাপ্য জাতং পুত্রং মহৌজসম্।
কার্ত্তিকেয়ঃ।
তত্যাজুঃ ষট্ তদা পত্নী বিনা দেবীং অরুন্ধতিং।
মহাভারত। ২২৫।৮

(২০) Gr. plein to sail হইতে Ploeiades নাম। গ্রীক জাতি কৃত্তিকার উদয়ে নৌ যাত্রার শুভক্ষণ জ্ঞান করিতেন।

গ্রীক প্রবাদে কৃত্তিকা সপ্ততারা অট্‌লস্ দেবের (অতল) সপ্তকন্যা। গিকরী প্রবাদে কৃত্তিকা "সপ্ত-মনীষি" "Seven sages." বলিয়া খ্যাত। হিন্দুজাতির সপ্তর্ষি মণ্ডল স্বতন্ত্র।

(২১) হিন্দু প্রবাদ বিদ্যায় [Hindu mytholoy] রোহিণীর নামার্থ অন্যরূপ। মৃগশিরা নক্ষত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

(২২) Gr. uein to rain. রোহিণী তারার হেলীক উদয়ের অর্থাৎ অস্তমণ কালে বর্ষা হইত এ জন্য Hyades. নাম।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরী কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

রাধা-ভাব-কান্তি-বিলাসরূপায়
হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহা-প্রেমরস-প্রদায়
শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমোনমস্তে ॥

"শ্রীগৌরাঙ্গ" ধ্বনি আবার ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে উত্থিত হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নামের সঙ্গে তাঁহার প্রেম, লীলা, প্রচার প্রভৃতি প্রসঙ্গও ক্রমশঃ পুস্তকে, প্রবন্ধে, কবিতায়, বক্তৃতায়, সংগীতে, সংকীর্ত্তনে, আলাপে, আলোচনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

যে "গৌর-ভক্তি" বস্তুটি এতদিন প্রায়শঃ ভেকধারী বাউল-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সংগোপিতপ্রায় ছিল, তাহা এখন দেশের মুখ-পাত্র কৃতবিদ্য সমাজে সাদরে অভ্যর্থিত ও প্রার্থিত হইতেছে। সংপ্রতি গৌরতত্ত্ব-সেবক সুধীবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের "Lord Gouranga" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রচার ফলে গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গ, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্লাবিত বিলাস-বিমোহিত বিলাত-প্রদেশেও আলোচিত—আস্বাদিত হইতে চলিল। ফলে আধুনিক গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গীগণ সকলেই যে ঠিক গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার বা "স্বয়ং কৃষ্ণ" বিশ্বাস করিয়া গৌরভক্তিতে আকৃষ্ট হইতেছেন, তাহা নহে। কেহ তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান গৌরাঙ্গাবতার, কেহ অংশাবতার বা গুণাবতার, কেহবা ভগবদ্ভক্ত মাত্র জ্ঞানেও গৌরভক্তির ভাবক, সেবক ও যথাসম্ভব সাধক হইতেছেন।

অস্মদ্দেশে অনেকেই জানেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের "হাত-চালা" পত্রীকায় এই বাক্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল——

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ।"

ইহার তিনপ্রকার অর্থ হয়, তাহাও অনেকে জানেন।

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ,নচ পূর্ণঃ,নচ অংশকঃ।(১)

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ নচ,পূর্ণঃ নচ,অংশকঃ।(২)

গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ নচ,পূর্ণঃ,নচ অংশকঃ।(৩)

এই বাক্যটির প্রথম ত্রিধাভেদান্বয়ে গৌরাঙ্গকে ভগবদ্ভক্ত মাত্র বুঝায়; দ্বিতীয় ত্রিধাভেদান্বয়ে তাঁহাকে অংশাবতার বুঝায়; তৃতীয় ত্রিধাভেদান্বয়ে পূর্ণ অবতার স্বয়ং ভগবান বুঝায়। তবে কিনা, সংস্কৃত ভাষার সহজ রীতি-প্রকৃতি অনুসারে প্রথমান্বয়ই স্বতঃসঙ্গত বোধহয়; কিন্তু জনরব-জীবিত ঐ "হাত-চালা" সংবাদটির উপরেই গৌরতত্ত্ব-নিরূপণ-নির্ভর সম্ভবেনা। উহার বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিছু নাই; বিশেষতঃ উহাতে প্রত্যক্ষ,অনুমিতি ও আপ্ত, এই ত্রিবিধ শাস্ত্র-সম্মত-প্রমাণের অবিতর্কিত অস্তিত্ব অসিদ্ধ। যাহাহউক,শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে উক্ত ত্রিবিধ মতভেদই চলিয়া আসিতেছে, সত্য। বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ; তবে ইদানীং দিন দিন গৌরাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেছি। মোটের উপর,শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অতি মহীয়ান মান ও পরম প্রীতি-গৌরবের ভাব অধুনা দিন দিন হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ-গরিষ্ঠ হইতেছে, সন্দেহ নাই। আশা করি, ইহা অতি শুভফলপ্রদ সুলক্ষণই হইবে।

গৌরাঙ্গের লীলা বা জীবনচরিত অপূর্ব্ব। গৌরাঙ্গের রূপ অতুল্য, গুণ অনন্ত। গৌরাঙ্গের শিক্ষা, শক্তি, প্রেম, ভক্তি, ভাব, প্রভাব, ঐশ্বর্য্য,মাধুর্য্য, সমস্তই অসাধারণ—অলৌকিক—অনুপম! এই জন্যই গৌরাঙ্গ-চরিত বা গৌরাঙ্গ-লীলার বিবরণ বিশিষ্টরূপে অবগত হইলে, তাঁহার প্রতি "ভগবান"—"অবতার" বা অন্ততঃ "মহাপুরুষ"-বুদ্ধি স্বতএব বিকসিত হইয়া উঠে। সুতরাং গৌরাঙ্গ-মহিমার মহন্মাননা সম্বন্ধে সাধারণতঃ মতদ্বৈধ নাই বলিলেই হয়। প্রকাশ্য-পরধর্ম্ম-প্রনিন্দুক "পাদ্রী" প্রচারকেরাও কষ্ট-কল্পনা করিয়া আমাদের "নিখুঁত গৌরাঙ্গ-সুন্দরে" কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সর্ব্বধর্ম্ম-সার শিক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গের চারু চরিতে সর্ব্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকগণই মুগ্ধ।

ধার্ম্মিক হিন্দুদের ত কথাই নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের ত সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁর শাক্ত, শৈব, সৌর,গাণপত্য, এই অপর চতুঃ-সম্প্রদায়ের উপাসকগণও গৌরাঙ্গ-শিক্ষায় স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক উপাসনার অনুকূল সাধন-শক্তি ও প্রেম ভক্তি লাভ করিতে পারেন। হিন্দুধর্ম্ম-সংসৃষ্ট বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরাও গৌরভক্তির শক্তিতে স্ব স্ব ধর্ম্মসাধন-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। এমন কি, খ্রীষ্টিয়ান্, মুসলমান, ইহুদী,পার্শিক প্রভৃতি অভারতীয় মূল-বৈদেশিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরাও গৌরাঙ্গকে অন্ততঃ মহাত্মা বা মহাপুরুষরূপে মানিয়াও, তাঁহার অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন স্বর্গীয় শিক্ষা-প্রসাদের স্বাধিকারানুযায়ী অংশভোগে সমর্থ হইয়া আত্মোন্নয়নের অনুত্তম অনুকূলতা লাভ করিতে পারেন। অতএব মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি কবিত্ব সম্বন্ধে যদ্রূপ

"ভারতের কালিদাস! জগতের তুমি" এইরূপ কবি-উক্তি প্রচারিত আছে, তদ্রূপ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানবাত্মার সাধারণ ও স্বাভাবিক সম্পত্তি ভগবদ্ভজন লক্ষ্য করিয়াও ভাকভরে-তারস্বরে—অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলাযায়——"ভারতের শ্রীগৌরাঙ্গ! জগতের তুমি!"

ভক্তিই ভগবদুপাসনা-সিদ্ধির একমাত্র শক্তি, এ সত্য সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের উপাসকগণেরই অবিসংবাদ-স্বীকৃত। এ তত্ত্ব বেদ-পুরাণ, বাইবেল্-কোরাণ, ইঞ্জিল-জব্বুর, আবেস্তা-মানসুর ইত্যাদি সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রেই একতানে গীত—এক সিদ্ধান্তে সমন্বিত। সেই ভক্তির চরম আদর্শ, পরম পরাকাষ্ঠা, অনুপম ও অসাধারণ উদাহরণ শ্রীগৌরাঙ্গের মহামহিমাময় জীবনে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত বা থরে থরে সজ্জিত! শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন সাধক-সাধারণের হৃদয়ের ধন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত কথা সাধন-নন্দনের কল্পলতা।

সত্য হইতেই কল্পনার উদ্ভব। সত্যের ছায়াতেই কল্পনা পালিত। অতএব কল্পনা কলিতার্থে সত্যকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ। "Truth is often stranger than fiction" ইত্যাদি কবি-বাক্যে পাশ্চাত্য জগতেও এ তত্ত্ব স্বীকৃত। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এ তত্ত্ব গৌরাঙ্গ-জীবনে পরম প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত। দ্বিপাদ-ধর্ম্মময় দ্বাপরে মহাভারতের মহাকবি ব্যাসদেব মহাপুরাণ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-প্রসঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের যে লোকোত্তর লীলা-বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, এই পাদধর্ম্মাবশিষ্ট কলিযুগে গৌরাঙ্গ চরিতে তাহাও অতিক্রান্ত হইয়াছে! ভগবদ্ভক্তির যে মূর্ত্তি কোন যুগে কেহ কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই মূর্ত্তি দেখাইয়া জগৎ মোহিত করিয়াছেন। এইজন্যই আজিও অনেক বঙ্গীয় "কথক" মহাশয় কর্ত্তৃক

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

গৌর-লীলার প্রত্যক্ষসাক্ষী ভাগবতপ্রবর ও ভক্তি-দর্শন-কবিবর শ্রীরূপগোস্বামীর বিখ্যাত "বিদগ্ধমাধব" গ্রন্থের গৌরবন্দনা সূচক এই সুমধুর শ্লোকটিদ্বারা গৌর-লীলার অসাধারণ বিশেষত্ব কীর্ত্তিত বা গীত হইয়া থাকে।

"লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা।
প্রলাপো ব্যধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যু দশাদশঃ॥"

অথবা—

অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যালম্বশূন্যতা।
জড়তা ব্যাধিরুন্মাদো প্রলাপো মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিরহীর এই যে দশ দশা বর্ণিত আছে, তাহা সেই কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা রাধিকার কৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব জীবনেও পূর্ণপ্রকটিত হয় নাই। শ্রীরাধার নবমী দশা পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহাই পৌরাণিক ইতিহাসের সাক্ষ্য। অনেকের মতে সে ইতিহাসও অর্থবাদ, অতি-কল্পনা ও রূপক-রঞ্জনাপূর্ণ। কিন্তু শতাব্দী-চতুষ্টয় মাত্র পূর্ব্বের ঘটনা গৌরাঙ্গ-লীলায় ইতিহাসের সমুজ্জ্বল সত্যালোকে সুস্পষ্টরূপে উক্ত দশ দশাই পূর্ণ পরিণামে প্রকটিত বা পরিস্ফুটিত। গৌরাঙ্গের গম্ভীর গোবিন্দ-বিরহ তাঁহার শ্রীমুখের শ্লোক-বাক্যেই সুব্যক্ত, যথা——

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"
পলকে প্রলয় মম—বর্ষাসম ঝরে আঁখি।
সমস্ত সংসার শূন্য গোবিন্দ-বিরহে দেখি॥

বাস্তবিক গৌরাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির অলৌকিক অসামান্য ব্যাপার-পরম্পরা—'নভূত ন ভবিষ্যতি" বাক্যের বিশিষ্ট বিষয়ীভূত বলিলেইযেন যথার্থ বলা হয়। আবার বলি,কোন দেশের, কোন জাতির,কোন ধর্ম্মের, কোন ভগবদুপাসক ভক্তির এমন অনন্ত-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অসামান্য আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনুষ্যের তেমন ভাষা নাই, ভাষায় তেমন শব্দ নাই, শব্দে তেমন অর্থ-প্রকাশ-শক্তি নাই, যদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির সম্যক্ বর্ণনা সম্ভবে। সাধে কি বৈষ্ণবাদি সাধকেরা গৌরাঙ্গকে "ভগবান" বলিয়া জানেন?—"অবতার" বলিয়া মানেন? এবং অপর—সাধারণেরা অন্ততঃ "মহাপুরুষ" জ্ঞানে ভক্তি করেন? অতি প্রচণ্ড পাষণ্ড নাস্তিকও গৌরাঙ্গ-জীবনী অধ্যয়ন করিয়া, তাহার ঐতিহাসিক সত্যতায় অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস করিলেও বোধহয় গৌরভক্ত না হইয়া পারেন না। অতএব গৌরাঙ্গ জীবনী সকলেরই অবশ্য অধ্যেয় ও একান্ত আলোচ্য।

আমাদের এ ক্ষুদ্র নগণ্য প্রবন্ধে গৌরাঙ্গ-মহিমার অণু-কণাও প্রকাশিত হইতে পারে না। ভাষায় উহার বর্ণন চেষ্টা উহার অবর্ণনীয়তা ও অনির্ব্বচনীয়তায় অবিশ্বাস-সূচিকা হয় মাত্র। পাঠক মহাশয়গণকে আমাদের সানুনয় অনুরোধ,তাঁহারা(যাঁহাদের প্রয়োজন)গৌরাঙ্গ-চরিতের ইতিহাস "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" "চৈতন্যভাগবত"ও"চৈতন্য-মঙ্গল"প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে স্বয়ং অবগত হইবেন। "মুরারী গুপ্তের কড়চা" প্রভৃতি আরও বিস্তর প্রামাণিক গৌর-লীলাসন্দর্ভ বর্ত্তমান। যাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রকৃত ও প্রায় সমসাময়িক,যাঁহারা স্বচক্ষে বা স্বগুরু-চক্ষে গৌর-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,তাঁহাদের স্বরচিত সন্দর্ভ সাক্ষ্যে (আশাকরি) অন্ততঃ অনেকেরই গৌর মহিমা বিষয়ে সন্দেহ-অন্ধকার অন্তর্হিত হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদি যাঁহারা সংগ্রহ পূর্ব্বক অধ্যয়ন আলোচনাদি করিতে অসুবিধা বোধ করেন,তাঁহারা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "অমিয় নিমাই চরিত" পুস্তক পাঠ করুন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ। এ পুস্তক একাধারে গৌর-লীলার, ইতিহাস, কাব্য ও দর্শন স্বরূপ।

এক্ষণে কথা এই যে, গৌরাঙ্গ যদি অবতার হন, তবে তাঁহার অবতারত্বের মাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হিন্দুর বিচারে সিদ্ধান্ত-সমাধান পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপ্ত বা শাব্দ প্রমাণ—অর্থাৎশাস্ত্রীয় প্রমাণই তৎসম্পূরণে সমর্থ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণে গৌরাঙ্গকে অবতার স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎসম্বন্ধে আপ্ত প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের যোগ সিদ্ধ-জ্ঞান-দর্পণে অবশ্যই উহা অপ্রতিফলিত রহে নাই। অবশ্যই আর্য শাস্ত্রে উহার অন্ততঃ কিছু না কিছু উল্লেখ বা প্রমাণ পরিচয় আছেই। সুতরাং গৌরাঙ্গ যে ভগবান,গৌরাঙ্গ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের "রাধা-ভাব কান্তি-বিলাসরূপী" অবতার,অস্মদ্দেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ তৎসমর্থক কতিপয় শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণাদি সংগ্রহ করি-

য়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"গৌরাঙ্গ ছন্ন অবতার, সুতরাং তাঁহারই ইচ্ছায় শাস্ত্রে তদ্বিবরণ একটু প্রচ্ছন্ন আছে; অর্থাৎ বিশদ-বিস্তৃতভাবে নাই; অথচ খুঁজিয়া বুঝিয়া দেখিলে, বিভিন্ন শাস্ত্রেই তাহার আভাষ, ইঙ্গিত, সংক্ষিপ্ত সংবাদ এবং কোথাও কোথাওবা বিস্পষ্ট বিবৃতিও দৃষ্ট হয়।" প্রাচীন গৌরাঙ্গ-চরিতাখ্যায়ক বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকারগণ কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎপর এযাবৎকাল আরও কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা তাহার কতিপয় সংখ্যক বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এ দীন লেখক অশাস্ত্রজ্ঞ—অপণ্ডিত, সুতরাং উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত রহিল ; ফলে লেখক-পক্ষ হইতে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমাধানের চেষ্টা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অতএব নিম্নোদ্ধৃত বচন-প্রমাণগুলির উপক্রম-উপসংহার-সমন্বয়, ব্যাখ্যা-বিবৃতি, বিচার-বিতর্ক, খণ্ডন-সমর্থন, পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্তপক্ষ, এ সমস্তই গৌরাঙ্গাবতার-বাদের স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ পণ্ডিত-পাঠক-মণ্ডলীর জন্যই প্রতীক্ষিত রহিল।

গীতায়—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

(গৌরাঙ্গাবির্ভাব-কালে এতদ্দেশে শুষ্ক জ্ঞানমার্গীয় ন্যায়-তর্কের প্রবল প্রভাব, তান্ত্রিক "পঞ্চমকারাদির" অতি অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে ভক্তিমার্গীয় "ভাগবতধর্ম্মের" অত্যবনতি ঘটিয়াছিল।)

ভাগবতে—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

বায়ুপুরাণে—

"শুক্লো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহো ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥"

স্কন্দপুরাণে—

"অন্তঃ কৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়া-মানুষ-কর্ম্মকৃৎ।"

"শ্বেতঃ সত্যযুগে বর্ণঃ রক্তস্ত্রেতা যুগে পুনঃ।
দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণোহহং পীতঃ কলিযুগে স্মৃতঃ॥"

বামনপুরাণে—

"কলৌ ঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥"

ভবিষ্য পুরাণে—

"আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসরূপিণং॥"

"কলৌ সন্ন্যাসরূপেণ বিচরামি চরাচরম্॥"

গরুড়পুরাণে—

"কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥"

"অহমেব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
হরের্ণাম কীর্ত্তনেন তারয়ামি কলৌ নরান্॥"

কূর্ম্মপুরাণে—

"কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় তনুভৃতঃ।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু।"

লিঙ্গপুরাণে—

"ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য নামধৃক্॥"

শিবপুরাণে—

"কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে —

"অহমেব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
আহরামি হরৌ ভক্তিং কলৌ পাপহতান্নরান্‌॥"

ব্রহ্মপুরাণে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ইতি মুখাত্তমং প্রভোঃ।
হেলয়াশ্রদ্ধয়ারাধ্য সর্ব্বসার্থফলং লভেৎ।"

অগ্নিপুরাণে—

'শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।"

বিশ্বসার তন্ত্রে—

"গঙ্গায়া দক্ষিণেভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ॥
জনিষ্যতে প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥

কপিলতন্ত্রে—

"জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥"

মুক্তসঙ্কলিনী তন্ত্রে—

"কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতং।
দ্বাপরে নৈমিষারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল।
যথা দ্বিজমণি গৌরঃ সাক্ষাদবতরিষ্যতি॥"

কৃষ্ণযামলে—

"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।"

অনন্ত সংহিতায়—

"রাধিকাবল্লভঃ কৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয়কাম্যয়া।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গরূপেণ নবদ্বীপে বিরাজতে॥
গোপীভাব প্রদানার্থং ভগবান্‌ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ॥

মনুসংহিতায়—

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণুষ্বপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং॥"

[টীকা—"রুক্মাভং—(উপাসনাবিশেষে) শুদ্ধ স্বর্ণাভং। স্বপ্নধীঃ—আত্মধীঃ।"]

ভাগবতে—প্রহ্লাদ স্তবে—

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং।
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ সত্বং॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—

"মহান্‌ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।"

মুণ্ডকোপনিষদে—

"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং।
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌॥
তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয়॥
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

গোপালোপনিষদে—

"নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ॥"

ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ সহস্রনামে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।"

ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গাবতারের বচন-প্রমাণ উপরে যেগুলি উদ্ধৃত হইল, তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি আছে। আমরা আপাততঃ সকলগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ফলে যাহা কিছু সংগৃহীত হইল, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, সর্ব্ব শাস্ত্র হইতেই গৌরাঙ্গাবতারের প্রমাণ-প্রয়োগ হইতেছে। এ সমস্ত হাসিয়া উড়াইবার বস্তু নহে।—উদাস্য উপেক্ষার বিষয় নহে। তিনটি মাত্র মৌখিক বর্ণ-ব্যয়ে "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া একটানে বিচারের বাহিরে নিক্ষিপ্ত করার জিনিস নহে। তবে কিনা, "গৌরাঙ্গ" "কৃষ্ণচৈতন্য" "শচী" "নবদ্বীপ" প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল-প্রমাণক পদগুলিযুক্ত বচনগুলিতে প্রক্ষিপ্ততার সন্দেহ আপাততঃ

হয়ত আসিতে পারে কিন্তু কথা এই যে, "এই সেদিনকার আমাদেরই বাঙ্গালী নিমাই চাঁদ মিশ্র কখনও অবতার হইতে পারেন না" এইরূপ বলাৎকৃত 'একগুঁয়ে' বিশ্বাস ভিন্ন নিশ্চয় "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া বুঝিবার কারণ নাই। গৌরাঙ্গের অবতার হওয়া যদি অসম্ভব না হয়, তবে উক্ত বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত না হওয়ারইবা অসম্ভাবনা কোথায়? যে ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধর্ষিগণ কলির অন্ত্য-সন্ধ্যায় সুদূর ভবিষ্যতের যুগাবতার কল্কীশদেবের লীলা-বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, গৌরাঙ্গের অবতারত্ব সত্য হইলে, তাঁহারা কি কলির প্রথমসন্ধ্যার ছন্নরূপী সেই ভক্তি শিক্ষয়িতা ভক্তাবতারের বিষয়ে কিছুই বলিবেন না? বিশ্ব-দর্শন আর্য্যশাস্ত্রে কি তাহার অন্ততঃ আভাষ-ইঙ্গিত বা সংক্ষিপ্ত সংবাদও থাকিবে না? গৌরাঙ্গের কথা ঠিক খাটিয়া গিয়াছে, এই অপরাধেই কি উক্ত বচনগুলিকে 'প্রক্ষিপ্ত' জ্ঞান করিতে হইবে? বুঝিয়া দেখিলে, ইহা একরূপ হাস্যকর সিদ্ধান্ত। রাম-কৃষ্ণাদির অবতারব্যাপার বহুকাল হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্য ঐতিহাসিক সত্য; আর কল্কী অবতার অনেক দূরে। অতএব ঋষিদের তদ্বিবরিণী ভবিষ্যদ্বাণি নিশ্চয় সত্য হওয়া সম্ভব; কিন্তু গৌরাঙ্গাবতার এই সেদিন বাঙ্গালায় হইয়া গিয়াছে, অতএব তৎপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কোন আর্ষ ভবিষ্যদ্বাক্যই অসম্ভব; এরূপ অর্থশূন্য "অতএব" গুলির আনীত সিদ্ধান্ত কখনও অবতারবিশ্বাসী জ্ঞানী হিন্দুর অনায়াস-গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মোটকথা, যদি স্বতঃসিদ্ধভাবে বা অনুমানাদি প্রমাণান্তর-প্রভাবে গৌরাঙ্গাবতার প্রকৃত বোধ হয়, তবে উক্ত বচনগুলিও প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে, অর্থাৎ গৌরাঙ্গাবতার-প্রতিপাদক আপ্ত প্রমাণ বলিয়া মানিতে বাধা নাই। আর যদি গৌরাঙ্গাবতার অপ্রকৃত মনে হয়, তবে ওগুলিও কাজেই প্রক্ষিপ্ত বা ভিন্নার্থক মনে হইবেই। কিন্তু তাই বলিয়া, গৌরাঙ্গাবতারে ঠিক বিশ্বাস হইলেই বচনগুলি ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা যেন কতকটা "সাঁতার শিখিয়া জলে পা দিব" বা "রোগমুক্ত হইয়া ঔষধ খাইব" এইরূপ প্রতিজ্ঞার ন্যায়! কেননা বচনগুলিতে বিশ্বাসই গৌরাঙ্গাবতারে পূর্ণ বিশ্বাসের প্রয়োজক; কারণ আপ্ত বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণে হিন্দুর মনস্তৃপ্তি হয় না। শাস্ত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠতম আসন দিয়াছেন। ফলকথা, যদি গৌরাঙ্গাবতার বিশ্বাসের সাপেক্ষতায় তৎপ্রতিপাদক প্রমাণগুলি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ন্যায়শাস্ত্রের মস্তক ভক্ষণ করা হয়; অর্থাৎ তাহাহইলে প্রমাণকেই প্রমেয়দ্বারা প্রমাণিত করিতে হয়! তাহাহইলে অবস্থাটি এইরূপ দাঁড়ায়, যেন উক্ত বচনগুলির খাতিরেই গৌরাঙ্গকে অবতার হইতে হইয়াছে! যেন ঋষি বেচারিরা সোমরসের নেশার ঝোঁকে বচনগুলা শাস্ত্রে বসাইয়া প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন, কাজেই দয়াল ভগবানকে অগত্যা গৌরাঙ্গ সাজিতে হইয়াছে!

যাহাহউক, বিষয় অতি গুরুতর। বিষয়টি ধর্ম্মার্থী—ভগবদ্ভজনার্থী—জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশিষ্ট মানব মাত্রেরই আলোচ্য। বিশেষতঃ

হিন্দুমাত্রেরই, এবং সুবিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই আলোচ্য যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালী ছিলেন। এই দীন কৃষ্ণাঙ্গ বাঙ্গালীকুলেই দীনবন্ধু গৌরাঙ্গ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত বচন-প্রমাণগুলির মধ্যে যে গুলিতে আপাততঃ প্রক্ষিপ্ততার সন্দেহ আসিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেগুলিকে যাঁহারা মনের বিশ্বাসেই "প্রক্ষিপ্ত" না বলিয়া, শাস্ত্রীয়তা সহযোগে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন, এবং যাহাতে একটু আবরিত ভাবে—অর্থাৎ আভাষে—ইঙ্গিতে বা অন্ততঃ সুসংক্ষিপ্ত সংবাদে "গৌরাঙ্গাবতার" সূচিত হইয়াছে, এরূপ অবশিষ্ট বচনগুলি ভিন্নার্থবাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এরূপ পণ্ডিত কেহ আছেন কিনা, জানিনা; কিন্তু অদ্যাপি সেরূপ কোন প্রতিবাদ-ব্যাখ্যাদি শুনি নাই বা সাহিত্যের বাজারেও প্রকাশিত দেখি নাই। যদি সেরূপ কিছু থাকে, তবে বোধহয় তাহার স্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট আলোচনা আবশ্যক। খাঁটি সোনার আগুনে ভয় কি? পরন্তু ছিন্ন-মনে সুধা খাইলেও ক্ষুধা যায় না। বিশেষতঃ এ বিংশ শতাব্দী, জড়-বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তি-তর্কের যুগ। এ যুগে লোক অন্ধকারে সন্দেশ খাইতেও চায় না, হাতে সোণা দিলেও লয় না! আলো চাই, প্রমাণ-পরীক্ষা চাই। তা প্রমাণ-পরীক্ষারই বা বাধা কি?—আপত্তি কি? একটি গ্রাম্য প্রবাদ এই যে, "সাচা গুড় আঁধারেও মিঠা।" প্রমাণ-পরীক্ষার বিচার-বিতর্ক আপাততঃ ভক্তি-বাধক বোধ হইলেও, এই বিচার-বিতর্কের যুগে উহা অপরিহার্য্য বলিয়া, তদধিকৃত করিয়াও, ভক্তির আলম্বকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে হইবে। উহাকে বিতর্ক-বিজয়ী করিয়া নিতে হইবে।

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া" ইত্যাদি বেদ-বাক্য এবং "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি চিরপ্রচলিত বঙ্গীয় মহাজন-বাক্যের প্রতিবর্ণে—প্রতিমাত্রায় সত্য-জ্যোতি সমুৎকীর্ণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবদ্বিষয়ে তর্ক-সংস্পর্শশূন্য স্বতঃসরল বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে অতি অল্প লোককেই ভাগ্যবান করে। যিনি সহজ বিশ্বাস ও তর্কানুশীলন, দুয়ের বাহির, তাঁহার আশা কোথায়? বরং বিশ্বাসের সুলভসিদ্ধি ভাগ্যে না থাকিলেও, অন্ততঃ "তর্কে বহুদূর" বলিয়া এক দিন না একদিন কিছু না কিছু হইলেও হইতে পারে। অনেক স্থলে, সরল সত্যজিজ্ঞাসুর তর্ক-ফলে অনুকূল সিদ্ধান্ত-সমাধান লাভ হইয়া, ভক্তি-বিশ্বাস অর্জ্জনের আনুকূল্য হয়; কিন্তু দুয়ের বাহির হইলে কোন আশা নাই। এইজন্য প্রমাণ-পরীক্ষার কথা কহিলাম। অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সহজ জ্ঞানের অভাবস্থলে বরং প্রমাণ-পরীক্ষা-লভ্য জ্ঞানই গ্রাহ্য, কিন্তু উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য একান্তই অন্যায্য ও ত্যাজ্য।

গৌরাঙ্গাবতার বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বচন-প্রমাণগুলি যদি তত্ত্বান্তরনিষ্ঠ বা অসত্য-প্রতিষ্ঠ হয়, তবে আমাদের (বুঝিয়া দেখিলে) বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি সত্যপ্রতিষ্ঠ গৌরতত্ত্বনিষ্ঠই হয়, এবং আমরা উপেক্ষা-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকি, "হেলায়ে রতন হারাই" বা "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি," তবে বিশেষ ক্ষতির কথা বটে। অপিচ, সামান্য মানুষকে অবতারবোধে গ্রহণের ক্ষতি অপেক্ষা অবতারকে

সামান্য মানববোধে ত্যাগের ক্ষতি মহত্তর, সন্দেহ নাই। অবতারতত্ত্বে অবিশ্বাসী অহিন্দুর নিকট এ যুক্তি নগণ্য বা ন-কিঞ্চিৎ-কর হইলেও হিন্দুর পক্ষে কদাচ তাহা নহে। হিন্দু বুঝিবেন যে, অবতার জ্ঞানে মানুষের সাধনা করিলে, সাধকের তাহাতে সাধন-শক্তি বা প্রেম-ভক্তির অপচয় হইবে না, বরং স্থলবিশেষে সাত্বিক অনুশীলনে তাহার বর্দ্ধন-পোষণই হইবে এবং তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রণিহিত ইষ্ট বিষয়ে কিছুই অনিষ্ট হইবেনা; কিন্তু অবতারকে সামান্য মানুষবোধে উপেক্ষা করিলে, তাহাতে অনেক করামলকবৎ লক্ষিত ইষ্টে বঞ্চিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তর্কস্থলে বলা যায় যে, যদি গৌরাঙ্গাবতার অলীক হন, তবে বহু-অবতার-সেবী হিন্দুর তাহাতে নিতান্ত নিরাশার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কলিযুগ পাবনরূপে—— সুলভ শান্তিবিধাতা স্বরূপে গৌরাঙ্গাবতার যদি সত্য হন, আর আমরা দুর্ভাগ্যদোষে দুর্ব্বুদ্ধি-বশে তাঁহার শুদ্ধ শীতল আশ্রয় হারাইয়া ক্রমাগত কলিকল্মষ-কলঙ্কিত ও ত্রিতাপ-তাপিত হইতে থাকি, তবে তাহার ন্যায় নিদারুণ নিরাশা, ক্ষতি ও খেদের কারণ আর কি হইতে পারে? এইজন্যই বলি, গৌর-লীলার বিশেষ বিবরণাদি অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, অনুধ্যান আমাদের একান্ত আবশ্যক। এই দুর্লভ—অথচ চঞ্চল জীবনে ইহাতে আলস্য বা ইতস্ততঃ করা সুবুদ্ধিসঙ্গত বোধ হয় না।

অবশ্য "ঘষে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে পীরিত" হয় না সত্য; কিন্তু স্বতঃসুরূপমূর্ত্তি কালী-ঝুলী-মাখা হইলেও, যেমন ঘষে মেজে নিলে আবার রূপ ভাসে, তেমনি স্বতঃসর্ব্ব-মনোহর পাত্রের শুভসঙ্গ ধরে বেঁধে করাইলেও তাহাতে আপনি মনের অনুরাগ আসে; নচেৎ "মনোহর" শব্দের অর্থই যে অসিদ্ধ হয়। অতএব ভগবৎকৃপায় স্বতঃ-সদ্ভাব-সুন্দর হিন্দু-হৃদয়ে কুশিক্ষা-কলঙ্ক না থাকিলে এবং স্বতঃসর্ব্বমনোহর গৌরাঙ্গচরিত্র অনুশীলিত হইলে, তাহাতে গৌরাঙ্গানুরাগ স্বতঃই সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা।

অপর, যদি হিন্দুর বিশ্বাসে যোগ্য মানুষে ঈশ্বরাবতারত্ব অশাস্ত্রসঙ্গত ও অস্বাভাবিক না হয়, তবে গৌরাঙ্গের ন্যায় অমন যোগ্যাতিযোগ্য পাত্রে ঈশ্বরাবতারত্বেরইবা অশাস্ত্রসঙ্গতি ও অসম্ভাবনা কি? বাঙ্গালী জাতি কি এতই অভিশপ্ত যে, এ জাতিতে ঈশ্বরের অবতার হওয়া একান্তই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক? বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া, বাঙ্গালীর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া, বাঙ্গালা কথা কহিয়া কি ঈশ্বরের অবতার হওয়া একান্তই হিন্দুর দর্শন-বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ? বোধকরি অবতারবাদী কেহই তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। ঘরের লোককে ভগবানরূপে পাওয়া বড়ই ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। ঘরের লোক উপাস্য ঈশ্বরাবতার, ঘরের লোক ভোগ-মোক্ষ-দাতা, শান্তি বিধাতা, এ অপেক্ষা সুখ, সুবিধা ও সুকৃতির বিষয় সাধকের আর কি হইতে পারে? এ কথায় অবতার-অবিশ্বাসী অহিন্দু-মণ্ডলে হয়ত হাস্য-রসের তরল তরঙ্গ বহিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর-পক্ষে তদ্বিপরীত। ভাবিয়া দেখিলে, ব্যাপার বড় গুরুতর। যে ধর্ম্মার্থী হিন্দু প্রয়োজন-লাঘব-বোধে এবিষয়ে উদাসীন রহিবেন, তিনি সংসারে

অপর সহস্র গুণ-বিশেষণে বিভূষিত হইলেও তাঁহাকে "প্রকৃত বুদ্ধিমান" বলা যায় কিনা, সন্দেহ। ফলকথা, আমরা ঠকিয়া না যাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার অসার অভিমান-মোহে মজিয়া আমরা আত্মপ্রতারিত না হই। স্বর্ণ ফেলিয়া শূন্য অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন না করি। অধর-ধৃত সরল সুধাপাত্র স্বকরে সরাইয়া, কুটিল কালকূট গরল গলাধঃকৃত না করি, ইহাই প্রার্থনীয়।

শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, প্রধানতঃ এই পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায়ে হিন্দু-জাতি বিভক্ত। ইহার মধ্যে বৈষ্ণবের (বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবের) গৌরাঙ্গাবতারে বিশ্বাস একরূপ স্বাভাবিক, বলাযায়। ইহার ব্যতিক্রমে কলিতে কৃষ্ণভজনের অধিকারই অসম্ভব, ইহাও গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস। কৃষ্ণমন্ত্রে ইষ্ট সাধন এবং গৌরভক্তিতে তাহারই শক্তি-সঞ্চারণ ও সিদ্ধি সম্পাদন, ইহাই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের তত্ত্ব-সাধন-নীতি। বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গে একাধারে রাধা-কৃষ্ণ-যুগল মিলনের সমাবেশ! শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-বিলাস-লীলারূপী শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ, অস্মদ্দেশে আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব সাধক-সমাজে এই গুহ্য তত্ত্বের নিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাই গৌর-ভজনের ভিত্তিভূমি। অতএব গৌর-ভজন সম্বন্ধে বৈষ্ণবের পথ পরিষ্কার। তবে শৈব-শাক্ত প্রভৃতি সমাজস্থ গুণাধিকারিগণের আপাততঃ তদ্বিষয়ে একটু জটিলতা বোধ হইতে পারে।

বৈষ্ণবেতর অপর সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অনেকে হয়ত গৌরাঙ্গকে বড় জোর "ভগবদ্ভক্ত" মাত্র বলিতে প্রস্তুত। গৌরাঙ্গাবতার-বাদের পক্ষ হইতে ইহাকে "মন্দের ভাল" বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের "Second Edition" বলিয়া কৌতুকোক্তি করা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত বলা মন্দ নহে। "ভগবদ্ভক্ত" বিশেষণটি মানুষের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোত্তম, সন্দেহ নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে? উত্তর—ভগবদ্ভক্ত যে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-চরিত অবগত হইয়া, তাঁহাকে অতুল্য অসাধারণ ভগবদ্ভক্ত—সুতরাং মানবশ্রেষ্ঠ——নরোত্তম বলিয়া বুঝিতে পারিলেও উপকার আছে। ভক্ত ও ভগবানে বিশেষ নৈকট্য। রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি মানব মূর্ত্তিতে যেখানে অবতারত্ব, সেখানেই আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ মানবত্বই অবতারত্বের আধাররূপে প্রতিপন্ন। গৌরাঙ্গও ভক্তরূপী অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং ভগবদ্ভক্তের চূড়ান্ত আদর্শ স্বরূপ শ্রেষ্ঠতম মানবত্বে অবতারত্বের অসম্ভাবনা কোথায়? অতএব আদৌ "ভক্তশ্রেষ্ঠ" বোধে গৌরাঙ্গে ভক্তিমান হইয়া, ক্রমে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা-বিলাসের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা, তাঁহার সমসাময়িক দেশপ্রসিদ্ধ পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের স্বহস্ত-লিখিত গৌরতত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অবধারণা এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণাদির বিচারণা ইত্যাদিতে "গৌরাঙ্গবতার" বিশ্বাস-বিষয়ীভূত হন কিনা, তাহার অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাও ধর্ম্মসাধনার্থী মানব (বিশেষতঃ হিন্দু) মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। ফলে গৌরাঙ্গাভিমুখিনী চিদ্বৃত্তির কথঞ্চিৎ প্রাকৃতিক প্রেরণা ভিন্ন গৌরতত্ত্বানুসন্ধানে কাহারও প্রবৃত্তিই অসম্ভব। সকলের মূলেই প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠা;

ভক্তির সহস্র চেষ্টাতেও কিছুই হয় না। মূলে যাহা নাই, ডালে তাহা কখনও ফলে না।

যে হেতু মূলেই হউক, গৌরাঙ্গের অবতারত্বে বিশ্বাস হইলে, বৈষ্ণব ব্যতীত অপর চতুরুপাসক সম্প্রদায় কিরূপে তাঁহার ভজনা করিবেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা যেরূপে ভজেন, সেইরূপেই গৌরাঙ্গ ভজিবেন। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষ হিন্দুমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস স্বাভাবিক। বৈষ্ণব বিশেষভাবে বিষ্ণু-উপাসক হইলেও সাধারণভাবে হিন্দুমাত্রেই বিষ্ণু-উপাসক। শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণুবিগ্রহ সর্ব্ব সম্প্রদায়স্থ হিন্দুরই গৃহ-দেবতা। এই বিষ্ণু ও কৃষ্ণ যেমন তত্ত্বতঃ একই বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস, গৌরাঙ্গাবতারে বিশ্বাস হইলে, কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গও তদ্রূপ একই বলিয়া হিন্দুর মানিতে হয়। যাঁহারা গৌরাঙ্গাবতার বিশ্বাসী, তাঁহারা সেইরূপই মানিতেছেন। গৌরাঙ্গ যদি স্বয়ং ভগবানই হন, তবে তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাসবান হইলে, তিনি বৈষ্ণবের বিষ্ণু-উপসনা যেমন সিদ্ধ করিবেন, শাক্ত-শৈবাদির শিব-শক্তি-উপাসনাদিও তিনি তদ্বৎ সিদ্ধ করিবেন, সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ "ভক্তাবতার" (ভক্তরূপী অবতার) বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত, অতএব তাঁহার কৃপায় তাঁহার অবতারত্বে আন্তরিক বিশ্বাসকারী উপাসকমাত্রেরই ইষ্টভক্তি সুপুষ্ট ও ইষ্টসাধন সুসিদ্ধ হইবে, আশা করা যাইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তবে পঞ্চোপাসনাত্মক হিন্দু-শাস্ত্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে না, এবং তাহা হইলে গৌরাঙ্গকে হিন্দু-শাস্ত্র-বিপ্লাবী একাকারকারী বলিয়া বুঝিতে হয়; কিন্তু বোধহয় অনেকেরই সেরূপ বিশ্বাস নয়। অবতারের উপাসনাজনিত কার্য্যফল বিশেষভাবে সম্প্রদায়-বিশেষে বিকাশিত হইলেও, সাধারণভাবে উহা জাতি-সাধারণেরই সম্পত্তি। এই সাধারণতা অধিকার ও আবশ্যকতার অনুপাত অনুসারে অল্পাধিক পরিমাণে সমগ্র মানব জাতিতেই বিস্তারিত হয়। মনে করুন, রামাবতারের বিশেষ উপাসনা রামায় ("রামাৎ") বৈষ্ণব সমাজে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলেও, উহা হিন্দুমাত্রেরই সাধারণ অধ্যাত্ম সম্পত্তি। "রাম" হিন্দু-সাধারণেরই "তারকব্রহ্ম নাম।" কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধেও সেই কথা। অধিক বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন; সেই রাম—সেই কৃষ্ণই যদি কলিতে সেই গৌরাঙ্গ হইলেন, তবে গৌর-ভক্তিও অবশ্য হিন্দু-সাধারণের জাতীয় অধ্যাত্ম-সম্পত্তি হইবে, সন্দেহ কি? গৌরাঙ্গের সমসাময়িক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত পুরীর রাজ-অধ্যাপক শ্রীমৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বচক্ষে স্বগৃহ-কক্ষে গৌরাঙ্গ অঙ্গে রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ, এই তিন অবতারের একত্ব-নিদর্শনস্বরূপ ধনুঃশর, মুরলী ও দণ্ড-কমণ্ডলুধারী "ষড়ভুজ" মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তি-বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে যে স্তব রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব-সন্দর্ভে প্রকাশিত আছে। প্রধানতঃ সেই ঘটনা-বিশ্বাস হইতেই যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌরাঙ্গ, এই বিশ্বাস বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌরলীলায় এ বিশ্বাসের প্রবর্ত্তক ও প্রবর্দ্ধক কারণান্তরেরও অভাব নাই। বিশেষতঃ গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ, ইহা প্রতিপন্ন হইলে, গৌরাঙ্গই রাম, এতৎপ্রতীতি অনায়াসসিদ্ধ; যেহেতু রাম-কৃষ্ণের একত্ব-প্রতীতি হিন্দু-হৃদয়ে স্বাভাবিক। একত্ব জ্যামিতি-

শাস্ত্রের প্রথম স্বতঃসিদ্ধেই সুসিদ্ধ। অতএব গৌরাঙ্গাবতার সত্য হইলে, তিনি রামকৃষ্ণের ন্যায় হিন্দুজাতির সাধারণ উপাস্য কেন না হইবেন? অধিকন্তু, গৌরাঙ্গ ভক্তরূপী অবতার হওয়ায়, তিনি শুধু হিন্দুর নহেন, ভগবদ্ভজনার্থী মানব মাত্রেরই আদর্শ গুরুরূপে আরাধ্য হইবার যোগ্য।

আমরা গলাগলি ছাড়িয়া দলাদলিতেই তৎপর। ঈশ্বরের কাছে দলাদলি নাই। সকলই তিনি; তবে তিনি কি আপনার সঙ্গে আপনি দলাদলি করিবেন? শাক্ত-বৈষ্ণবে দলাদলি হইতে পারে, কিন্তু শক্তি ও বিষ্ণুতে দলাদলি সম্ভবে না; কারণ উভয়েই তত্ত্বতঃ একত্ব; কেবল রূপ নামের বা ধ্যান-মন্ত্রের ভিন্নত্ব, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতএব গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিলে, ইহাও মানিতে হইবে যে, তিনি স্বয়ং ভক্ত-বৈষ্ণব-ভাবে লীলা বিস্তার করিলেও, তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাসবান যে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসকেরই তিনি পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করিবেন। কেবল নাম-সাধন ও ভক্তি-ভজনই দীন হীন অল্পপ্রাণ অল্পজ্ঞান কলির জীবের উদ্ধারের উপায়, গৌরাঙ্গের শিক্ষায় ইহাই বিবৃত; সুতরাং গৌরাঙ্গভক্ত যে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসকই গৌরাঙ্গ-প্রসাদে স্বীয় ইষ্ট-পদে ভক্তিলাভ ও ইষ্টনাম-মন্ত্র সাধনে শক্তিলাভ করিবার আশা কেন না করিবেন? অতএব গৌরাঙ্গাবতারের সত্যতায়, সর্ব্বসম্প্রদায়-নির্ব্বিশিষ্ট গৌরাঙ্গনিষ্ঠ মাত্রই স্বীয় ইষ্টভক্তির প্রকৃষ্ট পরিপুষ্টতায় চরিতার্থ হইতে পারেন।

অধিক কি, আত্মার অমরত্বে, পরলোকের অস্তিত্বে ও ভগবানের ভক্তিপ্রিয়ত্বে যাঁহার বিশ্বাস, তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, যথার্থ ধর্ম্মার্থী হইলেই তিনি গৌর-ভজন-প্রয়োজনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। গৌরলীলা অনতিদূরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিক সত্যে সমুদ্ভাসিত; অতএব ওরূপ ধারণাতীত—চিন্তাতীত—কল্পনাতীত অসাধারণ ভক্তি লীলা দেখাইয়া যিনি জগৎকে চমকিত—স্তম্ভিত—মোহিত করিয়াছেন, তিনি যিনিই হউন, তিনি আজ তাঁহার অতুল অমৃত সত্তায় পরলোকে বা যে কোন লোকে যে কোন লীলায়ই বিরাজিত থাকুন, তাঁহার ভক্তের আধ্যাত্মিক উপকার তাঁহার মহিমায়——তাঁহার কৃপায় অবশ্যই সম্পাদিত হইবে। ধর্ম্মজগতে তিনি পূর্ণ আদর্শপুরুষ; অতএব ধর্ম্মার্থী বা ভগবদ্ভজনার্থী মানব তাঁহার ন্যায় ওরূপ ভক্তি-পথ-প্রদর্শক গুরু আর কোথায় পাইবেন? সামান্য শাক্ত-বৈষ্ণবে, হিন্দু-ব্রাহ্মে বা খ্রীষ্টিয়ান মুসলমানে ধর্ম্ম-বিতর্ক-বিবাদ বাধিতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদ-তুলসীদাসে, রামকৃষ্ণে-বিজয়কৃষ্ণে, ভমরে-লুথরে কখনও বিবাদ বাধিবে না। ধর্ম্মার্থী মানব (হিন্দুর ন্যায় অবতারতত্ত্ব না মানিলেও) যীশু, মহম্মদ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, ইঁহাদের সকলকেই অন্ততঃ "মহাপুরুষ" বোধে অবশ্যই মানিবেন। তবে অবশ্য নিজের মতে—নিজের পথে—আত্ম ইষ্টে একান্তনিষ্ঠ হইবেন। রাম-সর্ব্বস্ব হনুমান বলিয়াছিলেন,——

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥"

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"সবসে পশিয়ে সবসে রসিয়ে,
সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহিয়ে
বৈঠে আপ্‌না ঠাম॥"

ফলে উপাসক মাত্রেই স্বেষ্ট-সাধনে দৃঢ়-নিবিষ্ট থাকিলেও গৌরভক্তির ফলে তাহাতে আশাতীত উন্নতিলাভ করিবেন, এ আশা অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, গৌরাঙ্গের লীলা-সাক্ষ্যেই সুপ্রমাণিত হয় যে, তাঁহার ন্যায় ভক্তিসাধক—পরমার্থ-শিক্ষা-প্রচারক আদর্শ ধর্ম্মসংস্কারক কোন যুগে কোন দেশে কোন জাতিতে আর হয় নাই। হইবে কিনা, ভগবান জানেন।

গৌরাঙ্গের ভগবৎসত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রোক্তি সমূহ, গৌরাঙ্গের ভাগবতী চরিত-লীলা, তাৎকালিক ভারতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থদ্বয় পুরুষোত্তম ও কাশীধামের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতদ্বয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য ইত্যাদির অনুকূলতায়, সর্ব্বোপরি ভক্তিভাব-প্রবণ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণায় যিনি গৌরাঙ্গকে "ভগবান" ভাবিতে পারেন, তাঁহার ত কথাই নাই, কিন্তু যিনি অন্ততঃ "পূর্ণ ভগবদ্ভক্ত" "মহামহিম পুরুষ" "আদর্শধর্ম্মসংস্কারক বা ধর্ম্ম-প্রচারক" প্রভৃতি বিশেষণ-বেদ্যভাবেও তাঁহাতে ভক্তিমান হইবেন, তাঁহারও বোধ হয় নিরাশ হইবার কারণ নাই; আশাকরি, তিনিও কৃপার্ণসিন্ধু গৌরাঙ্গের কৃপায় বঞ্চিত হইবেন না। গৌর-কৃপায় যথার্থ গৌরতত্ত্ব-বোধে তিনিও ক্রমশঃ অধিকারী হইবেন।

গৌরাঙ্গ তখনও ছিলেন, এখনও আছেন। তিনি স্বীয় অনন্ত অমৃতসত্ত্বে ও ভক্তের হৃদ্‌-পদ্মে চিরবিরাজিত থাকিবেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে একটি পরমাদৃত মহাজন-প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে,—

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

ভাক্তমানের তুল্য ভাগ্যবান আর কে? যে ভাগ্যবান ভক্ত গৌরলীলা-রসে নিত্য নিমগ্ন, গৌরতত্ত্ব-বোধার্থী তাঁহার সঙ্গ করিলেই সিদ্ধকাম হইবেন। আমাদের ন্যায় অধম অভক্তের শত প্রবন্ধ ও সহস্র বক্তৃতাতেও সে আশা নাই। "স্বয়মশুদ্ধঃ কথং পরান্‌ শোধয়তি?" আপনি অশুদ্ধ যে, অন্যে কি শোধিবে সে? তবে যদি ভগবৎ কৃপায় এই সব আলোচনায় আমাদেরই পাষাণ-প্রাণে একটু উদ্দীপনার আনুকূল্য হয়, এইমাত্র আশা। আমাদের ব্যক্তিগত মত এ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিতকর।

যাহাহউক শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়িণী আলোচনায় এপ্রবন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, তাহার সুসংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এইরূপ—

গৌরাঙ্গ ভগবানই হউন বা ভক্তই হউন, তিনি ভজনীয়। গৌরাঙ্গ শুধু বৈষ্ণবের নহেন, তিনি শাক্ত-শৈব প্রভৃতিরও বটেন। গৌরাঙ্গ সমগ্র হিন্দু-জাতির। গৌরাঙ্গ শুধু হিন্দুর নহেন, কিন্তু মানবজাতির। গৌরাঙ্গ প্রেমিকের প্রাণ, কিন্তু পাষণ্ডের ত্রাণ। গৌরাঙ্গ ভক্তের জীবন—তথা ভাক্তের পাবন। গৌরাঙ্গ সাধুর আনন্দ—পাপীর আশা। ফলে গৌরাঙ্গ যে কি, তাহা গৌরাঙ্গই জানেন! কবি ঠিক গাহিয়াছেন,—

গোরার তুলন গোরা—অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী-পূজন যথা জাহ্নবীর জলে॥

উপসংহারে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান-বোধে ভজনা করেন, তাঁহাদের সেই গৌরাঙ্গ-পদ কমলসেবী কর-কমলে নিম্নের গৌরাঙ্গবিষয়িণী কবিতাটি নিবেদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

[বাঙ্গালীর সৌভাগ্য।]

(১)

জাননা বাঙ্গালি! তুমি কত ভাগ্যবান,
উদিত তোমারি ঘরে স্বয়ং ভগবান!
তোমারি বাঙ্গালীরূপে, তোমারি ধরণে,
তোমারি মতন ধুতি চাদর পরণে।
শ্রীঅঙ্গে তোমারি মত কোঁচার বাহার,
শ্রীপদে তোমারি মত চটী ব্যবহার!
শ্রীমুখে বাঙ্গালী-বুলি তোমারি মতন;
ভাব-ভঙ্গি তোমারি—তোমারি আচরণ।
তোমারি মতন ঠিক তেলে জলে নেয়ে,
তোমারি মতন ঠিক শাক-ভাত খেয়ে,
বিকাশি বাঙ্গালী-রূপ—বাঙ্গালী-শ্রীচাঁদ,
ধরিলা বাঙ্গালী-নাম শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ!

(২)

এ হতে বাঙ্গালি! তব সৌভাগ্য কি আর?
তব নবদ্বীপে সপ্তদ্বীপার উদ্ধার!
তোমারি "স্বজাতি" নরজাতি-ত্রাণকারী,
জন্মিলা তোমারি কুলে অকুল-কাণ্ডারী!
ধন্য ধন্য বাঙ্গালার পুণ্য-পুরস্কার,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত নিধি বঙ্গের কুমার!
দেখুক ভুবনবাসী ভক্তি-আঁখি মেলে,
দেবের দুর্লভধন বাঙ্গালীর ছেলে!
বাঙ্গালায় জগতের শুভ আশীর্ব্বাদ,
বাঙ্গালী "জগন্নাথের" ঘরে জগন্নাথ!
দেখ আসি ভববাসি! যদি ভাগ্য খোলে,
যশোদা-দুলাল দোলে শচীমা'র কোলে!

(৩)

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের যোগীন্দ্র-জীবন,
কলিতে বাঙ্গালিনীর যাদু-বাছা-ধন!
যুগ-তপস্যায় যোগী যে পায় না পায়,
শচীমা সে রাঙ্গাপায় হলুদ মাখায়!
নাহেন নদীয়া গঙ্গা-নীরে গোরারায়,
নিজ পদোদক দেন নিজেই মাথায়!
কমলা-কোলে যে পদ-কমল-সুন্দর,
সে পদ এ নদীয়ার ধূলায় ধূসর!
কালো বাঙ্গালীর কোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
কলিতে শ্রীরাধাকান্ত রাধা-কান্তিধর!
গহন মোহন গৌরলীলা-তত্ত্ব-বোধ,—
প্যারীর পরম-প্রেম-ঋণ-পরিশোধ।

(৪)

কলিতে অল্পায়ু নর, অল্পবুদ্ধি-বল,
তাইসে অল্পেতে হয় সাধন সফল।
অল্পায়াসে অল্পকালে সিদ্ধির বিধান—
করুণায় করিলেন করুণানিধান।
বিশেষ অশেষ-কৃপা-কৌমুদী বিতরি,
গৌরচন্দ্র রূপে বঙ্গে অবতীর্ণ হরি!
হরিনাম—হরিনাম—হরিনাম সার,
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর।
গোলকবিহারী হরি গৌরহরি সেজে,
দিলা হেন হরিনাম আচণ্ডালে যেচে।

নিতাই-অদ্বৈত সঙ্গে নিতা নবরঙ্গে,
ভাসাইলা বঙ্গ হরি-প্রেমের তরঙ্গে!

(৫)

বঙ্গ তপস্যায় যার জনম-মরণ,
দু অক্ষরে কলিতে এ দুয়েরি হরণ!
সেই দু-অক্ষর শুধু "হরি" নাম-ধ্বনি,—
বিলাইলা বাঙ্গালায় গৌর গুণমণি।
দুর্লভ হরিনামের সুলভ সাধন
শিখিলা বাঙ্গালা হতে জগতের জন!
বাঙ্গালীর শিষ্য হল সর্ব্বদেশী লোক;
বঙ্গ-ঋণে বদ্ধ হল সমগ্র ভূলোক!
এক গৌর-রূপে—আর এক হরিবোলে,
আদরে বসিল বঙ্গ বসুধার কোলে!
সে বঙ্গের কোলে বসি বঙ্গ-সুতগণ!
লাগাও শ্রীহরি-ধ্বনি—জাগাও ভুবন!

(৬)

তুচ্ছ ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ প্রান্তে পৃথিবীর,
প্রেমলীলা-ক্ষেত্র হ'ল পৃথিবী-পতির!
কলিকালে বঙ্গ-ভালে কি সৌভাগ্য-যোগ!
হারা'ওনা বঙ্গবাসি! এ স্বর্ণ-সুযোগ।
অশিলক্ষ যোনি ভ্রমি মানব হয়েছ,
কর্ম্মভূমি এ ভারতে জনম পেয়েছ;
তাহে গৌর-লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে ঘর;
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য আছে এর পর?
তাই বলি হে বাঙ্গালি! সব দুঃখ ভুলে,
গৌর-প্রেমানন্দে মজ মনোপ্রাণ খুলে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে কভু এ কলি দুর্দ্দিনে,
কারো না হইবে শক্তি গৌরভক্তি বিনে।

(৭)

তাইবলি হে বাঙ্গালি! গৌরাঙ্গ-সজাতি!
গৌর-প্রেমে মজ—গৌর ভজ দিবারাতি।
ভক্তিভরে ধর করে করতাল-খোল,
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল!
গৌর ভেবে গৌরভাবে হইয়ে বিভোল,
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল!
গৌরহরি-ভাবে ভবে দেও সবে কোল,
ভব হরি, জপ হরি, বল হরিবোল!
গৌরহরি ধরি ধন্য বাঙ্গালার কোল;
বাঙ্গালি! হওহে ধন্য বলে হরিবোল!
গৌরহরি হয়ে হরি বলে হরিবোল,
হরি সহ অহরহ বল হরিবোল!

——

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শুনঃশেপ।

হরিশ্চন্দ্র নামে ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার শত জায়া ছিল, কিন্তু কাহারও গর্ভে পুত্র জন্মে নাই। তাঁহার গৃহে নারদ ও পর্ব্বত নামক দুই ঋষি বাস করিতেন। রাজা একদিন নারদকে বলিলেন যে, হে নারদ! মনুষ্য, এমনকি পশুরাও পুত্র কামনা করিয়া থাকে; পুত্রের দ্বারা কি লাভ হয়, আমাকে তাহা বলুন। নারদ বলিলেন যে, পিতা পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্ন জীবন রক্ষা করে, বস্ত্র শীত নিবারণ করে, সুবর্ণ দ্বারা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, জায়া বন্ধুর সমান, কন্যা দয়ার পাত্রী কিন্তু পুত্র জ্যোতিঃস্বরূপ। পতিই পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করেন, এবং দশম মাসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। পতি পত্নীতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, পত্নীকে "জায়া" বলা হয়। (তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ) পুত্রাভাবে রাজা বড়ই দুঃখিত ছিলেন। নারদ রাজাকে

বরুণ সন্নিধানে পুত্র প্রার্থনা করিতে এবং পুত্র জন্মিলে, তাহাকে বরুণের নিকট বলিপ্রদান করিতে উপদেশ দিলেন। হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন, এবং পুত্র জন্মিলে, উহাকে বলি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম রাখা হইল রোহিত। তখন বরুণ রাজাকে বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এখন উহাকে আমার নিকট বলি প্রদান কর। রাজা বলিলেন, পশ্বাদি দশম দিবসের পূর্ব্বে বলির উপযুক্ত হয় না। দশ দিন গত হইলে তবে বলি প্রদান করিব। দশ দিন গত হইল, তখন বরুণ পুনর্ব্বার চাহিলেন, রাজা বলিলেন যে, দন্ত না উঠিলে বলি দেওয়া যায়না। দন্ত উঠিলে বরুণ পুনর্ব্বার আসিলেন, কিন্তু রাজা বলিলেন, দন্ত না পড়িলে বলি দেওয়া যায় না। দন্ত পড়িল, তখন রাজা বলিলেন, দন্ত পুনর্ব্বার না উঠিলে বলি দেওয়া যায় না। দন্ত পুনর্ব্বার উঠিল, তখন রাজা বলিলেন যে, ক্ষত্রিয় সন্তান অস্ত্র-সজ্জিত না হইলে বলির উপযুক্ত হয় না। রোহিত অস্ত্র-সজ্জিত হইলেন, বরুণ পুনর্ব্বার বলি প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা পুত্র রোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন যে, হে পুত্র! যিনি তোমাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আমি তোমাকে বলি প্রদান করিব। রোহিত তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি ধনুর্গ্রহণ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।

বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে আশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহার উদর স্ফীত হইল, অর্থাৎ রাজা জলোদরী রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। এদিকে রোহিত ছয় বৎসর ধরিয়া অরণ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অরণ্যে তিনি অজীগর্ত্ত নামক এক ঋষির দেখা পাইলেন। অজীগর্ত্ত অন্নাভাবে সপরিবারে উপবাস করিতেছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল, তাহাদিগের নাম শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ, শুনোলাঙ্গুল। রোহিত ঋষিকে বলিলেন যে, আমি তোমাকে শত গাভী প্রদান করিব, আমার পরিবর্ত্তে তোমার এক পুত্রকে বলি দিতে হইবে। অজীগর্ত্ত বলিলেন যে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না; তাঁহার পত্নী বলিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না। উভয়েই মধ্যম পুত্রকে দিতে সম্মত হইলেন। রোহিত তাহাদিগকে শত গাভী প্রদান করিয়া শুনঃশেপকে লইয়া পিতৃসমীপে গেলেন এবং বলিলেন, আমার পরিবর্ত্তে ইহাকে বলি প্রদান করুন। হরিশ্চন্দ্র বরুণকে ঐ কথা বলিলেন এবং বরুণ তাহাতে সম্মত হইলেন। রাজা রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং ঐ যজ্ঞের অভিষেচনীয় দিনে পশুস্থানে নরবলি দিবার ব্যবস্থা হইল।

এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়স্য উদ্গাতা ছিলেন। বলি দিবার সময় শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিতে লোক পাওয়া গেল না। তখন শুনঃশেপের পিতা অজীগর্ত্ত বলিলেন, আমাকে আর এক শত গাভী দেও, আমি উহাকে বন্ধন করিব। তৎপরে তাহাকে হত্যা করে, এমন লোকও পাওয়াগেলনা। তখন অজীগর্ত্ত বলিলেন, আমাকে আর এক শত গাভী দেও, আমি উহাকে বধ করিব। তিনশত গাভী প্রাপ্ত হইয়া অজীগর্ত্ত স্বীয়

পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিতে চলিলেন। তিনি যখন অসি শাণিত করিতে লাগিলেন, তখন শুনঃশেপ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে পশুর মত বধ করা হইবে। তখন তিনি দেবতাদিগকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতাদিগের স্তব করিতে করিতে তিনি বন্ধন বিমুক্ত হইলেন. এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগবিমুক্ত হইলেন।

এই সময় ঋত্বিকেরা শুনঃশেপকে বলিলেন যে, তুমিও এ যজ্ঞের কার্য্য সম্পন্ন কর, এবং তিনি তাহা করিলেন। যজ্ঞান্তে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের কোলে গিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার পিতা অজীগর্ত্ত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,হে ঋষি! আমার পুত্র আমাকে পুনর্ব্বার দান কর। বিশ্বামিত্র বলিলেন,দেবতারা ইহাকে আমাকেই দিয়াছেন। তদবধি শুনঃশেপের নাম দেবরাত হইল। তখন অজীগর্ত্ত শুনঃশেপকে বলিলেন যে, তোমার মাতা এবং আমি তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি বাটীতে ফিরিয়া আইস। শুনঃশেপ উত্তর করিলেন, আমা অপেক্ষা তিনশত গাভী তোমার নিকট বড় হইল,এবং শূদ্রও যে কার্য্য করিতে না পারে, তুমি তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে! অজীগর্ত্ত বলিলেন যে, আমি যে পাপ-কার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি, তোমাকে শত গাভী প্রদান করিব, তুমি ফিরিয়া আইস। শুনঃশেপ বলিলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য একবার করিতে পারে, সে তাহা পুনর্ব্বারও করিতে পারে। তুমি এখনও শূদ্রজনোচিত নৃশংসতা পরিত্যাগ করিতে পার নাই; তোমার সহিত পুনর্ব্বার মিলন হইতে পারে না। বিশ্বামিত্রও বলিলেন যে, এ কার্য্যের পর মিলন অসম্ভব। বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন,অজীগর্ত্ত যখন অসি হস্তে করিয়া পুত্রবধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল,তখন তাহার কি ভীষণমূর্ত্তিই হইয়াছিল। হে শুনঃশেপ! তুমি ইহার পুত্র হইওনা, আমি তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব। শুনঃশেপ বলিলেন, আমি অঙ্গিরসবংশ-সমুৎপন্ন, তোমার পুত্র হইব কিরূপে? বিশ্বামিত্র বলিলেন, তুমি আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্র হইবে, এবং আমার দৈব ধন সমুদায়ই তোমার হইবে। বিশ্বামিত্র তখন মধুচ্ছন্দা, ঋষভ, রেণু,অষ্টক প্রভৃতি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন,হে পুত্রগণ! দেবরাত তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন।

শুনঃশেপের আখ্যান ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে সংক্ষিপ্তভাবে গৃহীত হইল। অতি প্রাচীন কালেই যে ভারতবর্ষ হইতে নরবলি প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, শুনঃশেপের বৃত্তান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শুনঃশেপ একজন বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা এবং ঋগ্বেদ তাঁহার মন্ত্রদৃষ্ট হয়। এই বৃত্তান্তটি পাঠ করিলে, বিশ্বামিত্রই যে শুনঃশেপের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন,তাহা বোধহয়। যখন অজীগর্ত্ত শুনঃশেপকে লইতে চাহিলেন, তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তাঁহাকেই দেবতারা শুনঃশেপকে দিয়াছেন, এবং পরে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের অন্তিকে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার পুত্ররূপে গৃহীত হইলেন। ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়দিগের দত্তক-পুত্ররূপে গৃহীত হইতেন, এতদ্দ্বারা তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে। গোধন যে প্রাচীন ভারতে পরম ধন ছিল, এ প্রসঙ্গে তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। এইপ্রকার বৈদিক আখ্যান-গুলিই প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য সমাজের অবস্থা পরিজ্ঞানের ঐতিহাসিক উপায় স্বরূপ।

মীমাংসা দর্শনম্।

[জৈমিনি সূত্রং]

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া, অতঃপর মীমাংসাচার্য্য মহর্ষিপ্রবর জৈমিনি "বিধিবন্নিগদ" নামক বেদবাক্যাবলীর বিচার করিতেছেন। এই সমস্ত বাক্য আপাততঃ বিধিবাক্যের ন্যায় প্রতীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহারা বিধিবাক্য নহে, স্তাবক মাত্র। বিহিতবস্তুর স্তুতিকরাই উহাদিগের উদ্দেশ্য। "বিধিবৎ নিগদ্যতে" (বিধির ন্যায় কথিত হইতেছে) এই জন্যই ইহাদের নাম "বিধিবন্নিগদ।" ঐ সকল বাক্যে বিধিভ্রম উপস্থিত হওয়ায় উহারা বিধি, কি অর্থবাদ, তাহা নিশ্চয়করা আবশ্যক, সুতরাং উহাদিগকে বিধিবাক্য বলিয়াই "পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে। যুক্তিবলে উহাদিগের অর্থবাদত্ব প্রমাণীকৃত হইলে আর বিধি বলিয়া ভ্রান্তি হইবে না!

পূর্ব্বপক্ষাবলম্বীর প্রথম সূত্র যথা,—

বিধির্ব্বাস্যাদপূর্ব্বত্বাদ্বাদমাত্রংহ্যনর্থকং। ১৯

পদপাঠঃ। বিধিঃ। বা। স্যাৎ। অপূর্ব্বত্বাৎ। বাদমাত্রং। হি। অনর্থকং।

ব্যাখ্যা। বিধিঃ—বিধি অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য। বা—(পক্ষান্তরে) স্যাৎ—হইবে। অপূর্ব্বত্বাৎ—অপূর্ব্ব পদার্থ প্রতিপাদন করিতেছে এইজন্য। বাদমাত্রং—অর্থবাদ হইলে উহা বাক্যমাত্র। (যেহেতু অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থবোধনে তাৎপর্য্য নাই।) হি—যেহেতু। অনর্থকং—ব্যর্থ হইয়া যায়। (নিষ্ফল হইয়া যাওয়া অপেক্ষা অপূর্ব্ব বিধি বলিলে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় এবং মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং বিফল অর্থবাদ বলা-যায় না "বিধি"—বলাই সমধিক সঙ্গত। পূর্ব্বপক্ষের এই একটী সাধারণ যুক্তি।):

বঙ্গার্থঃ। বিধির ন্যায় প্রতীত বিধিবন্নিগদ নামক বেদবাক্যগুলি বিধিই হইবে কিম্বা অর্থবাদ বলা যাইবে এইরূপ সংশয় সম্মুখীন হইলে বাদী বলিতেছেন, উহারা বিধি। যেহেতু অপূর্ব্ব অজ্ঞাত অর্থ বিধান করাই বিধির কার্য্য,ইহাতেও তাহাই দেখিতে পাইতেছি। যদি ঐগুলিকে অর্থবাদ বলাহয়, তাহারা উহা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইলে, কেন না অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। আর অর্থবাদ হইলে উহারা অনর্থক।

বিশদব্যাখ্যা।—"বা" শব্দেরদ্বারা পক্ষান্তর সূচিত হইয়াছে। "বিধির্ব্বা উত অর্থবাদঃ" এইরূপ সংশয় (অধ্যাহারদ্বারা) প্রদর্শিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সন্দেহ দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষের নির্ণয় বলিতেছেন "স্যাৎ" বিধিরেব।" উহাকে বিধিবাক্যই বলিব। অপূর্ব্বত্বাৎ—পূর্ব্বে যাহা কোনও-

প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই তাহাই যাহা-দ্বারা জানা যায় তাহাকে বিধি বলে। এই বিধিই এখানকার পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রেত। বেদে যে সকল যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড বিহিত-হইয়াছে তৎসমস্তই অপূর্ব্ব পদার্থ। যাগ করিলে স্বর্গ হয় ইহা লোকতঃ জানা যায় না, বেদবাক্যের দ্বারাই অবগত হইতে হয়। যেসকল পদার্থ অপূর্ব্ব,তৎপ্রতিপাদনই বিধির কার্য্য, সুতরাং নিগদবাক্য পূর্ব্বে সর্ব্বথা অজ্ঞাত পদার্থ জ্ঞাপক বলিয়া উহাকে বিধিই বলিব।

বাক্যটী আলোচনা করিলে ইহার রহস্য অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। "ঔডুম্বরো যূপোভবতি উর্গ্বা ঔডুম্বর উক্পশবঃ উর্জ্জৈবাস্মা উর্জ্জং পশূনাপ্নোতি উর্জ্জোবরুদ্ধ্যৈ।" ইহা একটী বিধিবন্নিগদ। ঔডুম্বর যূপ করিলে পশ্বাদি প্রাপ্তিফল হইবে। এইরূপ ফলবিধান এবং প্রয়োজনাদিও এই বাক্যে শ্রুত হইয়াছে। যূপ-কাষ্ঠ সাধারণের অপরিচিত নহে। পশুযাগে পশুবন্ধনের জন্য যূপ কাষ্ঠ আবশ্যক হইত। ঐ যূপকাষ্ঠ খদিরাদি বৃক্ষ হইতেই গ্রহণ করা হইত। এখানে বলা হইতেছে, উডুম্বর বৃক্ষজাত যূপ-কাষ্ঠ যজ্ঞে ব্যবহার করিলে পশুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এই পদার্থটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উডুম্বর বৃক্ষের যূপকাষ্ঠের এরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য আছে ইহা লোকতঃ অবগত হওয়া যায় না। ইহাকে বিধিবাক্য বলিলে কোনও দোষ হয় না। যদি ঐ বাক্য অর্থবাদ মাত্র হয়, তবে উহা বৃথা হইয়া গেল। অর্থবাদ স্তুতি করুক আর নাই করুক তাহাতে বিধেয় বস্তুর কিছু আসে যায় না, কারণ অনেক বিধানের স্তাবক অর্থবাদ নাই। বিধিবাক্যে যদি উহার ফলবত্তা অবগত হওয়া যায়, তবে ফলার্থী পুরুষ অবশ্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যে কর্ম্মের যে বিহিত ফল, তাহা দেখিয়াই লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। স্তুতি করিবার বিশেষ দরকার দেখাযায় না। সুতরাং অর্থবাদ পক্ষে ঐ বাক্য একেবারে নিষ্ফল। যদি বলাযায় যে, অর্থবাদ প্রবৃত্তির দৃঢ়তা জন্মায়। প্রশংসা শ্রবণ করিলে কার্য্যে সম-ধিক উৎসাহ হয়। এইজন্য অর্থবাদের আবশ্য-কতা থাকায় উহাকে অনর্থক বলা অনুচিত। তাহার উত্তরে বলিতে হইবে। বিধিপক্ষে শ্রুতিবলেই বিধানের জ্ঞান জন্মে। অর্থবাদ পক্ষে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। কেননা, প্রশংসাবোধক কোনও শব্দ নাই। ইহা এই-রূপ ফলপ্রদান করে, অতএব প্রশস্ত, সুতরাং ইহা করা উচিত। এইপ্রকারে প্রশংসা কল্পনা করিতে হয়। লক্ষণা অপেক্ষা শ্রুত পদার্থ সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ, অতএব লক্ষণা স্বীকার করিয়া উহাকে অর্থবাদ বলারচেয়ে শ্রুতিবলে সকল বিধিবাক্য বলাই বিশেষ সঙ্গত।

ইহার পরে পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা উত্থিত হইতেছে যথা—

লোকবৎ ইতিচেৎ। ২০

পদপাঠঃ। লোকবৎ। ইতি। চেৎ।

ব্যখ্যা। লোকবৎ—লোকে যেরূপ দেখা-যায় সেইরূপ। ইতি—ইহা। চেৎ—যদি-বলাযায়। (অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না এইরূপ প্রতিবাদাংশটুকু পরসূত্রে রহিয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। স্তুতি ব্যর্থ নয়, ইহার উপ-যোগিতা সাধারণতঃ লোক দৃষ্টান্তেই অবগত

হওয়া যায় এইরূপ যদি বলা হয়। ("তাহাও হইতে পারে না" এই টুকু পরসূত্রে আছে; পরসূত্রের সহিত ইহার অন্বয় করিতে হইবে।)

বিশদব্যাখ্যা।—প্রশংসা অনর্থক নহে, কারণ লৌকিক বাক্যগুলির রহস্য অন্বেষণ করিলেও তাহাকে প্ররোচনার কারণ প্রশংসা ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। দেবদত্তের এই গরুটী দুগ্ধবতী, স্ত্রীবৎস (বকনাবাছুর) প্রসব করে, ইহার বৎস কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, অল্পমাত্র আহারেই ইহার তৃপ্তি সম্পাদিত হয়, অতএব ইহাকে ক্রয় করা উচিত।" এই লৌকিক বাক্যে প্রশংসার কার্য্য কারিতা দেখা যাইতেছে। শুদ্ধ মাত্র "এই গরু ক্রয় করা উচিত" বলিলে তাহাতে ক্রেতার আকর্ষণের কোনও জিনিষ নাই বলিয়া আগ্রহ হয় না। কিন্তু উহার গুণগ্রাম শুনিলে তাহাতে আপনা হইতে ক্রেতা আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। বৈদিক বাক্যেও সেইরূপ হইতে পারে। কতকগুলি ঔডুম্বর যূপের প্রশংসা-শুনিলে অবশ্যই অনুষ্ঠাতা উহাতে প্ররোচিত ও প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই, সুতরাং প্রশংসার অভ্যন্তরে আবশ্যকতা রহিয়াছে। অর্থবাদ পক্ষের এই কথা বিধিপক্ষ (পূর্ব্বপক্ষবাদী) অনুপযুক্ত বলিতেছেন।

বর্ত্তমান সূত্রে আশঙ্কার মূল্য নাই ইহা বলা হইতেছে।

ন, পূর্ব্বত্বাৎ। ২১

পদপাঠঃ।—ন। পূর্ব্বত্বাৎ।

ব্যাখ্যা।—ন—প্রশংসা অনর্থক নহে ইহা বলিতে পারাযায় না (কেননা) পূর্ব্বত্বাৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তে যে সকল প্রশংসা বাক্য শুনিয়া লোকে দৃঢ় প্রবৃত্তি ও প্ররোচনা প্রাপ্ত হয় তথায় সেই সকল প্রশংসা তাহারা পূর্ব্বে জানিত বলিয়া আকৃষ্ট হয়। (এখানে তাহা নহে, কেননা এখানে যে সকল গুণের কথা বলা হইতেছে সে সকল গুণের বিষয় কেহই অবগত নহে, সুতরাং অজ্ঞাত গুণোল্লেখের দ্বারা প্রশংসাই হইতে পারে না, হইলেও তাহাতে প্ররোচিত হইবার কারণ নাই।)

বঙ্গার্থ।—স্তুতি ব্যর্থ নহে, একথা সত্য নয়, কারণ লৌকিক দৃষ্টান্ত এখানে খাটিতে পারে না। লোকে পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত গুণ-গুলির উল্লেখ করিয়াই গরুর প্রশংসা করা হইয়াছে, এখানে তাহা নহে।

বিশদব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি অবগত আছে "বকনাবাছুর প্রসব করিলে সে গরু ভাল, অল্প খাইলে বেশী দুগ্ধ দিলে তাহা সুলক্ষণ, বাছুর না মরিলে শীঘ্র গরুর দল বৃদ্ধি হয়" তাহারই ঐ গুণ গুলি বোধহওয়ায় প্রবৃত্তি হয়। ঐ সকলগুলি লোকে পরিচিত, পূর্ব্বে অনুভূত। বৈদিক প্রশংসায় যে সকল গুণের উল্লেখ করা হয়, তাহা লৌকিক পদার্থের ন্যায় সাধারণের জ্ঞাত বিষয় নহে, সে সকল গুণ শুনিয়া আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। বিধি-বাক্যদ্বারা "কর্ম্মকরা উচিত" ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদি "ইহা উচিত" শুনিয়া কেহ প্রবৃত্ত না হয়, তবে অজ্ঞাত কতকগুলি গুণের কথা তাহাকে বলিলে সে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে এরূপ হইতে পারে না। বিধিবাক্যে যদি সন্দেহ থাকে, অর্থবাদের সে সন্দেহ ভঞ্জনে সামর্থ্য নাই। বিধিবাক্য নিঃসন্দেহ বলিয়া ধারণা

হইলে তদ্দারাই প্ররোচনা হইতে পারে, অর্থবাদের আবশ্যক কি ? আরও দেখা যাইতেছে, যেহেতুত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, "উর্গা উদুম্বরঃ" উদুম্বর অন্ন এইজন্য উদুম্বর কাষ্ঠজাত যুপ করা উচিত, এই হেতুত্ব একান্ত অনুচিত ও অসম্ভব। উদুম্বরবৃক্ষ অন্ন হইতে পারে না, এ বচন নিশ্চয় মিথ্যা, অতএব ইহাতে যে প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে তাহাও মিথ্যাবলিয়া বলাযাইতে পারে, সুতরাং অর্থবাদ বলিলে ঐ বাক্য অনর্থক উহাদ্বারা প্রশংসা বোধন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং অগত্যা মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ফলবিধি বলা উচিত। পূর্ব্ব-পক্ষবাদী এখানে বিশ্রামগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মীমাংসাচার্য্যের মধুর গম্ভীর-রব কি ঘোষণা করে আলোচনা করা-যাউক।

উক্তন্তু বাক্য শেষত্বং। ২২

পদপাঠঃ।—উক্তং। তু। বাক্য-শেষত্বং।

ব্যাখ্যা।—উক্তং—বলাহইয়াছে। তু—(পক্ষান্তর অববোধক শব্দ।) বাক্যশেষত্বং—বিধিবাক্যের শেষভাগ অর্থবাদ ইহা।

বঙ্গার্থঃ।—বিধিবাক্যের শেষভাগ অর্থ-বাদ একথা পূর্ব্বেই "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। বিধির জন্য অর্থবাদ চাই এরূপ নহে, আছে বলি-য়াই বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া উহার সার্থক্য সম্পাদন করাহয়।)

বিশদব্যাখ্যা।—বিধির শেষ হইলে তাহা অর্থবাদ, ঐ অর্থবাদ যেরূপে বিধির উপকার করে এবং তাহার প্রামাণ্য যেরূপ তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। এখানে ফলবাক্য আছে বলিয়া উহাকে বিধি বলিতে এত আগ্রহ কেন? ঔদুম্বরযূপের ফলবাক্য এখানে বিধি হইতে পারে না কেন না, অবিহিত ঔদুম্বরের ফল কল্পনা অনুচিত, অবশ্যই বিহিত ঔদুম্বর যূপের ফল বলিতে হইবে। ফলবত্তা বুঝা-ইলে জানাযায় ইহার ফল আছে, ফল থাকিলে অবশ্য তাহা প্রশস্ত, কেননা নিষ্ফল অপেক্ষা চিরদিনই ফলবান্ আদৃত। সুতরাং ফল বচনের দ্বারা প্রশংসাই কথিত হইতেছে। প্রশংসা বুঝাইবার জন্য লক্ষণাস্বীকার দোষা-বহ নহে, কারণ লক্ষণা লোক প্রসিদ্ধ পদার্থ। একটী অপ্রসিদ্ধ অযুক্তিক ফল কল্পনা করা অপেক্ষা লোকপ্রসিদ্ধ লক্ষণাস্বীকার অসঙ্গত নহে, উদুম্বর বৃক্ষ অন্য নহে সত্য বটে, কিন্তু সাদৃশ্যনিবন্ধন ঐরূপ গৌণ ব্যবহার হয় ইহা গুণবাদের প্রতিপাদনে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অন্য যেরূপ প্রীতি সাধন ও তৃপ্তিকর সেইরূপ উদুম্বর বৃক্ষ পক্ক-ফল দ্বারা অন্নের ন্যায় তৃপ্তি সাধন হইতে পারে। এতাদৃশ সাদৃশ্য মনে করিয়াই উদু-ম্বরকে অন্নবলা হইয়াছে। ফলবচনই স্তুতি-বোধক, প্রকৃত ফল সম্বন্ধবোধক নহে কেন না তাহাতে বাক্যভেদ প্রভৃতি গুরুতর দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

সিদ্ধান্তে স্তুতি সম্ভব ইহাই দেখান হই-য়াছে। ফলবিষয় অসম্ভব। সম্প্রতি ইহা দেখাইবার জন্য অন্য একটী বিধিবন্নিগদ বাক্যের বিচার করা হইতেছে।

বিধিশ্চানর্থকঃ ক্বচিৎ তস্মাৎ স্তুতিঃ

প্রতীয়েত, তৎ সামান্যাৎ ইতরেষু তথাত্বং। ২৩

পদপাঠঃ।—বিধিঃ। চ। অনর্থকঃ। ক্বচিৎ। তস্মাৎ। স্তুতিঃ প্রতীয়েত। তৎসামান্যাৎ। ইতরেষু। তথাত্বং।

ব্যাখ্যা।—বিধিঃ—বিধান। চ—(হেত্বর্থে) যেহেতু। অনর্থকঃ—বৃথা। ক্বচিৎ—কোনও কোনও স্থানে। তস্মাৎ—সেইজন্য। স্তুতি—প্রশংসা। প্রতীয়েত—বুঝাযাইতেছে। তৎসামান্যাৎ—সেই সাদৃশ্য [বিধির সম্ভাবনা না থাকা এবং স্তুতির সম্ভাবনা থাকা] বশতঃ। ইতরেষু—অপরগুলিতে অর্থাৎ তৎ সজাতীয় সমস্ত স্থানে। তথাত্বং—তদ্রূপতা অর্থাৎ স্তাবকত্ব।

বঙ্গার্থঃ। কোনও কোনও স্থানে বিধিসম্ভব নহে, কিন্তু প্রশংসার সম্ভাবনা আছে সেইজন্য তৎসদৃশ সকল স্থানেই স্তাবকত্ব বলিতে হইবে। [কেননা সর্ব্বত্র বিধি অসম্ভব, কিন্তু কোন স্থানে প্রশংসা অসম্ভব নহে। অসম্ভব বস্তু প্রতিপাদন করিলে বাক্যের গৌরব রক্ষিত হয় না, বরঞ্চ ঐ বাক্য প্রলাপবাক্য বলিয়া উপেক্ষিত হয় অর্থবাদ পক্ষে সে দোষ সম্ভবই নহে, অতএব ঐ শ্রেণীর বাক্যগুলি অর্থবাদ একটীও বিধি নহে।]

বিশদব্যাখ্যা।—একটী বিধিবন্নিগদ আছে—"অপ্সুযোনির্ব্বা অশ্বো অপ্সুজো বেতসঃ" এখানে আর বিধি বলাযায় না, কেন না অপ্সুযোনি (জলজ) অশ্ব করা যায় না, তাহা অসম্ভব। মুখে বলিলে অসম্ভব সম্ভব হইবে না, বিধি বলে অশ্বকে অপ্‌-যোনি করা সাধ্যায়ত্ত নয়, সুতরাং বাধ্য হইয়া এখানে বিধিপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্তুতি পক্ষের স্তুতি করিতে হইবে, শময়িতৃজলের সহিত অশ্বের সম্বন্ধ যজমানের কষ্ট প্রশমিত করে ইত্যাদি রূপএকটী স্তুতি বোধন পথ অবশ্যই আশ্রয় করিতে হইবে। যখন এখানে বিধিসম্ভব নয়, স্তুতি সম্ভব আছে, তখন এই জাতীয় সমস্ত বাক্যেই অন্বেষণ করিলে দেখাযাইবে বিধি হয়না স্তুতিই প্রতিপাদিত হয়। অতএব ইহারা সকলেই স্তাবক অর্থবাদ, বিধিভ্রম উৎপাদন করিয়া নিজেদের বিধিবন্নিগদ নামের সার্থকতা সংরক্ষণ করে এইটুকুমাত্র সাধারণ অর্থবাদ অপেক্ষা ইহাদের বিশেষত্ব। এইজন্যই ইহাদের স্বতন্ত্র অধিকরণে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আরও একটী বিধিবন্নিগদ বাক্য আলোচনা করিয়া দেখান যাইতেছে বিধান অত্যন্ত অসম্ভব সর্ব্বথা স্তুতিই ইহাদের অর্থ।

প্রকরণে সম্ভবন্ অপকর্ষোনকল্প্যেত, বিধ্যানর্থক্যং হি তং প্রতি। ২৪

পদপাঠঃ। প্রকরণে। সম্ভবন্। অপকর্ষোনকল্প্যেত, বিধ্যানর্থক্যং। হি। তং। প্রতি।

ব্যাখ্যা।—প্রকরণে—প্রস্তাবে। সম্ভবন্—সম্ভব হইলে। (তাহার) অপকর্ষঃ—অন্যত্র উঠাইয়া লওয়া। ন—না। কল্প্যেত—কল্পিত হয়। [কল্পিত হয় না এইরূপ অর্থ।] বিধ্যানর্থক্যং—বিধানের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়। তংপ্রতি—সেই প্রকরণ প্রতিপাদিত কার্য্যের প্রতি। [অতএব স্তুতিবাদেই আনর্থক্য নিবারণ করিতে হইবে।]

বঙ্গার্থঃ।—অনেক স্থানে বিহিত পদার্থ-প্রকরণে স্থান পায় না, কিন্তু উহাকে অর্থবাদ

বলিলে প্রকরণেই সম্ভব হয়, সেখানে প্রকরণের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য অর্থবাদই বলিতে হয়, কারণ প্রকরণপ্রতিপাদ্য পদার্থের প্রতি বিধানের সার্থকতা নাই। অতএব উহাকে অর্থবাদ বলিতে আপত্তি না থাকা উচিত।

বিশদব্যাখ্যা।—দর্শ পূর্ণমাস যজ্ঞের প্রকরণে "যোবিদগ্ধঃ সনৈর্ঋতঃ যোঽশৃতঃ সরৌদ্রঃ যঃ শৃতঃ সদৈবতঃ তস্মাদবিদহতা শ্রপয়িতব্যং সদৈবতত্বায়" এই বাক্য আছে। ইহার অর্থ যে পুরোডাশ—দগ্ধ হইয়াছে তাহা নিঋতির যাহা আশৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পক্ক হয় নাই তাহারুদ্রের যাহা শৃত অর্থাৎ সম্যক পক্ক (অদগ্ধ) তাহাই দেবতার অতএব যাহাতে দগ্ধ না হয় এরূপ ভাবে শ্রপণ (উষ্ণকরণ) করা উচিত, তাহাহইলে তাহা দেবতার উপযোগী হয়। এখানে বিধান বলা যায় না, কেন না তাহা হইলে নৈঋত পুরোডাশ বিদগ্ধ করিতে হইবে, এইরূপ অর্থ হয়, কিন্তু দর্শপূর্ণ মাসযজ্ঞে নির্ঋতি দেবতা নাই, এ প্রকরণে সে কথা বলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না, বস্তুতঃ এখানে উহা সম্পূর্ণ অনর্থক, উহাকে অন্য কোনও স্থানে লইয়া যাওয়াও অনুচিত, কারণ তাহাতে প্রকরণ প্রমাণ বাধিত হয়। শ্রুতি, অথবা লিঙ্গ কিম্বা বাক্যবলে প্রকরণ প্রমাণের বাধ সংঘটিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এখানে ইহাকে অপরত্র লইবার কোনও শ্রুতিলিঙ্গ অথবা বাক্য প্রমাণ নাই। অতএব ইহার গতি নাই। অন্যত্র যাইবার সামর্থ্য নাই, থাকিবারও যোগ্যতা নাই, বেদবাক্যটী ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে অর্থবাদ বলাযায় তবে দর্শপূর্ণমাসযাগীয় শৃত পুরোডাশকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য দগ্ধ ও অপক্কের কথা বলা হইয়াছে। শৃত পুরোডাশ দৈবত তাহাই প্রশস্ত অশৃত ও বিদগ্ধ—দৈবত নহে, সুতরাং পরিত্যজ্য। এইরূপে শৃত-প্রশংসা বলিলে আর গোল নাই। বিধিপক্ষে ব্যর্থতা, সুতরাং ইহারা বিধি নহে, স্তাবক অর্থবাদ মাত্র।

অন্য প্রবল যুক্তির উল্লেখ করা হইতেছে—

বিধৌ চ বাক্যভেদঃ স্যাৎ। ২৫

পদপাঠঃ। বিধৌ। চ। বাক্যভেদঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। বিধৌ—বিধিস্বীকার করিলে। চ—আরও দোষ। বাক্যভেদঃ—বাক্যভেদ নামক দোষ। স্যাৎ—হয়।

বঙ্গার্থঃ। বিধি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষে তাহা অসম্ভব হয়।

বিশদব্যাখ্যা।—ঔডুম্বর যূপের যে বাক্য প্রথমে কথিত হইয়াছে, তাহাতে বিধান বলিলে বাক্যভেদ হয়। "ঔডুম্বরোযূপঃ প্রশস্তঃ সচউর্জ্জোরুদ্ধ্যৈ" ঔডুম্বর বৃক্ষজাত যূপ প্রশস্ত ভাবটীর উর্জ্জ (বল অথবা অন্ন) অবরোধ করে এই ভিন্ন বাক্যতা দোষ উপস্থিত হয়। বাক্যভেদ অনুচিত ও অশেষ দোষের মূলীভূত। শবর স্বামিরমতে বাক্যভেদ প্রকার প্রদর্শিত হইল। ভট্টপাদ বলেন "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্য ভেদোনবেষ্যতে" একবাক্যতা করিতে পারিলে বাক্যভেদ করা উচিত নয়। পূর্ব্বাপর আলোচনাকরিলে একবাক্যতা প্রতীত হয় সুতরাং বিধি নহে। অর্থবাদ বলিলে বাক্যভেদাদি দোষ হয় না। সুতরাং সেই পক্ষই শ্রেয়ঃ। অতএব বিধিবাদিগণ

অর্থবাদ মাত্র। তথায় বিধির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ইহা প্রতিপাদিত হইল। পরে অপর অর্থবাদের বিষয় বলা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

আমিত্বের প্রসার।

বৈরাগ্য।

মানুষ সুখের আশায় কতই কিনা করিতেছে,কিন্তু সুখ লাভ করিতে পারিতেছে-না। সুখের আশায় ঘর বাঁধিতেছে, কিন্তু তাহা আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে। সুখের আশায় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতেছে.সাগর পার-হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই সুখ হস্তগত হইতেছে না। প্রাসাদ কি কুটীর, লোকালয়, কি বিজনবন সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ, যুবা সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান, সুখের জন্য কত যত্ন কত চেষ্টা; এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, কিন্তু সুখ স্বর্ণমৃগের ন্যায় কিছুতেই ধরা-দিতে চাহে না। মানবজীবন বিড়ম্বনা পরিপূর্ণ। কোথাহইতে কে আসিয়া মানবের সমস্ত গণনায় ভুল করিয়া দেয়। যখন চাই রৌদ্র, তখন হয় বৃষ্টি, যখন চাই বৃষ্টি তখন হয় রৌদ্র। নীল নভোমণ্ডল—মেঘ মাত্র নাই, কিন্তু হঠাৎ মানবের শিরে বজ্রপাত হইতেছে। কন্যার বিবাহ উৎসবে গৃহ আনন্দ পরিপূর্ণ, কিন্তু বাসরঘরেই কন্যা বিধবা; আনন্দধ্বনি হৃদয়বিদারি, আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। বলিবারই কিছুই নাই। মানবের পদে পদে বিপদ, ভয়ে জড় প্রায়। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রের জন্য কত লালায়িত, কত তপ, জপ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিল, পুত্রও জন্মিল তখন কত আনন্দ, কিন্তু সেই পুত্র পিতা মাতাকে দুঃখের পাথারে ভাসাইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিল। কত যত্ন করিয়া গোলাপ গাছটি রোপণ করিলাম, মুকুলও দেখাদিল কিন্তু ফুল ফুটিতে না ফুটিতে কোথাকায় এক কীট আসিয়া তাহাকে দংশন করিয়া গেল। সব আশা ফুরাইয়া গেল। সর্ব্বত্রই মানব জীবন অবিচ্ছিন্ন বিষাদে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। যাহাকে বড়ই সুখী বলিয়া বিবেচনাকর না কেন, তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ খুলিয়া দেখিল, দেখিতে পাইবে সেখানে একটি দুঃখের উৎস নিয়ত বিষাদ উদ্গীরণ করিতেছে। মানুষ যে আত্মহত্যা করে না, সে কেবল আশার প্ররোচনায়। আশাই মানবের দুঃখের কারণ কিন্তু ঐ আশাই আবার মানবকে দুঃখসহ করিবার শক্তি প্রদান করে। এইজন্যই আশাকে কুহকিনী বলে। কুহকিনীর কুহকে পড়িয়াই মানব দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। কুহকিনীকে পরিত্যাগ কর, দেখিবে দুঃখ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই বলি আশাতে পরম-দুঃখ, নিরাশায় পরম সুখ। আশার পরিত্যাগ করিতে পারিলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং বৈরাগ্যে আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আশার কুহকে জীব কতই না কি করিতেছে! সুখ, দুখ, সম্পৎ, বিপৎ, সকলই আশারূপ সুদৃঢ়-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আশার মোহনবীণাধ্বনি যখন কর্ণবিবরে প্রচুর সুধা বর্ষণ করে জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে

তখন আনন্দের ভরপুর তুফান বহিয়া যায়। জীব আত্মহারা হয়। কর্ত্তব্যের পথ আপনা হইতে কণ্টকিত রহিয়াছে। মুগ্ধ-জীবের অন্ধ নয়ন তাহা দেখিতে পায় না। কাজেই পদে-পদে বিপদ জালে জড়ীভূত হয়। যখন আশাকে বিদায় দিয়া জীব আপনাতেই আপনি তুষ্ট হন, তখন কর্ত্তব্যের সঙ্কীর্ণ বিপৎ সঙ্কুল কণ্টকিত পন্থাও বিবেক-খড়্গের দ্বারা তিনি অকণ্টক করিতে পারেন। আশার অপগমে আশার সমস্ত চাতুরীও বিদূরিত হয়। জীবের নয়ন হইতে ঘুমের ঘোর ঘুঁচিয়া যায়। জীবের হৃদয়ের কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যায়। দর্পণ পরিষ্কৃত হইলে তাহাতে কোনও বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে বাধা হয় না। আশার কালী মাখিয়া হৃদয় কাল হইয়া গিয়াছিল। আশার অন্তর্দ্ধানে কালিমা ও কালের কবলে বিলীন হইল। বিমল হৃদয় দর্পণে—পরম জ্যোতি আপনা হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেঘের আবরণ আর নাই, নির্ম্মল আকাশে ভাস্কর কেন দেখা দিবে না? তত্ত্বজ্ঞানালোকে অবিদ্যা তিমির দূরেগেল। রহিল সেই শাশ্বত নির্ম্মল জ্যোতি, আমি যাহাছিলাম তাহাই হইলাম, আর কি আশায় আশ্বস্ত হইব? না নৈরাশ্যে ব্যথিত হইব? আর কিসুখে প্রাণ পাগল হইবে? না, দুঃখে দগ্ধ হইবে? দৈব দুর্ব্বিপাকে আমাকে আমি চিনিয়াও চিনিতাম না। এখন যে শান্তির কমনীয়-কান্তি দেখিতেছি, কাহার প্রসাদে? বৈরাগ্যের। আশার মূল উৎপাটিত হইলে অশান্তির নিবৃত্তি হইল। এই আশা ত্যাগ বৈরাগ্যের পরিচয়। বৈরাগ্য জীবকে দেখাইতে চায়—বুঝাইতে চায়—জানাইতে চায়, কুহকিনীর প্রলোভনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ উহাকে পরিত্যাগ করিলেই তোমার নিকট শান্তিকুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে। স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্র ধন ধান্য পরিত্যাগ করাই বৈরাগ্য নহে। বৈরাগ্য ইহার কিছুইত ত্যাগ করিতে বলেনা। ইহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে বলে। পুত্রাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিলে আর পুত্রজনিত সুখ দুঃখ হৃদয়কে ব্যথিত করিবে না। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করাই জীবের নির্দ্দোষ সন্ন্যাস, কর্ম্ম পরিত্যাগকরা সন্ন্যাস নহে; ভগবদুক্তিতে দেখাযায়। "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ। ধন জনের বৃথামোহমূলক মমতা ত্যাগই বৈরাগ্য। রাগ অর্থাৎ আসক্তি না থাকাই বৈরাগ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। আসক্তি গেলে কর্ত্তব্য কার্য্য যায় না। অথচ সকল গোল মিটিয়া যায়, শান্তির বাতাস একটু একটু ক্রমশঃ বহিতে থাকে বৈরাগ্য আমিত্বের প্রসারের সন্নিকৃষ্ট। আমার শরীর স্ত্রী পুত্র ধন সম্পত্তির প্রতি অযথা আসক্তিতেই আমার আমিত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছে। আসক্তির বন্ধন কাটিয়া গেলে জগৎজোড়া-আমিত্ব দেখাদিবে। সর্ব্বভূতে আত্ম দর্শন সকল সাধনারই ত মূলমন্ত্র। বৈরাগ্য তাহার পরম আত্মীয়। বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভ্রান্তসংস্কারই আমাদের অনিষ্ট-জনক। "স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিলাম, কুশাসনে শয়ন, কিন্তু কুশাসন খানি ছিঁড়িয়াগেলে যেন হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়, ইহা কি বৈরাগ্য? বৈরাগ্য বলেন, কুশাসনেও আসক্ত

হইও না, স্বর্ণাসনেও আসক্ত হইও না। আমরা এই উপদেশের অপব্যবহার করি। নিজের বিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করি, প্রজা-পুঞ্জের প্রতি অনাসক্ত হই অরণ্যের ক্ষুদ্র আশ্রম-রাজ্যে রাজা হইয়া মৃগশাবক প্রজার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হই। ইহা প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য নহে। প্রজাপুঞ্জ আর মৃগশাবক যেই হউক না কেন কেহই আমার বৈরাগ্যে সহায়তা করে না। একটীর প্রতি বিরক্ত হওয়ায় আর অপরের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় বৈরাগ্য হইতে পারে না। কোটী কোটী প্রজার প্রতি যে বিপুল স্নেহ বা আসক্তি তাহাকে চাঁপিয়া এক মৃগশিশুর উপর দেওয়াহইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই কমে নাই। তুলারাশিকে একটী থলিয়ায় আবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাই অনবরত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছি, মাটীতে রাখিলেও যেন ভাল লাগে না। এরূপ বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য নহে, কেবল বৈরাগ্যের প্রথম সোপান। আসক্তিকে কলসী হইতে তুলিয়া ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে রাখা ভিন্ন ইহা কিছুই নয়। সকল বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগই প্রকৃত বৈরাগ্য তাহাতেই আমিত্বের প্রসার।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে আশাই আমাদের তাবৎ দুঃখের কারণ। স্বার্থই আশার জনয়িতা। যেখানে স্বার্থ নাই সেখানে আশা নাই, আছে কেবল কর্ত্তব্য, এবং যেখানে কর্ত্তব্য সেখানে ফল প্রাপ্তি হেতু সুখ নাই কিম্বা ফলাপ্রাপ্তি হেতু দুঃখ নাই আছে কেবল কর্ত্তব্যসম্পাদনজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ। পুত্রের মৃত্যুজনিত যে দুঃখ তাহার মূল কোথায়? তাহার মূল আমার হৃদয়ের পোষিত-বাসনায়। বাসনা পূর্ণ না হওয়াতেই আমার দুঃখ। পুত্র যদি জীবিত থাকিত এবং ঐ পুত্র হইতে যদি আমার পোষিত বাসনাগুলি পূর্ণ না হইত, তাহা হইলেও আমার দুঃখ হইত। কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইত না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কোন কার্য্য করিলে ওরূপ হয় না। আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি করিলাম, ফল যাহা হইবার তাহা হউক। রাজা যুধিষ্ঠির নিরতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু আজীবন ধর্ম্মে নিরত থাকিয়াও, তাঁহার সহস্র সহস্র বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল; অন্য লোক রাজার দুঃখে কতই দুঃখিত হইত কিন্তু রাজার বিন্দুমাত্রও দুঃখ ছিল না। কেন না তিনি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। যখন যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃবর্গও দ্রৌপদীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলেন তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে কি লাভ হইল, দুর্য্যোধন নানাবিধ অন্যায় কার্য্য করিয়াও সুখে অবস্থান করিতেছেন এবং যুধিষ্ঠির নানাবিধ সুকার্য্য করিয়াও দুঃখে কালযাপন করিতেছেন ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি হিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করাতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন—

"নাহং কর্ম্ম ফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত
দদামি দেয়মিতি যজে যষ্টব্যমিত্যুত।
অস্তু বাত্র ফলং মাবা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ॥
ধর্ম্মঞ্চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্ম ফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥

ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবশ্চৈব মে ধ্রুতম।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম॥

হে দ্রৌপদি! আমি কর্ম্মফল অন্বেষণ-করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না! দান করা কর্ত্তব্য তাই আমি দান করি, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য তাই আমি যজ্ঞ করি। ফল হউক বা না হউক, গৃহে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য আমি তাহা যথাশক্তি করিয়া থাকি। হে সুশ্রোণি! আমি সাধুজনের ব্যবহার ও শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু ধর্ম্মের ফল কামনা করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না। হে কৃষ্ণে! আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মে আবদ্ধ আমি ধর্ম্মের বণিক নহি, যাহারা ধর্ম্মের বণিক তাহারা ধর্ম্মবাদীদিগের নিকট জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। বাহিরের লোক দেখিতেছে যুধিষ্ঠিরের কতই দুঃখ, কিন্তু যুধিষ্ঠির কর্ত্তব্য সম্পাদন জনিত আনন্দে বিহ্বল; সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে ফলে তোমার অধিকার নাই। ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না কিন্তু কর্ম্ম না করিয়াও থাকিও না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে আত্মার বিকাশ হয়। যেপর্য্যন্ত বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত আমাদের সকল কার্য্যই রঞ্জিত ভাব ধারণ করে এবং তাহাহইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয় না। নিস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে সাত্ত্বিকতা লাভ হয় এবং সাত্ত্বিকতা লাভ হইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয়।

ট্রান্সভালে ইংরেজদিগের সহিত বুয়রদিগের তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য না করিয়া স্বীয় স্বার্থের অভিসন্ধিতে এ ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তাহাহইলে আজ তাঁহার কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত। তাহাহইতে স্বীয় আত্ম-গ্লানি এবং সমগ্র জগতের নিন্দা তাঁহার জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিত কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট, দেশ ভ্রষ্ট, পরিবার ভ্রষ্ট হইয়াও ক্রুগার অচল অটল, ও বলীয়ান এবং তাঁহার শত্রুগণও শতমুখে তাঁহার অচল ভগবৎভক্তি বিশ্বাসে প্রশংসা না করিয়া পারিতেছেন না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিলে ফললাভ না হইলেও, হৃদয় বিষণ্ণ বা উৎকণ্ঠিত হয় না কিন্তু স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল সর্ব্বত্রই বিষময় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে গেলেই আত্ম-জ্ঞানের আবশ্যক তোমার আত্মা ও আমার আত্মা এক ইহা উপলব্ধি না করিতে পারিলে নিস্বার্থ-ভাবে কার্য্য করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই দেহ আত্মার উপাধি মাত্র কিন্তু দেহ মধ্যবর্ত্তী অন্তর্য্যামী পুরুষ এক মাত্র এই জ্ঞান দৃঢ় করিতে না পারিলে নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে পারা যায় না এবং নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য সম্পাদন হয় না। বৈরাগ্য ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না। ধনজন জায়া সুত পার্থিব তাবৎ পদার্থই

অনিত্য। তাহাদিগের দ্বারা কেহ কখন অমৃতত্বের অধিকারী হইতে পারে না; তাহারা কখনও বিশুদ্ধ নিত্যানন্দ প্রদান করিতে পারে না এই জ্ঞান দৃঢ় না হইলে কেহ কখন আত্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয় না। তোমার পিতা পিতামহ কোথায়, তুমি বা কিছুদিন পরে কোথায় যাইবে, কে তোমার পুত্র কে তোমার কন্যা.তুমি কে কোথা হইতে আসিয়াছ এই সমুদয় প্রশ্ন হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ভৌতিক জগতের উর্দ্ধে গমন করা যায়। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে করিতে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থে বিরাগ উপস্থিত হয় এবং আত্মাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হয়। হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জগতের তাবৎ পদার্থের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যই আত্মার দিকে লইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান জন্মিলে আবার তাবৎ বস্তুতেই স্বীয় আত্মা অনুভূত হওয়ায় তাহারা আত্মীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে কর্ত্তব্য থাকে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই সময়ে সুখে স্পৃহা থাকে না, দুঃখে উদ্বেগ জন্মে না, চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হয়। যাঁহার যত বৈরাগ্য তাঁহার তত মায়া, কেন না এই বিশ্ব তাঁহার বাহিরে নয়। অতএব হে জীব, যদি আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে তোমার আত্ম জ্ঞান হইবে এবং আত্ম জ্ঞান হইলেই তোমার সর্ব্বত্রই আত্মোপলব্ধি হইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শোকোচ্ছ্বাস।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

বিধাতার বিচিত্রকৌশলপূর্ণ বিশ্বচক্র প্রতিনিয়ত আপনা আপনি আবর্ত্তিত হইতেছে। অযাচিত ভাবেই সুখের পর দুঃখ শান্তির উপর অশান্তি আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমরা চাহি না বলিলেও যাইবে না, প্রীতিপ্রফুল্লমনে সাদর সম্ভাষণে অভিনন্দিত করিলেও চিরদিন রহিবে না। জগতের এই গতি, এই প্রকৃতি এই পদ্ধতি। পূর্ব্ববঙ্গের গগণে যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রটী আপন আভায় আপনি আলোকিত হইয়া আকাশতল বিমল করিতেছিল—যাহার অদর্শন অচিরকাল মধ্যেই বিষম বিষাদ তিমিরে বঙ্গ আবৃত হইয়াছে সেই প্রভাময়নক্ষত্রটী আর আমাদিগের নয়নের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিবে না। পাঠকমহোদয়গণ! সেই ভীষণ শোককথা কহিতে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যায়, প্রাণ যেন খিন্ন অবসন্ন হইতেছে, জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে কি বিষম শোক সংবাদ! ভাওয়ালের সর্ব্বজনপ্রিয় গুণগণ-নিকেতন অসাধারণ দানশক্তি-সম্পন্ন বঙ্গ সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ মান্যবর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে আমরা হারাইয়াছি। বঙ্গ শোকে ম্রিয়মান আত্মীয় স্বজনের ও প্রজাপুঞ্জের

আকুল আর্ত্তনাদে আকাশ পূর্ণ ও উষ্ণ অশ্রুতে ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে বঙ্গের এক একটী রত্ন না জানি বিশ্বপতির কোন্ অকৃপাবলেঅকালে কাল সাগরের অতলজলে ডুবিয়া যাইতেছে। বলিতে পারি না, বিধাতার মনে আর কি আছে? রাজাবাহাদুরের অসামান্য সাহিত্যানুরাগ ও দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না প্রতিবৎসর ৫০ খণ্ড হিন্দু-পত্রিকা রাজাবাহাদুর গ্রহণ করিতেন। হিন্দু-পত্রিকা একজন অকৃত্রিম আশ্রয়দাতা হারা হইয়া শোকার্ণবে নিমগ্না। হিন্দু-পত্রিকা রাজাবাহাদুরকে হারাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্নেহ জীবনে ভুলিবে না। স্বর্গত রাজাবাহাদুরের শোকাকুল স্বজন-বর্গের নয়নজলের সহিত হিন্দু-পত্রিকা স্বীয় অশ্রু মিশাইয়া চরিতার্থা। সংসারের অনাচার অত্যাচার ঘাত প্রতিঘাত দুঃখদুর্দ্দিন বেদনা তাড়না যাতনাময় মর্ত্ত্যরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাবাহাদুর মহাযাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গের চির-শান্তিময় রাজ্য তাঁহার জন্য রহিয়াছে। যেখানে ঈর্ষা প্রতিহিংসার প্রবল পৈশাচক্রীড়া নাই, অশান্তি অত্যাচারের নামগন্ধও নাই, সর্ব্বদা যেখানে শান্তির সুবাতাস ঝির ঝির রবে ধীরে ধীরে বহিতেছে সেই রাজ্যই তাঁহার যোগ্য। পাপের সংসারে পর দুঃখে যাঁহার প্রাণ কাঁদে এরূপ মহাত্মার স্থান স্বল্প সময়ের জন্যই। অতি দুঃখিত অন্তরে তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি, যেখানে ভগবানের অনন্ত করুণার উৎস তাঁহার জন্য প্রসারিত আছে, সেই স্থানে তিনি শান্তি লাভ করুন। আশ্রিতের আর্ত্তধ্বনি আর সেখানে তাঁহার কর্ণবিবরে পৌঁছিতে পারিবে না, কিন্তু শত শত নিরাশ্রয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবাকরিবে। রাজাবাহাদুরের অশেষ গুণগ্রাম বঙ্গের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, বঙ্গ তাহা ভুলিবে না। আমরা বঙ্গসাহিত্যের মহারথী বাগ্মিবর ধীশক্তির অবতার রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আশাকরি, বিশাল ভাওয়াল রাজ্যের সুব্যবস্থাপক ও রাজকুমার ত্রয়ের অভিভাবক তিনি থাকিলে ভাওয়াল সিংহাসনে রাজেন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর আমরা সেইরূপ গুণনিলয় তিন রাজেন্দ্র দেখিয়া আমাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। অতীতের অনুশোচনা কেবল ক্লেশকর; রাজাবাহাদুরের শোকাকুল পরিবারবর্গকে সংসারের নশ্বরতা দেখাইয়া আমরা সান্ত্বনা করিতে চাহি। ক্ষণভঙ্গুর শরীর সংস্থান কোনওনা কোন দিন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। প্রকৃতির সে প্রবল বেগ অনিবার্য্য। কিন্তু সৎকার্য্য জগতে আপনার প্রতিভূ রাখিয়া যাইবে। রাজা বাহাদুর নরদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গ সমস্বরে বলিবে **কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।**

শরীর রক্ষার্থ সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান।

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য
শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং
সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাং

এ জগতে মানবমাত্রেই চতুর্ব্বর্গের ফল কামনা করিয়া থাকে, চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করিতে হইলেই সর্ব্বতোভাবে শরীর সুস্থ রাখা আবশ্যক। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ লাভের প্রধান কারণই শরীর, এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বভাবঃ শরীরিণাং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমং
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ॥

অর্থাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরীর রক্ষা করা আবশ্যক, কেননা শরীর অভাব হইলে সকল কার্য্যই বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মূল কারণই সুস্থতা। কিন্তু রোগ স্বাস্থ্য এবং শরীর বিনাশ করে, শরীর রক্ষা বিষয়ে হঠযোগবলেন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" কেবল যে পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিলেই শরীর রক্ষা হইবে তাহাও নহে ঐ সঙ্গে ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বেদাদি শাস্ত্রে যেমন সদাচার অনুষ্ঠানের বিধান আছে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও সেরূপ সৎকার্য্যানুষ্ঠানের নিয়ম আছে। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনকে বশীভূত করা আবশ্যক, যেহেতু "মনঃপুরঃসরাণী ন্দ্রিয়াণ্যর্থগ্রহণসমর্থানি ভবন্তি" মনই চক্ষু আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং জিহ্বাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে প্রেরণ করে, মনব্যতীত কখনই ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, মন যে সময় যে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে তখন সেই ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান হয়, অন্য ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ মন যদি চক্ষুকে আশ্রয় করে চক্ষু জনিত জ্ঞান হয় এইরূপ কর্ণাশ্রিত হইলে শ্রবণ জন্য জ্ঞান হয়, এইজন্য একদা উভয় ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না, ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনই সমস্ত সুকার্য্য দুষ্কার্য্যের একটী প্রধান কারণ, সত্ত্ব, রজঃ তম গুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মন সুকার্য্য দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, রজওতম গুণাক্রান্ত হইয়া কুপথে রত হয় মন যদি সত্ত্বগুণাধিক্য হয় তাহাহইলে কখনই গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না কেন না "রজস্তমোভ্যামাবিষ্টঃ চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে" রজ এবং তমগুণেরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়, এই রজ এবং তম গুণই শরীরের অস্বাস্থ্যের প্রতি একমাত্র কারণ, রজওতমগুণাক্রান্ত হইয়া মানবগণ নানাপ্রকার অসদনুষ্ঠানে আসক্ত হয়। ক্রমে সেই কুকার্য্যরূপপাপ হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া শরীরকে অসার জড়পিণ্ডের ন্যায় মনে করে দেহিনং নহি নির্দ্দোষং রোগঃ সমুপসেবতে"।পাপবিনাকখনই রোগ হয় না, পাপ কার্য্যের আদি কারণ ভূত রজওতমগুণকে বশীভূত করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাহইলেই মানব জীবনের কার্য্য সাধিত হয় এবং শরীরও অসুস্থ হয় না। এই উদ্দেশ্যে আত্রেয় মুনি

স্বীয় শিষ্য অগ্নিবেশকে বলিয়াছেন যে হে অগ্নিবেশ! যাহাতে মন সৎপথগামী হয় এবং ইন্দ্রিয় জয় হয় আমি তোমাকে সেই সকল সদ্বৃত্ত উপদেশ দিতেছি, এই সদাচার পালন করিলে ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ ভোগ হইবে।

. তত্ সদ্বৃত্তমখিলেনোপদেক্ষ্যামি। তদ্ যথা—দেব গো ব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যা-নর্চ্চয়েত্। অগ্নিমনুচরেত্। ওষধীঃ প্রশস্তা ধারয়েত্। দ্বৌকালাবুপস্পৃশেত্। মলায়নেষ্ব ভীক্ষং পাদয়োশ্চ বৈমল্যমাদধ্যাত্। ত্রিঃ পক্ষস্তকেশশ্মশ্রুলোমনখান্ সংহারয়েত্ নিত্য-মপহুহত বাসাঃ সুমনঃ সুগন্ধিঃ স্যাত্। সাধুবেশঃ প্রসাধিতকেশো মূর্দ্ধশ্রোত্রঘ্রাণ-পাদতৈলনিত্যো ধূমপঃ পূর্ব্বাবভাষী সুমুখঃ দুর্গেষ্বভ্যুপপত্তা হোতা যষ্টা দাতা চতুষ্প-থানাং নমস্কর্ত্তা বলীনামুপহর্ত্তা অতিথীনাং পূজকঃ পিতৄণাং পিণ্ডদঃ কালে হিতমিত-মধুরার্থবাদী বশ্যাত্মা ধর্ম্মাত্মা হেতাবীর্ষুঃ নিশ্চিন্তো নির্ভীকো ধীমান্ হ্রীমান্ মহোত-সাহো দক্ষঃ ক্ষমাবান্ ধার্ম্মিক আস্তিকো বিনয় বুদ্ধি বিদ্যাভিজন বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যণা মুপাসিতা। ছত্রী দণ্ডী মৌনী সেপানত্কো যুগমাত্রদৃগ্ বিচরেৎ। মঙ্গলাচারশীলঃ কুচে লাস্থি কণ্ঠকামেধ্যাকেশতুষোত্কর ভস্মক-পাল স্নানবলিভূমীনাং পরিহর্ত্তা, প্রাক্ শ্রমাদ্ব্যায়ামবর্জ্জী স্যাৎ। সর্ব্বপ্রণিষু বন্ধুভূতঃ স্যাৎ, ক্রুদ্ধানামনুনেতা ভীতানামাশ্বাসয়িতা দীনানামভ্যুপপত্তা সত্য সন্ধঃ সাম প্রধান-পরপরুষবচনসহিষ্ণুঃ অমর্ষঘ্নঃ প্রশমগুণ দর্শী রাগদ্বেষহেতুনাং হন্তা। নানৃতং ব্রূয়াৎ। নান্যস্বমাদদীত। নান্যস্ত্রিয়মভিহরেৎ। নান্য শ্রিয়ং নবৈরং রোচয়েৎ। ন কুর্য্যাৎ পাপং নপাপেঽপিপাপী স্যাৎ। নান্যদোষান্ ব্রূয়াৎ। নান্যরহস্যমাগময়েত্। নাধার্ম্মি-কৈর্ন নরেন্দ্রদ্বিষ্টৈঃ সহাসীত, নোম্মত্তৈর্ন পতিতৈর্ন ভ্রূণ হন্তৃভির্নক্ষুদ্রৈর্ন দুষ্টৈঃ। নদুষ্টয়া নান্যারোহেৎ। নজানুসমং কঠিনমাসনম-ধ্যাসীৎ। নানাস্তীর্ণ মনুপহিতমবিশালমসমং বা শয়নং প্রপদ্যেত। নগিরিবিষমমস্তকেষু অনুচরেৎ, নক্রমমারোহেৎ, কুলচ্ছায়াংনোপা-সীৎ। নোচ্চৈর্হসেৎ। শব্দবতং মারুতং মুঞ্চেৎ।

সদাচার সমস্ত উপদেশ দিব।

যথা—

দেবতা গো ব্রাহ্মণ গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ আচার্য্যদিগেকে অর্চ্চনা করিবে, যজ্ঞাদি হোম কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত মণি মুক্তা প্রবলাদি ধারণ করিবে, প্রাতঃ এবং সায়ং কালে স্নান করতঃ উপাস্য দেবতার আরাধনা করিবে। মলায়েনের স্থান সমস্ত অর্থাৎ মেঢ্র গুহ্যদ্বার চক্ষুদ্বয় কর্ণদ্বয় নাসিকা দ্বয় মুখ এবং রোমকূপ সমস্ত পাদদ্বয় সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। পক্ষের মধ্যে তিনবার কেশ শ্মশ্রু লোম নখ কর্ত্তন করিবে জীর্ণ বস্ত্র এবং দুর্জ্জন সংসর্গ পরিত্যাগ করতঃ সুমন সুগন্ধি হইয়া চিরুণী দ্বারা কেশ পরিষ্কার করিবে মস্তক চক্ষু নেত্র এবং পায়ে নিয়মমত তৈল ব্যবহার করিবে ধূমপায়ী এবং মিষ্টভাষী হইবে দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান করিবে ধনীদিগকে দান করিবার আবশ্যক হয়না মহাভারতে মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া

ছেন। দরিদ্রান্ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কি মৌষধৈঃ।

হে যুধিষ্ঠির দরিদ্র দিগকে দান কর ধনবান ব্যক্তিদিগকে দান করিবার কেন আবশ্যক নাই রোগীরই ঔষধ পথ্য নিরোগের ঔষধের প্রয়োজন হয় না। অতিথি সৎকার করিবে পিতৃলোককে পিণ্ডদান করিবে, কালে অর্থাৎ যে সময় যেরূপ যোগ্য সেই সময়ে জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মাত্মা হয়ে হিতকর প্রমিত এবং মধুর বাক্য বলিবে, সর্ব্বদা কার্য্যকারণের প্রতি দৃষ্টিরাখিবে, সহসা কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভীক হইবে, সাধুবিগর্হিত কোন কার্য্য করিয়া অপ্রতিভ হইলে লজ্জিত হইবে। জ্ঞানবান্ কার্য্যদক্ষ ক্ষমাবান্ বুদ্ধিমান্ এবং ঈশ্বরভক্ত পরায়ণ হইয়া বিনীত বুদ্ধিমান্ সৎকুলজ বয়োবৃদ্ধসিদ্ধ এবং পূজ্য ব্যক্তিদিগকে উপাসনা করিবে। কোন স্থানে গমন করিতে হইলে সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ছত্র, যষ্ঠি এবং পাদুকা গ্রহণ করিয়া গমন করিবে, কদাচ অমঙ্গলজনক কার্য্য করিবে না, উপযুক্ত পরিশ্রম হওয়ায় পূর্ব্বেই ব্যায়াম হইতে নিবৃত্তি হইবে। সকল প্রাণিকে বন্ধুর ন্যায় দেখিবে ক্রুদ্ধব্যক্তিদিগকে বিনয়েরদ্বারা বাধ্য করিবে, কোন ব্যক্তি দুর্ব্বাক্য বলিলেও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে না রাগদ্বেষাদির কারণ সমস্ত বিনাশ করতঃ কদাচ মিথ্যাকথা বলিবে না। অন্যের ধন এবং অন্যের সম্পত্তি অভিলাষ করিবে না। [illegible] বিবাদ করিবে না, স্বপ্নেও পরস্ত্রীর বিষয় চিন্তা করিবে না, পাপ সংসর্গে থাকিয়াও পাপ কার্য্যে রত হইবে না, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকিবে। অপরের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবে না, অধার্ম্মিক, রাজদ্বেষ্টা উন্মত্ত ভ্রূণহত্যাকারী ক্ষুদ্র এবং দুষ্ট লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ বিধেয়। অতিশয় উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না, আবরণ রহিত অবিস্তৃত এবং অসম শয্যায় শয়ন করিবে না। পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। জলের অত্যন্ত স্রোতে অবগাহন এবং নদ্যাদির তীরে বসিয়া উপাসন করিবেনা, কারণ তাহাতে উপরের মৃত্তিকা শরীরের উপর পতিত হইতে পারে, উচ্চৈঃস্বরে হাসিবে না। কদাচ প্রবল ঝটিকা সম্মুখে যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ।

আশ্রমবার্ত্তা।

পৃথিবীপাতাপরমেশ্বরের পবিত্র করুণাবলে, স্বধর্ম্ম পরায়ণ মহোদয় মণ্ডলীর অনুগ্রহ সম্বলে ব্রহ্মচারি-আশ্রম পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইতেছে। বিপৎপাত অতিক্রম করিয়া অনটনের আঘাত সহ্য করিয়া ও স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রকে প্রসারিত ভিন্ন সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করে নাই। আশ্রমে পূর্ব্বমত বেদ, ষড়্‌দর্শন, সাহিত্য, মহারাষ্ট্র দেশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী প্রভৃতি অধ্যাপক বর্গ অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আশ্রমে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত মতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ কবিরাজ মহাশয়কে অধ্যাপক নিযুক্ত

করা হইয়াছে। আশ্রমসম্পাদক সুধীপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আশ্রমের আয়ুর্ব্বেদবিভাগে আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত সর্ব্ববিধ অকৃত্রিম তৈল,ঘৃত,মোদক,অরিষ্টাদি প্রস্তুত হইয়া সাধারণের সুবিধার জন্য বিক্রয়ার্থ স্থাপিত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদবিভাগে লভ্যাংশ ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেশীয় মহোদয়গণ পরোক্ষে ব্রহ্মচারি-আশ্রমেরই উপকার সাধন করিবেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা, নিয়মাবলী ও কার্য্যবিবরণ হিন্দু-পত্রিকায় বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মের ভরসাস্থল ভদ্র মহোদয়গণের নিকট তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আশ্রম কেবল শ্রীভগবানের করুণা তরণীকেই ভরসা করিয়া বিশাল সাগর স্বরূপ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-সন্তানের সহানুভূতি বাতাস তাহার অনুকূলে রহিলেই তাহার কৃতকার্য্যতার পক্ষে সন্দেহ নাই। নবোদ্যমে নবনবের কর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিবার সময় আশা করি গণ্য মান্য হিন্দু-সন্তান দরিদ্র আশ্রমের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য যেন বিস্মৃত না হন। অলমিতি বিস্তরেণ। বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ।

হিন্দু-পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

১৩০৭ সালের ১৩ই মাঘ হইতে ১৩০৮ সালের ৩১শে বৈশাখ পর্য্যন্ত।

১৭৩৬	বাবু গোপালচন্দ্র শর্ম্মা	৭*
২৯৯৪	,, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩।৭
২৩৭২	,, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	৭
২৬৫৯	,, রজনীকান্ত ঘোষ	৬।৭
৫৭২	,, দেবেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী	,,
২০৮৭	,, জয়নারায়ণ চৌধুরী	,,
১১০৮°	,, জানকীনাথ নিয়োগী	,,
৩৮৯	,, বিশ্বেশ্বর লাহিড়ী	,,
৯৩৩	,, হরসুন্দর দাস	৭
১০৬৭	,, যোগেশচন্দ্র সান্যাল	৬
১৫৮	,, অক্ষয়কুমার মিশ্র	৭
১৪৩২	,, মনহরি পরামাণিক	,,
১২২১	,, কৈলাশচন্দ্র বসু	৬।৭
৯৯১	বাবু যদুনাথ মুন্সী	,,
১৩২৫	,, কিশোরীকিশোর গোস্বামী	৭
৩১০৩	,, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
৩১২২	,, ভুবনমোহন বন্দোপাধ্যায়	৬।৭
১৮১৬	,, রাজেন্দ্রলাল দাস	৬।৭
২৯৩৭	,, কমলাকান্ত দাস	৭
২৯৩৮	,, রজনীনাথ দাস	,,
১৪৬০	,, [illegible]হেশ্বর চক্রবর্ত্তী	৬।৭
[illegible]৭১	,, কেদারনাথ [illegible]	৭

* ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ইত্যাদি অঙ্ক ১৩০১, ১৩০২ ইত্যাদির হিসাবে বুঝিতে হইবে। উ চিহ্নিত শব্দে উপহার পুস্তকের মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩৭৭	,, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী	৭
১৬০৬	এন্ চাটুর্জ্জি স্কয়ার	,,
২৪৮৮	বাবু রসিকলাল সেন	৬।৭
১৪০১	এম্ এন্ মিত্র স্কয়ার	,,
২২৯৪	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার	,,
৯২০	,, হরিকৃষ্ণ দাস	,,
১৯৭৩	,, রাখালদাস বাগ্ছি	,,
৫৮২	,, দুর্গাচরণ সেন	,,
৭৯০	,, গণপতি দাস	,,
১৭৫১	,, পাচুগোপাল বিশ্বাস	,,
২৪৬০	,, কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী	,,
১২৫৭	,, কেদারনাথ মজুমদার	৭
৯৬২	,, ইন্দুভূষণ বসু	,,
২৮০১	,, শিবেশ্বর কুণ্ডু	,,
৯১১	,, হরিপ্রসন্ন মজুমদার	,,
১০৮৫	,, যজ্ঞেশ্বর বসু	,,
১২৩৫	,, কৈলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬।৭
৩৭৯	,, কাশীনাথ দে	,,
১৯২২	,, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
২২৯৯	শ্রীযুত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া	,,
২৪৫১	বাবু সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	,,
৯০৩	,, হরিপদ নাথ	,,
৯১৯	,, শ্রীযুত করেশ্বর শর্ম্মা	[illegible]
১৬৯৪	বাবু প্রসন্নকুমার পাল	৭
১০৮৩	,, যোগেন্দ্রনাথ বাগচি	,,
২১২	,, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৬ ৭
৩২২২	লালা রামনারায়ণ রায়	৭
৭৬৫	বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত	,,
১৮৫৮	,, রাজকুমার রায়	৬।৭
২৫৭৬	,, মহিমচন্দ্র বসু	৭
৭৭৬	,, গৌরাঙ্গচন্দ্র ভৌমিক	৬।৭
৮৬২	,, হরিলাল চট্টোপাধ্যায়	,,
৫৮৩	,, দয়ালবন্ধু পাল	৭
১০২৫	,, কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায়	,,
১৪০৩	,, [illegible] পাঠক	৬।৭
১১২৭	,, যোগেন্দ্রনাথ বসু	,,
২৫২	,, বসন্তকুমার রায়	৭
১৩৬৯	,, কিশোরিমোহন চট্টোরায়	৬।৭
১২৯৫	,, কালীকুমার সেন	,,
১৪১৪	রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর	৭
১৭৪৬	শ্রীযুত পদ্মকান্ত শর্ম্মা বড়ুয়া	,,
২৬৪৩	বাবু সিদ্ধেশ্বর বাগছী	৬ ৭
২৫৫১	রায় অভয়চরণ মিত্র	৭
২৩০৩	বাবু উমাচরণ হালদার	,,
২৬৯৫	,, রজনীরঞ্জন চৌধুরী	,,
২৭২৫	,, কালীপ্রসাদ মাইতি	,,
২১৫৫	,, সোনারাম দাস	,,
১৯৫৭	,, রামদাস সানার	,,
২৭১১	,, নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়	,,
৩১৭৮	,, ললিতলাল মুখোপাধ্যায়	,,
৩২১৮	,, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য	,,
১০৪৯	,, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	[illegible]
২৬০৯	,, মৃত্যুঞ্জয় দাস	৭
২০১৩	,, বংশীবর ভট্টাচার্য্য	,,
২১৩৩	,, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬।৭
১৮৭৬	,, প্রসন্নকুমার ঘোষ	,,
৬৮৯	,, গিরিশচন্দ্র মণ্ডল	৭
১৪৩৩	,, মোহিনীমোহন তালাপত্র	৬।৭
২৯৮৮	,, মধুসূদন বসু	৭
১৯৯৪	,, হরিদাস ঘোষ	৬ ৭
৯১৮	,, হরিবল্লভ রায়	৭ উঃ
১৫৬	,, আনন্দনাথ মজুমদার	,,
৮১৮	,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪।৫।৬ ৭
৮০৫	,, গিরিশচন্দ্র সেন	৭
১১০২	,, হরিলাল মুখোপাধ্যায়	,,
১১৭	পণ্ডিত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ	৬।৭
১৯৪৩	বাবু রামকুমার গুহ	,,
২৯০৩	,, শশীকুমার নিউগী	৭
২৯০০	,, সূর্য্যকুমার সরকার	,,
২৫৬৫	,, শরৎচন্দ্র দাস অধিকারী	,,
১৬১৪	,, নৃত্যগোপাল বসু	,,
২৪৮৫	,, দিনেশচন্দ্র রায়	,,

১৯৪৮	,, রমেশচন্দ্র মিশ্র	৭
৯৮৭	,, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,
৫৮৪	,, দুর্গাদাস নন্দী	৬।৭
২৮৬৪	,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪।৫ ৬।৭
৪৫৮	,, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৭
১১৫০	,, কৈলাসচন্দ্র কর্ম্মকার	৬।৭
১২১২এ	,, কৃষ্ণকুমার রায়	,,
২৬৪৮	,, রামচন্দ্র কর্ম্মকার	৭
২৫৫০	,, ক্ষিরোদচন্দ্র দাস	,,
৪৯০	,, চন্দ্রধর বড়ুয়া	,,
১৭৩৮	,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬।৭
১৭০৯	ডাক্তার প্রসন্নকুমার গুপ্ত	৭
১৭৬৫	বাবু পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	,,
২৮০১	,, শয়ারাম ঘোষ	,,
৩৬২	,, গোপিনাথ মুখোপাধ্যায়	৭উ
২৫৪৭	,, বেণিমাধব চট্টোপাধ্যায়	৮উঃ
২২৩২	,, সর্ব্বেশ্বর বিদ্যারত্ন	৭
৬৯৪	,, গিরিশচন্দ্র সেন	,,
২৮১০	,, চণ্ডিপ্রসাদ চৌধুরী	,,
৯৬০	,, ঈশানচন্দ্র বেড়া	৮উ
৩৩৬৩	,, মুকুন্দলাল চৌধুরী	৭
৩৩৬৪	,, নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী	৮উ
২২৮৫	,, তারিণীচরণ সেন	৬আং
৩৩৭১	শ্রীযুত মহেশ্বর দাস তাম্বুলি	৭
২৪৯২	বাবু শ্রীনাথ শিরোমণী	৮
৮৬৯	,, হারাণচন্দ্র বিশ্বাস	৬।৭
২০০৮	,, শিবচন্দ্র ভাদুড়ি	৮উ
৮০৭	,, গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
২৭৫২	,, নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল	৮উ
৯৪৭	,, হরিহর চট্টোপাধ্যায়	,,
১৭৫৮	,, পঞ্চানন ঘোষাল	৮
২৮৭৫	,, মনিচরণ মহাপাত্র	৮উ
২৭৯৩	,, কুমুদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮উ
৮৩	,, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,,
২৪৬১	,, নন্দলাল বসু	৮৯উঃ
৭০২	,, মুন্সী গোরক নাথ	৮উঃ
২৭৭৩	শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী	৭
২৮৪৪	বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র	৮উ
৩৬৮	,, ভাগবতপ্রসাদ মহাপাত্র	৬।৭
১৪২৪	,, মহেন্দ্রনাথ দাস	৮
১৭৭	,, বিপিনচন্দ্র বসু	৮
১৯০১	,, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮উ
৩১৩৮	,, চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	৭
১৪৮৬	মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	,,
২১০৯	বাবু শীতলচন্দ্র ধর	৮
৯৫৬	,, ঈশানচন্দ্র ঘোষ	৭
২০৯১	,, শ্রীকুমার চৌধুরী	৮
১৪১৪	,, মতিলাল মুখোপাধ্যায়	৮উ
১৮২৮	,, রাজেন্দ্রকুমার বটব্যাল	,,
২৭৫৭	,, অমৃতলাল রায়	,,
১০৮৩	,, যোগেন্দ্রনাথ বাগচি	,,
২৭৫৬	,, দ্বারিকানাথ দাস অধিকারী	,,
১৬৩৪	,, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
৩৩৯২	,, উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
২৯৩১	,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
৩৩৯৩	,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ১।২ ৩।৪ ৫	৬।৭৮
১৯৫৮	,, রামযাদু রায়	৮
৩১৯০	,, রাজেন্দ্রনাথ বাগ	৭
১৬৪৭	,, প্রসন্নকুমার বসু	৮
১৭১৭	,, পটকেশ্বর মুখোপাধ্যায়	৭ ৮উঃ
২৬২০	,, ক্ষান্তিচন্দ্র গুপ্ত	৮৯উঃ
১০২৬	,, জ্যোতিশ্বর মুখোপাধ্যায়	৭
১৮০০	,, রামজীবন শয়ানাধিক	৬

২০০৫ ,, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ৮উ
৩১৬৬ ,, রজনীকান্ত বসু ৮
১৭৯৮ ,, রামমোহন নাথ ৬৭৮ উ
২৩১৭ ,, উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬।৭
১৭২৩ ,, প্রতাপচন্দ্র দে ৮উ
১৭৮৬ ,, রামদাস সরকার ৮
২৮২১ ,, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭
১১৭০ ,, কালীপদ বসু ৮উঃ
১৮১২ ,, রেবতীমোহন দাস গুপ্ত ,,
৯৪৮ ,, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় ,,
২৫৯০ ,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ,,
৮৮৬ ,, হরিশচন্দ্র মৌলিক ৭
২১০৪ ,, শরৎচন্দ্র সেন গুপ্ত ৮উ
২৯৮১ ,, নৃত্যগোপাল মিত্র ,,
২৯৭ ,, বসন্তকুমার মিত্র ৭
১৩৫৬ ,, কেদারনাথ বাগচি ৭৮উ
২২৮১ ,, উমেশচন্দ্র দত্ত ৬৭
৩৩০০ এচ্, বি, পাল স্কয়ার ৭
১৪৯৬ বাবু মদনমোহন গুহ ৮উ
,, আশুতোষ নিয়োগী ৮উ
২২৩২ ,, সর্ব্বেশ্বর বিদ্যারত্ন ,,
২৫৬০ ,, হেমচন্দ্র ঘোষাল ,,
২৬৭০ ,, পূর্ণচন্দ্র রায় ,,
২১২৪ ,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ,,
৭১২ ,, জ্ঞানচন্দ্র রায় ,,
,, কালীদাস দাস ,,
৩১৭৮ ,, কালীচরণ দাস ৬৭
২০২১ ,, হরিদাস গুপ্ত ৭
২০৪১ ,, শীবনাথ ভট্টাচার্য্য ৮উ
৩২৭ ,, বিনদবিহারী সিংহ ,,
২৩২ ,, বিপিনবিহারি বন্দোপাধ্যায় ,,
১৫৫৭ ,, নিত্যদ'চরণ সেন ,,
৩২৮৩ ,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ,,
৩২৬১ ,, প্রভাসচন্দ্র মিত্র ,,
২৫২৪ ,, রসিকলাল পাল ,,
৩১৯৬ ,, বিপিনবিহারি ঘোষাল ,,
২৬০০ ,, হরিদাস দাস ৮আং
৩৩১৯ ,, নিমরতন মৌলিক ৮উ
২৪৭৮ ,, সারদাচরণ মজুমদার ,,
২৬১৫ ,, বৈকুণ্ঠনাথ দিন্দু ,,
২২৯৮ ,, উগ্রকান্ত রায় ,,
১৫৩১ ,, মধুসূদন বন্দোপাধ্যায় ৮আং
৯৭৩ ,, হরিনাথ রায় ৮উ
৮২৬ ,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ,,
১৪০৬ ,, লালবিহারি বসু ৬,৭
৩০৭৮ ,, হরিচরণ দত্ত ৮উ
১৫৮৯ ,, নিত্যানন্দ রায় ,,
৩০ ,, অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৭
১০৯৩ ,, জগন্নাথপ্রসাদ বসু ,,
৩৩৩৪ ,, উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী ৮উঃ
২৪৬৪ ,, নৃত্যগোপাল পাড়ি ৮
১৬৬৭ ,, প্যারিমোহন সরকার ৮
৩২০৬ ,, রামলাল দত্ত ৮উ
৫৭৩ ,, ধীরকৃষ্ণ সরকার ,,
১০৯৫ জে এন্ ভট্টাচার্য্য স্কয়ার ৭
৩১৫৭ বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ ,,
৩৩৭৯ ,, বনমালীচরণ বন্দোপাধ্যায় ,,
৫২৪ ,, দেবেন্দ্রনাথ বসু ৮উঃ
১৮১৯ ,, রমাপ্রসাদ বিশ্বাস ৬,৭
২০৭০ ,, শশীভূষণ শীল ৮।৯
১৪৬১ ,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী ৮
৩১৮২ ,, রামপদ বিশ্বাস ,,
৬০৯ ,, দুর্গাচরণ সেন গুপ্ত ,,
৯৭ রায় আনন্দচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর ,,
২৭৬৬ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মৌলিক ৮উ
৪৭১ ,, চুণিলাল ৫।৬ ও ৭ আং
২৯১৬ ,, রামদাস চক্রবর্ত্তী ৭
১০৫৮ ,, জগৎচন্দ্র দাস ৭৮
৩১৮৪ ,, চারুচন্দ্র মৈত্র ১।২।৩।৪
৩২০২ ,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ ৭ ৮উঃ

৮ম বর্ষ। আষাঢ়, শ্রাবণ। ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।
১৮২৩, ১৩০৮।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৩।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৬ষ্ঠ ও ৭ম)

দ্বিতীয় পাদ।

৯। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।

১০। প্রকরণাচ্চ।

১১। গুহাম্প্রবিষ্টাবাত্মা নৌহিত-দ্দর্শনাৎ।

১২। বিশেষণাচ্চ।

১৩। অন্তর উপপত্তেঃ।

১৪। স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ।

১৫। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ।

১৬। শ্রুতোপনিষৎক্ গতাভি-ধানাচ্চ।

১৭। অনবস্থিতেরসম্ভাবাচ্চ নেতরঃ।

১৮। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ।

১৯। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।

২০। শারীরশ্চোভয়েঽপি ভেদে নৈনমধীয়তে।

২১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।

২২। বিশেষণ ভেদব্যপদেশাভ্যা-ঞ্চনেতরৌ।

২৩। রূপোপন্যাসাচ্চ।

২৪। বৈশ্বানরঃ সাধারণঃ শব্দ-বিশেষাৎ

২৫। স্মর্য্যমানমনুমানং স্যাদিতি।
২৬। শব্দাদিভ্যোন্তঃ প্রতিষ্ঠানাম্নেতি চেন্ন, তথা দ্রষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।
২৭। অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ।
২৮। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।
২৯। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।
৩০। অনুস্মৃতের্ব্বাদরি।
৩১। সম্পাত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।
৩২। আমনন্তি চৈনমস্মিন্।

৯। "চরাচর" পদের প্রয়োগ হেতু অত্তা (খাদক) শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১০। প্রকরণ অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় অনুসারেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১১। "গুহা-প্রবিষ্ট দ্বয়" বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে; কারণ এক বস্তুর দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিলে, লৌকিক ব্যবহারে তাহার সমজাতীয় বস্তুই বুঝায়।

১২। বিশেষণ হেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৩। উপপত্তি হেতু "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৪। অধিষ্ঠানাদির বর্ণনা থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৫। "সুখবিশিষ্ট" অভিধানহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৬। বেদান্ত-বিদের পরমগতি-নির্দ্দেশ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৭। "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা বুঝায় না; যেহেতু অন্য আত্মা [অন্যতাত্মক ভাবে] অনিত্য এবং বর্ণিত অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের গুণ তাহাতে অপ্রযোজ্য।

১৮। গুণ-সমন্বয় হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

১৯। গুণ-বিরোধ-হেতু "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে সাংখ্যাদি-স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" প্রতিপাদ্য নহে।

২০। "অন্তর্যামী পুরুষ" পদে "শরীরী" অর্থাৎ জীবাত্মা প্রতিপাদ্য নহে; কারণ আরণ্যকের উভয় শাখাতেই লক্ষণ-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

২১। অদৃশ্যতাদি লক্ষণ বর্ণিত থাকায় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২২। বিশেষণ-ভেদ বর্ণিত হওয়ায়, পরমাত্মা ব্যতীত প্রধান বা জীবাত্মা অপ্রতিপাদ্য।

২৩। রূপের উপন্যাস থাকাহেতুও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৪। বৈশ্বানর ও আত্মা, এই দুই পদাযুগতদ্রূপে দুয়ের লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, "বৈশ্বানর" পদে পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য।

২৫। অপিচ, স্মৃতির বর্ণনা আমাদিগকে শ্রুতির অর্থ-সম্বোধে সমর্থ করে।

২৬। যদি এই পূর্ব্বপক্ষ লওয়া যায় যে, বৈশ্বানর পদের অর্থ-পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং জঠরাগ্নির লক্ষণ পুরুষান্তর্ব্বর্ত্তিতার উল্লেখ থাকায়, উক্ত পদে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য নহেন; সিদ্ধান্ত এই যে, স্বর্গলোক জঠরাগ্নির মস্তক হওয়া অসম্ভবহেতু এবং

বাজসনেয়িগণ-কর্তৃক জঠরাগ্নি-পক্ষে অপ্রযোজ্য "পুরুষ" পদের প্রয়োগহেতু উক্ত পদে পরব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

২৭। উপরোক্ত হেতুবাদে 'বৈশ্বানর' অগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবও নহে, ভৌতিক অগ্নিও নহে।

২৮। জৈমিনির মতে বৈশ্বানররূপে পরব্রহ্মের স্বরূপোপাসনার কল্পনাতেও কোনরূপ আপত্তি বা অনুপপত্তির হেতু নাই।

২৯। ঐশ্বরিক প্রকাশহেতু আশ্মরথ্যের মতেও তাহাই বটে।

৩০। অনুস্মরণহেতু বাদরির মতেও তাহাই বটে।

৩১। কাল্পনিকনির্দ্দেশন হেতু জৈমিনির মতে পরব্রহ্মই "প্রাদেশ মাত্র" বাক্যে বিজ্ঞেয়; বিশেষতঃ উহা শ্রুত্যুক্তি-সম্মত।

৩২। অপিচ, [জাবালমতে] মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান-ব্যাপিত্ব-কল্পনাহেতু "প্রাদেশমাত্র" বাক্যে পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়।

৯ম ও ১০ম সূত্র।—নবম ও দশম সূত্র অনুসারে কঠোপনিষদুক্ত "অত্তা" (খাদক) পদে পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কঠোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্ কইত্থা বেদ যত্র সঃ।"

কেমনে কেজানে, কোন্ অধিষ্ঠানে
অধিষ্ঠিত তিনি হন।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র যাঁর উভয়ে আহার,
মরণ উপকরণ॥

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, এতদুক্তি পরমাত্মা-প্রতিপাদক কিনা? উত্তর, বিশ্বের তাবৎ পদার্থই যে স্থলে ব্রহ্মে প্রলয়-প্রাপ্ত হয়, সেস্থলে ব্রহ্মকেই বিশ্বগ্রাসক বলা যায়। অতএব কঠশ্রুতি বলিতেছেন যে, তিনি সেই খাদক, এই বিশ্বচরাচর যাঁর খাদ্য। "ব্রহ্মক্ষত্র" সমবেত সর্ব্বভূতেরই উদাহরণ-উপলক্ষ্য স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মই অত্তা বা খাদক। অগ্নি এ খাদক হইতে পারেন না; কারণ অগ্নি "অন্ন-খাদক" পদে স্পষ্টই শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত। যথা—"অগ্নিরন্নাদঃ।" (বৃঃ উঃ ১।৪।৬) কিন্তু "সর্ব্বাদঃ" বা সর্ব্বখাদক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এস্থলে "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং" বাক্যেই ব্রহ্মের বিশ্বখাদকত্ব ব্যক্ত হইতেছে।

যদি এরূপ তর্ক ধরাযায় যে, নিরাকার পরমাত্মা নির্লেপ—নির্ভোগ, তাঁহার খাওয়া সম্ভবে না, এই তাৎপর্য্যই সচরাচর শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, পরন্তু জীবাত্মাই ভোগী বা খাদক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা—

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি (মুঃ উঃ।৩।)

উত্তর এই যে, জীবাত্মার এই যে ভোজন, ইহা জগৎ-গ্রাসন নহে, ইহা কর্ম্ম-ফল-ভোজন মাত্র; কিন্তু পরমাত্মা নির্লেপ—সুতরাং নির্ভোগ, কারণ তিনি কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা নহেন; তিনি সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র। জীবাত্মাই কাম-কর্ম্মী ও ভোগী, অর্থাৎ যাচক ও খাদক। আর সমগ্র জগৎ-সমষ্টির খাদক বলিলে, ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে; কারণ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মেই বিশ্ব বিলীন হয়। অতএব সূত্রোক্ত "অত্তা" পদের ব্রহ্মবাচকত্ব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন নহে।

কঠোপনিষদের আলোচ্য বিষয়ের ব্রহ্মই অবলম্বন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ"

[কঃ উঃ ১।২।১৮] অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা যিনি, অজ ও অমর তিনি। এস্থলে যদি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মা বুঝিতে হয়, তবে আলোচ্য-বিষয়ের মূল-বিস্মৃতি-বিপর্য্যয়-জনিত স্থূল অনুপপত্তি দোষ ঘটে; কিন্তু তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব; সুতরাং পরমাত্মা ব্রহ্মই অজ ও অক্ষর।

১১শ ও ১২শ সূত্র।—এই দুই সূত্রে কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত সমাহিত।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহা-প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ।"

[কঃ উঃ ১।৩।১]

দুয়ে ভবে সুকৃতের সুধারস পিয়ে।
সে পরম ধামরূপ গুহাগত দুয়ে॥
সে দুয়েরে 'ছায়াতপ' বলে ব্রহ্মবিদ্‌জন।
ত্রিনাচিকেতাগ্নিযাজী তথা পঞ্চাগ্নিকগণ॥

কোন্‌ দুয়ের বিষয় এস্থলে বলা হইয়াছে? এ দুই কে কে? অবশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বটে; কিন্তু ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? যেস্থলে মুণ্ডকোপনিষদ্‌ স্পষ্টতঃ পরমাত্মা ব্রহ্মকে জীবাত্মার কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ অভোক্তা দ্রষ্টারূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেস্থলে সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম এস্থলে আবার সুকৃত-কর্ম্মের সুফল-সম্ভোগী বলিয়া ব্যক্ত হইবেন কিরূপে? উত্তর এই যে, যদিও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ কর্ম্মফলের অতীত, কিন্তু এস্থলে পরমাত্ম-বাচকত্ব ঔপমিকভাবেই ব্যবহৃত। এস্থলে বিশদরূপেই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, জীবাত্মাই নিশ্চয় কর্ম্মফল-ভোক্তা বটে, কিন্তু দ্বিবচনের প্রয়োগহেতু আমাদিগকে অবশ্য আর একটি আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুইটি মাত্র "আত্মা" সংজ্ঞক আপাত-সমধর্ম্মী চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ-সত্তা স্বতঃসংবুদ্ধ থাকায়, ঐ অপরাত্মা পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে।

অপর, "গৌর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্য।" এই গরুর দ্বিতীয়টি চাই, এ কথায় কিছু আমরা ঐ দ্বিতীয়টির পূরণার্থ গরু ব্যতীত কোন মনুষ্য বা ঘোটকের অনুসন্ধান করিব না; কারণ সাধারণতঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, একাধিক বচনের পদ-প্রয়োগে সেই পদ-প্রবোধিত পদার্থের একজাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, পরমাত্মাকে কিরূপে গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ হৃদয় প্রবিষ্ট বলা যাইতে পারে? ফলে উক্ত বাক্য রূপক-ভাবেই বিন্যস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদিও ব্রহ্ম বিশ্বময় বটেন, তথাপি সগুণাধিকারীর সসীম জ্ঞানজনিত বিশদ-বোধার্থে তাঁহার সসীম স্থিতি-স্থানবিশেষ কল্পিত হইতেছে। যথা বিষ্ণু বিশ্ব-বিনির্দিষ্ট হইয়াও, সগুণ-সাধন-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শালগ্রাম-শিলাধারে পূজিত হইয়া থাকেন। যাহা-হউক, জীব ও পরম, এই দুই আত্মাই ছায়া ও আতপরূপে কথিত হইয়াছেন। জীবাত্মা অজ্ঞানান্ধতমোরূপিণী অবিদ্যার অধীন, কিন্তু পরমাত্মা অবিদ্যার অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপ, অতএব অবিদ্যাযুক্ত অজ্ঞ জীবাত্মা ছায়া এবং অবিদ্যামুক্ত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা আতপ।

১২শ সূত্রের সমাধেয় এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দ্দিষ্ট থাকায়, এই দ্বিবিধ আত্মাই এ স্থলে অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে।

কঠোপনিষদে (১।৩।৩) উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥"

আত্মাকে জানিবে রথী, রথ জান দেহ।
বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ॥

এই স্থলে আত্মা পদে জীবাত্মাই বুঝাইতেছে। আবার আমরা উক্ত কঠবল্লীর ষষ্ঠ শ্লোক এইরূপ দেখিতে পাই,—

"বিজ্ঞান সারথির্যস্য মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥"

বিজ্ঞান-সারথি, আর মানস-প্রগ্রহ যার পরিবদ্ধ রয়।
পার হয়ে ভ্রাম্য পথ, বিষ্ণুর পরম পদ সেই প্রাপ্ত হয়॥

এ স্থলে বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ পরমধাম সেই পরমাত্মতত্ত্ব। অতএব তৃতীয় বল্লীর তৃতীয় ও নবম শ্লোক দ্বারাই প্রথম শ্লোকের অর্থ বিশদীভূত হইতেছে।

অতঃপর মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) দৃষ্ট হয়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানংবৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়াশোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

প্রেমবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে এক বৃক্ষ-পর॥
সে দুটির একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তায়॥
এক বৃক্ষে করি বাস বঞ্চিতাত্ম পাখী।
শোকে ক্ষুণ্ণ আপনাকে শক্তিশূন্য দেখি॥
যবে সে পরাত্মা দেখে হয়ে যোগযুক্ত।
মহিমা বুঝিয়া হয় শোক মোহ-মুক্ত॥

এখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি ও জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই। ফলে অনেকে এ স্থলে বুদ্ধি ও জীবাত্মা ভাবিয়া ভুল করেন।

১৩শ হইতে ১৭শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৫) দৃষ্ট হয়,—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচৈ তদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। তদ্যদপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি।"

সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম অভয় অমর॥
যে পুরুষ অধিষ্ঠিত অক্ষি-অভ্যন্তর।
সর্পি বা সলিল ইথে হলে সুসিঞ্চিত।
পথদ্বয় বাহি হয় বহির্ব্বিনিঃসৃত॥

এস্থলে এই "অক্ষি-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে অপরের অক্ষি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত কোন পুরুষবিশেষের প্রতিকৃতি প্রতিপাদিত হইবে না, পরন্তু তদ্দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য। পরমাত্মা ব্রহ্মই অভয় ও অমৃত। অতএব অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অভয় ও অমৃত, এ কথায়, উক্ত পুরুষ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারাই বিরোধের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তের সদুপপত্তি

সম্পাদিত হইবে। অক্ষিমণ্ডলে ব্রহ্মের অবস্থান রূপককল্পনা মাত্র। উহাদ্বারা ব্রহ্মের পরমাত্মধর্ম্মের পরম নৈর্ম্মল্য ভাবই আভাষিত হইতেছে। অক্ষি-মণ্ডলে কিছুরই স্পর্শাঙ্ক প্রলিপ্ত থাকে না, উহা সতত সমুজ্জ্বল ও সুনির্ম্মল; এইজন্যই রূপক ভাবে অক্ষিমণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান রূপে কল্পিত ও কথিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র অক্ষি-মণ্ডলই পরমাত্মার অধিষ্ঠান-স্থান রূপে উক্ত হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৭) আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-স্থানরূপে পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ,সূর্য্য, চন্দ্র,নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত ভৌতিক মহৎ পদার্থই কল্পিত ও কথিত হইয়াছে। বহু নাম-রূপ-উপাধিই তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। এবম্বিধ উপাধির অবলম্বই ধ্যান-ধারণার অনুকূল উপায়।

১৫শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্মকেই বুঝায়, তাহা "ক" অর্থাৎ সুখ, এই শ্রৌতবাক্যবিশেষ দ্বারাও প্রতিপন্ন। সত্যকাম-জাবাল নামক ঋষির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া উপকোশল নামক জনৈক ব্রহ্মবিদ্যার্থী দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল ব্রহ্মচারীরূপে উপস্থিত ছিলেন; তথাপি তাঁহার উক্ত গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। অবশেষে গুরুদেবের আরাধিত আহিত অগ্নিস্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।" "প্রাণ" অর্থাৎ প্রাণবায়ু [শ্বাস] ব্রহ্মস্বরূপ, "ক" অর্থাৎ সুখ ব্রহ্ম স্বরূপ, "খ" অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মস্বরূপ।

গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিগণ তাঁহাকে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে এ বিষয়ে আরো শিক্ষা দিবেন। পরে গুরুও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষের ব্রহ্মত্ব এবং তাঁহার অমরত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এস্থলে গুরু সেই ব্রহ্মতত্ত্বই শিখাইলেন, যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত অগ্নিগণ "ক" শব্দাত্মক শ্রুতি উল্লেখে শিখাইয়াছিলেন। অতএব "অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ" বাক্যে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞাপিত।

"ক" (সুখ) শব্দ ভৌতিক সুখকে বুঝায় না, পরন্তু ব্রহ্মানন্দই বুঝায়; "খ" শব্দে ভৌতিক আকাশ বুঝায় না, কিন্তু উক্ত ব্রহ্মানন্দের আধারতত্ত্ব বুঝায়। এইরূপ আধার-আধেয়ত্ব ভাবেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত। "যদ্বা কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং।" যাহা ক, তাহাই খ; যাহা খ, তাহাই ক। এইরূপে 'খ'এর সমবায়িতায় 'ক'তত্ত্ব ভৌতিক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখবোধের অতীত আধ্যাত্মিক সুখ বা ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইয়াছে এবং 'ক'এর সমবায়িতায় 'খ'তত্ত্ব ভৌতিক ব্যোম বা আকাশের অতীত ব্রহ্মানন্দাধার স্বরূপ হইয়াছে। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়িত্ব বা পরস্পর-সাপেক্ষত্ব ভাবজনিত মৌলিক একত্ব "নীল-লোহিত ন্যায়" অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। যথা কোন বস্তুকে "নীল-লোহিত" বলিলে, তাহাকে নীলও বলা হয় না, লোহিতও বলা হয় না; ফলিতার্থে নীল-সাপেক্ষ লোহিত বা লোহিত-সাপেক্ষ নীলই বলা হয়। তৎপর, "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যের পর উক্ত হইতেছে, যথা—"এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে

এতং হি সর্ব্বাণি বামন্যভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়ন্তি। এষ উ ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি।”

সর্ব্ব পবিত্রতা তাঁতে থাকে।
সংযদ্বাম বলে তাই তাঁকে॥
সর্ব্বাশীষ তাঁহা হতে ফলে।
তাই তাঁকে বামনীও বলে॥
সর্ব্ব লোক তাঁতে দীপ্তি পায়।
তাই বলে ভামনীও তাঁয়॥

এই বর্ণনা শুদ্ধ মাত্র পরমাত্মাতেই প্রযোজ্য।

১৬শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ যে ব্রহ্ম, তাহা এইরূপেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে ব্রহ্মকে জানে, সে মোক্ষ লাভ করে, এইরূপ শ্রুতি আছে এবং যে অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে জানে, সে মোক্ষলাভ করে, এরূপও শ্রুতি আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যেখানে মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা নাই, সেখানে উক্ত উভয় মোক্ষলাভ-সম্ভাবনা স্থলে সেই একই ব্রহ্ম সূচিত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে।

১৭শ সূত্র।—অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ ছায়াত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, দেবাত্মা প্রভৃতি অন্য কোনবিধ আত্মা হইতে পারেন না। তাঁহারা ‘আত্মা’ পদবাচ্য হইলেও অনিত্য। ‘অভয়’ ‘অমর’ প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিরুপাধিক নিত্য পরমাত্মা ব্যতীত উপরোক্ত অপরবিধ কোন সোপাধিক অনিত্য আত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারেনা। অপরের অক্ষি-দর্পণে কোন পুরুষবিশেষের প্রতিবিম্বরূপ ছায়াত্মা, বা ভয় ও মৃত্যুর আস্পদীভূত বিজ্ঞানাত্মা বা সূর্য্য প্রভৃতি জনন-মরণশীল দেবাত্মা [যাঁহাদের তথাকথিত অমরত্ব সুদীর্ঘজীবীত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে] ইঁহারা কেহই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ হইতে পারেন না, কারণ উক্ত পুরুষের অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব বিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, দেবতারাও ভয়াতিক্রান্ত নহেন।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি
সূর্য্যঃ ভীষ স্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম।’

এঁর ভয়ে ভয়ে, বায়ু সদা বহে,
এঁর ভয়ে সূর্য্য উঠে।
এঁর ভয়ে ভয়ে বহ্নি বিশ্ব দহে,
চন্দ্রফুটে—মৃত্যু ছুটে॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণেই অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই হইতেছেন।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৩।৭) কথিত “অন্তর্যামী পুরুষ” সেই পরমাত্মাই বটে। সেই অন্তর্যামী পুরুষ পৃথিবীতে, জলে, অনলে, পবনে, তপনে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, দেহে, মনে, ইত্যাদি সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তৎসমস্তকে নিয়মিত করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, ইহাই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা কি না? এতদুত্তরে বলা যায় যে, উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণই সূচিত হইতেছে। অন্তর্যামীত্বের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদি ব্রহ্ম-লক্ষণেই সমন্বিত। অতএব ব্রহ্মই উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ।

বৃহদারণ্যক [৩৭] উপসংহারভাগে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—তিনি "অদৃষ্ট হইয়াও দৃষ্টি করেন, অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ করেন, অমনোগত হইয়াও মনন করেন এবং অজ্ঞানিত হইয়াও জানেন। কেহ দেখে না, তিনি দেখেন। কেহ শুনে না, তিনি শুনেন। কেহ মনন করে না, তিনি মনন করেন। কেহ জানিতে পারে না, তিনি জানেন। তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমর—অর্থাৎ নিত্য। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু, সমস্তই মর্ত্ত্য অর্থাৎ অনিত্য।" এতাবতা ইহা বিশদীভূত যে, অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনোক্ত "প্রধান" উক্ত অন্তর্যামী পুরুষ কেন হইতে পারে না? প্রধানও অপ্রকাশ্য এবং অজ্ঞেয়। প্রধানও বিশ্বের কারণরূপে পরিগণিত, অতএব অন্তর্যামী পুরুষের লক্ষণে প্রধান কেন লক্ষিত হইতে পারে না? এ তর্কের সমাধান এই যে, অন্তর্যামী পুরুষের এরূপ লক্ষণবিশেষও বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রানুসারেও তাহা কদাপি প্রধানে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যথা—প্রধান জ্ঞানশূন্য, সুতরাং দর্শন-শ্রবণ-মনন ইত্যাদি জ্ঞান-ক্রিয়া প্রধানে কদাচ সম্ভবে না, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মায় সম্ভবে। অতএব অন্তর্যামী পুরুষের দর্শন-শ্রবণাদি উল্লিখিত হওয়ায়, উহাতে পরমাত্মাই সূচিত হইতেছেন।

২০শ সূত্র।—অতঃপর আর একটি এইরূপ তর্ক উত্থিত হইতে পারে যে, জীবাত্মা দেহাভ্যন্তর্বর্ত্তী রহিয়া দৈহিক ক্রিয়াদি নিয়মন ও পরিচালন করিতেছেন। তিনি চেতন স্বরূপ ও অদৃষ্ট; কারণ ক্রিয়া-নিষ্পাদনের সহিত যুগপৎ কর্ত্তার কর্ম্মত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব। "ন দৃষ্টে র্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ।" দৃষ্টের দ্রষ্টা স্বয়ং দ্রষ্টব্য নহেন; অতএব জীবাত্মাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে পারেন। উত্তর এই যে, যদিও জীবাত্মা উপাধিদ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং যদিও দেহাভ্যন্তর্বর্ত্তী থাকিয়া দেহকে নিয়মিত করেন, কিন্তু ইনি বৃহদারণ্যক-বর্ণিত অন্তর্যামী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করেন না। অতএব ইনি কিরূপে সেই অন্তর্যামী পুরুষ হইবেন? দ্বিতীয়তঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই স্ব স্ব সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও অন্তর্যামী পুরুষের স্পষ্ট পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। কাণ্ব (বৃঃ আঃ উঃ ৩।৭।২২) বলেন যে, "যিনি স্বয়ং জ্ঞানাধিষ্ঠিত, জ্ঞান যাঁহাকে জানে না, জ্ঞানই যাঁহার দেহস্বরূপ; যিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে জ্ঞানকে নিয়মিত বা পরিচালিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা।" ইহাই কাণ্বোক্ত সিদ্ধান্ত। আর যদি আমরা এস্থলে জীবাত্মাকেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানাত্মার স্থানীয় ধরি, তবেই আমরা মাধ্যন্দিনোক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই। কাণ্বোক্ত বিজ্ঞানতত্ত্ব মাধ্যন্দিনোক্ত জীবাত্মতত্ত্ব দ্বারাই অববোধিত। এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এইরূপে পার্থক্য পরিসূচিত হইতেছে।

তৎপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অন্তর্যামী পুরুষ দুইটি কিনা। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা নিয়ামক জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, এই দুইটি কিনা?

কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্বতঃ একত্ব শ্রুতিসম্মত। এস্থলে উত্তর এই যে, আত্মা যে টে একটি মাত্র! উপাধির অবচ্ছেদবশে বহুবৎ প্রতীয়মান। যথা- ঘটাকাশ ঘটোপাধি অনবচ্ছিন্ন মহাকাশ। মায়িক জগতে এক জীবাত্মা অপর জীবাত্মা হইতে এবং পরমাত্মা হইতে প্রভিন্ন; কিন্তু সাধনবলে যাঁহার আত্মচক্ষুর অক্ষিক হইতে অবিদ্যাবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পরমাত্মা মাত্র প্রকাশিত। তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য—জ্ঞাতা জ্ঞেয় একত্বে পরিণত। শ্রুতি বলেন, "যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎকেন কং পশ্যেৎ।" অর্থাৎ—দ্বৈতজ্ঞান যেখানে, দেখাদেখি সেখানে। অদ্বৈতাত্মজ্ঞান যথা, কেবা কারে দেখে তথা?

২২শ সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"

পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা হন।
এ দুয়ে জানিতে হবে ব্রহ্মজ্ঞেরা কন॥
ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্ব চারি বেদগ্রন্থ।
শিক্ষা কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত ও ছন্দ॥
জ্যোতিষ সহিত এই বেদ-অঙ্গ ছয়।
এ শিক্ষা অপরা-বিদ্যা-বলে সিদ্ধ হয়॥
পরাবিদ্যা-বলেতে অক্ষর হন জ্ঞাত।
অদৃশ্য অগ্রাহ্য যিনি অবর্ণ অজাত॥
অচক্ষু অশ্রোত্র যিনি অপাণি অপদ।
নিত্য বিভু সুসূক্ষ্ম অব্যয় সর্ব্বগত॥
যাঁহ'হতে সর্ব্বভূত সমুদ্ভূত ভবে।
পরাবিদ্যাবলে জ্ঞানী তাঁর জ্ঞান লভে॥

বক্ষ্যমাণ সূত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, পূর্ব্ব-বর্ণিত সর্ব্বভূত-সমুৎপাদয়িতা অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি বিশেষণ-বেদ্য যিনি, তিনি পরমাত্মা বা জীবাত্মা। সিদ্ধান্ত এই যে, "সর্ব্বভূত-সমুৎপাদক" বলিলেই পরমাত্মা বুঝায়; অন্যান্য বর্ণিত বিশেষণের বিচার বাহুল্য মাত্র। যে সমস্ত গুণ বা লক্ষণ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা ব্যতীত দেহোপাধি-অবচ্ছিন্ন অবিদ্যাধীন জীবাত্মা বা মাত্র জড়-তত্ত্বস্বরূপ অচেতন প্রধানে কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এস্থলে আরও একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, প্রধানও অদৃশ্য তত্ত্ব এবং ইহা হইতেই সর্ব্বভূত উদ্ভূত, বলা যাইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, মুণ্ডকোপনিষদে যে পুরুষের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শুধু অদৃশ্যত্বই মাত্র তাঁহার গুণ বা লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞত্ব—সর্ব্বান্তর্যামিত্ব প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপগত বিশিষ্ট লক্ষণাবলীও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি। [মুঃ উঃ ১৷১ ৯] পরমাত্মা ব্যতীত উক্ত বিশেষণগুলি স্বভাবানুসারে কদাচ প্রধান বা জীবাত্মার যোগ্য নয়। তারপর, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" [মুঃ উঃ ১৷১৷৩]

হে আর্য্য! জানিলে কারে।
সমস্ত জানিতে পারে?

এই শ্রুত্যুক্তিদ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মই সর্ব্বথা সুপ্রতিপন্ন।

২২শ সূত্র।—সর্ব্বভূতযোনি যে পরমাত্মা ব্রহ্মই বটেন, তাহা এই দ্বাবিংশ সূত্রে একটি অতিরিক্ত সুযুক্তি সংযোগে সমর্থিত হইয়াছে। এক পক্ষে পরমাত্মার তত্ত্ব-লক্ষণাবলী ও অপরপক্ষে প্রধানের তত্ত্ব-লক্ষণাবলী পরস্পর স্বতন্ত্র ও সুবিশদ। মুণ্ডকোপনিষৎ (২।১।২) বিস্পষ্ট বলিতেছেন,—"দিব্যোহ্যমূর্ত্তপুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হি অজোহপ্রাণো অমনা শুভ্রঃ।"

যে দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ যিনি,
বাহ্য-অভ্যন্তর অজ ও অমর,
অপ্রাণ অমন-অমল তিনি।

এ বর্ণনার বিষয়ীভূত বা অধিকারাস্পদ হওয়া প্রধান বা জীবাত্মপুরুষের যোগ্যতা-বহির্ভূত।

অতঃপর সেই সর্ব্বভূত-জনয়িতার এরূপও লক্ষণ লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সৃষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য বিধায়, এই সৃষ্ট বিশ্বের ভৌতিক সুসূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব প্রধানকে এস্থলে "অক্ষর" বলা হইয়াছে। এই প্রধান স্বয়ং পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত থাকিয়া বিবিধ জাগতিক নাম-রূপ বা পরমাত্মার বিবিধ উপাধি কল্পনা করে। তর্কস্থলে যদি প্রধানকে স্বায়ত্ত বা স্বাধীনসত্ত্বও কল্পনা করা যায়, তথাপি "শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" এ কথায় স্পষ্টই প্রধান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থান্তর সূচিত হইতেছে, সন্দেহ নাই; অতএব সেই পদার্থান্তর প্রধান হইতেও প্রধান—পরাৎপর পরমাত্মা।

২৩শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, যেরূপ রূপোপন্যাস উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রধান কখনই সর্ব্বভূত-জনয়িতা-রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

অগ্নি মূর্দ্ধা, রবীন্দু নয়ন।
দিক্ শ্রুতি, বেদোক্তি বচন
বায়ু যাঁর নিশ্বাস-নিস্বন।
হৃদি যাঁর এ বিশ্বভুবন॥
চরণে ধরণীধর যিনি।
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা তিনি॥

এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মেরই সম্ভবে, কিন্তু প্রধানের বা জীবাত্মার নহে; কারণ অজ্ঞান প্রধান কখনও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হইতে পারেন না; আর উপাধিবদ্ধ অবিদ্যা-বাধ্য জীবাত্মাও জগজ্জনয়িতা হইতে পারেন না।

পরমাত্মা ব্রহ্মের রূপ প্রদর্শন যে এরূপ রূপ বর্ণনা হইয়াছে, তাহা নহে; উহা রূপকোক্তি মাত্র। উহাদ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বভূতান্তরাত্মস্বরূপতাই সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপেও পরমাত্মা সূচিত হন না।"

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে,
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং,

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"
সমুদিত সর্ব্বাগ্রে—হিরণ্যগর্ভ যিনি।
একমাত্র জাত ভূত-পতি হন তিনি॥
স্থাপিলেন তিনি এই আকাশ পৃথিবী।
কোন্ দেবোদ্দেশে মোরা নিবেদিব হবিঃ॥

এই হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা নহেন; কিন্তু পরমাত্মা হইতে সম্ভূত দেবপুরুষ বা ঈশ্বরবিশেষ। ইনি ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপাত্মক প্রথমাবতার স্বরূপ। শ্রুত্যন্তরে ইঁহাকে 'ব্রহ্মা' বলা হইয়াছে। ঔপনিষদী উক্তি অনুসারে ইঁহাকে "সর্ব্বভূতাত্মা" বলিলেও অনুপপত্তি হয় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বভূতসৃষ্টির আদিকারণ নহেন।

২৪শ সূত্র।—ছান্দোগ্য উপনিষদের (৫।২) একটি উক্তিতে আত্মা "বৈশ্বানর" পদে উক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রশ্ন এই যে, এই বৈশ্বানর পদে জঠরাগ্নি, বাহ্য-জড়াগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাতা দেবপুরুষবিশেষ ইত্যাদিই বুঝাইবে না পরমাত্মা বুঝাইবে। অপিচ, উক্ত পদ আত্মার সাধারণ লক্ষণ-বিশেষত্বে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহাদ্বারা "জীবাত্মা" বুঝাইবে কিনা, তাহাও আলোচ্য।

উত্তর এই যে, উহাদ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হইতেছেন। অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্ম, সুতরাং এতদ্দ্বারা তদিতর পদার্থান্তর সূচিত হওয়া সম্ভবে না। অতএব যদিও "বৈশ্বানর" পদে জঠরাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিতত্ত্ব সূচিত হইলেও, অন্যান্য লক্ষণানুসারে আত্মতত্ত্বও সূচিত হয়; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট থাকায়, উক্ত আত্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্বই বটে, পরন্তু জীবাত্মতত্ত্ব নহে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষাত্মস্বন্নমত্তি, তস্য হবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয় ইত্যাদি

প্রাদেশ মাত্রাভিমানী বৈশ্বানর-ধাতা সেই।
সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বাত্মসম্ভোগী সেই॥
এই বৈশ্বানরাত্মার মস্তক সুতেজোময়।
বিশ্বরূপ নেত্র তাঁর—শ্বাস পৃথগ্বর্ত্ম হয়।
সন্দেহবহুল তাঁর—বস্তি রয়ীরূপ।
চরণধরণী—বক্ষ বেদিকা স্বরূপ॥
লোমাবলী বেদিকার তৃণরূপী হয়।
গার্হপত্য অগ্নিরূপী তাঁহার হৃদয়॥
অন্বহার্য্য অগ্নিরূপী হয় তাঁর মন।
যে অগ্নি আহবনীয়, সে তাঁর আনন॥

উপরোক্ত বর্ণনায় ব্রহ্মতত্ত্বই নিস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত। প্রাচীন আর্য্যজাতি ব্রহ্ম-মূর্ত্তি স্বরূপেই অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাত্মা বোধক ভাবেই 'অগ্নি'পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা কদাপি একের স্থলে অন্যের সূচনাদ্বারা প্রমাদপাতিত হন নাই।

২৫শ সূত্র।—স্মৃতিও পরমাত্মার বর্ণন করিতেছেন উহা উপরোক্ত বৈশ্বানরাত্মা-বর্ণন-প্রণালীতেই বর্ণিত। স্মৃতিদ্বারাই শ্রুতির অর্থ আমাদের অধিগত হয়।

স্মৃতির পরমাত্মবর্ণন এইরূপ,—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ,সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূত-প্রণেতা।"

বলেন ব্রাহ্মণবর্গ, মস্তক যাঁহার স্বর্গ,
অন্তরীক্ষ নাভি যাঁর, রবীন্দু নয়ন;
দিক্ যাঁর শ্রোত্ররূপ, পৃথিবী পদস্বরূপ,
তিনি হন সর্ব্বভূত-অনাদিকারণ।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বৈশ্বানর শব্দেও সর্ব্বভূত কারণই সূচিত হন।

২৬শ সূত্র।—এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, বৈশ্বানর শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও কি কারণে উহা অন্যার্থে প্রযুক্ত হইবে? অন্তরন্ত বৈশ্বানর বলিলে, উহা বৈশ্বানরের স্বভাব বিশেষত্ব হেতু উহা-দ্বারা জঠরাগ্নিত্বই প্রতিপন্ন হয়, এবং এই হেতুই উহা পরমাত্মা-প্রতিপাদক হইতে পারে না। উত্তর এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব এই-রূপেই বোধবিষয়ীভূত হন। সসীম-উপাধ্য-বচ্ছিন্নত্ব ব্যতীত অসীম পরমাত্মার বোধ-বিষয়িত্ব সম্ভবে না; এই হেতুই এ স্থলে বৈশ্বানরত্ব তাঁহার উপাধি স্বরূপ।

চতুর্বিংশ সূত্র প্রকরণে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বাহ্য জড়াগ্নি বা জঠরাগ্নি প্রভৃতি বুঝিতে হইলে, উহা ফলিতার্থে অর্থশূন্যই হইয়া পড়ে। যদি তদ্দ্বারা মাত্র জঠরাগ্নিই বুঝাইত, তবে "পুরুষান্তরবর্ত্তী অগ্নি" বাক্যেই তাহা সিদ্ধ হইত; কিন্তু বাজসনেয়িগণ কর্ত্তৃক তাহা "পুরুষ" পদেও অভিহিত হইয়াছে, অতএব উক্ত বর্ণনায় অগ্নি বা জঠরাগ্নি বুঝাইবে কিরূপে? বাজসনেয়িগণ তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—

"স যো হৈতমেব অগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ।"

যেই জন জানে এই অগ্নি বৈশ্বানরে।
পুরুষস্বরূপে আর পুরুষ-অন্তরে॥

২৭শ সূত্র।—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সমূহের আলোচিত হেতুবাদ বশে "বৈশ্বানর" মাত্র ভৌতিকাগ্নি বা অগ্ন্যধিষ্ঠাতা কোন দেব-পুরুষ-বিশেষ হইতে পারেন না।

২৮শ সূত্র।—ষড়্বিংশ সূত্রের আলো-চনায় "পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং" এই বাক্যে জঠরাগ্নির অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু উহ দ্বারা অন্তঃসাক্ষীত্ব স্বরূপে পরমাত্মাও বুঝা যাইতে পারে। যেহেতু পরমাত্মা প্রতি-পুরুষান্তরে অফলভোগী থাকিয়া সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষীস্বরূপে সংস্থিত, এইরূপ শ্রুত্যুক্তি আছে। অতএব মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, জঠরাগ্নিকে উপাধিস্বরূপ মধ্যবর্ত্তীরূপে কল্পনা না করিয়া, উক্ত ঔপনিষদী উক্তিদ্বারা স্বয়ং সর্ব্বান্তর্গামী সর্ব্বদ্রষ্টা পরমাত্মাই সংপূজ্য, এইরূপ সহজ উপপত্তিই গৃহীত হইতে পারে। এই শ্রুত্যুক্তি যেস্থলে বৈশ্বানরকে পুরুষান্ত-র্বর্ত্তী—অথচ স্বয়ং পুরুষস্বরূপ বলিয়াছেন, সেস্থলে তদ্দ্বারা পরমাত্মাই পরিস্ফুটরূপে প্রতিপাদিত হইতেছেন,সন্দেহ নাই। "বৈশ্বা-নর" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, যথা—

"বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি, বিশ্বেষাং বা অয়ং নরঃ, বিশ্বেবা নরা অস্যেতি বিশ্বানর পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ তদ্ধিতো নান্যার্থঃ।"

যিনি বিশ্বরূপ, যিনি নররূপ,
বিশ্বনররূপ যিনি,
বিশ্ব-জীব-আত্মা, নরাত্মা পরাত্মা
"বৈশ্বানর" বটে তিনি।
বিশ্বানর পদ, বৈশ্বানর পদ,
সমার্থসূচক হয়।
তদ্ধিত প্রত্যয় প্রয়োগে নিশ্চয়
ভিন্নার্থবাচক নয়।

২৯শ হইতে ৩২শ সূত্র।—আচার্য্য অশ্মরথ্য বলেন, যদিও পরমাত্মা সর্ব্বমিতি-মাত্রাতীত, তথাপি তাঁহার ধ্যানাধিগম্যতা-মূলক প্রকাশ কল্পনায় তাঁহাকে "প্রাদেশ মাত্র" বলা হইয়াছে। সাধকগণের হিতার্থে পরব্রহ্ম হৃদয়, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে ধ্যানাধিগম্যভাবে প্রকাশিত। বাদরি বলেন,— পরব্রহ্মকে "প্রাদেশ মাত্র" বলার হেতু এই যে, তিনি অনন্তমাত্রায় বা মাত্রাতীত সত্তায় "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্"— কিন্তু মনের উপাস্য হইতে হইলে, তাঁহাকে সাঙ্গমাত্র ও মনের ধ্যানাধিগম্য বা স্মর্ত্তব্য স্বরূপে প্রকাশিত হইতে হইবে। এজন্যই তিনি শাস্ত্র-কথিত হৃদয়স্থ প্রাদেশমাত্রাত্মক—অর্থাৎ মনের আয়ত্তিযোগ্যভাবে স্বয়ংই "প্রাদেশমাত্র" রূপে কল্পিত হইয়াছেন। অথবা সরলভাবে এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে "প্রাদেশ মাত্র" না হইলেও, "প্রাদেশ মাত্র' রূপেই তিনি যোগী-হৃদয়ের যোগ-ধ্যানাধিগম্য হইয়া থাকেন।

আচার্য্য জৈমিনিও বলেন, "প্রাদেশ মাত্র" বিশেষণ ব্রহ্মের কাল্পনিক নির্দ্দেশ মাত্র। বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণ আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদিকে বৈশ্বানরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়াছেন। শিরোর্দ্ধ দেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত স্থান প্রাদেশ-পরিমিত; ইহার মধ্যস্থলে ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্রে—দ্বিদলে" যোগীর ধ্যানারত ঐশতত্ত্ব অবস্থিত। অতএব ত্রিভুবনাত্মা ভগবান প্রাদেশমাত্রাত্মকরূপে ঐ স্থানে বিদ্যমান। "বৈশ্বানর" পুরুষের তথাবিধ প্রাদেশমাত্রাত্মক বিদ্যমানতা বর্ণিত হওয়াতে, তদ্দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই প্রতিপাদন হইতেছে। জাবাল তাঁহাকে মূর্দ্ধা ও চিবুক দেশের ব্যবধান-মধ্যবর্ত্তী বলেন। ফলে নাসিকাগ্র অর্থাৎ ভ্রূমধ্যই পরমাত্মার যোগধ্যানাধিগম্য স্বরূপের অধিষ্ঠান স্থান।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশঃ—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১৫

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥

অন্বয়ঃ— স এব কালে অস্য ভুবনস্য গোপ্তা, বিশ্বাধিপঃ, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবতাঃ চ যুক্তাঃ। তম্ এবম্ জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা— "স এব" পূর্ব্বপূর্ব্ব-

শ্রুতি-সমূহে যাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী-রূপে বর্ণনা করাহইয়াছে, তিনিই, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরই। "কালে" — অতীত-কালেষু, জীবসঞ্চিতকর্ম্মপরিপাকসময়ে ইতি-ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যাঃ; স্থিতিকালে ইতি-শঙ্করানন্দঃ জীবের সঞ্চিত কর্ম্মের পরিপাক-সময়ে, অথবা স্থিতিকালে। "ভুবনস্য গোপ্তা" জগতঃ তত্তৎ কর্ম্মানুগুণতয়া রক্ষিত — জগতের যাবতীয় কর্ম্মের অনুগুণতা-নিবন্ধন জগতের অদ্বিতীয় পরিপালক। "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু সাক্ষিমাত্রতয়াহ-বস্থিতঃ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয়-পদার্থে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত। "যস্মিন্" চিদ্‌ঘনা-নন্দবপুষি যে চিদ্-ঘন-আনন্দময় পরমপুরুষ। "ব্রহ্মর্ষয় সনকাদি-ব্রহ্মর্ষিগণ। "দেবতাশ্চ" ব্রহ্মাদি-দেবতাগণও। "যুক্তা" — ঐক্যং প্রাপ্তাঃ ইতি শঙ্করাচার্য্যাঃ, যোগং আশ্রিতা প্রবৃত্তাঃ ইতি নারায়ণঃ "জ্ঞাত্বা" ব্রহ্মাহমস্মীতি অপরোক্ষীকৃত "তিনিই আমি" এবম্প্রকারে প্রত্যক্ষকরিয়া। "মৃত্যুপাশান্" মৃত্যুঃ অবিদ্যা, তমঃ, রূপাদয়শ্চ" মৃত্যু শব্দের অর্থ অবিদ্যা, মহামোহ এবং রূপাদি, পাশঃ—পাশ্যন্তে বধ্যতে অনেন ইতি পাশঃ, যাহাতে বন্ধন করে, মৃত্যুরেবপাশঃ মৃত্যুপাশঃ তান্ অবিদ্যা রূপ মহাপাশ অর্থাৎ প্রধান বন্ধন। 'ছিনত্তি' নাশয়তি—ঐক্যরূপ স্বপ্রকাশাগ্নিনা দহতীত্যর্থঃ—ঐক্য অর্থাৎ তৎসাযুজ্যরূপ স্ব-প্রকাশঅনলের দ্বারা দহন করেন।

বঙ্গার্থঃ— সেই পরমদেবতা পরমেশ্বর (যিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্রুতি সমূহে সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন) জীবের সঞ্চিত কর্ম্মফল-ভোগ সময়ে এই বিশ্ব রক্ষাকরিয়া থাকেন, তিনিই বিশ্বের অদ্বিতীয় অধিপতি, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থেই তিনি সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে পরমপুরুষে সনকাদিব্রহ্মর্ষিগণ এবং ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ একতাপ্রাপ্ত হইয়া মিলিয়া রহিয়াছেন, সেই আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত পদার্থের আশ্রয়ভূমিকে সেই অপায়বিহীন করুণা-নিধানকে "তিনিই আমি" এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সাধক অবিদ্যা, মহামোহ প্রভৃতি সংসারের দুশ্ছেদ্য-বন্ধন ছেদনে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকে আর প্রতি-নিয়ত অবিদ্যার কঠিনতম-শৃঙ্খলে সম্পিষ্ট হইতে হয়না।

বিশেষব্যাখ্যা—আমাদের যে অবস্থাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহা প্রকৃত-মৃত্যু নহে; প্রকৃত-মৃত্যু অবিদ্যাচ্ছন্নতা, তাঁহার হৃদয়, শ্বাস-প্রশ্বাস-যুক্ত থাকিয়াও অবিদ্যামুক্ত নহে, তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত। এই মহা-মোহ বা প্রগাঢ় "তমঃ"ই শ্রুতিতে মৃত্যু নামে আখ্যাত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মৃত্যুর্বৈ তমঃ" "তমঃ"ই মৃত্যু। এই তমো-বিনাশেরই নামান্তর মৃত্যুবিনাশন। মায়া-বিনী-অবিদ্যার মায়ার কুহকে আত্মহারা হইয়া জীব ইতস্ততঃ উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়ে বাসনা-পরিতৃপ্তির লুব্ধ-আশ্বাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিদ্যার কুহক-সম্ভূত এই বাসনার বিনাশ-সাধনের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-চিন্তা-ভগবদ্-বিষয়িণী রতি। ভগবানের চরণ-নখময়ূখের মনোরম দীপ্তিতে যে হৃদয় পরিদীপ্ত, অবিদ্যা-রূপিণী নিশাচরীর তিমির-পূর্ণ-বাসনাছায়া সে হৃদয়ে কদাচও প্রবেশ করিতে পারেনা। স্বর্গীয় কৌমুদীর সম্মুখে কি নারকীয়

অন্ধকার স্থান পায়? তাই শ্রুতি বলিতেছেন যে, যদি হৃদয়ের অশান্তিদায়িনী অবিদ্যার করাল-কবল হইতে পরিত্রাণলাভ করিতেচাও, তবে সেই সর্ব্বশক্তিময়ের চিন্তাকর; তদীয় দিব্য বিভূতি স্বীয় উষর-হৃদয়ে ধারণা করিতে অভ্যাস কর। নতুবা অবিদ্যার কঠোরবদ্ধকরালহস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

১৬

ঘৃতাৎপরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্—
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

অন্বয়ঃ—ঘৃতাৎপরংমণ্ডমিব অতিসূক্ষ্মং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্, শিবং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ দেবং জ্ঞাত্বা (সাধকঃ) সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "মণ্ডম্"— সারঃ মণ্ড শব্দের অর্থ সার। "সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ম্" ইহা পূর্ব্ব শ্রুতিতেই অনুবাদিত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—ঘৃতের উপরিভাগে বিদ্যমান অতিসূক্ষ্মতম-মণ্ডের ন্যায় যিনি সূক্ষ্মহইতেও সূক্ষ্মতম, ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্রতমতৃণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থে যাঁহার দিব্যবিভূতি অনুস্যূত রহিয়াছে, নিয়ত মঙ্গলময়, সেই জগতের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক পরমদেবকে আত্মার সহিত অভিন্নভাব জানিতে পারিলে সাধক দুশ্ছেদ্যসংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীবনের শান্তিপথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন জন্মের মত তিরোহিত হয়।

১৭

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

অন্বয়ঃ—এষ দেবঃ বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা চ, (অয়ং) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। (এষঃ) হৃদা মনীষা (মনীষয়া ইত্যর্থঃ অত্র ছান্দসাৎ বিভক্তি-বিপর্য্যয়ঃ। মনসা (চ) অভিক্লৃপ্তঃ (ভবেৎ)। যে এতদ্ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা— "বিশ্বকর্ম্মা"—"মহৎ" আদি বিশ্বং "কর্ম্ম" কার্য্যং অস্য ইতি বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থের আদি কর্ত্তা। "মহাত্মা"—সর্ব্বব্যাপী। "দেবঃ"—দ্যোতনাত্মক। "মনীষা"—বিবেকবুদ্ধিরদ্বারা। "হৃদা"—নেতি নেতি নেতি নিষেধোপদেশেন—ইহানয়, ইহানয়, ইহানয়, এই প্রকারে প্রতিবিষয়ে তিতিক্ষা পুরঃসরী যে বুদ্ধি, তাহা দ্বারা। "মনসা"—বিচার পরিপূত-জ্ঞানদ্বারা (অর্থাৎ অন্ধবুদ্ধি বশতঃ নয়) "অভিক্লৃপ্তঃ" প্রকাশিতঃ—প্রকাশিত হয়েন।

বঙ্গার্থঃ—বিশ্বের আদিকর্ত্তা সেই সনাতন-পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। জীব হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার অধিষ্ঠান-বিচ্যুত হয়না। তিনি নিরন্তর সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে সন্নিবেশ করিয়া আছেন। বিবেক-মার্জ্জিত--প্রতিভা তিতিক্ষাপূর্ব্বিকা বুদ্ধি এবং আত্ম-বিচার-পরিপূত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে স্বস্ব হৃদয়াভ্যন্তরে উপলব্ধি করা-যায়। যাঁহারা ঐ সমুদয় দুশ্চর সাধনা-

সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তাঁহাদের সংসার-যাতনা চিরদিনেরমত তিরোহিত হয়। অনন্তশান্তিসংস্পর্শে তাঁহাদের মনপ্রাণ জুড়াইয়া যায়।

১৮

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥

অন্বয়ঃ—যদা অতমঃ (ভবতি) তৎ (তদা) দিবা ন (ভবতি), রাত্রিঃ ন (ভবতি), সন্ ন (ভবতি), অসৎ চ ন (ভবতি)। কেবলঃ শিবঃ এব প্রকাশতে, তৎ অক্ষরং, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, তস্মাৎ (হি) পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা।

বিষমপদব্যাখ্যা—"যদা"—যস্যাং অবস্থায়াং, যে অবস্থায়। "অতমঃ" তমোনিবৃত্তিঃ অজ্ঞানের ধ্বংস হয়। "তৎ" তদা, সেই সময়ে। "দিবা ন ভবতি"- দিন-কল্পনা থাকেনা। 'রাত্রিঃন ভবতি' রাত্রি-কল্পনা থাকেনা। "সৎ ন ভবতি" সৎ অর্থাৎ কারণ বা ভাব কল্পনা থাকেনা। "অসৎ ন ভবতি" অসৎ অর্থাৎ কার্য্য বা অভাব-কল্পনাও থাকেনা, "কেবলঃ"—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশূন্য নির্ব্বিকার। "শিবঃ" চিদ্রূপ অবিদ্যাস্পর্শরহিত জ্ঞানময় আনন্দাত্মা। "তৎ"—সেই প্রসিদ্ধ-বিজ্ঞানময় পরম-জ্যোতিঃ। "অক্ষরং" ব্যাপক বা সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য। "সবিতুঃ" প্রাণিনাং উৎপাদকস্য সর্ব্বজনকস্য ইতি শঙ্করানন্দঃ, সমস্ত প্রাণীর জনক সবিতৃদেবের "বরেণ্যং" সম্যক্ প্রকারে ভজনীয়। "পুরাণী প্রজ্ঞা"—পুরাঽপি নবীনা সর্ব্বদা একরূপা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বাক্যজন্যা ইত্যর্থঃ—ইতি শঙ্করানন্দঃ, প্রাচীনতমা হইলেও সর্ব্বদা একরূপা অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার জ্ঞান-জন্যা নিত্যা আত্মবিদ্যা।

বঙ্গার্থ:—যখন "তমঃ" অর্থাৎ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া সুবিমল স্বপ্রকাশজ্ঞানালোকের সমুদ্ভাস হয়, তখন কি দিন, কি রাত্র, কি ভাব, কি অভাব, কিছুরই কল্পনা থাকেনা। সমস্ত কল্পনাই অবিদ্যার কুহকবিজৃম্ভিতা, সেই অবিদ্যার ধ্বংসে তাহার ক্রিয়াবলীরও ধ্বংস হয়। সেই সময়ে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদপরিশূন্য, নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ, অবিদ্যাস্পর্শরহিত জ্ঞানময় আনন্দ জ্যোতিঃই ইতস্ততঃ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সেই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানময় পরমজ্যোতিঃ ব্যাপক—অর্থাৎ সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য; সর্ব্বপ্রাণীর জনক পরমধ্যেয় সবিতৃদেবও তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই, প্রাচীনতমা হইলেও সর্বদা অবিকৃতা "আমিই ব্রহ্ম" এবংবিধা নবীনা অধ্যাত্মবিদ্যা বিনির্গতা হয়। তিনিই সর্ব্ববিধ বিকল্পের একমাত্র পরিচ্ছেত্তা তাঁহাকে জানিলে সমস্ত বিকল্পই দূরীভূত হয়। যে অবস্থার কথা বর্ণিত হইল, তখন যে কোনপ্রকার কল্পনাই থাকেনা; তাহা অপরাপর শ্রুতিতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে — "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদ আসীদিতি"।

১৯

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে
পরিজগ্রভৎ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম
মহদ্-যশঃ ॥

অন্বয়ঃ— (কশ্চিদপি) এনং ঊর্দ্ধং ন পরিজগ্রভৎ, তির্য্যঞ্চং ন পরিজগ্রভৎ, (বা) মধ্যে ন পরিজগ্রভৎ, তস্য প্রতিমা ন অস্তি, যস্য নাম মহৎ যশঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ কুত্রচিৎ কেনাঽপি অগ্রাহ্যত্বং, অদ্বিতীয়ত্বাৎ নিরুপমত্বম্ সর্ব্বেভ্যঃ সমধিকযশঃস্বরূপঞ্চ প্রকটয়তি ইয়ং শ্রুতিঃ।

পরিজগ্রভৎ—পর্য্যগ্রহীৎ বা পরিগ্রহীতুম্ শক্নুয়াৎ, পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। "তস্য প্রতিমা ন অস্তি"—অদ্বিতীয়ত্বাৎ তস্য উপমা নাস্তি। অদ্বিতীয়তানিবন্ধন তাঁহার উপমা নাই, অর্থাৎ তিনি কোন পদার্থেরই সহিত উপমিত হইবার যোগ্য নহেন। যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।— যাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত যশোরাশি জগতের প্রতিস্তরে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। "নাম"—প্রসিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—সেই কূটস্থব্রহ্ম কি ঊর্দ্ধ কি অধঃ, কি মধ্য, কোথায়ও কাহার পরিগ্রাহ্য নহেন, কেহ তাঁহাকে পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। (তবে তাঁহাকে কি করিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? তাঁহার স্বরূপ কিপ্রকার? এতদুত্তরে কথিত হইতেছে যে) তাঁহার উপমা নাই, (অতএব তিনি অমুক পদার্থের ন্যায়, ইহাও বলা যাইতে পারে না; তবে তিনি কিরূপ? কি করিয়া তাঁহাকে বুঝিব? এতদুত্তরে উক্ত হইতেছে) যাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত প্রসিদ্ধযশঃ বিশ্বের তাবৎ পদার্থেই বিরাজিত রহিয়াছে, জগতের যাবতীয় বস্তুই যাঁহার কীর্ত্তিমেখলায় বিমণ্ডিত। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপদার্থে তাঁহার কীর্ত্তি-সত্তা-পরিগ্রহ করিতে প্রথমতঃ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। ভূতভৌতিক প্রপঞ্চজাত তদীয় সনাতনী কীর্ত্তি। সমাহিত হৃদয়ে দেখিতে চেষ্টা করিলে, প্রতি পদার্থেই সেই কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কৌমুদী অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হওয়া যায়; কিন্তু সকলের মূল সমাধি, সেই সমাধি বর্জ্জিতহৃদয়ে তদুপলব্ধির আশা কদাচ সম্ভবপর নহে।

২০

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনম্
এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবতি ॥

অন্বয়ঃ—অস্য রূপম্ সন্দৃশে ন তিষ্ঠতি, কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে এনং হৃদিস্থং হৃদা মনসা চ এবং বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"সন্দৃশে"—(সম্যক্ প্রকারেণ দৃশ্যতে অত্র ইতি সম্+দৃশ্+ক, চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্য প্রদেশঃ—তত্র,) চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্থানে। "হৃদা" — শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা। "মনসা"—মননধর্ম্মকমনের দ্বারা। "হৃদিস্থং"—হৃদাকাশগুহাস্থ। "তে অমৃতাঃ ভবন্তি"—ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ—এই পরম ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ অখণ্ডানন্দ স্বরূপ চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানে অবস্থান করে না, অর্থাৎ ইহার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, ইহাকে কেহ

চক্ষুদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেনা। যে সাধনচতুষ্টয়াদিযুক্ত যোগ্যাধিকারি-সন্ন্যাসিগণ সুপরিশুদ্ধ--সমাধিমার্জ্জিত বিমলবুদ্ধি ও নিশ্চলমনের দ্বারা হৃদাকাশগুহায় এই পরমপুরুষকে "ব্রহ্মাহমস্মি" "ব্রহ্মই আমি" এই ভাবে জানিতে পারেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা অপরোক্ষীকরণ-মহিমা বলে অমৃতত্ব লাভ করেন। মরণের হেতু অবিদ্যাদি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলের দ্বারা দগ্ধীভূত হওয়ায়, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী-দিগকে আর পুনরায় দেহান্তরভজনা করিতে হয়না। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইতি।"

২১

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ ভীরুঃ
প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং
পাহি নিত্যম্।

অন্বয়ঃ— (ত্বম্) অজাতঃ ইতি এবং (কথয়িত্বা) ভীরুঃ (সন্) (ত্বাম্ এব শরণম্) প্রতিপদ্যতে। হে রুদ্র! যৎ তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং নিত্যং পাহি।

বিষমপদব্যাখ্যা—"অজাতঃ" জন্ম-জরা-অশন--পিপাসাধর্ম্মবর্জ্জিত। "ভীরুঃ"—সংসার হইতে ভীত হইয়া। "ত্বামেব শরণং প্রতিপদ্যতে" তোমাকে শরণপ্রাপ্ত হইতেছে। "দক্ষিণংমুখং"—উৎসাহজননং রূপং তোমার উৎসাহজনন আহ্লাদপূর্ণ চিন্ময়রূপ। "পাহি"—রক্ষা কর।

বঙ্গার্থঃ—সাধক জন্ম, জরা, মরণ, অশন, পিপাসা, শোক, মোহ প্রভৃতি অনন্ত-ক্লেশ-পরিপূর্ণ সংসার হইতে ভীত হইয়া, তত্তৎ ক্লেশাত্মক-ধর্ম্মবর্জ্জিত তোমাকে একমাত্র নিরপায় সংশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়েন। হে রুদ্র অর্থাৎ হে অবিদ্যাবিনাশক! তোমার নিরতানন্দময় উৎসাহজনক রূপদ্বারা তুমি সর্ব্বদা আমাকে অবিদ্যার করাল-কবল হইতে রক্ষা কর। হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার অনুপমজ্যোতি প্রকাশিত করিয়া, আমার মনের চিরান্ধতমসের বিনাশসাধন কর। তুমি জন্ম-জরা মরণ প্রভৃতি অকল্যাণ সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত; তাই হে রুদ্র! অর্থাৎ হে অবিদ্যাধ্বংসক! তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি, তুমি তোমার চিরোৎ-সাহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমার জড়ত্ব-পন্ন জীবন পুনরুৎসাহিত করিয়া দাও।

২২

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু
রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো—
বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥

অন্বয়ঃ— হে রুদ্র! (ত্বম্) নঃ তোকে, তনয়ে, আয়ুষি গোষু অশ্বেষু (চ) মা রীরিষঃ। ভামিতঃ (সন্) বীরান্ নঃ মা বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ (বয়ং) সদম্ইত্ত্বাহবামহে।

বিষমপদব্যাখ্যা— "তোকে"— পুত্রে—অর্থাৎ পুত্রকে। "তনয়ে"— পৌত্রকে। "আয়ুষি"— আয়ুঃ। "অশ্বেষু"—অপরাপর শরীরিসমূহকে। "মা ন রীরিষঃ" বধং মা কার্ষীঃ— বধ করিও না। "ভামিতঃ সন্

বীরান্ নঃ মা বধীঃ"—অত্র শঙ্করঃ—"যে চাস্মাকং বীরা বিক্রামন্তো ভৃত্যা, হে রুদ্র! তান্ "ভামিতঃ ক্রোধিতঃ সন্ মা বধীঃ',—হে রুদ্র! আমরা তোমার বিক্রমশালী অর্থাৎ ঔদ্ধত্যযুক্ত ভৃত্য; তুমি ক্রোধিত হইয়া, তোমার এই সকল ভৃত্যকে বিনষ্ট করিওনা। "হবিষ্মন্তঃ" হবির্যুক্ত হইয়া, অর্থাৎ নিয়ত হোমপরায়ণ হইয়া। "সদমিৎ"—সদা সর্ব্বদা, "ত্বা" ত্বাম্—তোমাকে। "হবামহে"—রক্ষণার্থং আহ্বয়ামঃ—রক্ষারনিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গার্থঃ—হে রুদ্র! হে অনন্তশক্তে! তুমি আমাদের পুত্র, পৌত্র, জীবন, হবিঃ-সাধন গো এবং অন্যান্য শরীরধারীদিগকে বিনাশকরিও না। আমরা শত উদ্ধত হইলেও, তোমার ভৃত্য; হে নাথ! তুমি তোমার ভৃত্যের প্রাণ-সংহার করিও না। আমরা প্রতিনিয়ত হবিরাদি সাধন দ্বারা তোমাকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।
মেট্রপলিটান কালেজ।

এক ও অনেক।

এক চন্দ্র অন্ধকার হরে;
অনেক তারায় কিবা করে? । ১
রাজ্যরক্ষা একটি রাজায়;
নাহি হয় অনেক প্রজায়। ২
এক সেনাপতির শাসনে,
অনেক সৈনিক রত রণে। ৩
এক শিক্ষিতের শিক্ষামত—
সম্প্রদায় হয় সমুন্নত।
মিলিয়া অনেক মূর্খজন,
কোন শিক্ষা না করে সাধন। ৪
ভাল এক বাক্যও সার্থক,
অনেক প্রলাপ অনর্থক। ৫
একটি সুখাদ্যে স্বাস্থ্যারয়,
অনেক কুখাদ্য কিছুনয়। ৬
সুপুত্রেকে সুখ-সম্ভাবনা,
কুপুত্র-অনেকে বিড়ম্বনা। ৭
সুপঠিত এক গ্রন্থ সার,
কুপঠিত অনেক অসার। ৮
সুকৃত এক কাজেও হিত,
কুকৃত অনেক বিপরীত। ৯
একটি সরিৎ সুনিশ্চয়—
অনেক কূপের শ্রেষ্ঠ হয়। ১০
অনেক কুসুম উপেক্ষিত,
একটি গোলাপ সমাদৃত। ১১
অনেক দিনের দাসত্বের তুলনায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ প্রায়। ১২
দিনেকের তরে ধর্ম্ম-জীবন সার্থক;
অধর্ম্মে অনেক দিন বাঁচা অনর্থক। ১৩
ঘৃণিত অধর্ম্মার্জ্জিত কনক অনেক,
সমাদৃত ধর্ম্মার্জ্জিত কপর্দ্দক এক। ১৪
সুপাত্রে একটি পাই দানও সার্থক;
অপাত্রে অনেক অর্থদান অনর্থক। ১৫
সুকৃত ব্যবসা এক ধনপ্রদ বটে;
কুকৃত অনেকে মাত্র অপহ্নব ঘটে। ১৬
তরুর একটী মূলে জল দিলে ফল,

অনেক শাখায়-পত্রে সেচন নিষ্ফল। ১৭
সুসিদ্ধ একটি লক্ষ্যে শুভ ফলোদয়,
অসিদ্ধ অনেক লক্ষ্যে বৃথা কালক্ষয়। ১৮
অনেক নাস্তিক শুধু ধরণীর ভার;
এক ভগবৎভক্ত ভুবনালঙ্কার। ১৯
একেকে যে সার করে অনেক সে পায়,
অনেক যে চায়,তার এক পাওয়া দায়।২০

হিন্দু ও অহিন্দু।

সত্য হিন্দু হতে যদি চাও,
সত্যপর-স্থায়বান হও। ১
যদ্যপি প্রকৃত হিন্দু হও,
কায়মনোবাক্যে শুচি রও। ২
স্বার্থত্যাগী পরার্থানুরাগী,
সেই সত্য হিন্দু নামভাগী। ২
সুখে শান্ত দুখে অবিহ্বল,
হিন্দু নাম তাহারি সফল। ৪
ভ্রাতৃভাবে ভাবে যে মানবে,
হিন্দু আখ্যা তাকেই সম্ভবে। ৫
সদা যে কর্ত্তব্য কাজে রত,
হিন্দু সংজ্ঞা তাহারি সঙ্গত। ৬
মূকজীবে যেবা দয়াবান,
সত্য তার হিন্দু অভিধান। ৭
সর্ব্বধর্ম্মে ধীর-দৃষ্টি যার,
হিন্দু নাম স্থায্য বটে তার। ৮
ঈশে যার রতি-গতি-মতি,
হিন্দু সংজ্ঞা সাজে তারি প্রতি। ৯
খুটিনাটি ক্রটি আচারের—
হেতু নয় "অহিন্দু" নামের।
স্বার্থপর অধার্ম্মিক যেই,
যথার্থ অহিন্দু বটে সেই। ১০
খাদ্য-বিচারের অঙ্গহানি,
তাতেই না যায় হিন্দুয়ানী।
সুচিন্তা সুবাক্য-সুকর্ম্মের—
হানিতেই হানি হিন্দুত্বের। ১১
সর্ব্বভূতে আত্ম প্রসারণ,
সনাতন ধর্ম্মের সাধন।
যে জাতি সে ধর্ম্মে আস্থাবান,
সিন্ধুতীরে যার আদিস্থান।
সে জাতীয় যে জন্মে যথায়,
সাধে ধর্ম্ম যেবা সুবিধায়,
তাহারেই "হিন্দু" নামে মানি;
তদিতর "অহিন্দু" বাখানি। ১২
আহার-বিচার-ভিন্নত,
জল-যানে সমুদ্র-যাত্রায়,
সত্যজ্ঞানে নহে অহিন্দুত্ব;
অহিন্দুত্ব অসত্যেই সত্য। ১৩
চোর দস্যু লোলুপ লম্পট,
নিপট কপট ক্রূর শঠ;
হত্যাকারী অত্যাচারী তথা,
গৃহদাহী মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা;
জালিয়াৎ দাঙ্গাবাজ ঠক,
প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক;
কামুক ও হিংসুক দুর্ম্মুখ,
মিথ্যুক ও বিশ্ব-বিনিন্দুক;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসবিহীন,
চিত্ত যার দীন হীন ক্ষীণ;
নাস্তিকতা-নীরস-পরাণ,
মন যার মহামরুস্থান;

নাহি যার স্নেহ দয়া-বিন্দু;
ইহারাই প্রকৃত অহিন্দু। ১৪
(শুধু) —
অন্নাদি-আচার-ভেদে,
বর্ণাদি-বিচার-ভেদে,
হিন্দু বা অহিন্দু হয়,
এ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ নয়;
বিশ্বাস ও কার্য্যে বদ্ধ
হিন্দুত্ব ও অহিন্দুত্ব। ১৫

সেকাল ও একাল।

আয়কর।

ইনকম্ টেকস বা আয় অনুসারে প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণ, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইহা একালে ইংরাজ রাজ্যের একটী উৎপীড়ন বলিয়া যে সাধারণের ধারণা আছে তাহা ভ্রমমূলক। বিজিত জাতি বলিয়া রাজা আমাদের নিকট অতি উচ্চহারে এই কর গ্রহণ করেন বলিয়া যে অনেক লোকের সংস্কার আছে, তাহাও ভ্রমমূলক। বাস্তবিক সেকালের "রামরাজ্যেও" ইনকম্ টেক্স ছিল এবং তাহার হার একালের অপেক্ষা বেশী ছিল। একথা কেবল বলিলে পাছে লোকের বিশ্বাস না হয়, এজন্ত দুএকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি।

মনু, ৭ম অধ্যায়।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎ করান্॥ ১২৭

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তাচ কর্ম্মণাম্;
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ১২৮

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকো বৎস ষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥ ১২৯

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশএব বা॥ ১৩০

আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধি রসানাঞ্চ পুষ্পমূল ফলস্য চ॥ ১৩১

পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥ ১৩২

যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্ জনম্॥ ১৩৭

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ॥ ১৩৮

বাণিজ্য দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে ক্রীত হইয়াছে, এবং ঐ দ্রব্য কবে কোন্ স্থানে কত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, আনিতে পথে বিপদাদির কিরূপ সম্ভাবনা, পথে ব্যয়, মাসুল প্রভৃতি কত দিতে হইয়াছে, চোরদস্যু প্রভৃতি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কত ব্যয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে লাভালাভের কিরূপ সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখিয়া কর ধার্য্য হইবে। যাহাতে রাজা উচিত মত কর পান ও বণিক্ সম্যক্ রূপে আপন কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারেন, উভয় বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া কর সংস্থাপিত হইবে। যেরূপে জলৌকা (জোঁক) রক্ত পান করে বা গোবৎস দুগ্ধ পান করে অথবা ভ্রমর মধু পান করে সেই প্রকার রাজা ও মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অল্প অল্প কর গ্রহণ করিবেন। যাহাতে মূলধনের প্রতি কোন ব্যাঘাত, বা উৎপাদিত ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া বণিকের বাণিজ্যে অনুৎসাহ জন্মে, এরূপ একেবারে অধিক কর রাজা গ্রহণ করিবেন না। পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ; ধান্য শস্যাদি সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬, ৮ বা ১২ ভাগের এক ভাগ; বৃক্ষ, মাংস, মধু, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, বৃক্ষাদির রস, ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, শাক, তৃণ, বংশনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র, মৃৎপাত্র, বা প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্য সম্বন্ধীয় লভ্যের ৬ ভাগের ১ ভাগ, রাজার গ্রহণীয়।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন দুঃখী প্রজা, যাহারা শাকাদি সামান্য বস্তু বিক্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রাজা তাহাদিগের নিকট ও কিঞ্চিৎমাত্র কর বর্ষে বর্ষে গ্রহণ করিবেন। কারু ও শিল্পজীবিগণ—যথা, পাচক, মালাকার, কাংস্যকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, চিত্রকর, ভাস্কর এবং যে সকল শূদ্র নিজের শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।

মনুর দশম অধ্যায়ের ১১৮। ১১৯ এবং ১২০ শ্লোকেও এই বিষয়ের কথা আছে। আপৎকালে রাজা শস্যাদির ৪ভাগের এক ভাগ, সুবর্ণাদির ২০ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন, শূদ্র এবং কারু ও শিল্প কার্য্যোপজীবিগণের নিকট কর গ্রাহ্য নহে, তাহাদিগের দ্বারা (সাধারণকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে) কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

মনুর ন্যায় হারীতও " * * * ষড়ভাগার্হঃ সদানৃপঃ" (২য় অধ্যায় ৩য় শ্লোক) বলিয়াছেন। বশিষ্ঠও একোনবিংশ অধ্যায়ে প্রায় এইরূপ বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ যে মনুর পরবর্ত্তী, ঐ অধ্যায়েই তাহার নিদর্শন অন্তর্নিহিত (internal evidence) আছে। এই বশিষ্ঠ যে রামচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী বশিষ্ঠ নহেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখি নাই।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে দেখা যায় যে, ভূমি ও ব্যবসায়ের উপর কর সেকালে সাধারণতঃ $\frac{1}{6}$ হইতে $\frac{1}{12}$ পর্য্যন্ত ছিল এবং

আপৎকালে ¼ পর্য্যন্ত উঠিত। অর্থাৎ এখন যেমন আফগান যুদ্ধাদিতে লবণাদির শুল্ক বর্দ্ধিত হয় তখনও সেইরূপ হইত। তখনও এই "ঘৃণিত" বনকর ছিল। এখন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনে কাষ্ঠ, মধু, "গোল" পাতা এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে তৃণ (১) লাক্ষা (২) "মহুয়া" মধুপুষ্প প্রভৃতি হইতে বন বিভাগের যে শুল্ক আদায় হইয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে লোকে নানা আপত্তি ও দোষারোপ করে, কিন্তু এ কর নূতন নহে। বঙ্গের সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুশাসিত (Regulation District) দেশে "বেগার" নাই; কিন্তু ছোটনাগরপুর অঞ্চলের (non regulation) বন্য প্রদেশে "বেগারের" কুলিদিগকে কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার (অবশ্য কাজ করিলে পয়সা দিবার) প্রথা আছে। "বেগার" প্রথা সেকালে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; একালে উহা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে, বলিলেই চলে। অতি দরিদ্র লোকেও ৩০ ভাগের এক ভাগ কর দিত, ইহাদিগকে এখন কিছুই দিতে হয় না। বিদ্যার উপর কর ছিল না (মনু ৭ম অঃ ১৩৫—১৩৬) বরং বিদ্যাদানের ও লাভের পথ যাহাতে প্রশস্ত হয় তজ্জন্য বৃত্তি প্রভৃতি দান করা হইত। রাজা এখনও বিদ্যাদানে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন।

[১] "সাবাই" ঘাস (দড়ি ও কাগজের জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং পশুচারণার্থ ঘাস গবর্ণমেণ্ট জঙ্গলে "বিলি" হয়।

[২] পলাসবৃক্ষে কীট বিশেষের উৎপাদিত নির্য্যাস।

করবহনক্ষম সকল ব্যক্তির উপর সমানভাবে কর হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি যত দরিদ্র তাহার আয়ের তত বেশী ভাগ ভরণ পোষণে ব্যয় হয়, অথবা ভরণ পোষণে যে ব্যক্তির বা জাতির ব্যয় আয়ের অনুপাতে যত বেশী সে ব্যক্তি বা জাতি তত দরিদ্র। ছোটনাগপুরের প্যালামৌ অঞ্চলের মফঃস্বলে ৪ হইতে ৮টী গোরক্ষপুরী পয়সা (প্রচলিত ২¼ হইতে ৪½ পয়সা) দিলে স্ত্রীলোকে ও পুরুষে ৭।৮ ঘণ্টা কাজ করে, অনেকস্থলে পাকি দেড়সের মকাই বা নিকৃষ্ট চাউল পাইলে এক ব্যক্তি সমস্ত দিন কাজ করে। এই আয়ে উঁহাদের উদর পূর্ত্তি হইয়া কষ্টে বস্ত্রাদির জন্য কিছু থাকে, বোধ হয় শতকরা ৯০ ভাগ আহারে ব্যয় হয়। কলিকাতার নিকট যে সকল ভদ্র লোকের কেবল মাত্র চাকরীই সম্বল, তাঁহাদের ৪২।৪৩, আয় হইতে ১৲ টাকা টেকস্ দেওয়া বড় কষ্টকর। নিজেদের কথা দূরে থাকুক, বালক বালিকাগণও শরীর পোষণার্থ অত্যাবশ্যকীয় দুগ্ধ ঘৃতাদি উপযুক্ত পরিমাণে পায় না। এস্থলে ঐ ৪২৲।৪৩৲ টাকা হইতে যদি ১৲ টাকা না দিতে হইত, তাহা হইলে কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য ঐ টাকাটী ব্যয় হইত এবং সেই পরিমাণে ঐ পরিবারের সুখ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইত।

এক্ষণে চাকরিতে বার্ষিক ৫০০৲ বা ততোধিক ২০০০৲ পর্য্যন্ত আয়ের উপর টাকায় ৪ পাই বা ১/৪৮ ভাগ এবং ব্যবসায়ে ৫০০৲ আয়ের উপর প্রায় ১/৫০ ভাগ এবং বার্ষিক ২০০০৲ আয়ের উপর সর্ব্বত্র ১ টাকায় ৫

পাই বা প্রায় $\frac{১}{৫০}$ ভাগ কর ধার্য্য আছে। আমাদের রাজার নিজের দেশে গত বৎসর পাউণ্ডে ১ শিলিং বা ২০ ভাগের একভাগ আয় কর ছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে অনেক কোটী টাকা ব্যয় হওয়ায় আয়কর বর্দ্ধিত হইয়া পাউণ্ডে ১ শিলিং ২ পেন্স বা প্রায় ১৯ ভাগের এক ভাগ হইয়াছে। ইংলণ্ড ধনী, ভারত দরিদ্র' ইংলণ্ডে এই বর্দ্ধিত করে আপত্তিও হয় নাই। ইংলণ্ডে যথেষ্ট টাকা, মূলধনের অভাব নাই, বার্ষিক ৩৲ হারে ধার দিতেও লোকে উৎসুক। ভারতে ব্যবহার যোগ্য মূলধন বড় অল্প, সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা প্রায় দেখা যায়। ব্যবসায়ের উপর কর এদেশে অনেকস্থলে মূলধনে আঘাত করে; মূলধনে আঘাত লাগিলে ধনী প্রথমতঃ ঐ কর দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দ্রব্য ব্যবহারকারীর উপর এবং তৎপরে শ্রমজীবি-গণের উপর চাপাইতে চেষ্টা করেন; উহাতে ও ঠিক না হইলে ব্যবসায় বন্ধ হয়। দরিদ্র দেশে আরও দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় ধনশালী দেশে অনেক লোকের ২০০০০৲ আয়। তাহারা টেক্স দিয়াও যথেষ্ট খায়দায় ও বাবুয়ানী করে। টেক্স কমিলে তাহাদের সেই টাকা যে টাকা জমিতেছিল, তাহাই কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিবে মাত্র। অর্থাৎ ধার দিবার বা কোম্পানির কাগজ কিনিবার অর্থ কিছু বাড়িবে। টেক্স বাড়িলে স্বল্প সংখ্যক টাকা জমিল না মাত্র— ঐরূপ টাকা না জমায় সুখস্বাস্থ্যের কিছু প্রতিবন্ধক হয় না, সুতরাং লোকে বিশেষ আপত্তিও করেনা।

প্রত্যেকের আয়, সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য কিরূপ অভাব পূরণের আবশ্যক, তৎপরে রাজাকে দিবার মত কত থাকে, ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য, পথের ব্যয় ক্লেশ ও বিপদ, কিরূপে জাতীয় বাণি-জ্যাদির বিস্তার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সকল সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিয়া একালের মত সেকালেও করবহন ক্ষমতা নির্দ্ধারণের রীতি ছিল। যে ব্যক্তি অধিক সম্পত্তির অধিকারী, তাহার সুখ শান্তির জন্য রাজার সামান্য চৌকি পাহারার বন্দোবস্তও অধিক প্রয়োজন, তাহার করদানের ক্ষমতাও অধিক। কিন্তু যাহার কিছুই নাই, যে শাক বেচিয়া, কাঠ কুড়াইয়া বা সামান্য মজুরী করিয়া কষ্টে খাদ্যের সংস্থান করে, তাহার কর দানের ক্ষমতা নাই, তাহার উপর আয় কর হওয়া অকর্ত্তব্য। ইংরাজ রাজ সেকালের মত এইরূপ দীন দরিদ্র ব্যক্তি বর্গের নিকট আয় করগ্রহণ করেন না, ইহা আমাদের রাজার দয়া, মহানুভবতা ও গভীর অর্থনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে হারে আয়কর আছে, তাহা ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও ভারতের ব্যক্তিগত ও জাতিগত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজা উহার হার বর্দ্ধিত করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। বরং বার্ষিক ৫০০৲ আয়ের উপর কর এক বারে তুলিয়া দিয়া যদি ১০০০৲ আয়ের উপর হইতে কর সংস্থাপন সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই সুযো-গের সদ্ব্যবহার করিতে আমাদিগের রাজা সচেষ্ট আছেন ইহা একাধিকবার প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত

মন্তব্য।

রাজা প্রজাদিগের স্বদেশবাসী হইলে, তিনি যে করগ্রহণ করেন, তাহা অধিক হইলেও প্রজাদিগের মধ্যে ব্যয়িত হওয়ায়, তাহারা যথেষ্ট উপকৃত হয়। বিদেশীয় রাজার সংগৃহীত কর অল্প হইলেও উহার অধিকাংশই বিদেশ ব্যয়িত হওয়ায় প্রজা-দিগের উহা হইতে কোন প্রত্যুপকার পাই-বার সম্ভাবনা থাকেনা, এবং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে থাকে, রাজা বিদেশীয় হইলে বিদেশীর শিল্প বাণিজ্যের প্রভাবে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের অবনতি না হইয়াও পারেনা এবং তাহাতে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়ে।

হিঃ পঃ সম্পাদক।

ভ-গোল-পরিচয়।

৭ম পাঠ।

বৃষ-রাশি।

কৃত্তিকানক্ষত্রের ¾ অংশ ও রোহিণী-নক্ষত্র এবং মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের ½ অংশ দ্বারা বৃষরাশি গঠিত। কিন্তু বৃষরাশির আয়তন মধ্যে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ও রোহিণী নক্ষত্রের তারা গুলি অবস্থিত। (১)

কৃত্তিকা নক্ষত্র দ্বারা তারাময় বৃষের ককুৎ গঠিত এবং রোহিণী নক্ষত্র দ্বারা তারা-বৃষের মুণ্ড গঠিত।

বর্ত্তমান সময়ে বৈশাখাদি বর্ষগণনা হয়; রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেষ এবং প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী। প্রাচীনকালে কার্ত্তিকাদি বর্ষগণনা হইত,এবং রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র কৃত্তিকা এবং প্রথম রাশি বৃষরাশি ছিল। (২)

বৃষরাশিস্থ তারাগণ মধ্যে...

(১) হলদ্দীবর্ণ তারা বৃহত্তম, এবং লোহিতবর্ণ এই তারাটী দেখিতে অতি মনোহর। এই তারা রোহিণী নক্ষত্রের যোগতারা; রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা, এজন্য রোহিণীর অপর নাম ব্রাহ্ম বা কমণ্ডলু দৈবত। (৩)

(২) হলদ্দীবর্ণ তারার প্রায় ৮ হাত উঃ পূঃ কোণে অগ্নিতারক অবস্থিত।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের তারাগণ মধ্যস্থিত দেবসেনা তারা। দেবসেনা বৃষরাশির ৪র্থ তারা। ইহার পাশ্চাত্য নাম Alcyone

কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগশিরা নক্ষত্র।

দেবসেনা ও হলদ্দীবর্ণ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা অগ্নিকোণে পরিবর্দ্ধিত করিলে, হলদ্দীবর্ণ তারা হইতে ১০ ফুট অন্তরে একটী ২য় শ্রেণীর তারা দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবেক। এই তারাটীর নাম কার্ত্তিকেয় তারা। কার্ত্তিকেয় তারা হইতে ২ফুট অন্তরে ঈশানকোণে একটী ক্ষুদ্র তারাগুচ্ছ আছে; ঐ তারাগুচ্ছের তিনটী মাত্র ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়। তারাগুচ্ছের উত্তরস্থ তারাটী ৪র্থ শ্রেণীর এবং ঐ তারার নাম একতারা। অপর ২টী তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর। তারাত্রয় বিড়াল পদাকৃতি; ঐ তারাগুচ্ছের নাম মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ (৪)

কালপুরুষমণ্ডলস্থ ১১।১৩।১৭তারা = মৃগশিরা নক্ষত্র। একতারা-যোগতারা(মৃগশিরা)

কালপুরুষ মণ্ডলস্থ আর্দ্রা নক্ষত্র।

কার্ত্তিকেয় তারার ৪ হাত পূর্ব্বে এবং একতারার ৩ হাত অগ্নিকোণে যে একটী

১। সাধারণতঃ নক্ষত্র শব্দে রবিমার্গের ৩৬০° অংশের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ১৩⅓° অংশ বুঝিতে হইবে। তারা বর্ণনকালে নক্ষত্র শব্দে তারাসংহতি বুঝিতে হইবে।

২। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতার বাহন বৃষ।

"শিবাধিদৈবতং দেব অগ্নি প্রত্যাভি দৈবতং"
ইতি গ্রহযাগতত্ত্ব।

৩। রোহিণীর অধিপতি ব্রহ্মমণ্ডলস্থ ব্রহ্মা অথবা মৃগরূপী কালপুরুষ।

৪। কালপুরুষমণ্ডলস্থ মৃগরূপী প্রজাপতির মস্তক।

৫। আর্দ্রানক্ষত্রে সূর্য্য প্রবেশ করিবা মাত্র অম্বুবাচির সূচনা হয়। অম্বুবাচির স্থিতি ৩ দিন ২০ দণ্ড। অম্বুবাচির সূচনার ৪র্থ দিনে দীর্ঘতম দিবা এবং হ্রস্বতম রাত্রি হয় এবং বর্ষাঋতুর আবির্ভাব হয়।

১ম শ্রেণীর রক্তবর্ণ তারা দর্শক দেখিবেন, ঐ তারাটীর প্রাচীন নাম বিশাখা আধুনিক নাম আর্দ্রা। আর্দ্রা কালপুরুষমণ্ডলস্থ ২ তারা। সৌন্দর্য্য-বলে আর্দ্রা স্বপ্রকাশে সমর্থ। এজন্ত আর্দ্রা তারা এককই নক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

বিশাখ তারা = আর্দ্রা নক্ষত্র

বিশাখ তারা = আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ তারা। আর্দ্রাতারা নামের সার্থকতা আছে।

মৃগব্যাধ মণ্ডলস্থ লুব্ধক তারা পূর্ব্বে আর্দ্রানক্ষত্র ছিল। পৌরাণিক সময়ে অয়নাংশগতি বলে লুব্ধক তারার আর্দ্রানক্ষত্রত্ব লোপ হয়। কালপুরুষ মণ্ডলস্থ বিশাখ তারাকে আর্দ্রানক্ষত্র পদে (৬) অভিষিক্ত করা হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লুব্ধক আর্দ্রালুব্ধক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (৭)

৬। যে তারা অয়নান্ত বিন্দুর সহিত এক ধ্রুবকে অবস্থিতি করে, ঐ তারায় সূর্য্য উপনীত হইলে, বর্ষাগম হয় এবং ঐ তারাকে আর্দ্রা বলা হয়। অয়নান্তবিন্দু বিলোমগতিবলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সরিতেছে এবং ক্রমে আর্দ্রা নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অতি প্রাচীনকালে সরমা তারা (আধুনিক প্রভাষতারা) আর্দ্রানক্ষত্র ছিল, পরে তৎপুত্র শ্বা (লুব্ধক) আর্দ্রা হইয়াছিল; এক্ষণে বিশাখাতারা আর্দ্রানক্ষত্র।

৭। একই তারার আর্দ্রানাম, এবং লুব্ধক নাম, অথবা অগ্রে আর্দ্রানাম পশ্চাৎ লুব্ধক নাম, এই অর্থে আর্দ্রা-লুব্ধক। কিন্তু পণ্ডিতবর হলায়ুধ স্বীয় কোষে বলেন—"আর্দ্রালুব্ধকঃ কেতুগ্রহঃ।"

মিথুন রাশি।

মৃগশিরা নক্ষত্রের ½ অংশ, ও আর্দ্রা নক্ষত্র এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ¾ অংশ দ্বারা মিথুনরাশি গঠিত। কিন্তু মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে তারামিথুন (অশ্বিদ্বয় = বিষ্ণুতারা + সোমতারা) অবস্থিত নহে। মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে মৃগশিরা নক্ষত্রের তারাগণ এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের তারা অবস্থিত। আদিমতারামিথুন কর্কটরাশিতে অবস্থিত। রাশিচক্রের আদিগঠনকালে তারা মিথুন অবশ্যই মিথুন রাশির আয়তন মধ্যে অবস্থিত ছিল। পুনর্গঠনকালে বাহিরে পড়িয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ঋশ্য-মৃগরূপী প্রজাপতি কালপুরুষ ও রোহিৎ মৃগরূপিণী রোহিণী. এই মিথুন হইতে বর্ত্তমান মিথুন রাশির নামের (৮) সার্থকতা কতকাংশে রক্ষা পাইয়াছে। কারণ মৃগশিরা

৮। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৫—৯ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বদুহিতার প্রতি ধাবমান হইলেন।

(কেহ বলেন দুহিতা অর্থে দিব কেহ বলেন ঊষা।) প্রজাপতি ঋশ্য মৃগরূপ ধারণ করিয়া রোহিৎমৃগরূপধারিণী স্বদুহিতার অনুসরণ করেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, প্রজাপতি অকার্য্য করিতেছেন, ইঁহাকে কে বধ করিবে। দেবগণের যে ঘোরতম আকৃতি ছিল তাহা সমবেত হইয়া এক দেবরূপ সম্ভূত হইল। ঐ সম্ভূতরূপ ভূতবৎদেব নামে অভিহিত। দেবগণ ভূত-

নক্ষত্র মিথুন রাশির আয়তনের মধ্যগত বলিলেও বলাযায়; কিন্তু রোহিণী নক্ষত্র মিথুন রাশির আরম্ভন বহির্গত।

বৎকে বলিলেন প্রজাপতি অকৃতপূর্ব্ব কর্ম্ম করিলেন। ইহাকে বধকর।; তিনি বলিলেন—তথাস্তু। তিনি পশুপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ-বরে তিনি পশুমান্ (বা পশুপতি) হইলেন। বাণবিদ্ধ প্রজাপতি উর্দ্ধে উঠিলেন। ইহাকে মৃগ বলে। ভূতবৎ মৃগব্যাধ। রোহিৎরূপ ধারিণী রোহিণী। সেই ইষু ত্রিসন্ধিময় বলিয়া তাহার নাম ত্রিকাণ্ড।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৩৩

শত পথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়:—

প্রজাপতি স্বদুহিতার প্রতি আসক্ত হইলেন; স্বদুহিতা দিব বা উষা তাঁহার সহিত আমি মিলিত হই,এই [চিন্তা করিয়া] তিনি আসক্ত হইলেন। দেবগণের চক্ষে ইহা পাপ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইল। দেবগণ চিন্তা করিলেন, যিনি স্বদুহিতার,আমাদিগের ভগ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তিনি পাপে লিপ্ত। দেবগণ তখন পশুপতি [রুদ্র] দেবকে বলিলেন, যিনি স্বদুহিতার, আমাদিগের ভগ্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন তিনি পাপে লিপ্ত। নিশ্চয়ই "বাণে বিদ্ধ কর।" রুদ্র শর সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৭ ৪ ১—৩

মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে গৃহী অগ্নি স্থাপন করিতে পারেন, কারণ মার্গশীর্ষ নিশ্চয়ই প্রজাপতির শিরঃ। শিরঃই শ্রী। শিরঃ অর্থেই শ্রেষ্ঠ।

মিথুন রাশির তারাগণ মধ্যে—

১। স্বাহা তারা, অগ্নিতারার প্রায় ৫ হাত দূরে অগ্নি কোণে অবস্থিত। এই স্বাহা তারা আদিম ইল্বল নক্ষত্রের যোগতারা। পঞ্চতারাত্মিকা প্রাচীন ইল্বল নক্ষত্রের অপর তারাচতুষ্টয় স্বাহা তারার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। (৯)

২। স্বাহা তারার উত্তরেই পুতনা নামক কর্কটাকৃতি তারাস্তবক অবস্থিত।

এই জন্য সমাজপতিকে শ্রেষ্ঠী বলে। অর্থাৎ তিনি সমাজের প্রধান। এতৎ সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়া যিনি মৃগশিরা নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করেন,তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

অপরপক্ষে বলিতে পারেন,মৃগশীর্ষনক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন ব্যবস্থা নহে। সত্য বটে মৃগশীর্ষ প্রজাপতির দেহ, কিন্তু যখন দেবগণ তদবস্থায় তাঁহাকে ত্রিকাণ্ড বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন,তখন তিনি ঐ দেহ ত্যাগ করেন। শরীর আবরণ মাত্র, অপবিত্র ও নির্বীর্য্য; সুতরাং গৃহস্থের মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান বিধেয় নহে।

যাহাহউক, তিনি মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে অগ্নি স্থাপন করিতে পারেন। কারণ প্রজাপতির দেহ শব বা অপবিত্র নহে।

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৮-১০

আমরা কেবল একটী কথা বলিতে চাই, এই ত্রিকাণ্ড বাণ পুরাণোক্ত পাশুপত বাণ।

৯। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত মৃগরূপী কালপুরুষের মস্তক নক্ষত্র মধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে ইল্বলনক্ষত্র মৃগশীর্ষ স্থানীয় ছিল।

"ইল্বলাঃ তৎশিরোদেশে তারকাঃ নিবসন্তি যে।"

ইতি অমরকোষঃ।

"ইল্বলাঃ সোমদৈবত্যাঃ।"

ইতিগরুড়পুরাণ ১।৫৯

কালপুরুষমণ্ডল।

মৃগশিরা নক্ষত্রের দক্ষিণে একটী তারাময় চতুর্ভুজক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তারাচতুর্ভুজের উত্তর বাহু ৪ হাত, দক্ষিণ বাহু ৫ হাত, পূর্ব্ব বাহু ৮ হাত এবং পশ্চিম বাহু ১০ হাত দীর্ঘ। তারাচতুর্ভুজক্ষেত্রের অগ্নিকোণে কার্ত্তিকের তারা, ঈশান কোণে আর্দ্রা তারা, বায়ুকোণে কার্ত্তবীর্য্য এবং নৈঋত কোণে একটী প্রথমশ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ তারা। ঐ তারার নাম বাণতারা। ঐ তারা চতুর্ভুজক্ষেত্রের মধ্যদেশে শরাকৃতি উজ্জ্বলতারাত্রয়। মৃগশিরা নক্ষত্র সহ এই তারা চতুর্ভুজক্ষেত্র কালপুরুষমণ্ডল নামে অভিহিত। কালপুরুষ মণ্ডল দেখিলে বোধহয়,নাভিদেশে শরবিদ্ধ মৃগ লম্ফপ্রদানে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকে কালপুরুষমণ্ডলকে ত্রিশঙ্কুরাজ বলে। (১০)

মৃগব্যাধ মণ্ডল।

কালপুরুষ মণ্ডলস্থ তারাময়শর অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে ১২ হাত দূরে একটী নীলাভ শুভ্রবর্ণ অতি বৃহৎ তারা দর্শক দেখিবেন। ঐ তারার আদি নাম তিষ্য, প্রাচীন নাম শ্বন্ ও লুব্ধক এবং এক সময়ে লুব্ধক আর্দ্রা নাম পাইয়াছিল। লুব্ধক ও তৎসন্নিহিত তারাচতুষ্টয় একটী তারাময় মহিষশৃঙ্গ গঠন করিতেছে। যে মণ্ডলে এই তারাশৃঙ্গ অবস্থিত, ঐ মণ্ডলের নাম মৃগব্যাধ মণ্ডল। লুব্ধক তারা মৃগব্যাধমণ্ডলের ১ তারা। লুব্ধক তারা তারাকুলের শিরোমণি। আয়তনে লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা ৫০০ গুণ বৃহত্তর। প্রাচীনকালে লুব্ধক রক্তবর্ণ ছিল। কালবশে লুব্ধকতারা নীলাভ শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে লুব্ধকতারা আর্দ্রানক্ষত্র বলিয়া গণ্য ছিল, এজন্য ইহার অপর নাম আর্দ্রালুব্ধক। কিন্তু লুব্ধক নামেই পরিচিত। মৃগব্যাধমণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম বৃহৎকুক্কুর Canis majoris.

লুব্ধক-গ্রীস দেশে Cyon. (১১)
রোমকে Canis বা Canicula. (১২)
মিসরদেশে Sirus. "জলন্ত"
ইংলণ্ডদেশে Dog star.
ইরাণে তিস্ত্রা নামে খ্যাত। (১৩)

শুনী মণ্ডলস্থ ও কর্কটরাশিস্থ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র।

আর্দ্রাতারা এবং লুব্ধক তারা পরস্পর ১২ হাত দূরে অবস্থিত। আর্দ্রা তারারপূর্ব্বে ১২ হাত দূরে আর একটী ১ম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন; ঐ তারাটীর

"ইল্বলাস্তু মৃগশিরঃ শিরস্থাঃ পঞ্চতারকা।"
ইতি হেমচন্দ্র।

১০। মহর্ষি বাল্মীকির মতে কালপুরুষ মণ্ডলই ত্রিশঙ্কু মণ্ডল। এই জন্য এই মণ্ডল জন-সাধারণে ত্রিশঙ্কু রাজ বলিয়া খ্যাত। রামায়ণ ১৬০

১১। সংস্কৃত শ্বন্ শব্দে কুক্কুর, Gr. cyon.

১২। কুক্কুর তারা হইতে কুক্কুর দিন (Dog days) শব্দ হইয়াছে। গ্রীকগণ Dies caniculares, হিন্দুগণ অম্বুবাচি বলেন।

১৩। তিষ্য তারা ইরাণে তিস্ত্রা নামে খ্যাত।

নাম প্রভাষ তারা। প্রভাষ তারা শুনীমণ্ডলে অবস্থিত। আর্দ্রাতারা, লুব্ধকতারা ও প্রভাষতারা এই তারাত্রয়ে একটী সুদৃশ্য সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করিতেছে। ঐ প্রভাষ তারা ও তাহার বায়ুকোণস্থ ৪ হাত দূরস্থিত এবং উহা দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সদৃশ। প্রত্যুষ তারা এবং প্রভাষ তারার উত্তরে ১২ হাত দূরস্থিত পাশ্চাত্য সোমতারা নামক একটী ১ম শ্রেণীর তারা ( ) ঐ সোমতারার ৪ হাত অন্তরে বায়ুকোণে হরিদ্বর্ণ বিষ্ণুতারা নামক যে তারা আছে, ঐ বিষ্ণুতারার দক্ষিণস্থ ৫ হাত দূরস্থিত অনিল তারা এবং অনিল তারার ৪ হাত দূরে নৈঋর্ত কোণস্থ অনল তারা দর্শক দেখিতে পাইবেন। সোমতারা, অনিলতারা, অনলতারা, প্রত্যুষতারা, ও প্রভাষ তারা, এই পঞ্চতারায় একটী ধনুকাকৃতি গঠন করিতেছে। ঐ তারাময় ধনুকের নাম পুনর্ব্বসুনক্ষত্র। এই নক্ষত্রের দেবতা অদিতি। (ক)

কর্কট রাশিস্থ
তিষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্র।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে মণ্ডলাকৃতি তারাস্তবক আছে, ঐ তারাস্তবকের আকার মধুচক্র সদৃশ, এজন্য উহার নাম মধুচক্র তারাস্তবক। এই তারাস্তবক ঈষৎ রক্তাভ এবং ইহার তারাগুলি ধূলি সদৃশ সূক্ষ্ম। তারাস্তবকের ব্যাস প্রায় ১ ফুট প্রভাষতারা ও সোমতারা হইতে মধুচক্র ৮ হাত দূরে অবস্থিত। তারাস্তবকের তারাপুঞ্জ এত ঘন ও ক্ষুদ্র যে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও নির্ব্বাচন করিতে অশক্ত। এই তারাস্তবকের ১ফুট দূরে অগ্নিকোণে ও ঈশান কোণে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর দুইটী ক্ষুদ্র তারা আছে; তারাদ্বয়ের নাম সুমিত্রা ( ) ও খর ( )। এই তারাদ্বয়ের যোগরেখা অগ্নিকোণে প্রসারিত করিলে, একটী ৪র্থ শ্রেণীর তারার পশ্চিম দিয়া ঐ সংযোগরেখা চলিয়া যাইবে। এই তারার নাম তোমর। তোমরতারা সুমিত্রা তারা হইতে ৪ হাত দূরে স্থিত। পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ২ তারার নাম তোমর, ৩ তারার নাম সুমিত্রা এবং ৪ তারার নাম খর, এই তারাত্রয় শরাকৃতি।

পাশ্চাত্য কর্কট রাশিস্থ ২।৩৪ তারা = পুষ্যানক্ষত্র।

সুমিত্রাতারা—যোগতারা, পুষ্যা = এই নক্ষত্রের নাম তিষ্য। তিষ্য পূষণদৈবতা বলিয়া তিষ্য পুষ্যা নামে খ্যাত।

পাশ্চাত্য কর্কটরাশিস্থ ৩।৪ তারা + মধুচক্র = কর্কটাকৃতি এবং এই কর্কট হইতে কর্কট রাশির নামকরণ হইয়াছে। কর্কটটী পূর্ব্বাভিমুখ।

কর্কটরাশিস্থ
অশ্লেষানক্ষত্র।

খরতারা ও সুমিত্রা তারার সংযোগরেখা তোমরতারা অতিক্রম করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিলে, দর্শকের নেত্র একটী তারাগুচ্ছে নীত হইবে। এই তারাগুচ্ছে ৬ টী ক্ষুদ্র তারা দৃষ্টিগোচর হয়, তারাগুচ্ছের আকার।—

কর্কটরাশি।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের ১ পাদ এবং পুষ্যা ও,

(ক) অদিতির্দেবকী হ্যভূৎ। হরিবংশ।
দেবমাতাচ দেবকী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে।

অশ্লেষা নক্ষত্রদ্বারা কর্কটরাশি গঠিত। কিন্তু এই রাশিস্থ মধুচক্র নামক তারাস্তবক এবং পুষ্যানক্ষত্রের থর ও সুমিত্রা তারাদ্বারা কর্কট দেহ গঠিত। (১৪)

ক্রমশঃ।

আর্য্য কবিতা।*

ওঁ অগ্নি মীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং। ১
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভি
রীড্যোনূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি। ২
অগ্নিনা রয়ি মশ্নবৎ
পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং
বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪
অগ্নি র্হোতা কবিক্রতুঃ
সত্যশ্চিত্র শ্রব স্তমঃ।
দেবো দেবেভি রাগমৎ। ৫
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে
ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ। ৬
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরংত এমসি। ৭
রাজং তমধ্বরাণাং
গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে। ৮
স নঃ পিতেব সূনবে
অগ্নে সূপায়নো ভব।
স চ স্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

অগ্নিদেবে করি আমি স্তব ;—
যিনি যজ্ঞ পুরোহিত, যিনি দীপ্তিমান্।
যিনি সে ঋত্বিক্ হোতা বহুরত্নবান ॥ ১
যিনি পূর্ব্ব ঋষিগণ-স্তুতির ভাজন,

১৪। কর্কট দশপদযুক্ত, এজন্য কর্কট উৎকলে দশরথ বলিয়া খ্যাত; আবার উঃপঃ অঞ্চলে সারস পক্ষী দশরথ নামে খ্যাত।

* আর্য্যগণই জগতের আদি কবি এবং তাঁহাদের কাব্যই জগতের প্রথম মহাকাব্য এ কথা এখন সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সেই আদি কাব্য ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটী এইবার অনুবাদ করিয়া দিলাম; শিক্ষিত মণ্ডলী যদি ইহা পাঠোপযোগী মনে করেন। তবে ক্রমশ অগ্রসর হইব নচেৎ এই পর্য্যন্ত। পাঠকবর্গের এস্থানে মনেরাখা কর্ত্তব্য যে, আর্য্যগণ যদিও অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে স্তব করিতেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে একেশ্বরবাদী ছিলেন। একথা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের তৃতীয় ঋকে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সং প্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা ॥

পরবর্ত্তী মনুসংহিতাতেও ইহা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনু মন্যে প্রজাপতিম্,
ইন্দ্র মেকে পরে প্রাণ মপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
মনুসংহিতা ১২। ১২৩

যাঁহারে করয়ে স্তুতি নব ঋষিগণ,
তিনি দেবগণে হেথা করুন বহন ॥ ২
অগ্নি যজমানে ধন করেন প্রদান
—প্রতিদিন পুষ্যমাণ হেতু বর্দ্ধমান্,
যশঃ আর বীর শ্রেষ্ঠে করে যেই দান। ৩
হে অগ্নি, সর্ব্বতঃ থাক যে যজ্ঞ অধ্বরে,
নিশ্চয় সে যজ্ঞ যায় দেবতৃপ্তি তরে ॥ ৪
হোতা, যজ্ঞকারী, আর সত্য পরায়ণ
বিচিত্রকীর্ত্তিসংযুত, সহ দেবগণ
করুন এ যজ্ঞে অগ্নিদেব আগমন ॥ ৫
যে কল্যাণ কর তুমি হব্য প্রদাতার,
অগ্নে, অঙ্গিরস, তাহা সত্যই তোমার ॥ ৬
আসিতেছি দিনে দিনে নিকটে তোমার,
দিবা রাত্র মনঃ সহ করি নমস্কার ॥ ৭
যজ্ঞের রক্ষক তুমি, তুমি দীপ্যমান্
যজ্ঞ দীপ্তিদাতা যজ্ঞাগারে বর্দ্ধমান ॥ ৮
পুত্র কাছে পিতৃবৎ, অনায়াস গম্য হও।
মোদের কুশলতরে মোদের সমীপেরও ॥ ৯

কস্যচিৎ বৈদিকস্য।

স্বরজ্ঞান

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

স্বরশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইলে এবং স্বরশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অগ্রে দুইটি বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ১ম—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর বিষয়। ২য়,—পঞ্চতত্ত্বের বিষয়। যেমন ব্যাকরণ না পড়িলে সংস্কৃত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার কি বুঝিবার উপায় নাই; তেমনি ঐ নাড়ী তিনটি ও পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ অগ্রে প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইলে, "অব্যাকরণ জনস্বন্ধঃ" সদৃশ স্বরশাস্ত্রালোচনা বিফল। কেবল হাতড়ান সার। অধিক কি, ক, খ, ইত্যাদি অক্ষর পরিচয় না হইলে এবং স্বরবর্ণ ত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ অবলম্বন ভাষা পড়িতে চেষ্টা করা যেমন হাস্যাস্পদ, তদ্রূপ নাড়ীজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অগ্রে উত্তমরূপে না হইলে স্বরশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা ও বিফল প্রয়াস এবং পক্ক বিল্বফলে বায়স-চঞ্চু-পুটাঘাতের ন্যায় উপহাসাস্পদ ও পণ্ডশ্রম মাত্র। একারণ এই দুই বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। পরে অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠান বলিব। এবার এই অংশটি পাঠকগণের কিছু নীরস বোধ হইবে; কিন্তু ইহাদ্বারা পরে সরসরস উপভোগ করিবার সুবিধা হইবে।

এখানে আর একটি কথা বলি। বেদান্ত শাস্ত্র ও স্বরশাস্ত্রে অধিক প্রভেদ নাই; ইহাতে অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, স্বর হইতে ঋক্, যজু, সামাদি বেদ চতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ এবং স্বর হইতে গান্ধর্ব্বাদি সঙ্গীত বিদ্যা ও স্বর হইতেই তল, অতল, বিতল, রসাতল, পাতালাদি চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে এবং স্বরই আত্মার স্বরূপ। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয় *। এই 'হং' শাম্ভু-

* হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ, সকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥

মনুষ্যের শ্বাসপতন কালে হং ও শ্বাস

রূপী, আর 'স' শক্তিরূপিণী। এই প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলনে হংস পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। বৈদান্তিকদিগের মতেও ইহাকে পরমব্রহ্ম এবং

গ্রহণ সময়ে স উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী ও স শক্তিরূপিণী।

এই হংসো বিপরীত উচ্চারিত হইলে সোঽহং বুঝায়, জীব সর্ব্বদা তাহাই জপ করিতেছে।

সোঽহং হংসপদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

সোঽহং অর্থে সেই আমি, অর্থাৎ শিবশক্তিরূপ পরমব্রহ্ম আমি। হংস প্রতিপাদক পরমব্রহ্ম অভেদ শিবশক্তিরূপ। হংসের দুইপক্ষ আগম ও নিগম, পদদ্বয় শিবশক্তি, কণ্ঠ ও নেত্র কামকলারূপ। কামকলাতত্ত্ব অতি গুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য। যোগী ও অধিকারী সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে, প্রকাশকের সর্ব্বনাশ হয়; ইহা শিববাক্য ও প্রত্যক্ষফল দৃষ্ট। কামকলাতত্ত্ব যথা সম্ভব প্রকাশযোগ্য, তাহা ও হংসের গূঢ় রহস্য মৎপ্রণীত "যোগের সোপান" নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

হংস এই পরমমন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। গতবারে বলিয়াছি যে, এক দিবা রাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহাকে অজপাজপ কহে।

"একবিংশতি সহস্রং ষট্ শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাং।
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ

হংস বীজরূপে উল্লেখ হইয়া থাকে। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য দ্বারা পরমব্রহ্ম হংসই উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই তিনের কারণ।

[ক্রমশঃ।]

অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশ নিকৃন্তনী।"

যতবার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার 'হংস' পরমমন্ত্র অজপাজপ হয় এবং প্রত্যেক মনুষ্যের ২১৬০০ বার অজপাজপ হইয়া থাকে। ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপ ও সাধনা। ইহা জানিতে পারিলে মালাঝোলা লইয়া আর জপ করিতে হয় না এবং উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। দুঃখের বিষয় ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ও সঙ্কেত না জানায় ও উপদেশাভাবে এমন সহজ জপ সাধনা কেহ বুঝেনা। মুখে 'সোঽহং' বলিয়া বাহিরে কাছা খুলিয়া পরম হংস সাজো, কি রাজহংস সাজিয়া বেড়াও, ভিতরের হংসের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিলে বাহিরে আড়ম্বর বৃথা। বড় বড় পেটমোটা নামজাদা পরমহংস দেখিতেছি যে, প্রকৃত হংসের কোন অংশ জ্ঞাত নহে, তাহাপেক্ষা হংস পরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র পাতিহংস সাদা কাপড়ে আবদ্ধ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

মোক্ষদায়িনী অজপা দ্বিবিধ। যথা—ব্যক্তা ও গুপ্তা। ব্যক্তা অজপাজপের অঙ্গন্যাসাদি আছে; কিন্তু গুপ্তা অতি গুপ্ত, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ যোগার্ণব ও দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা এবং কুল মুলাবতার কল্পসূত্র টীকায় বিবৃত আছে; কিন্তু অনেক বিষয় গুরুমুখগত। সুতরাং যোগিগুরুর নিকট শিক্ষা না করিলে কোন কায হয় না, এবং প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা

স্বরজ্ঞান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

"হংসঃ পরংব্রহ্মরূপঃ সাকারঃ শিবরূপকঃ।
হকারঃ শম্ভুরূপঃস্যাৎ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥"

ইহাতে দেখাযাইতেছে যে, হং—চিৎকলা, চৈতন্য। সঃ সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণময়ী শক্তি, মায়া জড়-স্বরূপা। এই শক্তিরূপিণী মায়ার শক্তি দুইটি। একটি বিক্ষেপ শক্তি; আর একটি আবরণ শক্তি। মায়াময়ী প্রকৃতি আবরণ শক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে তাহাকেই জগদাকারে দেখাইয়া থাকেন। চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর বিশ্ব উদ্ভূত হইবার একমাত্র কারণ, ঐ মায়া-রূপিণী শক্তি প্রকৃতির বিক্ষেপ শক্তি সত্য স্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ আভাষিত করিতেছে। প্রকৃতির শক্তি চৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে ব্রহ্ম চৈতন্য থাকিতেও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতির সঙ্গে চৈতন্য সংমিলিত না হইলে, প্রকৃতি চৈতন্য-হীনা জড়স্বরূপা। এই জন্য প্রকৃতি-পুরুষ অভেদ চণকাকার। শক্তিরূপিণী মায়া সত্ত্ব, রজ, তম গুণে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা নামে অভিহিত হয়েন এবং তত্সহিত চৈতন্য বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

বেদান্ত ও স্বর, যোগাদি-শাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকার প্রণালী পৃথক হইলেও মূল উদ্দেশ্য ও বিষয় এক পরমব্রহ্ম। পরম-ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষরূপে নানা নামে কথিত হইয়া থাকেন এবং উপাসনার প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা তান্ত্রিক-সাধক শুনিলেই—মদ্য মাংসাদি পঞ্চমকারের সেবক মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ সাধক ও তন্ত্র এবং পঞ্চমকারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কত কথাই বলিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক

পণ্ডিত নামে সমাজে পরিচিত হইলেও বাস্তবিক অতিমূর্খ মহাপাপী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা রীতিমত তন্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই, তাহারাই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে। কোন শাস্ত্রে রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া মতামত প্রকাশ করা মূর্খতার পরিচয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আদ্যাশক্তি-কালীর সাধনাই ব্রহ্ম সাধনা এবং ব্রহ্মজ্ঞানই উপাসনার শ্রেষ্ঠতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রে "হংস" পরমব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাধনা যোগাদি ক্রিয়ার অতিচমৎকার উপদেশ আছে। যে তন্ত্রে মূর্ত্তি পূজার বিধি ও পঞ্চমকার সহযোগে সাধনের উপদেশ আছে, সেই তন্ত্র বলিতেছেন—

"কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঘৃতং।
দেহমধ্যে তথাদেবঃ পুণ্যাপাপবিবর্জ্জিতঃ।"
(গায়ত্রীতন্ত্র।)

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি, ফুলে গন্ধ ও দুগ্ধে ঘৃত যেরূপ আছে, মানব দেহের মধ্যে সেইরূপ পাপপুণ্য বর্জ্জিত দেবতা রহিয়াছেন।

গায়ত্রী তন্ত্রোক্ত ঐ একটী মাত্র কথায় তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উহাতেই বেদান্ত ও যোগের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। আর "হংস" স্পষ্টতঃ বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাহা অগ্রে বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় আজ কাল সমগ্র তন্ত্র ও তন্ত্রজ্ঞ-গুরু দুষ্প্রাপ্য। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের কতকাংশ প্রচলিত আছে, তাহার সমস্ত বিধি সর্ব্বদেশে ব্যবহার্য্য নহে। উহা বিষ্ণু ক্রান্তাদি দেশভেদে এবং অধিকারী ভেদে প্রযোজ্য। আমরা তাহা বুঝিনা এবং কালের গতি অধিকারী ও লোকের মতি গতি, শরীর ও রুচি অনুসারে সাধন বিধি, পঞ্চমকারের উদ্দেশ্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অথচ মদ্য মাংসাদির উল্লেখ দেখিয়া শুড়ির দোকানের মদ, জলের মাছ, কশাইয়ের দোকানের মাংস ইত্যাদি স্থির করিয়া বসি। সুতরাং কেহ-বা তন্ত্রোক্ত সাধনার নামে মদ্য, মাংস উদরগত ও শক্তিরূপিণী-বেশ্যা ক্রোড়গত করিয়া বসেন। কেহবা তন্ত্রের নিন্দা ও মহাযোগী মহেশ্বরকে পাপাচারের পথ প্রদর্শক অপদার্থ মনে করিয়া থাকেন। হায়! কালমাহাত্ম্যে তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্র দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। তন্ত্র, যোগ ও স্বরশাস্ত্র* এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ ফলদায়ক সকল শাস্ত্র। শেষোক্ত দুই শাস্ত্রের সফলতা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রথমোক্ত তিন শাস্ত্রের সফলতা ও প্রত্যক্ষতা বর্ত্তমান কালে কলির গৃহস্থ সাধক বৃন্দের ভাগ্যে অতীব দুর্লভ। সুলভ হইবেই বা কিসে?

*স্বরোদয়শাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও নানা কারণে এখন পৃথক শাস্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছে। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভিন্ন, তন্ত্র শাস্ত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। পারাদি ভস্ম ও দ্রব্যগুণে অতি সহজে স্বল্প সময়ে ধাতু আদি ভস্ম করিবার ও রসায়নাদি করিবার উপায় যাহা তন্ত্রে ক্রমতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা অতি আশ্চর্য্য।

"মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রংপিবন্তি পণ্ডিতাঃ।"

সর্ব্বশাস্ত্রের সারভাগ যোগীরা গ্রহণ করেন; আর পণ্ডিতগণ ঘোল আহার করেন। —অসার ভাগ লইয়া বৃথা কচ্‌কচি করিয়া বেড়ান্। সুতরাং কূপমণ্ডূকের ন্যায় সহস্র বৎসর গৃহে বদ্ধ থাকিলে কিম্বা বায়ান্ন কোটী টোলে পড়িলেও উহা শিখিবার উপায় নাই। কেহ যদি পর্য্যটন করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায়, বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া যোগী ও সাধকের নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া গৃহে আইসে, তবে সে ব্যক্তি সংসারী সদাশয়মহাশয়গণের নিকট দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিচিত হয়। অধিকন্তু তাহার অন্নচিন্তা-চমৎকারিত্ব-গুণে সব হজম হইয়া যায়। তৎপ্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই, কাহারও শিখিবার আগ্রহও নাই। বিশেষতঃ—

'স্বদেশ জাতস্য জনস্য লোকে গুণাধিকস্যাপি ভবেদবজ্ঞা।
গৃহাঙ্গনা যদ্যপি চারুরূপা তথাপি পুংসাং পরদারবাঞ্ছা।"

স্বদেশস্থ কোন ব্যক্তির গৃহস্থ জন দুর্লভ কোন বিদ্যা বা গুণ আয়ত্ত থাকিলে, তাহা দেশীয় লোকের উপেক্ষণীয় ও অনাদরণীয় হয়। এ বিষয়ের অধিক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। অনুতাপে মর্ম্ম-দাহে ব্যথিতান্তঃকরণে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কেহ হয় তো বলিবেন, ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত কেন? স্বরমতে কার্য্য করিবার কথা বলিব, তাহাতে পেনেল সাহেবের রায়ের মত অবান্তর কথা কেন? ইহাতে পেনেলের মতন আমারও কৈফিয়ৎ।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার পরিচয়।

মানব দেহের মধ্যে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ী সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া আছে। যথা—

'সার্দ্ধ লক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।'

সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী এইরূপ ভাবে রহিয়াছে যে,—

"যথাশ্বত্থদলে তদ্বৎ পদ্মপত্রেষু বা শিরাঃ।
নাড়ীষেতাসু সর্ব্বাসু বিজ্ঞাতব্যাস্তপোধন॥"

অর্থ।—অশ্বত্থ কি পদ্মপত্রে যে প্রকার শিরা সকল বিন্যস্ত থাকে, দেহমধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী তদ্রূপ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

মনুষ্য-শরীরে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে দেখাযায়, তাহা ঐ নাড়ী সকলের মুখ হইতে ক্ষরণ হয়। যথা—

"নাড়ী মুখানি সর্ব্বাণি ঘর্ম্ম-বিন্দুং ক্ষরন্তি চ।"

শরীরাভ্যন্তরস্থিত নাড়ীর ঘর্ম্ম সকল বাহিরে ত্বকের উপর প্রত্যেক লোমকূপের সহিত সংমিলিত এবং নাড়ী-মুখ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে।

সার্দ্ধ তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে নাভির অধোদেশে কুণ্ডলীস্থানকে * আশ্রয় করিয়া সর্পাকার বিংশতি নাড়ী অবস্থিত আছে। উহাদের মধ্যে ১০টি ঊর্দ্ধমুখী ও দশটি নিম্নমুখী রহিয়াছে। যথা—

* নাভির অধোদেশে যে কুণ্ডলী স্থানের কথা বলিলাম। ইহাতে কেহ যেন মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি না বুঝেন। কুণ্ডলী ও কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক এবং অব-

"নাভ্যধঃকুণ্ডলী--স্থানেভুজঙ্গাকারনাড়িকাঃ।
ঊর্দ্ধগা দশ নাড্যস্তু দশৈবাধস্ততাঃ স্থিতাঃ ॥"

এই বিশতি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ৭২০০০ নাড়ী সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া জীবনের আধারভূতা হইয়া আছে। এই সকল নাড়ীদ্বারা সর্ব্বদেহে বায়ু ও ভুক্ত-দ্রব্যের রস সঞ্চার হয়। তজ্জন্য ইহাদিগকে ভোগবহা নাড়ী কহে। মনুষ্য অন্নাদি যাহা

স্থিতির স্থান বিভিন্ন। আজ্‌ কাল্‌ দেশ-কাল পাত্র সব নূতন রকম কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরকাল পক্ষী পাখালী খাইয়া স্বেচ্ছাহার বিহার করিয়া কেহ হজমিগুলিরূপ শীকা মস্তকে রাখিয়া, কি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া হঠাৎ একেবারে গোঁড়া হিন্দু সাজিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাহিরে শীকা, ভিতরে ফক্কা! উদ্দেশ্য—বক্তৃতার কেতায় লোক ভুলাইয়া ডঙ্কা মারিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ'—দৃষ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ বা যোগের যো পর্য্যন্ত না জানিয়া কলিকাতা সহরে যোগে যোগে যোগের দোকান খুলিয়া আপামর সাধারণকে যোগ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই পঞ্চমুদ্রা প্রণামি না দিলে, যোগের দোকানে প্রবেশ করিবার যো নাই। অনেকেই আবার বাপের রাখা, মায়ের দেওয়া নাম ত্যাগ করিয়া প্রেমানন্দ, কেবলানন্দ, ভুঁড়িয়ানন্দ প্রভৃতি বিশ্রী, বিতিকিচ্ছি নাম গ্রহণ করিয়া গৈরিক বসন পরিধানে কাচা খুলিয়া যথেচ্ছাহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছে। আবার একদল রাতারাতি 'স্বামী' উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সাধু হইয়াছে; কিন্তু নিত্য প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে দুগ্ধ চিনি সংযুক্ত বা হালুয়া প্রচুর ভোজন; প্রাতঃ ভোজন রূপে পরিণত হয়। এই দল অতি চতুর চালাক! এই দলের অর্থোপার্জ্জন ও উদর-পোষণ ও শরীরের তোয়াজ করাই প্রধান কারণ। ইহাদের গৈরিক বসন ও মুখের বচন গুণে অনেকগুলি গবারাম ধনীর টাকায় এই স্বামী দলের সম্পদ ও বিলাসিতা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন নগরে, গ্রামে, হাটে, বাজারে, রেলগাড়ীতে, পথে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী যুবক যোগী, সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বিনা গুরূপদেশে আপনাআপনি একেবারে মহাযোগী ও তত্ত্বজ্ঞানী সাধু হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার মূল, বঙ্গবাসীর প্রকাশিত 'ঘেরণ্ডসংহিতা' প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু কি গীতা একটু ঘরে বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ স্বয়ম্ভূসিদ্ধ মহাযোগী! পাঠকগণ! এই সকল কথা আমার কল্পিত বা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য। বিনা গুরূপদেশে আপনাপনি মহাযোগী ২।১ জনের জ্বালায় আমি মধ্যে মধ্যে জ্বালাতন হইয়া থাকি এবং অনেকের যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও গুরূপদেশ বিনা স্বয়ং যোগীর পাগলামী অনেক দেখিয়াছি। যাহউক ঐ শ্রেণীর যোগী ও সবজান্তা পণ্ডিতগণ কুণ্ডলিনী একই জিনিষ বুঝিয়া না বসেন। এই জন্য কুণ্ডলীর পরিচয় ও অবস্থিতির স্থান সংক্ষেপে বলিতেছি। বলা বাহুল্য কালে এই প্রবন্ধের শেষে পাঠকগণেরও লাগিবে।

"* * * * * নাভৌ চক্রং সমুদ্ভবঃ।
দ্বাদশারযুতং তচ্চতেন দেহং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্যোর্দ্ধং কুণ্ডলীস্থানং নাভেস্তির্য্য-গধূর্দ্ধতঃ।
অষ্ট প্রকৃতিরূপা সা অষ্টধা কুণ্ডলকৃতিঃ।"

নাভি হইতে এক চক্র সমুদ্ভব হইয়াছে। উহার দ্বাদশ অর (পত্র) এবং উহাতেই সমস্ত শরীর প্রতিষ্ঠিত। এই চক্রের ঊর্দ্ধদিকে এবং নাভির তির্য্যক্‌, ঊর্দ্ধ ও নিম্ন-

আহার করে, তাহা অপানবায়ু-কর্ত্তৃক শরীর-মধ্যগত অগ্নির দ্বারায় পরিপাক ক্রিয়ার সম্পন্ন হইলে, প্রাণ বায়ু সমান নামক বায়ুর সহিত একত্র হইয়া ভুক্ত-অন্নাদির রস-সমূহকে অগ্নির সহিত ঐ ৭২০০০ নাড়ী-পথে শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত করিয়া থাকে।

এই নাড়ীপুঞ্জ মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের নাম যথা—

"সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকাঃ।"

সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্না তিন নাড়ী প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। আবার এই তিন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিমার্গে সাধনার প্রধান অবলম্বন।

দিকে কুণ্ডলীর স্থান। এই কুণ্ডলী অষ্ট প্রকৃতিরূপ অষ্ঠ কুণ্ডলাকৃতি।
নরপতি জয়চর্য্যা স্বরোদয়ে উক্ত আছে যে,—
"শরীর পুষ্ট্যর্থমেব নাভৌ কুণ্ডলী মাহ।
মহাশক্তিঃ কুণ্ডলী নাড়ীস্থা হি স্বরূপিণী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশ চাধোগতা স্তথা।"

অর্থাৎ শরীরের পুষ্টির জন্যই নাভিতে কুণ্ডলী রহিয়াছে। এই কুণ্ডলীস্থান হইতে দশটি নাড়ী ঊর্দ্ধমুখী ও দশটি নাড়ী অধোমুখী হইয়া রহিয়াছে।

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ব্যতীত অপর একাদশ নাড়ী চক্ষু, কর্ণ, মুখ, উপস্থ প্রভৃতি এক এক স্থান অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। তদ্বিষয় চিকিৎসাপ্রকরণে বলিব। এক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনায় প্রধান তিন নাড়ীর কথা বলিতেছি।

মনুষ্যের প্রাণবায়ু (শ্বাস-প্রশ্বাস) যাহা নাসাপুট দিয়া বাহির হয় ও ভিতরে পুনঃ প্রবেশ করে, তাহা ঐ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী-পথে গতায়াত করিয়া থাকে। ঐ নাড়ী ও তত্ত্বের দোষ-গুণেই যাত্রাদি সাংসারিক বৈষয়িক সকল কার্য্যের ভাল ও মন্দ ফল হইয়া থাকে। এই তিন নাড়ীর পরিচয় জানিয়া স্বরশাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে, শরীর সুস্থ থাকে ও মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

মানবদেহের পূর্ব্বদেশে যে মেরুদণ্ড দেখাযায়, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। আর মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে ইড়া নাড়ী ও দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ী রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বস্থিত ইড়া নাড়ী বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ইড়া নাড়ী—শক্তিরূপিণী এবং ইহাতে চন্দ্র অবস্থিত করে। এজন্য ইহা সুধা-স্বরূপা। ইড়া নাড়ীর গুণ শীতল, স্থির-প্রকৃতি, স্ত্রীরূপা, এবং উত্তরায়না। বর্ণ, শঙ্খচন্দ্রাভা। শুক্লপক্ষ, সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিবারের এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি ইড়া নাড়ী। মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে স্থিত ইড়া নাড়ী

বামনাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং বামনাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ ইড়া নাড়ী পথে প্রবাহিত হয়। এজন্য বাম-নাসিকায় শ্বাসবহন সময় "ইড়ারবহন" "চন্দ্রচর" প্রভৃতি নামে কথিত হয়। পিঙ্গলানাড়ী সূর্য্যস্বরূপ, পুরুষ, দক্ষিণায়না। ইহার গুণ উষ্ণ, চর প্রকৃতি, বর্ণ-সিত-রক্তাভা, কৃষ্ণপক্ষ ও শনি, রবি, মঙ্গল এই তিন বারের এবং পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি। পিঙ্গলানাড়ী মেরুদণ্ডের দক্ষিণ-পার্শ্বে থাকিয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং দক্ষিণ নাসিকায় যে শ্বাসবহন হয়, তাহা ঐ পিঙ্গলা নাড়ী-পথে গতায়াত করে। তদ্ধেতু দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালের নাম "পিঙ্গলার বহন" 'সূর্য্যবাহ' ইত্যাদি নামে কথিত হয়

সুষুম্নানাড়ী—অগ্নি স্বরূপা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নানাড়ী রহিয়াছে। ক্ষণে বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে, তাহাকে 'সুষুম্নার বহন' বলা যায়। এই সুষুম্নার বহন বড় অমঙ্গল জনক।

ইড়া ও পিঙ্গলার বহন সময় অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যে ২ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ সুষুম্নার বহন কাহাকে বলে এবং সুষুম্নার বহন সময়ের কর্ত্তব্য নিম্নে বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, একবার বাম নাসিকায় এক ঘণ্টা ও একবার দক্ষিণ নাসিকায় এক ঘণ্টা পর্য্যায় ক্রমে শ্বাস বহন হইয়া থাকে। এই নিয়মে যখন এক নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তখন অন্য নাসিকায় নিশ্বাস খুব কমতেজে মৃদু বহিতে থাকে। আর এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন এক ঘণ্টা পূর্ণ হইয়া যখন অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হয়, তখন অতি অল্প সময়ের জন্য কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় ক্ষণিক নিশ্বাস বহন হয়, কিম্বা ঐ সময়ে ক্ষণকালের জন্য একেবারে দুই নাসিকায়ও সমানরূপে নিশ্বাস বহিতে থাকে। ইহাকে 'সুষুম্নার উদয়' বা সুষুম্নার বহন বলে। এরূপ সময় মনুষ্যের বিবিধ বিপদ, কলহ ও ক্ষতি নিশ্চয়ই হয় এবং যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তাহার ফল বিপরীত হইবে। মনুষ্য-জীবনে যত কিছু অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হয়।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরা স্মৃতা॥"

ক্ষণে বাম নাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণ নাসিকায়, নিশ্বাস বহিলে সুষুম্নার বহন বলা যায়। এরূপ সময় সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় ও অশুভ জনক।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীত ফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥"

যদি কখন, নিশ্বাস একবার বাম ও একবার দক্ষিণ নাসায় ক্ষণে ক্ষণে বহন হয়, তবে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে।

যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ী দ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥

যাহার শ্বাসের নিয়ম ব্যতিক্রম হইয়া ইড়া ও পিঙ্গলায় বহন হয়, অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ উভয় নাসিকায় একেবারে নিশ্বাস বহন হইলে, তাহার অশুভ উপস্থিত জানিতে হইবে।

"উভয়োরেব সঞ্চারে বিষুবন্তং সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

যখন দুই নাসিকায় এককালীন নিশ্বাস বহন হয়, তখন বিষুব যোগ বলে। এইরূপ সময় ক্রূর কিম্বা সৌম্য কোন কার্য্যই করিবেনা, করিলে সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, দুই নাসিকায় সমানভাবে নিয়ত নিশ্বাস বহন হয়, তাঁহারা সে ভুল সংস্কারটী একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন। দুই নাসিকায় সমানভাবে সর্ব্বদা নিশ্বাস বহিলে, বিঘ্নসঙ্কুল-সংসারে বিবিধ বিঘ্নজালে সতত জড়িত থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কচিৎ কখন দুই নাসায় নিশ্বাস বহন হইয়া থাকে, সে সময় কষ্ট, ক্ষতি, কার্য্যধ্বংশ, আশানাশ, বিবাদ প্রভৃতি যাহা কিছু অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘটিবে। এজন্য সেরূপ সময়ের কর্ত্তব্য এই—

ঈশ্বর স্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মসু।
অন্যৎ তত্র ন কর্ত্তব্যং জয়লাভসুখাপিভিঃ॥

কচিৎ এক আধ মুহূর্ত্তের জন্য যদি ঐরূপ সুষুম্নার প্রবাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সময় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ ও যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম করিবে। ঐরূপ সময় অন্য কোন কার্য্য করিবে না, কাহারও নিকট যাইবে না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেনা।

উত্তান ভাবে শয়ন করিলে সুষুম্নার বহন হয়, এজন্য চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নাই, কারণ, মনুষ্যের ক্ষতি, অনিষ্ট, বিপদ প্রভৃতি যত কিছু অনিষ্টকর ঘটনা সুষুম্নার প্রবাহেই সংঘটিত হইয়া থাকে *। রাগের মত বালাই আর নাই, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে কত অকার্য্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটির শত্রু ক্রোধ।

"অপরাধিনি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধঃ কথং নহি।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥"

বাস্তবিক, ক্রোধোদ্দীপ্ত ব্যক্তি নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করে, কিন্তু সুষুম্নার বহনের সময়ই চতুর্ব্বর্গের শত্রু ক্রোধ উপস্থিত হয়, একারণ কোন বিষয়ে বা কোন কারণে রাগ উপস্থিত হইলে, দক্ষিণ নাসিকা

---

* বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি পুরুষ যিনি বাগ্‌দী রাজা নামে বিখ্যাত, তিনি বিষ্ণুপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিয়া গোচারণ করিতেন। এক দিন রাজোচিত কোন শুভ ঘটনা দৃষ্টে ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বালক সামান্য নয়, ভবিষ্যতে রাজা হইবেন। সেই দিনই নিজ স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল বালককে কোন প্রকার উচ্ছিষ্ট খাইতে দিও না এবং এই বালকের উপর কোন রূপ অসদ্ব্যবহারাদি করিও না, আর ঐ বালককে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ স্বরজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বারণ করিয়াছিলেন। কারণ, সুষুম্নার বহন সময় শুভক্ষণ, লগ্ন নষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে রাজসিংহাসন প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবে। সত্যই, ঐ বাগ্‌দী নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় বালক বিষ্ণুপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া টীকাধারী রাজা হইয়াছিলেন এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠিতা।

বন্ধ করিয়া, বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করিবে। তাহা হইলে খুন করিবার মত মহাক্রোধ উপস্থিত হইলেও অতি শীঘ্রই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, আর কোন অনর্থ ঘটিবে না।

(নিশ্বাস পরিবর্ত্তনের উপায়াদি পরে বলিব।)

যে পর্য্যন্ত বলা হইল, ইহাতে পাঠকগণ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অবস্থিতির স্থান, বহন ইত্যাদি বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। শারীরিক ও বৈষয়িক সমস্ত কার্য্য কোন নাড়ীর বহন সময় কি ভাবে করিলে, সকল কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহা পরে বলিব। এক্ষণ ঐ নাড়ী সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বলিতেছি।

ইড়া নাড়ীকে পিতৃযান ও পিঙ্গলা নাড়ীকে দেবযান বলে যথা—

ইড়া চ বাম নিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযান মিতিজ্ঞেয়া বামমাশ্রিতা তিষ্ঠতি।'

যে নাড়ী দ্বারায় বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ইড়া। ইহাকে পিতৃযান কহে।

যে যোগী ইড়া নাড়ীতে সাধনা করেন, তিনি জীবনান্তে পিতৃলোক পথে গমনকরিয়া চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পিঙ্গলা নাড়ীকে পিতৃযান কহে। যথা—

দক্ষিণ পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্যমণ্ডলগোচরা।
দেবযান মিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী।

যে নাড়ী দ্বারায় দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম পিঙ্গলা। ইহা সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তেজোময় এবং পুণ্য কর্ম্মানুসারিণী। ইহাকে দেবযান কহে।

যে সাধক পিঙ্গলা নাড়ীতে সাধনা করেন, তিনি দেবলোক পথে ক্রমে ক্রমে যাইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পিঙ্গলা সাধকের বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তজীবের আবার মর্ত্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, ব্রহ্মলোকও অনিত্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য, সুতরাং তত্তৎ লোকগত জীবের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

গীতা বাক্যেও ব্রহ্মলোক অনিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কোন হঠাৎযোগী গীতার অনুবাদে ওস্তাদি করিয়া বলিয়াছেন যে—'পিঙ্গলা সাধনকারী ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকের আর পুনরার্ত্তন হয় না ইত্যাদি।" ঘরে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু পড়িয়া আপনাপনি জ্ঞানী যোগী সাজিলে উহার অধিক তত্ত্ব জানিবার ও জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই।

যাহাহউক, যোগিগণ কঠোরজঠর-যন্ত্রণাভয়ে পিঙ্গলা সাধন ও ব্রহ্মলোক কমনা করেন না। তাঁহারা সুষুম্নার সাধন করিয়া থাকেন। কারণ—

মুক্তিমার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী।
(যোগ স্বরোদয়)

সুষুম্নাই মুক্তির মার্গ স্বরূপ। যে ব্যক্তি

পূর্ব্ব-সুকৃতি বলে উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া সুষুম্নার সাধন শিখিয়াছেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ সুষুম্না সাধনকারী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষঃ" সুষুম্না যে মোক্ষ-দায়িনী ইত্যাদি যোগ-স্বরোদয়ে অনেক বার উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুক্তি মার্গে সুষুম্না নাড়ী। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি মুক্তির সোপান বলিয়া যে সকল শাস্ত্র-বাক্য আছে, তাহা প্রবৃত্তি ও ভক্তি-উদ্দীপক মাত্র। নিষ্কর্মী হইলে মুক্তি হয় বটে; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নিষ্কামী ও নির্ম্মম কেহ আছে কি? জটাধারী সন্ন্যাসী সুদূর নির্জ্জনবনে বসিয়া আছেন, তিনি কি মুক্তির উপযোগী-কামনা ও মায়া শূন্য হইয়াছেন? কখনই না। যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিকদেহে জীবাত্মা বাস করিবেন, ততক্ষণ জীব-কামনা ও মায়া শূন্য হইতেই পারে না এবং কাম, ক্রোধাদি বৃত্তিনিচয় কখনই ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং সুষুম্না সাধন ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। এই সুষুম্না ও শম্ভুরূপাচ, শম্ভুর্হংসঃ স্বরূপক। হংসের পরিচয় অগ্রে বলিয়াছি।

সুষুম্না সম্বন্ধে যাহা ইঙ্গিত করিলাম, এ রসের রসজ্ঞ (যোগী ও স্বরসাধক) পাঠক বুঝিয়া লইবেন। যাঁহারা ঐ রসে বঞ্চিত, তাঁহারা স্বরজ্ঞ—যোগী গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। ফলকথা, পূর্ব্ব সুকৃতি বলে প্রাণের ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা হইলে, গুরুর কৃপায় উপযুক্তগুরু আপনিই ধরা দেন। ভক্তির প্রকৃত গুরু লাভ হয় না। অতএব প্রাণের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা চাই।

সুষুম্নাকে জ্ঞানজননী নাড়ী কহে।

সুষুম্না বাক্যের ঈশ্বরী, এজন্য সুষুম্নার নাম বাগীশ্বরী এবং জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কথা কহিতে পারে না, তাহার কারণ, সুষুম্নার বিকাশাভাব। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে সুষুম্না হইতে শ্লেষ্মা অপসারিত হয়, আর সেই সঙ্গে সুষুম্নার ক্রমবিকাশ হইয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

নাড়ী সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত প্রকাশ যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণ দশ বায়ুর রূপ বলিব।

দশ বায়ুর রূপ।

১। প্রাণ,—"ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং
প্রাণ রূপং প্রকীর্ত্তিতং।"

প্রাণ বায়ুর রূপ পদ্মরাগমণি নামক বিখ্যাত মণির বর্ণ ও জ্যোতির ন্যায়। পদ্মরাগমণির বর্ণ ইন্দ্রনীল সদৃশ। বিশ্বসারে উক্ত আছে, "প্রাণ আদৌ হৃদিস্থানে পদ্মরাগ-সমদ্যুতিঃ।"

২। অপান—ইন্দ্রগোপ প্রতীকাশঃ (১)
সন্ধ্যা-জলদ—সন্নিভঃ।

অপান বায়ু কাপাসিয়া পোকার ন্যায় রক্ত বর্ণ, কিম্বা সূর্য্যাস্ত হইবার সময় সন্ধ্যা

(১) ইন্দ্রগোপো—রক্ত বর্ণ কীট বিশেষঃ। কাপাসিয়া পোকা ইতি ভাষা।

বর্ষাকালে কাপাসিয়া পোকা অধিক দৃষ্ট হয় এবং রক্তবর্ণ কাপাসিয়া পোকা একস্থানে অনেক গুলি একত্রিত থাকে, পল্লীবাসী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ধান্যের গাছের ভক্ষ্য করিতে অভিলাষী থাব-সহরে বাবুর অদৃষ্টক্রমে অদৃষ্ট ও জ্ঞানাতীত।

কালে পশ্চিম আকাশে যে রক্তবর্ণ মেঘ দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট।

৩। সমান—গোক্ষীর সদৃশাকারঃ সর্ব্ব-দেহে ব্যবস্থিতঃ।

সমান নামক বায়ু গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলাকার।

৪। উদান—উদানো নাম মারুতঃ বিদ্যুৎ পাবক-বর্ণঃ স্যাৎ।

উদান বায়ুর রূপ বিদ্যুদগ্নি সদৃশ।

৫। ব্যান—মহারজত সঙ্কাশঃ (২) সর্ব্বব্যাধি প্রকোপনঃ।

ব্যান বায়ুর রূপ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বব্যাধি প্রকোপক।

৬। নাগ—উদগারে নাগ ইত্যুক্তো নীলজীমূত সন্নিভঃ।

নাগ বায়ুর রূপ নীলমেঘের ন্যায়।

৭। কূর্ম্ম—উন্মীলনে স্থিতঃ কূর্ম্মো ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভঃ।

কূর্ম্ম নামক বায়ুর রূপ গাঢ় কজ্জলের সদৃশ।

৮। কৃকর—ক্ষুৎকর শৈচব জবাকুসুম-সন্নিভঃ।

কৃকর নামক বায়ুর রূপ জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। এবং ইহার কার্য্য ক্ষবথু (হাঁচি)

৯। দেবদত্ত—বিজৃম্ভণে দেবদত্তঃ শুদ্ধ-স্ফটিকসন্নিভঃ।

দেবদত্ত বায়ুর রূপ বিশুদ্ধস্ফটিকের বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনুষ্যের মুখে যে হাই উঠে, তাহাই এই বায়ুর কার্য্য।

১০। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয় স্তথা ঘোষে মহারজত-বর্ণকঃ।

ধনঞ্জয় নামক বায়ুর রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ সদৃশ। (৩)

এই দশ বায়ু মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবশরীরে রহিয়াছে। আর প্রথমোক্ত পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব জীব-দেহের ন্যায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থে বিদ্যমান আছে। অধিক কি, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব রহিয়াছে। যথা—

"ককারস্যোর্দ্ধকোণেষু প্রাণবায়ুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

অপানো বামভাগেচ সংস্থিতশ্চ সদা প্রিয়ে।

সমানো দক্ষিণে কোণে শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভঃ।

উদানস্ত্বঙ্কুশাকারে মাত্রায়াং ব্যান এব চ॥"

ককারের ঊর্দ্ধ কোণে প্রাণ বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিত। বামভাগে আপন বায়ু ও দক্ষিণ কোণে শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ সমান বায়ু এবং অঙ্কুশে উদান বায়ু, আর ব্যান বায়ু মাত্রাতে অবস্থিত।

প্রকার স্বর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। ইহাতে অনেকের মনে তর্ক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, আবশ্যক সময়ে ব্যান কি ধনঞ্জয় বায়ু নির্দ্দিষ্ট করিবার উপায় কি? কিন্তু এখনকার প্রচলিত ধরণে পুঁথিগত বিদ্যা কিম্বা বিনা গুরূপদেশে স্বয়ং যোগী হইলে উপায় নাই। এই স্বরোদয় শাস্ত্র ও যোগাদি যোগীগুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। গুরু মুখে শিক্ষা হইলে, শরীরের স্থান ও কার্য্য বিশেষে এক বর্ণ বিশিষ্ট ঐ দুই বায়ুর পার্থক্য বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন মুদ্রিত শাস্ত্র পড়িয়া কি স্বয়ং হঠযোগী সাজিলে বুঝিবার উপায় নাই।

দশ বায়ুর কার্য্য ও অবস্থিতির স্থান চিকিৎসা প্রকরণে বলিব।

(২) মহারজতং—কাঞ্চনং।

(৩) ধনঞ্জয় ও ব্যান বায়ুর রূপ একই

পাঠকগণের অবগতির জন্য কেবল 'ক' অক্ষরের পঞ্চ বায়ু বলিলাম। প্রত্যেক অক্ষরে এইরূপ পঞ্চবায়ু ও পঞ্চতত্ত্ব আছে। তদ্বিস্তারিত বিষয় বর্ণোদ্ধার তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে আছে; কিন্তু ইহার গুঢ়রহস্য তত্ত্বজ্ঞ যোগীর নিকট জানিতে হয়।

উপরে দশ বায়ুর রূপ বলিয়াছি; কিন্তু সকলেই জানেন বায়ুর কোন রূপ নাই। এখন বিজ্ঞান বলে কত কি আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু বায়ুর রূপজ্ঞান কিম্বা রূপদর্শন বর্ত্তমানবিজ্ঞানবিদগণের জ্ঞানাতীত। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দশ বায়ুর রূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যদি কোন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলেন যে, উহা ঋষিগণের কল্পনা প্রসূত; উহার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একথা কেমন করিয়া বলিব?

মনুষ্য শরীরে কোন চর্ম্মরোগ হইলে, চিকিৎসকগণ রক্ত বিকৃতি কারণ বলিয়া তৈল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং বহুদিন তৈলমর্দ্দন ও ঔষধ ব্যবহার করাইয়া থাকেন। তাহার ফল নিঃসন্দেহ ভাবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ, হয় তো কিছু দিন রোগ অদৃশ্য হইয়া চাপা থাকে। কিন্তু স্বরজ্ঞ যোগিগণ বায়ুর রূপানুসারে রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং যে বায়ুর রং বিকৃত হইয়া কিম্বা যে বায়ুর স্বল্পাধিক্য বশতঃ পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন এবং রোগ সমূলে নির্ম্মূল হয়। ডাক্তার ও কবিরাজগণ যে সমস্ত পীড়ার কারণ বায়ু কি রক্তের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ঐ সকল এবং অন্যান্য বাতজ, রক্তজ পীড়ায় যোগিগণ দশ বায়ুর রূপ ও পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের রূপ ও গুণানুসারে আশ্চর্য্য উপায় দ্বারা অতি সহজে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন। তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুতরাং কিরূপে বলিব যে, বায়ুর রূপ কল্পনা প্রসূত। প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যাস করিলে, দশ বায়ুর ও পঞ্চতত্ত্বের রূপ যখন প্রত্যক্ষ করাবায়; তখন কোন্ সাহসে বলিব যে উহা কল্পনা মাত্র। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাত্মগণ সংসারের সুখ ও ভোগৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল গহনবনে ও সুদূর হিমালয়ের হিম-গহ্বরে অবস্থিতি করিতেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্‌ভক্ত ঋষিগণ আমাদের জন্য শাস্ত্রে কল্পনাবলে মিথ্যা-কথা বলিয়া গিয়াছেন কি? এখন পাশ্চত্য দেশে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ক্রমোপ্যাথি প্রভৃতি কত রকম বিরকম চিকিৎসা তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের বনবাসী ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য কোন দেশবাসী সভ্যগণ অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, বায়ুর রূপ জানিতে পারিলে চর্ম্ম পীড়া (Skin deases) ও চক্ষু পীড়া অতি সহজে আরোগ্য করা যায় *। আজ কাল ইউরোপ

* দুঃখের বিষয় বায়ুর রূপ ও পীড়ার কারণ নির্ণয় ইত্যাদি শিক্ষা ও সাধ্যায়ত্ত হইলেও চিকিৎসা বিবরটী সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। পারি নাই সাধ্যাতীত বলিয়া নহে। পরমারাধ্য জনক জননীর অপার্থিব স্নেহ মমতা অন্তরায়ায়

প্রদেশে কোন একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে আমরা বাহবা বলি, আর সেই দিকে দৌড়িয়া মরি! আমাদের ঘরে কি আছে, তাহা দেখি না; দেখিতে বুঝিতে চেষ্টাও করি না। ইংলণ্ডের অস্তিত্ব প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতবাসী কর্ত্তৃক গ্যাসালোক বিদিত ছিল এবং গ্যাসের নাম 'পুরীষ্য অগ্নি' বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যের 'চলাপৃথ্বী স্থিরাভাতি' ইত্যাদি ভারতবাসীর অবিদিত ছিল না। অধুনা ইহা কয়জনে জ্ঞাত আছেন? ভারতে না ছিল কি? জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, শিল্পাদি যাহা ছিল, তাহার তুলনায় পৃথিবীর কোন দেশ অদ্যাপি সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু হায়! বিজাতীয় শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, চাল চলন অশন, বসন সবই বিকৃত, আর্য্য-তেজ, কার্য্য বল, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম, ভক্তি, শাস্ত্র, অনুষ্ঠান সকলি বিদূরিত। আমাদের ঘরে কি আছে দেখিনা, নিজস্ব মহার্ঘ জিনিষের মূল্য জানি না—গৌরব বুঝি না; দেবোপম পূর্ব্ব পুরুষগণের অলৌকিক ক্ষমতা জানি না, তাঁহাদের বিধি নিষেধ মানি না। কি পরিতাপ! জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনন্তভাণ্ডার সর্ব্বদেশের শীর্ষস্থানীয় ভারতবর্ষ এখন বিদেশী বিজাতি বিধর্ম্মী কেহ কচিৎ হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্রের এক আধ টুক চুটকী ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা শুনিয়া আমরা মোহিত স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আমরা কশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণের গোত্রোৎপন্ন। শাস্ত্র অশ্রদ্ধা করিয়া শাস্ত্র বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া শারীরিক মানসিক বল, ধর্ম্ম হারাইয়া ক্রমে কিম্ভূত কিমাকার ঘৃণিত জীব হইতেছি এবং সর্ব্বজাতি অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় হইতেছি। একি কম বিড়ম্বনা! আহা! কালের গতি অতি কুটিল, ঘাট অঘাট ও অঘাট ঘাট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কি ছিল কি হলো, আরো বা বা কি হয়! ভারতবাসিগণ! আগে ঘর রক্ষা কর, পরে বাহিরে চেষ্টা কর। আর্য্য শাস্ত্র বিশ্বাস কর, লুপ্ত প্রায় গুপ্তশাস্ত্রের উদ্ধার কর, ধর্ম্ম-বন্ধন দৃঢ় কর, ধর্ম্মে মতি রাখিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া শিথিল সমাজ, ছিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, অবনমিত জাতীয় আচার ব্যবহার প্রকৃতিস্থ কর, দেখিবে সর্ব্ব বিষয় ক্রমোন্নতি হইবে, হিন্দু বংশের গৌরব রক্ষা

দুঃখ-সন্তাপ-হারিণী জড়-জীবনের মহাশক্তি-স্বরূপিণী সদাসরলা সহধর্ম্মিণীর অপ্রতিম ভক্তি, ভালবাসা, আত্মিক অংশ মায়ার-পূর্ণ বিকাশ প্রাণাধিকা কন্যার মায়া ভুলিয়া, সংসারের প্রচুর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য-পথে চির-দিন বিচরণ করিব আশা ছিল। সুতরাং ঐ বিদ্যার আলোচনা করিবার প্রয়োজন ততোধিক মনে করি নাই, সংসারে পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু হায়! মনুষ্যের সব ইচ্ছা কবে পূর্ণ হয়? আর যাহা কখন চিন্তা করি নাই, কল্পনায় আইসে নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই হইয়াছে। সম্মুখে বসিয়া জীবনের সর্ব্বস্ব শ্মশানে বিসর্জ্জন দিব বলিয়াছি, বিধাতা বুঝি আবার সংসারের প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন। এখন ভাবিতেছি, তখন যদি যত্ন পূর্ব্বক উহা শিখিতাম, তবে অনেক কার্য্যে লাগিত। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। যৎটুকু দেখা শুনা আছে, তাহা চিকিৎসা প্রকরণে বলিবার ইচ্ছা আছে।

হইবে, হিন্দু নামের মহিমা পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।

পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এক ঘণ্টা করিয়া এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন হয়; কিন্তু সেই ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় যথাক্রমে হয়। যথা—

এক নাসিকায় এক ঘণ্টা শ্বাস বহন সময় প্রথমে পৃথিবীতত্ত্ব ৫০ পল ইংরাজী ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত থাকে; পরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল, ইং ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল, ইং ১২ মিনিট থাকে। পরে বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, ইং ৮ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্ব শেষে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল, ইং ৪ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ পলে ২॥০ দণ্ড ইং এক ঘণ্টা পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উদয়ে ঐ নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিয়া এক নাসিকায় শ্বাস বহন একঘণ্টা পূর্ণ হয়।

যখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই নাসিকায় ঐরূপ পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত এক এক তত্ত্বের স্থিতি হয়।

এই তত্ত্ব বিচার করিয়া নিশ্বাসের অনুকূলে কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই সুফল হয়। পরন্তু সাংসারিক বৈষয়িক কোন কার্য্য বিফল হইল বলিয়া হতাশাস চিত্তে দুঃখ প্রকাশ করিতে হয় না।

তত্ত্ববিচার করিয়া কার্য্য করার গুণে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ও পাণ্ডবকুল-ধুরন্ধর অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বিপরীত তত্ত্বে যাত্রা করিয়া কৌরবগণ বিহত হইয়াছিলেন।

তত্ত্বে রামো জয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবা নিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ব বিপর্য্যয়ে॥

দেখিলেন! স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র ও বিষ্ণু-সখা অর্জ্জুন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কৌরবগণ অমিত তেজা কর্ণের বীরত্বের উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া মহা অহঙ্কারে অন্ধ বশতঃ তত্ত্ব বিচার করেন নাই, সেজন্য ভীষ্ম-প্রমুখ বীরপুঞ্জ সহায়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বিঘ্ন সঙ্কুল সংসারে তত্ত্ব বিচার করিয়া স্বরানুকূলে কার্য্য না করিলে হতাশাস হইব বৈচিত্র্য কি?

কোন্ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়, কোন্ তত্ত্বের উদয় কালে কিরূপে কার্য্য করিলে, সমস্ত কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় এবং তত্ত্ব চিনিবার যে সহজ উপায়াদি, তাহা বারান্তরে বলিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয় ফল পাইবেন, কোন কার্য্যে আশা-ভঙ্গ, মনস্তাপ জনিত হা হুতাশ করিতে হইবে না। আরও দেখিবেন যে, দয়াময় মহেশ্বর মোকদ্দমায় জয়লাভ, ক্রুদ্ধ প্রভুকে সন্তোষ ও দুষ্ট শত্রু ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার জন্য—মন্ত্র ও ঔষধ ব্যতীত কেমন সহজে বশীকরণ, এবং সাংসারিক বৈষয়িক সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। যদি চিরপূজ্য হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্য মিথ্যা না হয় এবং পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাস

স্থান পায়, তাহা হইলে পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণের নাম স্মরণ করিয়া উন্নত কণ্ঠে বলিতেছি প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন নিশ্চয়! নিশ্চয়!!

প্রসঙ্গাধীন বলিতে হইতেছে যে, স্বর-জ্ঞানের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত মহাত্মা উৎসুক চিত্তে আমার পূর্ব্ব পরিচয় ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর আমার পূর্ব্বাপর পরিচয় এবং সাংসারিক অবস্থা—যে অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি—শুনিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তির হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই বলি, যে হতভাগা কিঞ্চিৎ ন্যূন পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা মাতা, ভগ্নী ও কন্যা, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি—জীবনের সর্ব্বস্ব শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া উদাসমনে, আকুল হৃদয়ে, আশা আকাঙ্ক্ষা শূন্য প্রাণে লক্ষ্য হারা ধূমকেতুর ন্যায় বেড়াইতেছে; তাহার আবার পরিচয় কি? বর্ত্তমান বয়ক্রম অতিপ্রৌঢ় অতিক্রম করিবার উপক্রম—এখন কন্যা ক্ষীরোদবাসিনী, জামাতা অমরনাথ তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধায় অন্ন দিবার স্থল এবং অন্ধের নড়ি সম্বল। ইহার পর যাহা হইবে, তাহা ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গভীর-গহ্বরে গাঢ়-প্রোথিত।

স্বর সম্বন্ধে কাহারও কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে, কিম্বা কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান শিক্ষা যাহা আছে, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।
বাবু অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
যশোহর।

বস্ত্র ও সভ্যতা।

প্রত্যেক সমাজেই বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার, আহার বিহার ইত্যাদিতে কতকগুলি আদর্শ থাকে এবং যে কার্য্যগুলি সেই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত না হয়, সেই কার্য্যগুলিকে আমরা সাধারণতঃ অসভ্য আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। সমাজ বিশেষে এই আদর্শ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন সমাজে যে কার্য্য সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্য সমাজে তাহা হয় ত নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদয় সমাজে বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সমুদয় সমাজে যদি কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া থাকে, অথচ সে উন্মাদ নয় কিংবা নিতান্ত শিশুও নয়, তাহা হইলে তাহাকে অসভ্য বলা হইয়া থাকে। আবার যে সমুদয় দেশে বস্ত্র পরিধান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সমাজ বিশেষে কোথায়ও বা সমুদয় অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়, কোথায়ও বা কেবল মাত্র অধমাঙ্গ আবৃত করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কেহ নাভির ঊর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখিলে

আমরা তাঁহাকে অসভ্য বলি না। কিন্তু ইউরোপ বাসীদিগের নিকট উহা ভয়ানক অসভ্যতা। এই জন্ত আমাদের দেশের ভদ্র লোকেরা সাহেব দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, সমস্ত দেহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া যান। একজন অতি অনক্ষর ইংরাজও কখনও তাহার দেহ অনাবৃত রাখিবে না। কিন্তু আমাদের দেশের বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-বিশারদ মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতগণও তাঁহাদের দেহের ঊর্দ্ধদেশ অনাবৃত রাখিতে কিছু মাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। আবার যাঁহারা গার্হস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তম ও অধম উভয় অঙ্গই অনাবৃত রাখেন এবং আমাদের সমাজের চক্ষে তাঁহাদিগের ঈদৃশ ব্যবহার অসভ্য বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। উলঙ্গ তৈলঙ্গ স্বামীকে যুবতী স্ত্রী লোকেরাও অসঙ্কুচিতচিত্তে যাইয়া প্রণাম করিত। এবং উহা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনেরা কিংবা সমাজ কিছু মাত্র দূষ্য বিবেচনা করিত না। এক দিকে মিশমি, নাগা, কুকি, খন্দ উলঙ্গ, আর এক দিকে তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী উলঙ্গ। ইংলণ্ডে কার্ডিন্যাল নিউম্যান ভাস্করানন্দের ন্তায় যদি দিগম্বর-বেশ ধারণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উন্মাদ—আগারে রাখা হইত। ভাস্করানন্দ কিন্তু মিশমি নাগাও ছিলেন না কিংবা উন্মাদও ছিলেন না। যে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এদেশে আসিতেন, তিনি কাশী না গিয়া থাকিতেন না; এবং কাশীতে গিয়া ভাস্করানন্দকে দর্শন করাই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য হইত। ভূতপূর্ব্ব ভারত সেনা-পতি লকহার্ট প্রভৃতি উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ ভাস্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করা অতীব শ্লাঘাজনক বিবেচনা করিতেন। বস্ত্রাবৃত ইংরাজ অনাবৃত হিন্দু সন্ন্যাসীকে মিশমি নাগার ন্তায় অসভ্য বিবেচনা করিতেন না। সুতরাং সভ্যতাসভ্যতার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, কেবল বস্ত্র ব্যবহার রীতি পর্য্যালোচনা করিলে, ভাস্করানন্দ মিশমি বা নাগার ন্তায় অসভ্য হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহাকে কিছুতেই অসভ্য বলা যায় না।

যখন মানব বস্ত্রধারণ প্রণালী জানিত না, তখন বৃক্ষবল্কল বা পশুচর্ম্ম দ্বারা দেহকে শীতাদি হইতে রক্ষা করিত, এবং ক্রমে বস্ত্রধারণ প্রণালী প্রথা অবগত হইয়া নানা-বিধ বস্ত্রের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। শরীর রক্ষার্থই বোধ হয় বস্ত্রাদি প্রথম ব্যবহৃত হয়। লজ্জা নিবারণ ও শরীরের সৌন্দর্য্য বিধান হেতু ও ক্রমে বস্ত্র ব্যবহৃত হইতে থাকে। শীত প্রধান দেশ সমূহে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহ অপেক্ষা বস্ত্র ব্যবহারের আধিক্য দৃষ্ট হয় এবং বহুকালের সংস্কার ও অভ্যাস হেতু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকিলেও শীত প্রধান দেশের লোকেরা তাহাদের দেশোচিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা কোন সমা-জের সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্ব্বাচিত করা যায় না। আজ যদি সমস্ত মিশমি জাতিকে ইংরাজদিগের ন্তায় কোট প্যাণ্টলান্ পরি-ধান করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা কি ইংরাজ জাতি অপেক্ষা

অধিক সুসভ্য হইয়া পড়িবে? আমরা যদি ইংরাজ দিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞানাদিতে নিকৃষ্ট হই, তাহা হইলে কি কোট প্যাণ্টালুন পরিধান করিলেই সভ্যতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব, কিম্বা ঐ সব বিষয়ে আমরা যদি তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হই, তাহা হইলে আমাদের দেহ অনাবৃত থাকে বলিয়াই কি আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িব? প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বস্ত্র দ্বারা কাহারও সভ্যতা বা অসভ্যতা নির্দ্ধারিত হইত না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মানুষের গুণ দেখিয়া সভ্য বা অসভ্য আখ্যা দিতেন, বস্ত্র দেখিয়া না। অধুনা বস্ত্রই হিন্দু সমাজের মানদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অতিকষ্টে চটি জুতা ও মোটা চাদর দিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর চলে না। কোট প্যাণ্টালুন না হইলে নানাবিধ ভাবে বিড়ম্বিত না হইয়া কাহারও পক্ষে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আদালতের চাপড়াশি, কনেষ্টবল, রেলওয়ের গার্ড বা দ্বারবাণের নিকট কত ভদ্রলোকের যে কত অপমানিত হইতে হয়, তাহা বলা যায় না। হিন্দু সমাজে বেশ বিন্যাসের এক মহাতরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং সকল শ্রেণীর হিন্দু নর নারী তাহাতে হাবুডুবু খাইতেছেন। কত রকম কোট, কামিজ, বডি কত কি যে হইতেছে, তাহার নামও মনে থাকে না। দেশের ধনবানেরা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতেছেন, এবং দরিদ্রেরা তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। নিত্য নূতন ফ্যাসিয়ান আসিয়া সমগ্রদেশকে সভ্যতার দিকে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ নিতান্ত দরিদ্র। আমরা বস্ত্রাদি সম্বন্ধে কখন ইংরাজদিগের সমকক্ষত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা ইংরাজদিগের সংসর্গে পড়িয়া তাহাদের মত চাল চলন করিতেছি, অথচ রীতি নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। ধুতি চাদরও রাখিতে হয়, হ্যাট কোট ও রাখিতে হয় ফরাশও রাখিতে হয়। আমরা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে আমাদের ইংরাজদিগের বিলাসিতা সাজে না।

বঙ্গভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত-ভাষার অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই ইহাদিগের বর্ণমালা। প্রত্যেক বর্ণই শব্দ-বিশেষের পরিচায়ক। ক, খ ইত্যাদির ন্যায় একটি একটি শব্দ প্রকাশ করিবার জন্য একাধিক বর্ণের প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় মূর্দ্ধণ্যণ ও দন্ত্যন একইভাবে অর্থাৎ উভয় বর্ণই দন্ত্যন এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। একই ভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়াই; মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য এই দুই বিশেষণের দ্বারা উহাদের পার্থক্য সূচিত হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীরা যেরূপ র, ড় ও ঢ় এর পার্থক্য শব্দদ্বারা সূচিতকরিতে অশক্ত হইয়া বএশুন্য র, ডএশূন্য র ও ঢ এ শুন্য র, বলিয়া সূচিত করেন, সমগ্র বঙ্গদেশে সেইরূপ মূর্দ্ধণ্যণ ও

দন্ত্যান ন, বর্গীয় ব ও জ, অন্তস্থ ব ও য, তালব্য শ মূর্দ্ধণ্য ষ, ও দন্ত্য স এর পার্থক্য শব্দদ্বারা সূচিত না করিয়া উৎপত্তিস্থান উল্লেখ করিয়া সূচিত করেন। এক বঙ্গদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষেই এই সমুদায় বর্ণ পৃথক শব্দ দ্বারা উচ্চারিত হয়। বঙ্গদেশ-বাসী সংস্কৃতভাষা উচ্চারণ করিতে ও ঐ সমুদায় বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করেন না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বঙ্গদেশে শ, স ও ষ এই তিন বর্ণই শ এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। দন্ত্য স এর উচ্চারণ S এর ন্যায়, তালব্য শ এর Sh এর ন্যায় এবং ষ এর hh এর ন্যায়। স এর প্রকৃত-উচ্চারণ সৃষ্টি, স্রাব, স্নান ইত্যাদি স্থলে পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বর্ণই যদি এক তালব্য শ এর ন্যায় উচ্চারিত হইল, তাহা হইলে তিনটি বর্ণের প্রয়োজন কোথায়। ঐরূপ বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব এই দুই বর্ণই বর্গীয় ব এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। বর্গীয় ব এর উচ্চারণ ইংরাজি b এর ন্যায় এবং অন্তস্থ ব এর ইংরাজি v এর ন্যায়, ভ এর উচ্চারণ ইংরাজি v এর ন্যায় নহে bh এর ন্যায়। অন্তস্থ ব যখন অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহার উচ্চারণ ইংরাজি W এর ন্যায়। বাঙ্গালা ভাষায় য ফলা ও ব ফলা একই প্রকারে উচ্চারিত হয়। য ও ব যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তাহার দ্বিত্ব করা হয় মাত্র। অর্থাৎ ক্ক ও ক্ব ক্যএর উচ্চা-রণের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না, তিন স্থানেই ক্ক এর ন্যায় উচ্চারণ করা হয়। সেকালের গুরু মহাশয়েরা পড়াইতেন ক, ক, ক্য ক্ ই র ক্ক ক উ অ, আজ'কালের নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষিত-পণ্ডিত মহাশয়েরা পড়ান ক্ক, ক্য, ক ক্ক। য ও য় এর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের উচ্চারণই হয়। বাঙ্গালা ভাষায় "য" কে দুই ভাগে বিভক্ত-করা হইয়াছে। যথা-য ও য়। য় স্থলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ রাখা হইয়াছে, কিন্তু য এর স্থলে উচ্চারণ উহাকে জ এর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাদব, যোগেন্দ্র প্রভৃতি উচ্চারণ করিবার সময় আমরা 'জ' এর উচ্চারণই করি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, উহারা ইয়াদব, ইয়োগেন্দ্র এইরূপ উল্লেখিত হয়। জ, য প্রভৃতির উচ্চারণগত প্রভেদ না থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় এখনও তাহাদের আকারগত প্রভেদ আছে; কিন্তু বর্গীয় ব অন্তস্থ ব এর আকারগত প্রভেদ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেই বাঙ্গলা ভাষায় এই দুই বর্ণের আকারগত ও উচ্চারণগত দুই প্রভেদই ছিল। সেকালের গুরুমহাশয়েরা বর্ণমালা পড়াইবার সময় পেট-কাটা ব বলিয়া বর্গীয় বয়ের পরিচয় দিতেন ও অক্ষরের মধ্যস্থলে একটী সরল রেখা অঙ্কিত করাইতেন। প্রাচীন পুঁথিতেও বর্গীয় "ব" এর এরূপ আকার দৃষ্ট হয়। অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ চাই একাকীই উচ্চারিত হউক, চাই অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হউক, উহার উচ্চারণ পূর্ব্বে বঙ্গ-ভাষায় উক্ত হইত। স্বামী (সোয়ামি) দ্বারিকা (দোয়ারিকা) দ্বার (দোয়ার) ইত্যাদি উচ্চরণ এখনও শুনা যায়। ন, ণ এর উচ্চারণ লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। আমরা এই উভয় বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ করি, তাহাতে ন এর উচ্চারণ হইয়া থাকে, ণ এর উচ্চারণ

কথকটা ড় য়ে ৺ সংযুক্ত করিলে যেরূপ হয়, সেই প্রকার। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তাহা না শুনিলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ বুঝা কঠিন। বিসর্গের উচ্চারণ বাঙ্গালাভাষায় আদৌ করা হয় না। তবে ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু বাঙ্গালাভাষায় পদান্ত বিসর্গের ব্যবহার বিরল। ক্ষ এর উচ্চারণও বঙ্গ ভাষায় আদৌ হয় না। উহার উচ্চারণ খ এর সহিত ষ সংযুক্ত করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয়, সেইরূপ করা হইয়া থাকে। ম পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে, স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয়, এবং স্থলবিশেষে উচ্চারিত হয় না; যথা—জন্ম; বাল্মীকি প্রভৃতি স্থলে ম উচ্চারিত হয় এবং আত্মা, পদ্ম, রুক্মিণী প্রভৃতি স্থলে উচ্চারিত হয় না; কেবল যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, সেই বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় ম বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্বত্রই উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালাভাষায় ঋকারের আদৌ স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই, উহা রকারে ই বা ঈ যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিলে যেরূপ উচ্চারণ করা হয়, তাহাই করা হয়। ঋষি ও রিষ্ট, কৃত ও ক্রীত ইত্যাদির ঋ ও র এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ করা হয় না। বস্তুতঃ ঐ দুই বর্ণের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক। ণ এর উচ্চারণে ন্যায় ঋ এর উচ্চারণ লিখিয়া বুঝান কঠিন। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞ এর প্রকৃত উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণতঃ গ কে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় যুক্ত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণেরই স্বতন্ত্র উচ্চারণ হইয়া থাকে। বাঙ্গালাভাষার স্বরবর্ণের মধ্যে ই ঈ উ, ঊ ইত্যাদির উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ করা হয় না। যে বর্ণ যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত, তাহা না হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সাধারণতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি হয়। কোন্ স্থানে কোন্ স লাগিবে কোন্ ন লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ ব লাগিবে, কোন্ স্থানে কোন্ য লাগিবে, তাহা বালকদিগের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। যে বালকের বর্ণজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে অচল শব্দ লিখিতে বলিলে, তাহার কোন ভ্রম হইবে না, কেন না, অ, চ, ল এই তিন বর্ণই বিভিন্ন শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। কিন্তু মনে করুণ, এক বালককে বিস্মরণ লিখিতে বলা হইল। যে ভাবে আমরা বিস্মরণ উচ্চারণ করি, তাহাতে বালক যে কোন 'স' ও যে কোন "ন" লিখিতে পারে এবং ম ফলার পরিবর্ত্তে ব ফলা, য ফলা দিতে পারে, কিম্বা ঐরূপ কোন ফলা না দিয়া, যে কোন স দ্বিত্ব করিয়া লিখিতে পারে। কিন্তু ঐ কথাটি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্থলে যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহাতে কোনরূপ বর্ণাশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালী বালকের ঐ বর্ণাশুদ্ধি পরিহারের জন্য কোন্ ন, কোন স, ও সএ কোন ফলা, ইহা তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয় "কামিনী" কথাটি যেভাবে আমরা উচ্চারণ করি, তাহাতে লিখিবার সময় মএ এবং নএ যে কোন ইকার দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা এই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ প্রচলিত

থাকিলে, ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে কষ্ট পাইতে হয় না, এবং স্মৃতিশক্তিকেও অযথা কষ্ট দিতে হয় না।

সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন কালে উহার যথাযথ উচ্চারণ প্রবর্ত্তিত করা তত কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রদেশের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিলেই বর্ত্তমান দূষণীয় উচ্চারণ সংশোধিত হইতে পারে। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় স্কুল পরিদর্শনের সময় বালকদিগের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অত্যল্প সময়েই এ দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। স্কুল কলেজ ও টোলাদির সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় সার্কুলার জারি করিলে এ দেশের উচ্চারণ শীঘ্রই তিরোহিত হইতে পারে।

বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত করা নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু বিদ্যালয়াদিতে পড়িবার কালে বালকদিগকে প্রথম হইতেই প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষা দিলে কালে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্ত্তমান উচ্চারণ যে বিশুদ্ধ নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহা পরিবর্ত্তিত হওয়া যে উচিত, তাহা অস্মদ্দেশীয়-পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। অধুনা বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ উন্নতি ও প্রসার হইতেছে, তাহাতে ইহার উচ্চারণের এরূপ দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনার্থ সাহিত্য-সভা, সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি যে সমস্ত সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের এবং অস্মদ্দেশের সাহিত্য-সেবক ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার ভাষার উন্নতি সাধন করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা ভাষায় শ, ষ, স তিন বর্ণেরই উচ্চারণ শ এর ন্যায় হইলেও কোন কোন্ স্থলে শ এর উচ্চারণ স্থলে স এর উচ্চারণ প্রচলিত আছে, যথা.—শৃঙ্গ শ্রী শ্রবণ ইত্যাদি। অর্থাৎ ত, থ, ন, র, ঌকারের সহিত যুক্ত হইলে স এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়, অন্য স্থলে শ এর মত উচ্চারণ হয়; এবং ঌকারও র সংযুক্ত হইলে শএর উচ্চারণ স এর ন্যায় হয়।

বীর-রক্ষার্থ সদ্বৃত্তের-অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুংহাস্যং বা প্রবর্ত্তয়েৎ। ন নাসিকাং কুষ্ণীয়াৎ। ন নখান্ বাদয়েৎ। ন ভূমিং বিলিখেৎ। ন ছিন্দ্যাত্তৃণং। জ্যোতীংষ্যনিষ্টামেধ্যমশস্তঞ্চ নাভিবীক্ষেত। নচৈত্যধ্বজগুরুপূজ্যাশস্তচ্ছায়ামাক্রামেৎ। ন ক্ষপাস্বমরসদন চৈত্যচত্বর-চতুষ্পথোপবন শ্মশানায়তনান্যাসেবেত। নৈকঃ শূন্যগৃহং নচাটবীমনু-প্রবিশেৎ। ন পাপবৃত্তান্ স্ত্রী মিত্র ভৃত্যান্ ভজেৎ। নোত্তমৈর্বিরুধ্যাৎ। নাবরানুপাসীত। ন জিহ্মং রোচয়েৎ। নানার্য্যমাশ্রয়েৎ। ন সাহসাতিস্বপ্নপ্রজাগর-স্নান পানাশনান্যা-

সেবেত। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ। ন ব্যালানুপসর্পেৎ ন দংষ্ট্রিণো ন বিষাণিনঃ। পুরোবাতাতপাবশ্যায়াতিপ্রবাতান্ জহ্যাৎ। কলিংনারভেত। ন স্নানশাট্যা স্পৃশেদুত্তমাঙ্গং। নাস্পৃষ্ট্বা রত্নাজ্যপূজ্য মঙ্গল সুমনসোঽভিনিষ্ক্রামেৎ। ন পূজ্য মঙ্গলান্যপসব্যং গচ্ছেৎনারত্নপাণির্ন়াতো নোপহতবাসা না জপিত্বা নাহুত্বা, দেবতাভ্যো গুরুভ্যঃ পিতৃভ্যোনা তিথিভ্যো নোপাশ্রিতেভ্যো নাপুণ্যগন্ধো ন মালী না প্রক্ষালিত পাণিপাদ বদনো নাশুদ্ধমুখো নোদঙ্মুখো ন বিমনা নপাত্রীমমেধ্যাসু নাদেশে নাকালে, নাকীর্ণে না দত্বাগ্রে হগ্নয়ে নাপ্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈর্ন মন্ত্রৈরনভিমন্ত্রিতং ন কুৎসিতং ন প্রতিকূলোপহিতমন্নমাদদীত। নাশেষভুক্ স্যাদন্যত্র দধিমধুলবণসক্তুসর্পিভ্যঃ। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত। ন সক্তূনেকাশ্নীয়াৎ নানৃজুঃ ক্ষুয়াৎ নাশ্নাৎ নশয়ীত। নবেগিতোঽন্যকার্য্যং কুর্য্যাৎ। ন বায়্বগ্নি সলিলসোমার্কদ্বিজ গুরু প্রতিমুখং নিষ্ঠীবিকা বচ্চোমূত্রাণ্যুৎসৃজেৎ। নপন্থানং অবমূত্রয়েৎ ন জনবতি নান্নকালে। ন জপ্য হোমাধ্যান বলি মঙ্গলক্রিয়াসু শ্লেষ্মসিঙ্ঘাণকং মুঞ্চেৎ। ন স্ত্রিয়মবজানীত নাতি বিশ্রম্ভয়েৎ নাতিগুহ্যমনুপ্রবেশয়েৎ নাধিকুর্য্যাৎ। ন রজস্বলাং নাতুরাং নামেধ্যাং নাপ্রশস্ত্যাং নাকামাং নান্যকামাং নান্যস্ত্রিয়ং, বনশ্মশানায়তন সলিলৌষধ দ্বিজগুরু সুরালয়েষুন সন্ধ্যয়ো র্ন নিষিদ্ধতিথিষু নাশুচির্না জগ্ধভেষজো নানুপস্থিত প্রহর্ষো নাভুক্তবান্ ন মূত্রোচ্চারপীড়িতোনশ্রম ব্যায়ামোপবাস ক্লমাভিহতো ব্যবায়ং গচ্ছেৎ। ন সতো ন গুরূন্ পরিবদেৎ। না শুচিরভিচার কর্ম্ম পূজাধ্যয়নমভিনির্বর্ত্তয়েৎ। ন বিদ্যুৎসু ন ভূমিকম্পে নোল্কাপাতে ন নষ্টচন্দ্রায়াং তিথৌ ন সন্ধ্যয়োর্ন মহোৎসবে না মুখাদ্গুরোর্নাতি মাত্রং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈঃ স্বরৈরধ্যয়নং কুর্য্যাৎ। নাতি সময়ংজহ্যাৎ ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ। ন নক্তং নাদেশে চরেৎ। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারাধ্যয়ন স্ত্রী স্বপ্নসেবী স্যাৎ। ন বাল বৃদ্ধ লুব্ধ মূর্খ ক্লিষ্ট ক্লীবৈঃ সহ সখ্যং কুর্য্যাৎ। ন মদ্য দ্যূত বেশ্যা প্রসঙ্গরুচিঃ স্যাৎ। নগুহ্যং বিবৃণুয়াৎ। নকঞ্চিদবজানীত। নাহং মানী স্যাৎ ন বৃদ্ধান্ নগুরূন্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ, ন চাতিব্রূয়াৎ। নাভৃতভৃত্যো নাবিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃ সুখী ন সর্ব্ববিশ্রম্ভী নসর্ব্বাভিশঙ্কী ন কার্য্যকালমতিপাতয়েৎ। নচাতিদীর্ঘ সূত্রীস্যাৎ নক্রোধহর্ষাবনুবিদধ্যাৎ ন শোকমনুবিশেৎ। ন সিদ্ধাবৌৎসুক্যং গচ্ছেৎ নাসিদ্ধৌদৈন্যং।

মুখ বন্দ করিয়া জৃম্ভা (হাই) ক্ষবথু (হাঁচি) ত্যাগ কিংবা হাস্য করিবে না, চরকে উক্ত আছে, "বায়ুর আধিক্য হইলে জৃম্ভা ও ক্ষবথু হয়।" সেই বায়ুকে নির্গমন করাই তাহার চিকিৎসা, সেই বায়ুকে নির্গমন হইতে না দিয়া যদি তাহার বেগরোধ করা যায়, তাহাহইলে, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শিরঃশূল, অর্দ্ধাবভেদক, (অর্দ্ধেক মাথা ধরা) কম্প, শরীরের শিথিলতা উৎপন্ন হয়। চরকে উক্ত আছে যথা—

মস্থাস্তম্ভশিরঃ শূলমর্দ্দিতার্দ্ধাভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃস্যাৎ
বিধারণাৎ।

যদি মুখ বন্দ করিয়া ক্ষবথু এবং জৃম্ভা, পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কুপিত বায়ু নিঃশেষ রূপে বহির্গত না হওয়ার দরুণ, কুপিত বায়ু জন্য শিরোরোগ প্রভৃতি ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্যই মুখ বন্দ করিয়া জৃম্ভাদি পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নি এবং গ্রহাদি দর্শন করিবে না। (শ্মশানাদি স্থানের যে অগ্নি, ধূমকেতু প্রভৃতিযে গ্রহ, তাহাকেই অপবিত্র অগ্নি ও অপবিত্র গ্রহ বলে।) জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অমঙ্গলজনক গ্রহাদির দর্শন নিষেধ আছে: ধূমকেতু উদয় হইলে জগতের অমঙ্গল উপস্থিত হয়। যে অমঙ্গলময় তাহার দর্শনে যে লোকের অমঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই মহাত্মা শূদ্রক কবি মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ধূমকেতুকে অমঙ্গলের কারণ বলিয়া উপমা দিয়াছেন যথা।

অঙ্গারকবিরুদ্ধস্য প্রক্ষীণস্য বৃহস্পতেঃ
গ্রহোঽয়মপরঃ পার্শ্বে ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ॥

মঙ্গল বিরোধী হইলে, বৃহস্পতি ক্ষীণবল হয়, তাহাতে পার্শ্বে আবার অপর ধূমকেতু উপস্থিত। ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণ অমঙ্গলজনক বলিয়াই ইহাদিগকে দর্শন করা নিষেধ। নাসিকা সংকোচ করিবে না।

চতুষ্পথস্থিত বৃক্ষ, গুরু এবং পূজ্যাদিগের ছায়া অতিক্রম করিবে না। রাত্রিতে দেব-মন্দির, উঠান, চতুষ্পথ, (চৌরাস্তা) উপবন ও শ্মশানে থাকিবে না, একাকী গৃহ মধ্যে থাকিবে না, এবং অরণ্যে গমন করিবে না। কারণ; একাকী গৃহে থাকিলে এবং একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিলে, যদি সহসা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা করা বড়ই কষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে নির্জ্জনগৃহে শয়ন করিয়া মুখচাপা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যারপর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সে সময় যদি কেহ নিকটবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে মুখচাপাগ্রস্ত-ব্যক্তি মৃত প্রায় হয় এই জন্যই একাকী নির্জ্জনগৃহে থাকা অনুচিত। পাপাসক্ত স্ত্রী, বন্ধু ভৃত্য পরিত্যাগ করিবে। সজ্জনের সহিত বিরোধ এবং নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে না। নীচ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিলে স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হয় না, বরং তৎসহবাসে সংসর্গজ দোষই হইয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন যখন, দেবাদিদেব মহাদেবের সন্তোষার্থ ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন, তখন দেববিরোধী মূকদানব অর্জ্জুনকে দেবতা মনে করিয়া শূকর বেশে নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মহাদেব এই বিবরণ অবগত হইয়া ব্যাধ রূপ ধারণ করতঃ ঐ বরাহের উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ও ঠিক সেই সময় বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, উভয় বাণে বরাহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, ব্যাধ-বেশধারী মহাদেবের চর ছদ্মবেশে বাণগ্রহণেচ্ছু, অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার প্রভু কর্ত্তৃক তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, নতুবা বরাহ কর্ত্তৃক আজ তোমার জীবন বিনাশ হইত; তোমার প্রত্যুপকার স্বীকার করা উচিত, প্রত্যুপকার স্বীকার করা

দূরে থাকুক ; তুমি আমার প্রভুর বাণ অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ।

আমার প্রভুকে সামান্য লোক বিবেচনা করিও না। ইনি এই অরণ্যের একমাত্র অধীশ্বর। যদি তোমার বাণের নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রভুর সহিত মিত্রতা করিয়া যাচ্‌ঞাকর, যদি তুমি পৃথিবী প্রার্থনাকর, তাহাও তোমাকে অম্লানচিত্তে সমর্পণ করিবেন। তখন অর্জ্জুন ছদ্মবেশধারী দূতের "মিত্রতা কর" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে দূতকে বলিলেন যে, হে ব্যাধদূত! তোমার প্রভুর ন্যায় লোকের সহিত আমার ন্যায় ব্যক্তির মিত্রতা সম্ভব হয় না, কেন না—

যদা বিগৃহ্নাতি হতং তদাযশঃ
করোতিমৈত্রী মথ দূষিতা গুণাঃ ॥
স্থিতিং সমীক্ষ্যোভয়থা পরীক্ষকঃ
করোত্যবজ্ঞোপহতংপৃথগ্ জনং ॥

নীচ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিলে যশ নষ্ট হয়, মিত্রতা করিলেও স্বকীয় সমস্ত সদ্‌গুণ দূষিত হয়, অতএব বিবেচক ব্যক্তি উভয় কার্য্যেই দোষ বিবেচনা করিয়া হীন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা কিম্বা বিরোধ করেন না ; এই হেতুই নীচলোকের সহিত মিত্রতা করা বিধেয় নয়। খলের সহিত মিত্রতা করিবে না এবং দুর্জ্জনকে আশ্রয় করিবেনা। অতি সাহস, অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি স্নান, অতি জলপান, অতি ভক্ষণ পরিত্যাগ বিধেয়। মোটের উপর সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং। বিপৎ-সঙ্কুলস্থানে অতিশয় সাহস পূর্ব্বক কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, জীবন পর্য্যন্ত নাশ হইতে পারে। অধিক নিদ্রাতুর হইলে অর্দ্ধাবভেদক ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হওয়ার বিশেষ সম্ভব। চরক এবং সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, অলস এবং নিদ্রা সুখরতব্যক্তিদের প্রমেহ হইয়া থাকে। অতিশয় জাগরণ করিলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া তজ্জন্য উন্মাদাদি রোগ হইতে পারে। অধিক জলপান এবং অধিক ভোজন করিলে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে।

অত্যম্বুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ
কালেপিসাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্তং
অন্নং ন পাকং ভজতে জনস্য ॥
অনাত্মবন্তঃ পশুবৎ ভুঞ্জতে যেহপ্রমাণতঃ
রোগাণীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তিহি ॥

অধিক জলপান, বিষমাশন, (দধি মৎস্য একত্র ভোজন এবং অনিয়ত সময়ে ভোজন) মল মূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এই অজীর্ণ উপস্থিত হইলে যথা সময়ে যদি লঘু আহারও করা যায়, তাহাও পরিপাক হয় না। যাহারা পশুর ন্যায় অপরিমাণ আহার করে, তাহাদের সমস্ত রোগের কারণ ভূত অজীর্ণ উপস্থিত হয়। অনেক সময় উর্দ্ধজানু হইয়া বসিবে না। মহিষ, হস্তি, সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর নিকট গমন করিবে না। অতি রৌদ্র, অতি হিম, অতি রৌদ্র, অতি বায়ু সেবা পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করিবেনা,

শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখাই স্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিধানবস্ত্রের দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করিলে; বস্ত্রে ময়লা মাথায় যাওয়ার সম্ভব, সেই জন্যই পরিধান বস্ত্র দ্বারা মস্তক, পরিষ্কার করা বিধেয় নয়। স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে রত্ন, ঘৃত, পূজ্য, মঙ্গল-জনকপুষ্প স্পর্শ করিয়া গমন করিবে, পূজ্যদিগকে এবং মঙ্গলকর দ্রব্যাদি বাম দিকে রাখিয়া গমন করিবেনা, অকালে অস্থানে, অপবিত্র পাত্রে আহার করিবেনা। দেবতা, গুরু, অতিথি এবং আশ্রিতদিগকে সৎকার করিয়া হস্ত, পদ, মুখ ধৌত পূর্ব্বক মালাধারণ করতঃ স্বীয় অভীষ্ট দেবতার জপ করিয়া প্রসন্নান্তঃকরণে আহার করিবে, আহার কালে অন্যমনস্ক হইবে না। দধি, মধু, লবণ, ঘৃত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিবে না, রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। সরলভাবে ক্ষবথু পরিত্যাগ করিবে। বক্রভাবে শয়ন করিবে না। মল মূত্রের বেগ রোধ করিয়া অন্য কোন কার্য্য করিবে না, মল মূত্রের বেগ রোধ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে পারে, চরক বলিয়াছেন মল মূত্রের বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, বিষমাশন, অতি সাহস এই সমস্ত কারণে যক্ষ্মা হইয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্বিজ, গুরু, ইহাদে সম্মুখে নিষ্ঠীবন (মুখেরছেপ-ফেলা) মল, মূত্র পরিত্যাগ করিবে না, পথে, লোকসঙ্কুলস্থানে এবং ভোজন-সময়ে মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিবে না এবং অতিশয় বিশ্বাসও করিবে না। স্ত্রীকে অতি গোপনীয় কথা কখনও বলিবে না এবং কোন কার্য্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করিবে না।

রজস্বলা, পীড়িতা, অপবিত্রা অন্য পুরুষা-সক্ত স্ত্রী গমন করিবে না। নিষিদ্ধ তিথিতে (অমবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে) সন্ধ্যাকালে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, গুরু জনের নিন্দা করিবে না। অপবিত্রাবস্থায় পূজাদি কোন কার্য্য করিবে না। ভূমিকম্পে, বিদ্যুৎপাত সময়ে, নষ্টচন্দ্রায়, মহোৎসবে, সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন করিবে না। অতি-দ্রুত অতিধীরে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। অনর্থক বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সন্ধ্যা-কালে ভোজন, অধ্যয়ন, স্ত্রীসংসর্গ, নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, মূর্খ, ক্লীব ইহাদের সহিত মিত্রতা করিবে না। মদ্য, অক্ষক্রীড়া এবং বেশ্যাসক্ত হইবে না। অনর্থক অধিক কথা বলিবে না। একাকী সুখী হইবার ইচ্ছুক হইবে না, যাহাতে অন্যে সুখী হয় তাহাও চেষ্টা করিবে, দীর্ঘ সূত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসময় কার্য্যাদি সমাধা করিবে। কোন কার্য্য সিদ্ধ হইলে অহ্লাদিত হইবে না এবং অসিদ্ধ হইলেও দুঃখিত হইবে না, ক্রোধ, হর্ষ শোকের বশীভূত হইবে না। ভগবান্‌ও গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি
নকাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ
সমেপ্রিয়ঃ॥
১২ অঃ ১৭ শ্লোক।

যিনি হৃষ্ট হয়েন না, কাহারও প্রতিদ্বেষ করেন না, যিনি শোকাকুল হন না, কোন

বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীমতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ
যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রম।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দেহের উপাদানের সূক্ষ্মত্ব, স্থূলত্ব এবং নির্ম্মলত্ব ও মলিনত্ব হেতু জ্ঞান বা চৈতন্যের ন্যূনাতিরেক বিকাশ বা অবিকাশ হয়। স্বর্গ * হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় বিশুদ্ধ তেজ প্রধান উপাদানে নির্ম্মিত; সুতরাং সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী পুরুষ ও তদংশভূত জীব সমূহ নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময় সূক্ষ্মদেহ ধারী, উহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর দেবতা হইতেছেন। পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষে তৈজস, দ্রবীয়, বাস্পীয় ও বায়বীয় সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্মদেহধারী জীব সমূহ আছে। উহারা গুণ ভেদে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও অতি নিকৃষ্টতম জীব হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের সহিত তুলনায় উহাদিগের অধিকাংশই জীব পদ বাচ্য নহে, জীবাণুপদ বাচ্য। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আমাদের শরীরের ও কতকগুলি আমাদের মনের বড়ই অনিষ্ট কারক। যেমন বসন্ত বিসূচিকা বীজের মধ্যে অনিষ্ট কারক জীব বা জীবাণু আছে সেইরূপ, নিদানোক্ত দেবগ্রহ গন্ধর্ব্বগ্রহ পিশাচগ্রহ ইত্যাদি গ্রহজুষ্ট অনেক উন্মাদ রোগ আছে উহারা শরীর ও মনের অনিষ্ট কারক। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বা ভাবাংশ একত্রিত সম্মিলিত হইয়া এক একটী ভাবের বিকাশ হয় এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদার্থ একত্রকটী ভাবের আধার, পরমাণু যে অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ তাহাও ভাব শূন্য নহে, তবে পার্থিব অণু বা জড় পদার্থে চৈতন্যের বিকাশ না হওয়ায় তাহারা স্বয়ং কোন ভাব প্রকাশ করিতে পারেনা। * পৃথিবীস্থ জল,

* সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে সবনাৎ প্রেরণাচ্চৈব সবিতা তেন উচ্যতে। ঈশ্বরের স্থূল ত্রিমূর্ত্তির প্রধান মূর্ত্তি যে সূর্য্য তাহা সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ৩য় খণ্ড ১৫। ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

টীকা * ইয়ুরোপীয় তার্কিকগণ একটি বৃহৎ কাচপাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ কাচ পরকলা দিয়া দুইটি কুটরীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি কুটরির মধ্যে একটি জলাধারে কতকগুলি মৎস্য অন্য কুটরিতে মৎস্যভোজী একটা জীব (ধাড়ে) বদ্ধ করিয়া রাখায়, ঐ মৎস্য ভোজীজীব ঐ মৎস্য ধরিতে যাওয়ায়, বারম্বার ঐ পরকলায় বাধা প্রাপ্ত ও মস্তকে আঘাত লাগিয়া প্রতি নিবির্ত্ত হওয়া সত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা বিস্মৃত হইয়া আবার ধরিতে আঘত লাগিয়া প্রতি বিবির্ত্ত হয়। এইরূপে বহুবার আঘাতিত হইয়া অবশেষে সংস্কারের ন্যায় বাধা জনিত ভাবটি সামান্য উপলব্ধি হয়, ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তির্য্যগ্ জাতির স্মৃতি ও ধৃতির বিকাশ অতি অল্প।

তেজ, বায়ুর মধ্যে বহুতর জৈবোপাদান আছে, এমন কি, একটী বৃক্ষপত্র বা ক্ষুদ্রহ্রদস্থ জল উৎকৃষ্টঅণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, জীবাভাসময় শত শত কীটের ন্যায়, জীবাণু পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ঠা, গোময় হইতে বহুতর কীট উৎপন্ন হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, জগতে জীব শূন্য স্থান নাই।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধিতত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, ঐ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাভাসই আমি পদ বাচ্য জীবাত্মা। ঐ বুদ্ধিতে গুণ ক্ষোভ হেতু যে সকল বিকল্পাত্মক ভাবের স্ফুরণ হয়, ঐ সকল বিকল্পাত্মক ভাব রূপ তত্বই (Thinking Entity) মন হইতেছে। যেমন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জল দ্বারা ডাইলিউট করিলে ঔষধের গুণ ও শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, ক্রমে ক্রমে বহু শতবার বা বহু সহস্র বার ডাইলিউট করার পর ঔষধের গুণ লুপ্ত হইয়া শুদ্ধ জলে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাটমনের এক একটী চেতন ভাব তমগুণ কর্ত্তৃক ক্রমে সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থে পরিণত হইয়া চেতন ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যেমন জল দ্বারা অনেক বার ডাইলিউট হেতু ঔষধের গুণ অপ্রকাশ হইলেও ঔষধের অতি সামান্য অণুপরমাণু অবশ্যই জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু প্রায় সমস্তই জলীয় অংশ হওয়ায় জলের গুণ দ্বারা ঔষধের গুণ আবরিত হইয়া যায়, সেইরূপ জড়ের স্বাভাবিক (কেবল মাত্র তম) গুণদ্বারা তদভ্যন্তরস্থ রজ ও সত্ব গুণ সম্পূর্ণ রূপে আবরিত হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মাত্র রজ গুণের অতি-সামান্য ক্রিয়া (অর্থাৎ ক্ষয় বৃদ্ধির ক্রিয়া মাত্র) প্রকাশ পায়, যেমন কাচপোকা কর্ত্তৃক ধৃত আরসুল্লা কীটের (ভয় বৃত্তি দ্বারা) ক্ষুদ্র অন্তর কাচপোকা ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া দেহ তদাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বিরাট মনের চেতন ভাব মৃত্তিকা বা পর্ব্বত রূপে কল্পিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষিতি জাতীয় অণু হইতে স্থূলতম মৃত্তিকা বা পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়। যেমন অক্সিজন, হাইড্রোজন দুই জাতীয় অদৃশ্য বাষ্প একটী কাচ-যন্ত্র বিশেষে পুরিয়া তন্মধ্যে যদি তড়িৎ পাস্ করা যায়, তাহা হইলে ঐ অদৃশ্য বাষ্প দ্বয় সংমিশ্রিত হইয়া সামান্য বাষ্পীয় জ্যোতি অর্থাৎ এক একটী রেখার ন্যায় প্রকাশ হয়, পুনর্ব্বার উহাতে অন্য প্রকারে তড়িৎ পাস দ্বারা ঐ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর ঐ জল অন্য যন্ত্র বিশেষে প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফাকারে পরিণত করা যাইতে পারে অর্থাৎ যেমন সূক্ষ্ম হাইড্রজন্ ও অক্সিজন্ প্রক্রিয়া দ্বারা কঠিন বরফে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ মহৎ ক্ষেত্রে কল্পিত সূক্ষ্ম মনোভাব (তড়িৎ পাসের ন্যায়) তম গুণের প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূলদৃশ্যজগতে পরিণত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত মত মৃৎপাষাণাদিতে যেমন আদৌ জীবত্বের বিকাশ নাই, সেইরূপ কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতিতে জীবত্বের ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইলেও স্বাধীনভাবে মন ও বুদ্ধির বিকাশ হয় না। জড় পদার্থে যে সকল জড়ীয় প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া (যথা, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, তাপের স্ফুরণ) ইত্যাদি

আছে, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি তীর্য্যগ্ জাতিতে (জীবত্বের স্ফুরণহেতু) ঐ সকল আকর্ষণ বিক্ষেপণ আদি রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। পশ্বাদির বুদ্ধি ও মানবের সামান্য অঙ্কুর যাহা মস্তিষ্কে প্রকটিত হয়, তাহা ঐ রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া তদাকার ধারণ করে, ঐ সকল প্রবৃত্তি পশ্বাদিকে যে ভাবে চালিত করে; উহারা সেই ভাবে চালিত হয়। পশুদিগের স্বাধীন বিবেক বা যুক্তির বিকাশ না হওয়ায়, উহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও সদসদ্ বিবেচনা করিতে পারেনা।

বস্তুত উহাদের অন্ধ প্রবৃত্তি দমন করিবার শক্তি নাই। এবং উহাদের ধৃতি ও স্মৃতি শক্তি অতিঅল্পমাত্র বিকাশ হয়। মানবের সহিত তুলনায় ধৃতি ও স্মৃতিশক্তি উহাদের এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয় *। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন আমিত্বের অর্থাৎ স্বাধীন কল্পনাকারী মন ও নিশ্চয়কারী বুদ্ধির বিকাশ উহাদের হয় নাই। যেমন গর্ভস্থ-শুক্র ও শোণিত সংযোগে গর্ভেজীব-সঞ্চার হয় এবং যত দিন ভ্রূণ গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার অস্তিত্বেই ভ্রূণের অস্তিত্ব, মাতার আহারের দ্বারায় ভ্রূণের শরীর পোষিত হয়, কিন্তু জীব প্রসূত হওয়ার পর স্তন্যপায়ী শিশুর মাতার আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট হইলেও উহার স্বতন্ত্র আহারের প্রয়োজন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় সেইরূপ উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি, প্রকৃতি মাতার গর্ভস্থ ভ্রূণ সদৃশ।

* এই স্থানের টীকা ভ্রমক্রমে ১২১ পৃষ্ঠার নিম্নে বসিয়াছে; উক্ত পৃষ্ঠায় ৩৭ পংক্তিস্থিত * চিহ্নিত টীকা যাইবে (হিং সং)

অর্থাৎ স্বাভাবিক লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির অস্তিত্বেই উহাদের অস্তিত্ব, স্বভাবের বিরুদ্ধে স্বাধীনচিন্তা ও ন্যায়ান্যায় বিচার দ্বারা উহারা কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি মাতার স্তন্যপায়ী শিশু পুত্র সদৃশ হইলেও (অর্থাৎ স্বভাবের অধীন হইলেও) স্বাধীনভাবে চিন্তা যুক্তি ও ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে সক্ষম। বর্ণিত আছে, মনু প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং মনুই মানবের আদি পুরুষ, যে হেতু মানবের মন বুদ্ধি সেই বিরাট মনের ভাব-বিশেষ, উহা এই পঞ্চভূতোৎপন্ন দেহে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বিকাশিত হইয়াছে। শিশু মাতৃ গর্ভ—প্রসূত হইয়া যেমন প্রতিদিন দিবা ভাগে জাগরিত অবস্থায় পার্থিব অভিজ্ঞতা ও নানা ভাব শিক্ষা ও তাহা অন্তরে সঞ্চয় করিয়া নিশিতে নিদ্রা যায় এবং পর দিন নিদ্রোত্থিত হইলে ঐ পূর্ব দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ অস্পষ্ট সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া নূতন অভিজ্ঞতা ও নূতন ভাব সঞ্চয়ের ভিত্তি স্বরূপে পরিণত হয় এবং ঐ প্রতিদিনের নূতন নূতন সংগৃহীত ভাব সমূহ তাহাতে যোগ করিয়া লওয়ায় ক্রমে ক্রমে নানাভাব ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া মালার ন্যায় গ্রন্থিত হয় অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় নূতন নূতন ভাবে পরিণত হয়। সেইরূপ সূত্রাত্মা তাঁহার ত্রিগুণ সূত্রে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতারূপ এক একটী পুষ্প মালাকারে গ্রন্থন করিতে থাকে অর্থাৎ মানবাত্মা এক জন্মে যে অভিজ্ঞতা ও ভাব সমূহ সঞ্চয়

করে, পর জন্মে তাহার সারাংশ সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া অভিজ্ঞতা ও নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হয়। বালক যেমন শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে কর্ম্ম, করিতে সক্ষম হয় ও বয়প্রাপ্ত হইয়া মাতার স্তন্য ত্যাগ পূর্ব্বক মাতার প্রতিপালনাধীন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং আবার অন্য বালকের পিতৃ স্থানীয় হয়, মানবও সেইরূপ জন্ম জন্মান্তরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সাধনা দ্বারা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং মহাত্মা বা মহাপুরুষে পরিণত হয় ও তাহার ক্ষুদ্র মনও বিরাট মনে পরিণত হয়।

উপরোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন প্রণালী (যাহাকে ইংরেজীতে descending এবং Ascending cycle কহে.) ও সংস্কৃতে কালের অবসর্পিণী ও উপসর্পিণী প্রণালী কহে) বুঝা আবশ্যক, ইতিপূর্ব্বে হোমিও-প্যাথি ঔষধের ডাইলিউসন্ এবং অদৃশ্য বাষ্প বয়ুকে পরিণতি ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত দ্বারা বিরাটমনের এক একটী সূক্ষ্ম ভাব তমগুণাক্রান্ত হইয়া বা তামসিক অহঙ্কারাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে মৃৎ-পাষাণাদি স্থূল জড় পদার্থে কি রূপে পরিণত হয়, তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী যাহা কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পাঠকগণ কালের বা প্রকৃতির অব-নয়ন প্রণালীর সামান্য আভাস কিঞ্চিৎ পাইতে পারেন, তদ্ভিন্ন যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করা ভয়ঙ্কর কঠিন। এক্ষণে উন্নয়ন প্রণালী যাহা কথিত হইবে, তাহাও সহজ নহে। বেদান্তানভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন উভয় প্রণালীই ভয়ঙ্কর কঠিন। তবে ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকগণ যাঁহারা ডার উইনের সৃষ্টিবির্বর্ত্তবাদ (Evolution therory) মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৃষ্টির উন্নয়ন প্রণালী অর্থাৎ ক্রমোন্নতির নিয়ম বুঝার কিছু সুবিধা হইতে পারে। মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদিতে যে ক্রিয়া শক্তি আছে, তদ্দ্বারা বহুকালে উহাদিগের অন্তরোপাদানের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কথঞ্চিৎ তেজের স্ফুরণ হয়, তদ্দ্বারা আভ্যন্তরীণ উপাদান অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ক্রিয়া শীল দ্রবীভূত হয়। ঐ দ্রবীভূত উপাদান সকল কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট বা শ্লথ হইয়া উহাদের আভ্যন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে আকর্ষণ শক্তি কর্তৃক যখন ঐ সকল অণু পুনঃসংশ্লিষ্ট হয়, তখন উহাদের গুণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় ঐ মৃত্তিকা প্রস্তরের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া ধাতবো-পাদানে পরিণত হয়। কিন্তু উপাদান লৌহ, তাম্র, সীস প্রভৃতি আকরজ ধাতুতে পরিণত ও ঐ সকল ধাতুর সংমিশ্রণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস, পিত্তল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পুনর্ব্বার উক্ত আকরজ ধাতব ঔপাদানিক অংশ সহস্র সহস্র বর্ষে আভ্যন্তরীণ তেজের স্ফুরণ হইতে দ্রবীভূত হইয়া তাহাতে উষ্মার বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে বিকৃত হইয়া উদ্ভিদ ও জৈবো-পাদানে পরিণত হয় * চিকিৎসা ও রাসায়-নিক শাস্ত্রে জীবে ও উদ্ভিদে যে লৌহ প্রভৃতি

টীকা * আভ্যন্তরীণ তেজ বিশেষ হইতে যে, জীবত্বের বিকাশ হয়, ইহা আধনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচীন আর্য্যবিজ্ঞান সম্মত।

ধাতব উপাদান আছে। ইহা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে, আবার ঐ উদ্ভিদের ঔপাদানিক অংশ বিকৃত হইয়া তদ্দ্বারা যে কীটাদি জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা কেবল শাস্ত্রের প্রমাণ নহে, অনেক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গলিত ও বিকৃত বৃক্ষ—পত্র=বিশেষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কীট ও ক্ষুদ্র চিংড়া মৎস্য প্রভৃতি কীট উৎপন্ন হয়, কাঁচোয়ায় যে তাম্র ভাগ অধিক ইহা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ও অথর্ব্ব বেদাক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা এক ধাতুর সহিত পত্র বিশেষের রস সংযোগে অন্য ধাতু উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতির উৎপত্তি হইতে পারে। ভিন্ন জাতীয় ঔদ্ভিদ্য উপাদান দ্বারা আর এক জাতীয় উদ্ভিদ যে প্রস্তুত হইতে পারে ইহা পরীক্ষিত। যদিও অদ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিকপণ্ডিতেরা ধাতব্য ঔদ্ভিদ্য উপাদানে কিম্বা কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদান দ্বারা স্বেদজজীব ব্যতীত পশু পক্ষ্যাদি জরায়ুজ বা অণ্ডজ বৃহৎ জীব নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই * কিন্তু উদ্ভিদও ধাতু বিশেষ দ্বারা সর্প দংশিত মৃত

The caloric heat is as Heracletus widely taught the Primordial Principel of life, আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি।

টীকা * কিন্তু প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষিগণ যোগ বলে অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব মানস শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জীব যে পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং জীবের মস্তিষ্ক রক্ত মেদ ও মাংস প্রভৃতিতে বহুতর ধাতু উদ্ভিদতত্ত্ব এবং অন্য জৈবোপাদান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জৈবনিক বা জীবাণু আছে। ইহা বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রানুমোদিত ও পরীক্ষিত।* প্রাচীন পাশ্চাত্য ক্যা-বেনিষ্টগণের মতে আকরজ ধাতব-উপাদান বিকৃত হইয়া উদ্ভিদে, ঔদ্ভিদ্য উপাদান বিকৃত হইয়া পতঙ্গ ও কীটাদির জৈবোপাদানে, ঐ কীট পতঙ্গাদির জৈবোপাদন বিকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পশু পক্ষীর জৈবোপাদানে বিবর্ত্তিত এবং উচ্চতর জীবের অর্থাৎ বানর উল্লুক ও বন মানুষের জৈবোপাদান বিকৃত হইয়া মানবের দৈহিক জৈবোপাদানে পরিণত হয়। তদনন্তর মানবের জৈব ও মানসোপাদান * সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল বিশুদ্ধ দেবোপাদানে বিবর্ত্তিত হয় এবং ঐ বিশুদ্ধ দেবোপাদান ঈশ্বরতত্ত্বে পরিণত হয়। যথা Kabalistic aphorism runs "A stone becomes Plant, a plant a beast, the beast a man, a man Deva and Deva himself becomes God." পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পশু জগৎ পর্য্যন্ত প্রকৃতি

* মানবের মানস সোপান উচ্চতর লোকস্থ দেবাংশ। কিন্তু দৈহিক জৈবোদান প্রস্তুত হইলে ঐ তৈজস দেবোপাদান আকর্ষিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্ব ও তাহাদের সার সংগ্রহ স্বরূপ মন ও বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয়। এ দেবোপাদান পঞ্চ ভূতের সত্ত্বাংশ। তবে পার্থিব তম রজগুণের সহিত মিশিয়া তদনুরূপ হয়।

আত্মার গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় বা ভ্রূণ সদৃশ। তবে ৫ দিনের গর্ভস্থ বীর্যাপেক্ষা এক মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণ এবং তদপেক্ষা ৬। ৭। ৮ ৯। ১০ মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণের যেরূপ দেহও, চেতনার ন্যূনাতিরেক প্রভেদ হয়, সেইরূপ উদ্ভিদাপেক্ষা কীটাদি ও কীটাপেক্ষা পশ্বাদির দেহ ও চেতনার অধিকতর উন্নতি হওয়ায় উহাদের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। শক্তি-উপাধিধারি ব্রহ্মই স্বয়ং ঈশ্বর এবং কোষোপাধিধারীই জীব—যথা

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেববিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং
ব্রজেৎ॥
কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব
জীবতাম্।
পিতা পিতামহ শ্চৈকঃ পুত্র পৌত্রৌ
যথা প্রতি॥

বঙ্গার্থ। চৈতন্যেরছায়ায় শক্তি চেতনবৎপ্রকাশ হয়েন। শক্তি উপাধিধারি ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে ও কোষাপধারি ব্রহ্মই জীব নামে অভিহিত হন। পরব্রহ্মই পিতামহ তাঁহার পুত্র স্বরূপ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুত্র (পরব্রহ্মের-পৌত্র) স্বরূপে জীব হইতেছেন। ইহার পর শ্লোকেই বর্ণিত আছে যে—

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তি কোষা-বিবক্ষণে॥

যেমন পুত্র ও পৌত্রাভাবে পিতা ও পিতামহ নাম থাকেনা, সেইরূপ শক্তি ও কোষাভাবে ঈশ্বর বা জীবের অভাব হওয়ায় পর ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। অর্থাৎ কেবল তাঁহাতেই তিনি থাকেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে স্বত্বগুণ মলিন হওয়ায় ঐ মলিন সত্বগুণই এক একটি ভাবের কারণ রূপে পরিণত হয়, উহাই জীবের কারণ শরীর। ঐ কারণ শরীরে আনন্দ প্রতিভাত হওয়ায় উহাকে আনন্দময় কোষ বলে, তদুপরি বুদ্ধিতত্বকে বিজ্ঞানময় মনস্তত্বকে মনোময় জৈবতত্বকে প্রাণময় ও স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে। যেমন গুটি পোকা স্বীয় লালা দ্বারা সূত্রের ন্যায় পদার্থ বাহির করিয়া তদ্দ্বারা কোষ রূপ গুটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়, সেই রূপ সূত্রাত্মা স্বভাব হইতে ত্রিগুণ সূত্র বাহির করিয়া তদ্দ্বারা পঞ্চ কোষ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে বদ্ধ হন। প্রকৃত পক্ষে সদাত্মা বদ্ধ হন না। তাঁহার আভাস চৈতন্য স্বীয় ভাবে মগ্ন হইয়া কোষোপাধি জীব অভিমানী হন। ঐ আনন্দময় কোষকে কারণ দেহ বলে, যে হেতু শুদ্ধচিৎই আনন্দ এই জন্য কারণ দেহে আনন্দ মাত্র প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং প্রাণময় কোষকে সূক্ষ্ম দেহ বলে. যে হেতু, বিজ্ঞানময়কোষে বুদ্ধি ও অহঙ্কার রূপে অর্থাৎ আমিত্বকারে, মনোময় কোষ কল্পনাও কামরূপ দেহাকারে এবং প্রাণময় কোষে বায়ুরূপ দেহাকারে আভাস চৈতন্য প্রতিভাত হয় এবং অন্নময় কোষকে স্থূল দেহ বলে। পূর্ব্ব বর্ণিত মত কালের অবনয়ন প্রণালী অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাব সমূহ তমগুণাক্রান্ত হইয়া যখন পঞ্চভূতে বিবর্দ্ধিত হয় এবং তমগুণের প্রাধান্য হেতু মৃত্তিকা ও পাষাণাদিতে পরিণত হয়, তখন ঐ মৃৎ পাষাণাদি স্থূল জড়তত্ব ভেদ করিয়া

বুদ্ধি মন প্রাণ ইত্যাদির বিকাশ হয় না, কেবল রজ গুণের কিঞ্চিৎ মলিনাভাস তমগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত আকর্ষণ বিয়োজনাদি জড় ধর্ম্মাক্রান্ত—কর্ম্ম সমূহ ঐ মৃৎ পাষাণাদির অন্তরোপাদানকে ধাতবোপাদানে এবং ধাতবোপাদানকে উদ্ভিদোপাদানে উদ্ভিদোপাদনকে জৈবোপাদানে পরিণত করে, তদনন্তর ঐ জৈবোপাদান মধ্যে রজগুণ জনিত জান্তবউষ্মা (Animal magnetism উদ্দীপিত হইয়া ঐ জৈবোপাদান বা জীবাণু সকলকে পরস্পর সংযোগ করিয়া অন্নময় কোষ অর্থাৎ সপ্ত ধাতু ও জৈব যন্ত্র (organs সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকে, ঐ যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইলে শুদ্ধ সত্ব গুণের সামান্য কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র রজগুণাক্রান্ত হইয়া ঐ রজগুণের কিঞ্চিৎ সাহায্যকারি হওয়ায় রজগুণই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া জীবের প্রাণময় কোষ প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়, এই সম্মিলিত কোষদ্বয় অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ মনুর স্মৃতিতে ভূতাত্মা বলিয়া বর্ণিত আছে ; ঐ ভূতাত্মাই তীর্য্যগ্‌ অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদির আত্মা। পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌ জাতির মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সম্পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় উহাদের জীবাত্মার সম্যক বিকাশ হয় না। উহাদের জীবনান্তে প্রাণময় কোষ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ কোষস্থ জীবাণু সকল ভূলোকে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে অবশ্যই উক্ত জীবাণু সকলের মধ্যেও প্রাণময় কোষের অঙ্কুর আছে। যাহাহউক, উহাদের অন্তরস্থ রজগুণ জনিত রাগ বা আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে উহারা পুনঃ সংশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া স্বজাতীয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করে। অবশ্যই পশু পক্ষ্যাদির মধ্যেও আনন্দ বিজ্ঞানও মনোময় কোষ আছে, তবে ঐ কোষত্রয় মুদ্রিত থাকায়, পশ্বাদিতে আত্ম জ্যোতি বিকাশ হয় না। উহাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পর ক্রমে ক্রমে উহাদের জৈবোপাদান সংস্কৃত ও তাহাতে সত্ব গুণের বিকাশ হয়, সত্ব গুণের বিকাশ হইলে ঐ জৈবোপাদানের মধ্যে উচ্চতর লোকস্থ সত্ব গুণময় দেবতত্ত্বের স্ফুরণ হয় এবং তদ্বারা মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হয় ঐ মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হইলে বিজ্ঞানময় কোষের কিঞ্চিৎ বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষে আত্মাভাস প্রতিবিম্বিত হয় ঐ প্রতিবিম্ব মনোময় কোষে পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করে এবং তদ্‌গুণাক্রান্ত ও তদনুরূপ দেহেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া তাহাতে প্রতিভাত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। আত্রেয় উপনিষদে প্রকাশ আছে "প্রজাপতি ব্রহ্ম প্রথমে কীট পতঙ্গ; পরে ক্ষুদ্র পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন কিন্তু দেবতাগণ ঐ দেহ তাঁহাদের উপযোগী নহে বলিয়া প্রবেশ করিতে অস্বীকার করায় গবাশ্বাদি বৃহৎ পশু সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগের প্রতি পুনর্ব্বার ঐরূপ আদেশ করিলেন, দেবতাগণ ঐ পাশব দেহও অনুপযুক্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করায় প্রজাপতি মানব দেহ সৃষ্টি করিবা মাত্র অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ আহ্লাদের সহিত

মানবেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইলেন দেবগণ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র মহৎ সমভিব্যাহারী পুরুষ দ্রবীভূত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইলেন"।

বেদান্তোক্ত মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই মনুর মহৎ সংজ্ঞক জীব। উহাই আত্মার সমভিব্যাহারী। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আভাস মনোময় হইয়া ইহপরলোক গতায়াত পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে।

ঐ মহৎ সমভিব্যাহারী জীবাত্মা ইহলোক পরিত্যাগ কালে ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সার সংগ্রহ সমভিব্যাহারে লইয়া পরলোক গমন করেন।

তথায় উহা পরিপাক ও বুদ্ধি কোষে দ্রবীভূত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার সংস্কার পরজন্মের বীজরূপে পরিণত হয়। পরজন্মে ঐ বীজ হইতে ঐ সকল প্রবৃত্তি ও বিষয়জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও বিকাশিত হওয়ায়, তাহার সহিত নূতন নূতন ভাব ও অভিজ্ঞতা যতই সঞ্চিত হইতে থাকে বুদ্ধি কোষস্থ জ্ঞান মণ্ডল ততই বিস্তৃত হইতে থাকে, ঐ জ্ঞানালোকে বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে প্রকৃত সুখের বা জ্ঞানানন্দের বিকাশ হয় এবং ভ্রান্ত জ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা ধ্বংস হইলে চিন্ময়ি বিদ্যা দেবীর বিকাশ হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষে বিলীন এবং আনন্দময় কোষ অবিদ্যার অঙ্গীভূত হইয়া স্বরূপ জ্ঞানানন্দে পরিণত হয়। পূর্ব্ব বর্ণিত মত স্বরূপ জ্ঞানের মহদ্দর্পণ সদৃশ ঐশ্বরিক শক্তিই যে বিদ্যা তাহা বলা বাহুল্য অতএব অবিদ্যারাজ্য হইতে জীব মুক্ত হইলে বিদ্যা রাজ্যান্তর্গত হইয়া সর্ব্ব-শক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরের অঙ্গীভূত হয়। তখন মুক্তাত্মা আর জীব বা জীবাত্মা পদ বাচ্য থাকে না। যে হেতু অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর বা চিত্ত ঐ কারণ শরীরস্থ চিদাভাসই প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধি তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইলে তৈজস জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চিত্ত-দর্পণ মহৎ চিদ্দর্পণে পরিণত হইলে প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বা সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ মহাপুরুষ পদে উন্নীত হইয়া সর্ব্বেশ্বরের সমাঙ্গীভূত হন। ইহাই বেদান্ত মতের সার সংগ্রহ।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* আমাদের বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ, যাহা চিত্ত-দর্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে অথবা মনু যাহাকে আত্মার সমভিব্যাহারী মহৎ সংজ্ঞক জীব বলিয়াছেন এ মহৎ এবং পূর্ব্বোক্ত মহদ্ব্রহ্ম সমষ্টি বুদ্ধিরূপ ঈশ্বরের চিদ্দর্পণ এক নহে। উক্ত মহদ্বুদ্ধি সমষ্টি ভাবাপন্ন অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্য বা জ্ঞানের মহৎ চিদ্দর্পণ স্বরূপ। আমাদের বুদ্ধি ব্যষ্টি ভাবাপন্ন পৃথক ২ চিত্তের পৃথক ২ মলিন চিত্ত দর্পণ স্বরূপ। শেষোক্ত বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষকে মনের উচ্চ অঙ্গ বলিলে ভাল হয়। শঙ্করাচার্য্য "রূপাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমান" শ্লোকে যে দর্পণের কথা বলিয়াছেন, উহা শেষোক্ত চিত্ত-দর্পণ।

সামবেদীয়া

কেনোপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[মূলম্]

ওঁ কেনেষিতং পততিপ্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি। ১
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্
বাচো হবাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ২
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি
নবাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতা
দথো অবিদিতা দধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং
যেনস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩
যদ্ বাচা নভ্যুদিতং
যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৪
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৫
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি
যেন চক্ষূংষি পশ্যতি
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৬
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি
যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৭
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি
যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে। ৮ ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ

[অনুবাদ]

শিষ্য। প্রেরিত হইয়া কাঁহা কর্ত্তৃক মানস
যায় নিজ বিষয়েতে? কার নিয়োজনে
প্রথম স্বরূপ প্রাণ হয় অগ্রসর?
কাহার ইচ্ছায় লোকে বাক্য উচ্চারয়?
কোন্ দেবতাবা চক্ষু কর্ণে নিয়োজয়? ১
আচার্য্য!
শ্রোত্রেরও শ্রোত্র তিনি, মনের ও মনঃ
বাক্যেরওবাক্য তিনি প্রাণের ও প্রাণ।
চক্ষুর ও চক্ষু তিনি; এই জ্ঞানে ত্যজি
শ্রোত্রাদিকে আত্ম বোধ, সব ধীরগণ
এলোক হইতে যেয়ে লভে অমরণ। ২
চক্ষু কিম্বা বাক্যমন-গম্য তিনি নন;
জানি না তাঁহারে; পুনঃ তাঁর উপদেশ
কিরূপে অন্যেরে দেয় তাহাও না জানি।
"জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হ'তে ভিন্ন তিনি হন"
এরূপ কহেন সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ
যাঁহাদের উপদেশ করেছি শ্রবণ। ৩
নাহি হন প্রকাশিত বাক্যে যেই জন
কিন্তু বাক্য প্রকাশিত যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৪
না পারে করিতে যাঁরে মনেতে মনন
কিন্তু মন চিন্তা করে যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৫
না পারে করিতে যারে চক্ষুতে দর্শন
চক্ষের দর্শন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৬
নাহি পারে কর্ণে যাঁরে করিতে শ্রবণ
কর্ণের শ্রবণশক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৭
না পারে করিতে যাঁরে প্রাণেতে প্রাণন
প্রাণের প্রাণন শক্তি যাঁহার সত্তায়
তাঁহারেই জেনো ব্রহ্ম; যাঁহার অর্চ্চন
করে লোকে ইহা ব্রহ্ম না হয় কখন। ৮

শ্রীমনোরঞ্জন মিত্র।

৮ম বর্ষ। ভাদ্র, আশ্বিন। ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৮২৩, ১৩০৮।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৩।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দুটি পুরস্কার।

(প্রত্যেকটি ১০০৲ হিসাবে মোট ২০০৲ টাকা)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মনে জাতিবিচার বিষয়িণী আলোচনা ও চিন্তার প্রাদুর্ভাব। অতএব এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণের অভিমত-নির্দ্ধারণ আবশ্যক বটে। এই উদ্দেশ্যে আমি দুইটি (প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকার) পুরস্কার প্রদান করিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ জাতি-ভেদ-প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল দুই পক্ষেরই দুই প্রকার প্রবন্ধ আমার প্রার্থনীয়। এই দুই প্রকার প্রবন্ধের মধ্যে দুই পক্ষেরই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্ব্বাচিত-প্রবন্ধদ্বয়ের লেখকদ্বয় আমার স্বীকৃত উক্ত পুরস্কার দুটি পাইবেন। উক্ত প্রবন্ধ ইংরাজী বা বাঙ্গালা, এই দুয়ের যে কোন ভাষায় লিখিত হইলেই চলিবে। প্রবন্ধদ্বয় ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়িণী যুক্তিমালায় অলঙ্কৃত ও সুসম্পাদিত হওয়া প্রার্থনীয়। বিশেষতঃ প্রবন্ধদ্বয় বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুকূল-প্রতিকূল যুক্তি-প্রমাণ-বিচার-বিশিষ্ট হইবে।

জাতিভেদের স্বপক্ষবাদী কোন লেখক যদি বুঝিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে জাতিভেদ-প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অনুমোদিত হইতে পারেনা, তবে তিনি কিরূপ সংশোধিত প্রণালীতে উহা প্রচালিত হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, তাহা যথাসাধ্য যুক্তি-প্রমাণ যোগে বিবৃত করিবেন। পক্ষান্তরে, জাতিভেদের প্রতিপক্ষবাদী লেখক দেখাইবেন যে, জাতিভেদ-প্রথা উন্মূলিত হইলেও কিরূপে হিন্দুসমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, বিষয়কর্ম্ম ও জাতীয় ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইতে পারে।

পুরস্কারার্থে নির্ব্বাচিত প্রবন্ধদ্বয় অথবা তদ্বৎ অনুবাদ যশোহরের বাঙ্গালা মাসিক সন্দর্ভ "হিন্দু-পত্রিকায়" বা ইংরাজী মাসিক সন্দর্ভ "ব্রহ্মচারিণে" প্রকাশিত হইবে।

প্রবন্ধ-লেখক বর্ত্তমান ইং ১৯০১ সালের আগামী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তৎপূর্ব্বে স্ব স্ব প্রবন্ধ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারার্থ এক বিচার সমিতি গঠিত হইবে। উক্ত সমিতির সভ্যগণের নাম পরিচয়াদি পরে প্রকাশিত হইবে। বিচার-সমিতি পুরস্কারযোগ্য বলিয়া যে দুই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিবেন, তাঁহারই জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। বিচার-সমিতি কর্ত্তৃক পুরস্কার যোগ্য তাদৃশ উৎকর্ষ বিবেচিত না হইলে, কোন প্রবন্ধের জন্যই পুরস্কার প্রদত্ত হইবেনা,

সাপ্তাহিক ও মাসিক সন্দর্ভের উন্নতচেতা সম্পাদকগণ উপরোক্ত বিষয়টীর মর্ম্ম কৃপা করতঃ স্বীয় স্বীয় কাগজে মুদ্রিত করিলে, বিশেষ অনুগৃহীত হইব; এবং "হিন্দু-পত্রিকা"র সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দ উল্লিখিত প্রস্তাবটী সাধারণকে অবগত করান, ইহা ও অতীব বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল, হিন্দু-পত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণ সম্পাদক। যশোহর

শ্রীশ্রীহরিঃ।

১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।

হিন্দু-পত্রিকা

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। ভাদ্র। ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা

শ্রীসূর্য্য-স্তোত্রম্।

কার্গাজাত দীপনৈক দীপভূতসংস্তুতি।
মানিম.স্তপুণ্ডরীকদীপ্তিহর্ষকারিণম।
রক্তগন্ধভূষিতাঙ্গ রক্তপুষ্পধারিণম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরম্। ১

স্বোদয়েন জগত মোদকোকযুগ্ম-সংস্তুতং।
পদ্মগর্ত্তভাস্ত্রকান্তিদারিতান্ধকারজম্।
সানুরাগপূর্ব্বদিগ্বধূবিচুম্বিতাননম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরম্। ২

চণ্ডরশ্মিদীপ্রদেহ বিপ্রমুখ্যদৈবতম্।
শস্যপুষ্টিবৃষ্টিহেতু ঘৃষ্টি-তুষ্টি-দায়িনম্।
ছায়য়োসঙ্গমার্ণমশ্বরূপ ধারকম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৩

বেদমন্ত্রজপ্যমান সৌরভর্গভূসুর।
প্রত্ত অর্ঘ্যব রি দিব্য শস্ত্রনাশিতাসুরম্।
প্রাজ্ঞমুক্তিমার্গদং পুরাতনং জগৎপতিং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৪

মন্ত্রবর্ণ লব্ধ সূর্য্য দেবতা নিবর্ত্তিত।
শ্রোতকর্ম্মনক্তদিপ্রহূয়মান জোহনম্।
কুন্তনাভহস্তজাল সঞ্চিহীর্ষু মুদ্গতং
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৫

বেদতত্ত্ব বোধনেষ্ট সিদ্ধ্যুপায় কোবিদে।
নার্গাবর্য্যশঙ্করেণ দত্তভাষ্য-ভূষিতং।
অম্বরাদিক্ষ্মায়গমাহেমদেহদীপিতং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৬

যোগিবর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য মুগ্ধানুষ্ঠিতস্তুতি
প্রসাদিতঃ সমাদদৌহি দিব্যবেদবৈভবম্।
যাজুষন্তমঙ্গজাসন স্থিতং দয়াঘনং।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৭

শান্ত-দান্ত কান্ত দেহ-যোগীবৃন্দ-সেবিতম্
স্বপ্রকাশমদ্বিতীয়মংশুজাল ভাস্বরং।
স্থাবরাদিসৃষ্টিকার্য্য-মূলকারণংপরম্।
বন্দয়ামি শর্ম্মদং মতিপ্রদং দিবাকরং। ৮

উদয়গিরিশিখায়াং দিব্যবস্ত্র প্রভাভঃ।
সুর-নর-মুনিসঙ্ঘৈর্ব্বন্দিতোহভীষ্টসিদ্ধ্যা।

অরুণকিরণজালৈর্ব্বোধয়ন্ সর্ব্ব জন্তূন্।
দিনমণিরতি ভক্ত্যাস্তু য়তাং ভোঃ সমস্তাঃ ॥৯

ইতি শ্রীনরহরি শাস্ত্রি-বিরচিতম্ দিবা-
করাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

১। যিনি নিমীলিত পদ্মসমূহকে প্রস্ফুটিত করতঃ হর্ষ প্রদান করেন, রক্তগন্ধদ্বারা শোভিত শরীর, রক্তপুষ্পধারী, সুখ এবং জ্ঞানপ্রদ, কার্য্য সমূহের প্রকাশে দীপের স্বরূপ, সেই সূর্য্যদেবকে নমস্কার করি।

২। যে সূর্য্যদেব পদ্মগর্ভের ন্যায় তাম্র-কান্তিদ্বারা অন্ধকার জন্য দোষ সমূহ নিরাকরণ করিয়া উদিত হইলে, চক্রবাক চক্রবাকী-গণ আনন্দে যাঁহার স্তব করিয়া থাকে, এবং যিনি অনুরক্তা পূর্ব্বদিক্‌রূপা বধুর মুখ সাদরে চুম্বন করেন, বুদ্ধি এবং সুখদাতা সেই সূর্য্যদেবকে আমি প্রণাম করি।

৩। হে প্রচণ্ডকিরণশালিসূর্য্যদেব! তুমিই দ্বিজগণের মুখ্য আরাধ্য দেবতা, তুমিই বৃষ্টি হেতু ধান্যাদির বৃদ্ধির জন্য কিরণের দ্বারা ধান্যাদির সন্তোষ দানকর, তুমিই স্বীয় পত্নীর জন্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলে, হে সুখদ জ্ঞানদ দিবাকর! আমি তোমাকে বন্দনা করি।

৪। বিপ্রগণ বেদমন্ত্রেরদ্বারা জপ করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে, যে সূর্য্যদেব সেই অর্ঘ্য দানের জলরূপ দিব্যাস্ত্রদ্বারা অসুর সমূহকে নাশ করিয়াছিলেন, প্রাজ্ঞদিগের মুক্তিমার্গদাতা জ্ঞানদায়ী জগৎপতি সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৫। বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণ সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিলে, যে সূর্য্যদেব কুঙ্কুম সদৃশ হস্তদ্বারা সেই হোমীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার জন্যই যেন উদয় হন, আমি সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৬। বেদের তত্ত্ব-জ্ঞানান্বেষণে তৎপর আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য দান করিয়া যাঁহাকে শোভিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শরীর অম্বরাদি ন্যায় দ্বারা দেদীপ মান, আমি সেই সূর্য্যদেবকে বন্দনা করি।

৭। যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য যজুর্ব্বেদ দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানদাতা পদ্মাসনস্থ দয়ালু সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৮। যোগিগণ যাঁহাকে আরাধনা করিয়া দান্ত কান্ত শান্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি অদ্বিতীয় হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছেন এবং যিনি কিরণ সমূহের দ্বারা প্রকাশমান, স্থাবরাদি জগতের মূল কারণ স্বরূপ সুখদাতা সেই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি।

৯। হে জীবগণ! সুর, মানব, মুণিগণ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য উদয়াচলের শিখরে দিব্য রত্ন প্রভা সদৃশ যাঁহাকে আরাধনা করেন, এবং যিনি অরুণ-কিরণ সমূহদ্বারা সমস্ত জীবকে জাগরিত করেন, সেই সূর্য্যদেবকে আরাধনা কর।

বৈদান্তিক-মতের সমালোচনা।

বিগত বর্ষের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় উপাধ্যায় ব্রহ্ম বন্ধু ৮ই ডিসেম্বর বুধবার তারিখে অ্যাল্

আর্টহলে (Albert Hall) বেদান্ত সম্বন্ধে যে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ বক্তৃতায় তিনি আধুনিক বৈদান্তিকদিগের ও থিয়সফিষ্ট-গণের প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অমূলক, ইহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐ বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় কথিত এবং ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা হিন্দু, আমাদিগের পত্রিকার নাম হিন্দু-পত্রিকা, বিশেষতঃ বিষয়টীও হিন্দু-দিগের মৌলিক বেদান্তদর্শন-মূলক; অতএব হিন্দুদিগের ভাষা ব্যতীত বিজাতীয় ভাষা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, এজন্য তাঁহার অতিরঞ্জিত ইংরাজি বক্তৃতার কায়দাটী পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না; সুতরাং তাঁহার বক্তৃতার সার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উপরোক্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

"বৈদিক কালে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-দিগের অধ্যাত্মজ্ঞান উচ্চতর হইতে উচ্চতম সীমায় অধিরোহিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ সান্ত সসীম ব্যষ্টিজ্ঞান এক অদ্বিতীয় অসীম অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইয়াছে। হিন্দু জাতির বর্ত্তমান শোচনীয় অধঃপতন দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা তাহাদের ভ্রান্তি-জনিত অপরাধের দণ্ড ভোগ মাত্র; যেহেতু ন্যায়বান ঈশ্বর বিনা কারণে কাহাকেও দণ্ড প্রদান করেন না। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুরা বেদান্তদর্শনোক্ত অভ্রান্ত মত পরি-ত্যাগ করিয়া ভ্রান্তমত অবলম্বন করায় এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বেদান্তদর্শনে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের এক মাত্র কারণ আছে; সেই আদি কারণই পরব্রহ্ম; তিনিই সৎ (পবিত্র); তিনিই চিৎ (জ্ঞান), তিনিই আনন্দ (সুখ)। আর্য্যঋষিগণ সেই সচ্চিদানন্দ রূপ মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহাদের উত্তর বংশীয়গণকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই মূল্য-বান রত্ন যাহাতে অপহৃত না হয়, তৎপক্ষে আধুনিক হিন্দুগণের সাবধান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। আধুনিক থিয়সফিষ্টগণ পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীকার না করায়, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতির শত্রুরূপে পরিগ-ণিত। ঐ থিয়সফিষ্টগণ হিন্দুদিগের সহিত এক মতাবলম্বী বলিয়া মৌখিক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা প্রাচীন বেদান্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরোক্ত একমেবাদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-বাদ প্রচারিত হওয়ার পর হিন্দুগণ তাহাদের (পূর্ব্ববিশ্বাসরূপ) বহু দেব দেবীর সহিত ঐ অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সামঞ্জস্যের সন্ধি-স্থানে শনৈঃ শনৈঃ ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, যদিও ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নিরংশ ও অবিচ্ছিন্ন, তথাচ এক ব্রহ্ম আব-শ্যক মত সৃষ্টির নিমিত্ত বহু হইয়া থাকেন।

তদ্ধেতু সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহুরূপে বিবর্ত্তিত হওয়ায়, এই বহু-জন-সংশ্লিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের এ উক্তি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। যদি ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ ব্যষ্টি-জীবে পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাকে আর অসীম অনন্ত বলা যাইতে পারে না। অথবা একই সময় তিনি অসীম অনন্ত এবং সসীম সান্ত জীব, উভয়ই পরিগণিত হইয়াছেন, বলিতে হয়। এ পরবর্ত্তি-বৈদান্তিকগণ এই অসংলগ্ন ভ্রান্তমত সংস্থাপনের কোন উপায় করিতে না পারিয়া অর্থাৎ এক ব্রহ্মের সহিত বহুত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অপারক হইয়া, এ অসংলগ্নতা দূরীভূত ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মের "মায়া" কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত মায়া কল্পনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসংলগ্নতা দোষ সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তদপেক্ষা আরও জঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; অর্থাৎ উহা দ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্মে যে কেবল সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিত্বের আরোপণ হইয়াছে, তাহা নহে ; তদপেক্ষা গুরুতর দোষ ব্রহ্মের মায়া—অর্থাৎ কপটভাব আরোপিত হইয়াছে। উক্ত মতবাদ হইতে পৌত্তলিকতা—অর্থাৎ বহুদেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হওয়ায়, হিন্দুদিগের নৈতিক অবনতি ও ন্যায়অন্যায়-বিচারশক্তি এককালে তিরোহিত হইয়াছে।" ইত্যাদি।

বক্তা অবশেষে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে বহু দেব দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সেই অনাদি একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দ হইতে এই বহু জীব-জন্তু-সমন্বিত জগৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তর্ক বা যুক্তি দ্বারা তাহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। উহা কেবল সেই অন্তরাত্মার—অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তরতম স্তরের ভাব দৈববাণীর ন্যায় স্ফুট হইলে, মানবের এ আশা পূর্ণ হইতে পারে ; তদ্‌ভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই। তিনি স্বীয় অন্তরাত্মা হইতে উহার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঙ্গিতে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, এই ব্যষ্টি জগতের সহিত ব্রহ্মের যে সংস্রব আছে, তদ্দ্বারা অনন্ত ব্রহ্ম সান্ত রূপান্তরিত বা ব্যষ্টিত্বে পরিণত হন নাই। এই জগৎ তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অনাদি কাল হইতে তাঁহার আত্মার স্বরূপাংশের সহিত এই জগতে সম্পূর্ণ সংসৃষ্ট আছেন, এবং তাঁহার আত্মা উক্ত প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে স্থিত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ কার্য্য-জগৎকে সম্পূর্ণ জানেন ও ভালবাসেন এবং প্রতিদানে জ্ঞান ও প্রেম পাইয়া থাকেন। এইরূপে বহুত্বের অর্থাৎ ব্যষ্টি জগতের সহিত অনাদি অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্মের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

উপরোক্ত বক্তৃতার সমালোচনা।

বক্তার উপরোক্ত বক্তৃতার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ (Later Vetantists) অনন্ত ব্রহ্ম বহুরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন বলায়, ব্রহ্মের প্রতি সসীম ব্যষ্টিত্ব দোষ আরোপিত হইয়াছে এবং জগৎ তাঁহার মায়া বলাতে, তাঁহার প্রতি ভ্রান্তি-

উৎপাদক কপটতার আরোপ হইয়াছে। কিন্তু তৎপরেই বক্তা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি; এই প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার আত্মা স্থিত হইয়া জগতের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। বক্তা বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ বৈদান্তিকদিগকে (Later Vetan tists) পরবর্ত্তি বৈদান্তিক বলিয়া তাঁহাদিগের বেদান্ত-ব্যাখ্যার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ—অসীম অনন্ত ব্রহ্ম যে সসীম সান্তজীব রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা কোথাও বলেন নাই। এই জগৎ যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, এই ভাবটী বক্তা তাঁহার অন্তরাত্মার নিকট হইতে দৈববাণীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দৈববাণী, তাঁহার কথিত পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া যে সকল অমূল্য দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন, বক্তার অন্তরাত্মা বক্তার প্রতি বোধ হয় ততদূর অনুগ্রহ করেন নাই, যথা—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু॥
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব (বিম্বভূত) মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নয়। সেইরূপ জীবাত্মা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র; পৃথক্ বস্তু নয়। আমি নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মা।

যথা দর্পণাভাব আভাসহীনো
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়; তখন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ মাত্র থাকে; সেইরূপ যিনি অন্তঃকরণের বিয়োগে প্রতিবিম্বশূন্য (অর্থাৎ "জীব" এই উপাধিশূন্য) হন, আমিই সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা।

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যিনি এক (অর্থাৎ যাঁহার সদৃশ বস্তু নাই।) প্রকাশ স্বরূপ হইলেও শুদ্ধচিত্তে স্বতঃ যাঁহার প্রকাশ; যেমন শরাব প্রভৃতি বিবিধ জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্য এক হইলেও (পাত্র ভেদে) ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও, নানা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হওয়ায়, নানা বলিয়া বোধ হয়, সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

যথানেক চক্ষুঃপ্রকাশোরবির্ণ
ক্রমেন প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং।
অনেকাধিয়ো যস্তথৈক প্রবোধঃ
সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া অনেক চক্ষুর প্রকাশ্য বিষয় যুগপৎ প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক প্রবোধ (আত্মা) অনেক অন্তঃকরণ (অর্থাৎ যিনি এক হইয়া অনেক অন্তঃকরণের বিষয়কে) এককালে প্রকাশ

করেন, ক্রমে নয়; সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

যথা সূর্য্য একোঽপ্যনেকশ্চলাম্বু।
স্থির স্বপ্যনন্বস্থিভাস্ স্বরূপঃ॥
চলাম্বু প্রাভিন্নাসু ধীষেব একঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া সচল জলে অনেক এবং অচল জলে একরূপ দৃষ্ট হন, সেইরূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়া চঞ্চল নানা বুদ্ধিতে নানা প্রকার প্রতিভাত হন, নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি।

ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং
যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ় দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যেমন অতি মূঢ়ব্যক্তি, নয়ন-পথ আবৃত হইলে, সূর্য্যকে মেঘাবরণে অপ্রকাশস্বরূপ বিবেচনা করে, সেইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হইলে, অতিমূঢ় স্বপ্রকাশস্বরূপ যে চৈতন্যকে অপ্রকাশব রূপের ন্যায় বিবেচনা করে, সেই নিত্য জ্ঞানময় আত্মাই আমি।

সমস্তেষুবস্তুস্বনুস্যূতমেকং
সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধ স্বচ্ছস্বরূপং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥

অনুবাদ। যিনি সমস্ত (নানা) বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে অনুগত, অথচ এক, সমস্ত বস্তু যাঁহাকে স্পৃষ্ট (লিপ্ত) করিতে পারেনা এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত হইলেও যিনি—শুদ্ধ (রোগাদি-দোষশূন্য) এবং অমূর্ত্তস্বভাব নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি।

পাঠক! একবার দেখুন যে, বক্তার অন্তরাত্মার দৈববাণীর বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে বক্তার কথিত পরবর্ত্তিবৈদান্তিক—অর্থাৎ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টির সহিত অনন্ত ব্রহ্মের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে দর্শাইয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা অনন্ত অসীম ব্রহ্মে কি সান্ত সসীম দোষ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়?

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৪। ৫। ৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

অনুবাদ। অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চরাচর ভূত সমুদয় কারণীভূত আমাতে অবস্থিত, আমি নির্লিপ্ত বলিয়া সে সকলে অবস্থিত নহি।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

অনুবাদ। আমি নির্লিপ্ত, একারণ ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ, আমি ভূত-ধারক ও ভূতপালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথাসর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

অনুবাদ। সর্ব্বব্যাপী এবং মহান বায়ু যেরূপ অসংশ্লিষ্ট ভাবে আকাশে অবস্থিত, সমুদয় ভূত ও সেইরূপভাবে আমাতে অবস্থিত, ইহা জানিও।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।

অনুবাদ। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।

পাঠক! দেখিবেন, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্ম সসীম বা সান্ত হন নাই এবং সংস্পৃষ্ট-দোষেও দোষিত হন নাই। কিম্বা বক্তার কথিতমত একই সময় অসীম অনন্ত ও সসীম সান্ত হন্ নাই; তিনি অনাদি কাল হইতে অসীম অনন্তস্বরূপে বিরাজিত ছিলেন ও আছেন ও থাকিবেন; জগৎ-প্রকাশ দ্বারা তাঁহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বক্তার অন্তরাত্মার দৈববাণীর—বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ এবং তৎপর-বর্ত্তিবৈদান্তিকগণ ঐ দৈববাণী নানারূপ রূপক ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বৈদান্তিকগণ অনন্তের সহিত ব্যষ্টি জগতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া কোথাও ভ্রমে পতিত হন নাই, এবং এ সামঞ্জস্যের সন্ধি-স্থানে বক্তার উক্তমত শনৈঃ শনৈঃ ভ্রান্তি আসিয়া অধিকার করে নাই। উহা বক্তার কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

বক্তা পরবর্ত্তিবৈদান্তিকদিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দোষে কোন অংশে দোষী নহেন। মহাত্মা-শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের শারীরক ভাষ্যে বক্তার বর্ণিত মত দোষ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া, অতি সুন্দররূপে তাহার মীমাংসা এবং দোষক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

আপত্তি—

বিশুদ্ধ কারণ রূপ ব্রহ্মে অশুদ্ধ কার্য্যরূপ জগতের বীজ থাকায় কারণও অশুদ্ধ হয়।

মীমাংসা—

কারণ-ব্রহ্ম স্থিতি কালে বা লয়কালে অর্থাৎ কোন কালেই কার্য্য ধর্ম্মাক্রান্ত হন না। উভয় কালেই অবিকৃত থাকেন। কারণে কার্য্য-জগৎ থাকে না। যেমন স্বর্ণে কুণ্ডল, মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুত হইলেও স্বর্ণ, কুণ্ডলধর্ম্মাক্রান্ত কি মৃত্তিকা ঘটধর্ম্মা-ক্রান্ত হয় না। তবে স্বর্ণে কুণ্ডল প্রভৃতির শক্তি বা মৃত্তিকায় ঘট প্রভৃতির শক্তি গুহ্য থাকে; সেইরূপ ব্রহ্মে শক্তির বীজ গুহ্য থাকে। তাহাতে কারণ-ব্রহ্ম অশুদ্ধ হইবে কেন? (বেদান্তদর্শন।)

আপত্তি—

ব্রহ্মে যদি তপ্য-তাপক বিকার থাকে, তবে তিনি অশুদ্ধ হন। অর্থাৎ তিনি মুক্ত পুরুষ হওয়া অসম্ভব। যদি তাঁহাতে তপ্য-তাপক বিকার না থাকে, তবে নিত্য ব্রহ্মের পক্ষে তপ্য-তাপকভাব কোথা হইতে আসিবে?

মীমাংসা—

ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত, তাঁহাতে তপ্য-তাপক ভাব নাই। সত্ত্ব রজোগুণে ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব পতিত হইলে, প্রকৃত পক্ষে সেই সত্ত্বগুণই তপ্য, রজোগুণই তাপক হয়। বেদান্ত দর্শন ২য় পাদ ৬ হইতে ৯ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এ ২য় পাদের ১৭১ হইতে ১৭৩ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাতে ব্রহ্মের অনন্তত্ব ও জগতের সান্তত্ব বা ব্যষ্টিত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, সত্ত্ব-রজ-গুণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সত্ত্বগুণ তপ্য ও রজোগুণ তাপক হয়। প্রশ্ন-এ স্বত্ব-রজো-গুণ কোথা হইতে আসিল?

এই প্রশ্নের মীমাংসা যদিও মৎকৃত 'পুনর্জন্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে বিষদরূপে ব্যাখ্যাত ও সিদ্ধান্তীত হইয়াছে, তথপি বক্তার কৃত অন্যায় আরোপিত দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত সংক্ষেপে উহার উত্তর প্রদান আবশ্যক।

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব সমন্বিতা,
তমো রজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্ব শুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তেমতে,
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধ,
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রজ্ঞস্তত্রাভিমান-বান্।
তমঃ প্রধান প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া
বিয়ৎ পবন তেজোঽম্বু ভূবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥

অনুবাদ। আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহার কারণ স্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় এবং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা স্বরূপ। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধা, মায়া ও অবিদ্যা। যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন সাত্ত্বিক ভাবাপন্না হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে। এ প্রকৃতি যে সময়ে এ সত্ত্বগুণের মালিন্য ভাব আশ্রয় করে, তখন তাহাতে প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যা স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যা রূপে বিভিন্ন হইয়াছে, তাহা এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি মায়াকে বশীভূতা করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর ঈশ্বর নামে খ্যাত আছেন।

উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, যিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া 'জীব' নামে কীর্ত্তিত হয়েন, সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্য প্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞগণ সেই স্থূল শরীরকে 'বৈশ্বানর' জ্ঞান করিয়া অবিনাশী কারণ-শরীরকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণ-শরীরকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির নিদান এবং স্থূল শরীর—কেবল জীবের সুখাদি ভোগার্থ; সেই স্থূল শরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত, তাহা প্রাজ্ঞ জীবের ভোগার্থ। ইহা তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চ ভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত। ইহা হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে।

এখন এই তর্ক উঠিতে পারে; ব্রহ্ম-

প্রতিবিম্বিতা প্রকৃতি ত্রিগুণবিশিষ্টা ; ঐ ত্রিগুণের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা উভয়ই আছে। কিন্তু ব্রহ্ম সৎ—চিৎ—আনন্দ, তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতি অবিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

ইহার উত্তর অতি সহজ। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি, ঐ শক্তি ; কর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য কৃত হয় বলিয়া উহাকে প্রকৃতি কহে। চৈতন্য শক্তির অধীন নহেন, শক্তিই চৈতন্যের অধীন। তুমি জ্ঞানবান পুরুষ, শক্তি এবং কার্য্য তোমার সম্পূর্ণ অধীন। তুমি বিবেচনা ও ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার শক্তি ও কার্য্য যে ভাবে পরিচালন করিবে, সেই ভাবে পরিচালিত হইবে। যাহা-হউক, যখন তিনি অনন্ত, তখন তাঁহার শক্তিও অসীম। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড, জীব, বস্তু, মানব, সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ জীব জন্তু সমন্বিত জগৎ তাঁহার বিভূতি বা তাঁহার প্রকৃতির ভাব-প্রবাহ। ঐ ভাবের মধ্যে তাঁহার স্বরূপের যে কিঞ্চিৎ আভাস পতিত হয়, তাহাই জীব-চৈতন্য।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার শক্তির অধীন নহেন ; শক্তি তাঁহার অধীন, তিনি অনন্ত ; সুতরাং তাঁহার শক্তি হইতে আবশ্যক মত সমস্ত ভাবের বা গুণের স্ফুরণ বা বিকাশ হইতে পারে। কোন ভাব বা গুণ তাঁহার শক্তির বহির্ভূত নহে। বহির্ভূত হইলে তাঁহার অনন্তত্ব থাকেনা। মনে করুন আপনি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, কার্য্যদক্ষ ও সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। আপনি জন-সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত "মডেল্ ভগিনী" উপন্যাসের ন্যায় একখানি উপন্যাসে পাপরূপ নরকের চিত্র অতি রঞ্জিত করিয়া মানবের কর্ম্মানুরূপ ফলের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সমাজকে শিক্ষা দিলেন। ঐ পাপচিত্রগুলি আপনার কল্পনা-প্রসূত ভাবের প্রবাহ মাত্র ; কিন্তু ঐ পাপ-চিত্র রঞ্জন দ্বারা আপনাকে কি কোন পাপ স্পর্শ করিল ? অথবা আপনি স্বয়ং কি সেই পাপে লিপ্ত বা অবিশুদ্ধ হইলেন ? কখন না, কখন না ; অথচ ঐ "মডেল্ ভগিনী" উপন্যাসোক্ত পণ্ডিত রাধাশ্যাম ও বেহারের রাজা আপনার কল্পিত ভাবের বিশুদ্ধ চিত্র বা স্বর্গ এবং কমলিনী, তাহার গৃহ-শিক্ষক নগেন্দ্র, গৃহ চিকিৎসক মহেন্দ্র এবং খানসামা কপিল অবিশুদ্ধ চিত্র বা নরক। ঐ উপন্যাসটী আপনার ভাবের প্রবাহ, ঐ ভাবের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম, ত্রিগুণ বিদ্যমান আছে। সত্ত্বগুণের চিত্র পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত রাধাশ্যাম, বেহারের রাজা এবং পরে কৈলাসচন্দ্রও বটে ; রজ-তমমিশ্রিত গুণের চিত্র পূর্ব্বোক্ত কমলিনী, নগেন্দ্র, মহেন্দ্র, কপিল প্রভৃতি ; আবার সামান্য রজমিশ্রিত তমঃপ্রধান গুণের চিত্র কমলিনীর পিতার ঘোড়ার ঘাসিদার। * ঐ গ্রন্থে মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত কাশীর উলঙ্গ সন্ন্যাসী। নির্ম্মল জ্ঞান, নির্ম্মল সুখ, শম, দম, দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য্য

* কেবল তম-গুণের চিত্র না বলিয়া সামান্য রজমিশ্রিত তম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তম-গুণ হইতে জড় বস্তুর উৎপত্তি হয় ; অতএব জীব যতই অজ্ঞান ও জড়-ভাবাপন্ন হউক না কেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ

প্রভৃতি সত্বগুণের কার্য্য; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি এবং কর্ম্মের অসমস্পৃহা ইত্যাদি রজগুণের কার্য্য; ভ্রান্তি, মোহ, জড়তা, তম গুণের কার্য্য।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আপনার ভাবের প্রবাহ আপনার মন, হস্ত, কাগজ, কালী ও কলম সংযোগে যেরূপ পুস্তকাকারে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের ভাব-প্রবাহ কি প্রকারে স্থূল জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, (১) ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার মহামানস বা মহতী ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিও অনন্ত। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে ভাবের বিকাশ এবং ক্রিয়াশক্তি হইতে এই ভাবময় জগৎ উৎপন্ন বা ভাবসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জড়জীবজন্তুসমন্বিত অসংখ্য জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কালী, কলম, কাগজের ন্যায় পরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে সূক্ষ্ম স্থূলত্বে ও স্থূল সূক্ষ্মত্বে পরিণত হইয়া, এই বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ বিক্ষেপণ ও আকর্ষণাদির মূলে ঈশ্বরের হস্ত স্বরূপ একটী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে; ঐ শক্তিই ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্মের মহামানস স্বরূপই চিন্ময়ী ইচ্ছাশক্তি (Intelectual force) হইতে ঐ ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়; ঐ শক্তিকে যে চিন্ময়ী শক্তি ভিন্ন অন্ধশক্তি বলা যাইতে পারে না, জগতের যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ সর্ব্বসামঞ্জস্যই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) যেমন অদৃশ্য হাইড্রজান—অক্সিজান বাষ্প কাচ-যন্ত্র বিশেষে পূর্ণ করিয়া তাহাতে তড়িৎ পাস্ করিলে, উহা দৃশ্য তৈজস বাষ্প রূপে বিবর্ত্তিত ও তাহা দ্রবীভূত হইয়া বিন্দু২ নীহারের ন্যায় ক্ষরিত হয়; পরে ঐ বারি বিন্দু সকল একত্রিত হইয়া যে বারি-রাশি উৎপন্ন হয়, তাহা যন্ত্রবিশেষে প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূল কঠিন বরফাকারে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির ভাব-প্রবাহ তমোগুণ দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রে (পঞ্চ ভূতে) বা পঞ্চগুণবিশিষ্ট পরমাণু রূপে বিবর্ত্তিত হয় এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণাদি ও রাসায়নিক ক্রিয়াদি দ্বারা সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইয়া রূপান্তরিত হয় এবং ঐ রূপান্তরিত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া বিচিত্র ভাবময় স্থূল জগতে পরিণত হইয়াছে।

৩। যেমন হোমিওপ্যাথি ঔষধ, যত অধিক ডাইলিউসন্ করা হয়, ততই ঔষধের তেজ ও গুণ অপেক্ষাকৃত স্ফূর্ত্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ চিদাভাসময় সূক্ষ্ম ভাবসমূহ পূর্ব্বোক্ত মত স্থূল জড়জগতে পরিণত হইয়া, তদভ্যন্তরস্থ শুদ্ধ সত্বগুণের স্ফূরণ হেতু জীবদেহের উৎপত্তি হয় এবং বহু জন্মের পর ঐ জীবের মস্তিষ্কে মানস ও বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যন্ত্র প্রস্তুত এবং কল্পনা-চিন্তা, যুক্তি, বিচার, ন্যায়-অন্যায় ও সদসদ্বিবেচনার বিকাশ হয়। অর্থাৎ জড় ভাবের মধ্যে হইতে চিদাভাস স্ফূরিত হয়।

রজ-গুণের বিকাশ আছে; এমন কি, সত্ব-গুণের কিঞ্চিৎ আভাসও আছে; কিন্তু কার্য্যতঃ সত্বগুণের ক্রিয়া তমোভাবাপন্ন হওয়ায় উহা ধর্ত্তব্য নহে।

যেমন অন্ধকার গৃহে একটী দীপ মৃন্ময়-হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখিলে, ঐ দীপালোক প্রকাশিত হয় না; কিন্তু যদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মৃন্ময়পাত্র কাচপাত্রে পরিণত হয় কিম্বা স্বচ্ছ কাচের চিম্‌নির মধ্যে আলোক রক্ষিত হয়, তবে ঐ কাচের চিম্‌নি মধ্যস্থ আলোক-জ্যোতি বিকাশিত হইয়া গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ মৃত্তিকা পর্ব্বত প্রভৃতিতে জ্ঞান বা চৈতন্যের বিকাশ হয় না, কিন্তু জীব জন্তুতে কিঞ্চিৎ চিদাভাস—বিশেষতঃ মানবে জ্ঞানাভাস বিকাশিত হয়।

৫। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ এক হইলেও, যে পদার্থের উপর পতিত হয়, সেই পদার্থাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, আমরা অসংখ্য আকার বা রূপ দর্শন করি, সেইরূপ ব্রহ্মের চিদাভাসময় জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্কে (ঐ মস্তিষ্কের গুণানুসারে) ভিন্ন ২ রূপে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আমরা অসংখ্য জীব জন্তু রূপে ব্যক্ত হই। যেমন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে অসংখ্যাকারে প্রতিবিম্বিত হইলেও সূর্য্য বিকৃত বা বহু হন না, সেইরূপ চিদাভাস অসংখ্য জীব-দেহে প্রতি-বিম্বিত হইলেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিকৃত বা বহু হন না। সূর্য্য-কিরণ অপবিত্র বিষ্ঠার উপর পতিত হওয়ায় ঐ বিষ্ঠা-প্রতিবিম্বিত-জ্যোতি চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইলে বিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা যেমন সূর্য্য বা সূর্য্য কিরণ অপবিত্র হয় না, সেইরূপ চৈতন্যের জ্যোতি কুৎসিৎ পদার্থে বা হিংস্র জীব-দেহে প্রতি-বিম্বিত হওয়ায় ব্রহ্মচৈতন্য কখনও অপবিত্র হন না। * এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পরবর্ত্তিবৈদান্তিকগণ কোন ভ্রমে পতিত হন নাই, বরং প্রকৃত তত্ত্ব অতি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বক্তা তাঁহার স্বদেশীয়গণকে বহুদেব-দেবীর উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনার কার্য্য-পদ্ধতি কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। ব্রহ্ম অসীম—অনন্ত ও নিরাকার। আমরা সসীম সান্ত আকারবিশিষ্ট জীব এবং আমাদের জ্ঞানও সান্ত ও সসীম; এ জ্ঞান এক একটী ভাবের আকারে বিকাশিত হয়; অতএব সসীম সান্ত জ্ঞান কিরূপে অসীম অনন্ত নিরাকার ধারণা করিবে? অবশ্যই তিনি সচ্চিদানন্দ, সুতরাং পবিত্র সত্তা জ্ঞানা-নন্দের উপাসনাই তাঁহার উপাসনা; অর্থাৎ আত্মার সত্তা পবিত্র ভাব উচ্ছলিত হইলে, সতের উপাসনা; প্রকৃত চৈতন্য উদিত, অন্ত বিজ্ঞান স্ফুরিত ও দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হইলে চিতের উপাসনা এবং আত্মা লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, দুঃখ, প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিময় হইলে আনন্দের উপাসনা হয়। প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত উপাসনাই যথার্থ উপাসনা, কিন্তু ঐ প্রকার উপাসনার কার্য্যপদ্ধতি আবশ্যক। ঐ উপাসনা বেদান্তদর্শনে ও যোগদর্শনে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত আছে, অর্থাৎ বেদান্তোক্ত

* বালস্য বা বিষয় ভোগ রতস্য বাপি, মূর্খস্য সেবকজনস্য গৃহস্থিতস্য, এতদ্ গুরোঃ কিমপিনৈব ন চিন্তনীয়ং, রত্নং কথং ত্যজতি কোঽপ্যশুচৌ প্রবিষ্টম্।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি এবং পাতঞ্জলোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধিই উহার কার্য্যপদ্ধতি। শ্রবণ অর্থে বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রাদি শ্রবণ বা পাঠ দ্বারা তাহার অর্থোপলব্ধি, মনন অর্থে শ্রবণ দ্বারা যে অর্থোপলব্ধি হয়, চিন্তা দ্বারা তাহার প্রকৃত তত্ত্বাবিষ্কার, নিদিধ্যাসনার্থে ঐ তত্ত্ব অন্তরে প্রত্যক্ষ দর্শনের নিমিত্ত একাগ্রতার সহিত অবিচ্ছেদচিন্তা, সমাধি অর্থে ঐ অবিচ্ছেদ-চিন্তা দ্বারা অন্তরে যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তন্ময়ত্ব বুঝায়। ঐ সমাধি দ্বারা প্রথম স্থূল তত্ত্বে, তদনন্তর সূক্ষ্ম তত্ত্বে, অবশেষে সর্ব্ব কারণের কারণ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্ষ ও তাহাতে তন্ময়ত্ব লাভ হয়। কিন্তু শম (অন্তর্বৃত্তির শমতা), দম (ইন্দ্রিয়ের দমন), তিতিক্ষা শীতোষ্ণ প্রভৃতি সহিষ্ণুতা উপরতি (এক বস্তুর প্রতি মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ পূর্ব্বক অন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষাভাব) শ্রদ্ধা (ভক্তি), সমাধান (একাগ্রতা), বিবেক (সদসৎ বিবেচনা), বৈরাগ্য (ত্যাগ স্বীকার) ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ মননাদির অধিকার হয় না। পাতঞ্জলোক্ত যম নিয়মাদির একই উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপদ্ধতিও প্রায় এক রূপ। ঐ সকল কার্য্যপদ্ধতি অতীব কঠিন; ঐ শম-দমাদির সাধন করিতে হইলে, বিষয়ের ত্যাগ ও লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির দমন আবশ্যক; কিন্তু ভক্তি ও মনের উচ্ছ্বাস ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ত্যাগ ও দমন অসম্ভব। উপরোক্ত কার্য্যপদ্ধতি ভিন্ন আর এক প্রকার কার্য্যপদ্ধতি আছে। ব্রহ্ম জগন্ময়, অতএব ভেদ-নীতিরহিত ও হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের হিত সাধন, প্রাণী মাত্রের উপকার, পরিতুষ্টি এবং সাম্য-নীতির অনুসরণ দ্বারা তাঁহার উপাসনা হয়। উপরোক্ত কয়েক প্রকার উপাসনাই উচ্চ অধি-কারীর পক্ষে ব্যবস্থেয়। এই ভারতবর্ষে উচ্চ মহর্ষি ও রাজর্ষি হইতে নীচ জাতীয় বন্য গারো কুকির পর্য্যন্ত বাস আছে। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে বেদান্তোক্ত বা পাতঞ্জলোক্ত যোগ দ্বারা আত্মোন্নতি অতীব দুষ্কর, এই জন্য সিদ্ধ মহর্ষিগণ সাধারণ জনগণের ভক্তি-প্রণোদনের নিমিত্ত ঈশ্বর-প্রেরণায় এক একটী শক্তির বা তত্ত্বের গুণানুরূপ এবং কোন ২ স্থানে উচ্চতর জীবের পবিত্র চরিত্রানুরূপ (রূপক বা আদর্শ স্বরূপ) এক একটী ঐশী মূর্ত্তি আবিষ্কার ও ধ্যান প্রচার এবং পূজা-পদ্ধতির নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

যদি পবিত্রতা, জ্ঞান ও শক্তি লাভই উদ্দেশ্য হয়, তবে অজ্ঞানীর পক্ষে এক একটী ঐশী শক্তি বা সদ্‌গুণের প্রতিমা বা উচ্চতর সদ্‌ব্যক্তির আদর্শ চরিত্র বা গুণের উপাসনা বা পূজা অযৌক্তিক উপা-সনাই নহে। মানবের স্বীয় স্বভাবানুসারে প্রকৃতিসঙ্গত। স্বভাবকে হঠাৎ কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দেবোপাসনা বা মূর্ত্তিপূজা দ্বারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় উন্নতি সংসাধ্য। একটী একটী পূজা উপলক্ষে শত্রু-মিত্র অভেদ জ্ঞান, সকলকে আহ্বান, তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ভোজনাদি দ্বারা সৎকার করা হয় এবং বিনয় ও সদ্-ব্যবহার দ্বারা মনস্তুষ্টি করা হয় এবং তদ্দ্বারা অন্তরে কতকটা শান্তি লাভ হয়। ঐ দেব-

মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজাদি দ্বারা মন পবিত্র হয়। ঐ মূর্ত্তিময়ী ঐশী বিচ্ছক্তির কৃপা লাভ হয়।

মূর্ত্তিপূজা বা সাকারউপাসনার প্রকৃত ফল আমার কৃত "উপাসনতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে (যাহা "অনুসন্ধান" নামক মাসিক পত্রে ১৩০১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল) বিশদভাবে ব্যাখ্যাত আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পুনঃ বর্ণনায় নিরস্ত হইলাম। যাহাহউক, সাকার উপাসনার যথেষ্ট ফল আছে; উহা বক্তার কথিত মত ন্যায়-অন্যায়-বিচার রহিত অন্ধ-বিশ্বাসের কার্য্য নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বক্তা থিয়সফিষ্ট-দিগের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, উহা ভিত্তিশূন্য, যেহেতু থিয়সফিষ্টগণ তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অস্বীকার করেন নাই। তবে জগতের সর্ব্ব প্রকার কারণ পরব্রহ্ম, অনাদি, অব্যক্তের অব্যক্ত এবং মন-বুদ্ধির অতীত। ঐ প্রথম কারণ সৎও নহে, অসৎও নহে, অথচ ঐ প্রথম কারণ হইতে সদসৎ সমস্তই বিকাশিত হইয়াছে। সৎই চিৎশক্তি, উহাকেই থিয়সফিষ্টগণ সমগ্র উদ্যমের কেন্দ্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, উহাই সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যাহাহউক, থিয়সফিষ্টদিগকে সমর্থন করা এবং তাহাদের গ্রন্থাদির সমালোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, থিয়সফিষ্টগণ প্রাচীন বেদান্ত-মতের বিরোধী নহেন এবং বক্তার উল্লিখিত মত হিন্দুদিগের শত্রুও নহেন। তাঁহারা বেদান্তপ্রমুখ দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের সহিত মিল করিয়া অতি সরল ভাবে প্রকাশ করায়, তাঁহারা হিন্দুদিগের পরম মিত্র এবং ধন্যবাদের পাত্র, তাহার সন্দেহ নাই। বক্তা যদি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি-প্রণীত "সিকরেট্ ডকট্রিন্" নামক গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থখানি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে উঁহা-দিগকে প্রাচীন বেদান্ত মতের বিরোধী বলিতে সাহসী হইতেন না। উক্ত গ্রন্থ উপনিষদ্ ও বেদান্ত প্রমুখ দর্শন ও তত্ত্ব-শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত অতি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহাহউক, উক্ত গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা শঙ্করাচার্য্যের মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যযুক্ত। উক্ত শঙ্করাচার্য্যের মত যে প্রাচীন বেদান্তসম্মত, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে; অবশেষে বক্তব্য এই যে, শঙ্করা-চার্য্যের ভাষ্যোল্লিখিত মায়াবাদ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। ঐ মায়াবাদ বেদের অতি প্রাচীন নারদীয় সূক্তে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে এবং ঐ সূক্তে মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ঐ মায়াবাদ যে স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত, তাহা উক্ত "সিক্রেট্ ডক্ট্রিন্" গ্রন্থ (গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা) পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তদ্ভিন্ন এই হিন্দুপত্রিকার 'পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। বক্তা বোধ হয় মায়ার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, এই জন্যই উক্ত মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি দোষ আরোপিত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাহউক, উহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি যে কোনরূপ দোষ আরোপিত হইতে

পারে না, তাহা এই প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে; অলমতিবিস্তরেণ।

দার্শনিক মীমাংসা-প্রণেতা
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক কি? শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব-কৃত ও 'পদ্মাবলী'-ধৃত বৈষ্ণব-সারশিক্ষা-স্বরূপ শ্লোকাষ্টক। এই শ্লোকাষ্টক তাঁহার স্বরচিত, স্বয়মাস্বাদিত এবং জীব-শিক্ষা-ছলে শ্রীমুখনির্গত। কলির জীব দীন মানবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি কলি-ক্লিষ্ট আর্ত্ত মানব-সমাজের ভগবদ্ভজনের কৃপা-কল্পতরু গুরু হইয়া আসিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অলৌকিক ও অনুপম কৃষ্ণভজন জীবকে দেখাইয়া, শিখাইয়া, লিখাইয়াও গিয়াছেন। স্বনাম-বরণীয় প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর বৈষ্ণব-হৃদয়-রত্নস্বরূপ সন্দর্ভ-সমূহ শ্রীগৌরাঙ্গেরই আদিষ্ট, উপদিষ্ট ও স্বশিক্ষাবিনিবিষ্ট। তৎ সমস্তেরই সার-নিষ্কর্ষ (Extract) গৌরাঙ্গেরই স্বমুখ-বিবৃত এবং স্বয়ংসাধিত ও আস্বাদিত ঐ 'শিক্ষাষ্টক'। গৌরাঙ্গ-শিক্ষা-ক্ষীরাব্ধির মন্থনোৎপন্ন সুধাস্বরূপ এ শিক্ষাষ্টক। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ স্বরূপ—কলির জীবের হরি-তত্ত্ব-চিন্তামণি-হারের মধ্য-মণিই এ শিক্ষাষ্টক। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" বলিতেছেন,—

"পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক-শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক যে আপনে আস্বাদিল॥
প্রভু-শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥"

কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। যে শিক্ষাষ্টকের শ্রবণ-কীর্ত্তন-মননাদি রূপ সাধনে সে সম্পদের আস্পদ হওয়ার আশা করা যায়, তাহা যে কিরূপ প্রাণ-প্রিয় বস্তু, বলাই বাহুল্য।

ভাবুক ভক্ত বুঝিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই শিক্ষাষ্টকই মানবের সমস্ত অধ্যাত্ম-প্রয়োজনের সম্যক্ আয়োজনে সুসম্পন্ন। এই শ্লোকাষ্টকেই গীতা, ভাগবত, ভক্তি-সূত্র, উপনিষৎ, সমস্তই বর্ত্তমান। বলিতে কি, বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার-সৌরভ(Essence)স্বরূপ "শিক্ষাষ্টক"আখ্যাত ঐ সুবিখ্যাত শ্লোকাষ্টক। আপাততঃ অতি স্থূল দৃষ্টিতে এ শ্লোকাষ্টক বিভিন্ন ভাবের কতিপয় বৈষ্ণবী কবিতা মাত্র বোধ হইতে পারে; কিন্তু ভাবুক উপাসক উহার তত্ত্বার্থ-রস-কূপে যত পশিবেন, ততই রসিবেন; উহার তলাও পাইবেন না, উঠিতেও চাহিবেন না। অন্ততঃ গোস্বামী প্রভুগণের এই সাক্ষ্য। "অন্ততঃ" বলিলাম এই জন্য যে, আমাদের সুসংকীর্ণ হৃদয় হয়ত সে ভাব-সিন্ধুর বিন্দু-বিসর্গেই প্লাবিত হইয়া যায়, সুতরাং পূর্ণ প্রতীতির আশা পরিষ্কার দুরাশা। তবে কিনা, সুপক্ক সৌরভ-গৌরবিত সুরস অমৃত-ফলের ঈষদাঘ্রাণও আনন্দপ্রদ, মনোহর ও স্বাস্থ্যকর। কথাই আছে,—"ঘ্রাণেন চার্দ্ধভোজনং"। যার আপাততঃ ভোজনের আশা নাই, তার এবম্বিধ অর্দ্ধ-ভোজনও একটু উপকারী। অন্ততঃ ইহাতে ভোজন-লালসা বর্দ্ধিত হয়। লালসা হইতে

চেষ্টা, চেষ্টা হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে ফল। যাহাহউক, আমরা এইরূপ আশার বিচার অবলম্বন করিয়াই "শিক্ষাষ্টক" বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন ও নিবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম। বৈষ্ণব-সমাজে এই শিক্ষাষ্টক সুপরিচিত। তন্মধ্যে স্বতঃসাধু-মণ্ডলে ইহা স্বতএব আস্বাদিত ও সাধিত। তবে কি না, ব্যবহার না জানিলেও যেমন সুন্দর জিনিসটি নাড়াচাড়া করিতে শিশুর সাধ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই শিক্ষাষ্টক লইয়া আমাদের নাড়াচাড়া করাও তদ্বৎ। যাহাহউক, নিম্নে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইল।

(১)

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং
বিদ্যাবধূ-জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণা-
মৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

অন্বয়।—(এ শ্লোকের অন্বয় প্রায় ইহার পুনরাবৃত্তি মাত্র; কেবল শেষ চরণে "শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং পরং বিজয়তে" এইরূপ করিলেই হয়।)

পদ্যানুবাদ।—

চিত্ত-দরপণ হয় মার্জ্জিত যাহায়।
ভব-মহাদাবদাহ নির্ব্বাপিত যায়॥
কুশল-কুমুদে যাহা কৌমুদী-বর্ষণ।
যাহা হয় বিদ্যারূপা বধূর জীবন॥
আনন্দ-অমৃতসিন্ধু যাহাতে বর্দ্ধিত।
প্রতিপদে পূর্ণামৃত যাহে আস্বাদিত॥
সর্ব্বাত্মা সুস্নিগ্ধ অভিসিঞ্চনে যাহার।
সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয়জয়কার॥

(২)

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন
কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্ মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অন্বয়।—নাম্নাম্ বহুধা অকারি। তত্র নিজ সর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা; স্মরণে কালঃ ন নিয়মিতঃ। ভগবন্! তব এতাদৃশী কৃপা, মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং, ইহ অনুরাগঃ ন অজনি।

পদ্যানুবাদ।—

আপনার বহুনাম করি বিস্তারিত।
নিজ সর্ব্বশক্তি তায় করিলা অর্পিত॥
সেই নাম সকলের স্মরণ কারণ।
না করিলা কোনরূপ কাল-নির্দ্ধারণ॥
ভগবন্! হেন দয়া তব, কিন্তু হায়।
আমারো দুর্দ্দৈব হেন, রতি নাহি তায়॥

(৩)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি
সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ॥

অন্বয়।—(আর সমস্তই যথাবৎ; কেবল শেষে—হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ (ভবতি), এই মাত্র।)

পদ্যানুবাদ।—

তৃণ হতে নীচ হয়ে, সহিষ্ণু তরুর চেয়ে,
আপনি অমানী হয়ে, অন্যে যে মানদ।
তারি দ্বারা কীর্ত্তনীয় শ্রীহরি সতত॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি॥

অন্বয়।—জগদীশ! ধনং ন, জনং ন, সুন্দরীং ন, কবিতাং বা (ন) কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ত্বয়ি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ।

পদ্যানুবাদ।—

জগদীশ! ধন, জন, সুন্দরী, কবিত্ব,
এ সকল কামনা না করে মম চিত্ত।
তুমি হে ঈশ্বর, যেন তোমাতে নিশ্চয়—
জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি মোর হয়।

(৫)

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-
সদৃশং বিচিন্তয়॥

অন্বয়।—অয়ি নন্দতনুজ! বিষমে ভবাম্বুধৌ পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।

পদ্যানুবাদ।—

হে নন্দতনুজ! ভীম ভব-পারাবার-
নীরে নিপতিত এই কিঙ্কর তোমার।
তব পদপঙ্কজের ধূলি-কণা প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করি রাখ (হরি) পায়।

(৬)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদ-
রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-
গ্রহণে ভবিষ্যতি।

অন্বয়।—তব নাম গ্রহণে, গলদশ্রুধারয়া নয়নং, গদগদরুদ্ধয়া গিরা বদনং, পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ (চ) কদা ভবিষ্যতি।

পদ্যানুবাদ।—

গলদশ্রুধারে কবে ভাসিবে নয়ন।
বদনে গদগদ রুদ্ধ হইবে বচন॥
কবে হবে পুলকেতে লোমাঞ্চিত গাত্র।
(হরি হে!) নামটি তব উচ্চারণ মাত্র॥

(৭)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃ-
ষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-
বিরহেণ মে॥

অন্বয়।—গোবিন্দ-বিরহেণ মে (মম) নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং, সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং (ভবতি)।

পদ্যানুবাদ।—

নিমেষে যুগান্ত মম, বর্ষা সম ঝরে আঁখি।
সমস্ত জগৎ শূন্য গোবিন্দ-বিরহে দেখি॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

অন্বয়।—পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য পিনষ্টু বা, অদর্শনাৎ (মাং) মর্ম্মহতাং করোতু বা; লম্পটঃ যথা তথা বা বিদধাতু; তু (কিন্তু) সঃ মৎ-প্রাণনাথঃ এব, ন অপরঃ।

পদ্যানুবাদ।—

প্রেমাবেশে বাহুপাশে বাঁধিয়া সে জোরে।
পেষণ করুক্ এই পদরতা মোরে॥
অথবা দর্শনদান না করিয়া হায়।
পরম মরমহতা করুক্ আমায়॥
সে লম্পট যা খুসি তা করুক্ বিধান।
আমারি সে প্রাণনাথ—নহে কভু আন॥

প্রথম শ্লোকে সাধকের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। একটী প্রাচীন নাম-সংকীর্ত্তন-পদে আছে—"হরি হৈতে হরির নাম বড় ধন"। কথাটি লইয়া শুষ্ক তর্ক উঠাইলে রস পাওয়া যাইবে না—লাভ কিছু হইবে না। মোটামুটি এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, তত্ত্বরূপী হরিকে কে পায়? কিন্তু নামরূপী হরিকে অর্থাৎ হরি-নামকে সকলেই পাইতে পারে; এই নামস্বরূপ হরি সকলের সুলভ; অথচ নাম ও নামী অভিন্ন।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ।"

"হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে ইহার ভাবানুবাদ, যথা—

'কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অনাদিচিন্ময়।
যেই কৃষ্ণ সেই নাম—এক তত্ত্ব হয়॥
চৈতন্যবিগ্রহ নাম—নিত্য মুক্ততত্ত্ব।
নাম-নামী ভিন্ন নয়, পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্ব॥

ফলে পুরাণাদি বহু শাস্ত্রবাক্যেই হরি ও হরিনামের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত।

"সেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত র'ন আপনি শ্রীহরি॥"

এই তত্ত্বামৃত বৈষ্ণবসমাজে সাদরে আস্বাদিত।

'বিশ্বব্যাপী সে হরি, নরে করুণা করি,
হরিনামের মাঝে নাগর-সাজে নাচে আমরি!"

শ্রীহরির বিশ্বব্যাপী একান্ত-ঐশ্বর্য্য-সত্তায় সারতত্ত্ব পরিমিতগ্রাহী ক্ষুদ্র জীবের জন্য মাধুর্য্য-সত্তায় ক্ষুদ্ররসনায়ত্ত নামে বিরাজিত! ইহা অপেক্ষা কৃপা আর কি হইতে পারে? নামে ঐশ্বর্য্য-শক্তিও অপরিসীম। নাম-বলে কি না হইতে পারে? অধিক কথায় কাজ কি, নামেই যখন নামীকে পাই, তখন আর কি চাই? নামে নামীর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, উভয় তত্ত্বই উপেত।

"নাম ধর, নাম স্মর, নাম কর ভাই।
নামে কৃষ্ণ বিনিবিষ্ট, নামে কৃষ্ণ পাই॥"

আবার শাস্ত্র বলেন, "জপাৎ সিদ্ধিঃ।" মন্ত্রজপ—নামজপ একই। নামই মন্ত্র, মন্ত্রই নাম। 'বীজ' সকল উপাস্য ঐশতত্ত্বেরই রাশি-নাম স্বরূপ, অথবা সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক নাম বা 'বর্ণ-ব্রহ্ম'ও বলা যায়।

জপ-সাধনে—নাম-মন্ত্রের প্রত্যেক বিশুদ্ধ মননে ভগবদাকর্ষণ হয়।

"নাম সেব, নাম ভাব, নাম জপ ভাই।
নাম-সূত্র ধরি ধরি হরিধনে পাই॥
নাম লও, নাম কও, নাম গাও ভাই।
কীর্ত্তনে মিলান কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই॥"

এতাবতা সিদ্ধান্ত এই যে, স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভিন্ন হইলেও, নামে সুলভতা-

রূপ ভাবটি অধিক বলিয়াই "হরি হইতে হরির নাম বড় ধন।"

পৌরাণিক উদাহরণেও এ তত্ত্ব প্রমাণিত। সত্যভামার ব্রতে হরিনামের সহিত হরির তুলাযন্ত্রে আরোহণ ও নামের গৌরব-প্রতিষ্ঠাপন-লীলার বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। ইহাতে ফলিতার্থে হরির লাঘব হয় নাই; কারণ নামের যে গৌরব, তাহা তাঁহার নাম বলিয়াই, এবং তাঁহারই সর্ব্বশক্তি নামে সঞ্চিত বলিয়াই।

"তোমাতে মজিনি শ্যাম! মজেছি বাঁশীতে।
কুটিল কটাক্ষে আর মধুর হাঁসিতে॥"

এ কথায়, শ্যামের কুটিল কটাক্ষ, মধুর হাঁসি, আর সেই "কুল-মজানো" মোহন বাঁশী, এ সবের গৌরব-ঘোষণায় কি বস্তুতঃ শ্যামের লাঘব হইয়াছে? ফলে ও সব শ্যামের বলিয়াই এত গৌরবের! নামের বিষয়টি তাহারও অধিক; কারণ এস্থলে শ্যামের হাসি, বাঁশী, কটাক্ষ ইত্যাদি সমস্ত উপকরণ সহ সমগ্র শ্যামতত্ত্বই নাম-নিহিত! অতএব কেবল হরির নাম বলিয়াই "হরিনাম" এত গৌরবের নয়; পরন্তু নাম স্বয়ং হরি বলিয়াই এ গৌরব। হরির ইচ্ছাতেই হরির সহিত হরিনামের চির একীভবন এবং হরির কৃপাতেই "হরি হইতে হরির নাম বড় ধন!" তবে কিনা, শুধু কথার আলোচনায় এ তত্ত্ব হৃদগত হইবার নহে। শুধু বাগ্বিস্তার-বিচারণায় এ সিদ্ধান্ত সমাহিত হইবার নহে; কার্য্যতঃ সাধনা চাই। যেমন কোন রসময় বস্তুর রসবোধ আস্বাদন ব্যতীত কেবল দর্শন-স্পর্শনাদিতেই হইতে পারে না, তদ্রূপ সাধ্য বস্তুর তত্ত্ববোধ সাধনা ভিন্ন কেবল বচন-রচনা বা তর্কালোচনা দ্বারা সম্ভাবিত নহে। এই জন্যই কলির অনন্য-আরাধ্যসত্ত্ব ভগবন্নাম তত্ত্ব লাভার্থে সংকীর্ত্তন দ্বারা তৎসাধনার ব্যবস্থা।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হরি-নাম হরি-নাম হরি-নাম সার।
নাই নাই নাই গতি কলি কালে আর॥

কলিতে হরি-নাম অর্থাৎ হরির নাম ভিন্ন গতি নাই। মূলেও "হরের্নাম" (হরির নাম) এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ আছে। অর্থাৎ হরির যে কোন নাম-মন্ত্র এস্থলে লক্ষিত। কেবল "হরি" এই শব্দাত্মক নামটি মাত্র নয়; কিন্তু হরি, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোবিন্দ, গোপাল, বাসুদেব, ইত্যাদি নামগুলি সমস্তই পরিত্রাতা, মোক্ষদাতা, শাশ্বতশান্তিবিধাতা;—আবার (নাম-বিশেষে) নাম মোক্ষাধিক ধন মধুর আত্মসমর্পণ ও তদ্গত সাক্ষাৎ-সেবা-প্রেমানন্দ প্রদাতা। ফলে ভগন্নামনিচয় সমস্তই মন্ত্রময়। সমস্তই 'ইষ্ট' ও ভক্তের কাছে সমস্তই সুমিষ্ট। তারপর, যার যে নামাত্মক মন্ত্রে উপাসনা, তার সেই নামই একান্ত আত্মঘনিষ্ঠ। তাহার মনোপ্রাণ তাহাতেই নিতান্ত নিষ্ঠ ও নিত্য-নিবিষ্ট। আবার এক ভাবে তত্ত্বতঃ অভিন্নত্ব থাকিলেও, ভাবান্তরে অভ্যন্তরে নাম-ভেদে মন্ত্র-ভেদ, মন্ত্রভেদে ভজন-ভেদ, ভজন-ভেদে ভাবাশ্রয়-ভেদ, ভাবাশ্রয়-ভেদে সিদ্ধি বা প্রাপ্তি-ভেদ ব্যবস্থিত।

"যে ভাবে যে ভাবে, সে ভাবে সে পাবে।
ভবে ভাবময় ব্যক্ত ভক্ত-ভাবে॥"

শ্রীভগবান স্ব-শ্রীমুখে গীতায় গাহিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শ্রীচরিতামৃতকার এবিষয়ে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যেই যৈছে ভজে কৃষ্ণে, কৃষ্ণ ভজে তৈছে॥"

ফলে আমাদের এতৎপ্রসঙ্গে অধিক অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। গূঢ় ভজন-তত্ত্বের আলোচনা অস্মদীয় অধমাধিকারের অতি দূরবর্ত্তী।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

সত্যযুগে ধ্যানযোগে বিষ্ণুর ভজন।
ত্রেতায় যজ্ঞেতে যজ্ঞেশ্বরের যজন॥
দ্বাপরে হরি-সাধন সিদ্ধ অর্চ্চনায়।
কলিকালে হরিসঙ্কীর্ত্তনে হরি পায়॥

অপিচ—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

সত্যযুগে ধ্যান ধরি, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করি,
দ্বাপর যুগেতে অর্চ্চনায়।
পায় নর যেই ফলে, কেশব-কীর্ত্তন-ফলে
সেই ফল কলিযুগে পায়।

কলিযুগের ভগবদ্ভজন বিষয়ে নাম সংকীর্ত্তনের ঐকান্তিক আবশ্যকতা আরও অনেক শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে; বাহুল্য-ভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না।

কলির জীবের সামর্থ্য স্বল্প, আয়ু অল্প, স্বাস্থ্য ভগ্ন, দেহ রুগ্ন, বুদ্ধি দুর্ব্বলা, প্রবৃত্তি প্রবলা। স্বভাবতঃই "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—" বিশেষতঃ এই কলিযুগে। এ যুগে কুসঙ্গ যত্র তত্র, পাপ-প্রলোভন সর্ব্বত্র। এ যুগে ধরিয়া তুলিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্তু ঠেলিয়া ফেলিতে প্রায় প্রত্যেকেই পটু! এমন অবস্থায়, এত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, কলির এই সুদীনসত্ত্ব মানব কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? কিরূপে পরমার্থসাধনে সমর্থ হইবে? তাই দয়াল ভগবান জীবের অবস্থা বুঝিইয়াই এমন সুলভ উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রোগ সাংঘাতিক, রোগী 'এখন তখন'—এই সময়ে কবিরাজ মহাশয় ঔষধ-বকালের প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দাখিল করিলেই প্রতুল! তাহাতে যে "লুণ আনিতেই পান্তা ফুরায়"! তখন সুসংক্ষিপ্তপদ—অথচ মহাশক্তিসম্পন্ন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা যিনি করিতে পারেন, তিনিই সুচিকিৎসক। ভব-ব্যাধি বৈদ্য ভগবান কলির মুমূর্ষু জীবের জন্য তাহাই করিয়াছেন।

"ভব-ব্যাধি বিকারের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ।
হরিনামামৃত-বিন্দু মহামুষ্টিযোগ॥"

সর্ব্বৌষধি-সার এই হরিনাম রস। আমরাও ভব রোগে 'এখন তখন'! অতএব "শুভস্য শীঘ্রং"। স্বয়ং কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদ্যরাজ হইয়া, স্বহৃদয়-শুক্তিতে মাড়িয়া, স্বভক্তি রসে গুলিয়া, স্বপ্রেম মধুর প্রক্ষেপ দিয়া, স্ব-শ্রীহস্তে কলি-জীব-কণ্ঠে এ মহৌষধ ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা শুধু ঢোক্ গিলিতেই 'ওক্' তুলিতেছি! বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? যিনি গিলিলেন, তিনি উঠিয়া বসিলেন; যিনি

ফেলিলেন, তিনি চলিলেন! একটী মেয়েলী প্রবাদ আছে, "বড় সুহৃদ্ হয়, 'গালে তুলে দ্যায়, না গিল্‌লে কে গিলায়?" কাতর রোগীর কণ্ঠে ঔষধ ঢালিয়া দিতে হয়; দয়াল গৌরাঙ্গ তাহাই দিয়াছেন! কিন্তু আমরা না গিলিয়া মারা গেলে আর চারা কি?

ঔষধে ভক্তি ও গিলিবার শক্তি বর্দ্ধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীমুখে সুবিখ্যাত শিক্ষা-শ্লোকাষ্টকের প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই কলির ভব-রোগ-রসায়ন; অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যই বিবৃত ও বিস্তরিত হইয়াছে।

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং"। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন স্বরূপ। অমার্জ্জিত মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। মনের আরসিখানি ময়লা থাকিলে, মনোমোহনের হাসি-মুখটি তায় ফোটে না। মন ঠিক আরসিই বটে। "আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত" সমগ্র বিশ্বই ইহাতে বিম্বিত হয়। কিন্তু দর্পণের মার্জ্জন চাই; নচেৎ ইহার প্রতিবিম্ব-গ্রাহিণী প্রতিভা বিনষ্ট হয়। অতএব এই মহাদর্পণ মনের মোহ-মল-মার্জ্জনই মানবের প্রধান সাধন। ইহাকেই শাস্ত্র "চিত্তশুদ্ধি" বলিয়াছেন। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—পুরাণের ভাষায় 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' ভগবদুপাসনা। এই ভগবদুপাসনার প্রবেশ-দ্বার এই চিত্তশুদ্ধি সাধন। এই সাধনের সাধনার্থেও আবার ভজন চাই। সেই ভজনই এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। ইহাই "চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং।"

চিত্ত শুদ্ধি ও উপাসনায় পরস্পর জন্য-জনকতা সম্বন্ধ; অর্থাৎ পরস্পর আপেক্ষিক (Co-relative)। চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন উপাসনা হয় না, এবং উপাসনা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। প্রথমতঃ এই চিত্তশুদ্ধির জন্যই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ পরমোপাসনা। আবার চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইলে, এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-উপাসনায়, প্রতি কৃষ্ণনামে কৃষ্ণকে পাইয়া প্রাণ জুড়াইবে; জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক হইবে; জীব কৃষ্ণদাসত্ব রূপ 'হারানিধি' পাইয়া কৃতার্থ হইবে। কৃষ্ণপদ-সেবক-পদই জীবের চরম ও পরম সম্পদ। এই পদ হারাইয়াই জীবের বিপদ। দুশ্ছেদ্যমায়া-শৃঙ্খল-ভার, ভীম ভব-কারাগার, কামাদির অসহ্য অত্যাচার; সুতরাং হাহাকার—অশ্রুধার! অন্তরে নিরন্তর ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার! এ বিপদে এক মাত্র উপায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

চিত্তশুদ্ধির জন্য অগ্রেই শ্রবণ-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনে শ্রবণও হয়; সুতরাং যুগপৎ-উভয়-সিদ্ধি-হেতুক কীর্ত্তনই চিত্তশুদ্ধির পরম সাধন। এতৎফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই শুদ্ধচিত্তে "স্মরণ" অর্থাৎ ধ্যানের যন্ত্রস্থাপন হয়। পরে ক্রমে পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও নবলক্ষণা ভক্তির নবম বা চরম-লক্ষণ আত্মনিবেদনে ভক্ত কৃতার্থ হন।

প্রাথমিক কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনরূপ সাধনা-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সিদ্ধ হওয়ার পরে, সেই শুদ্ধ চিত্তের কৃষ্ণনাম-সাধন ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব-রসাস্বাদন একই কথা। এই জন্যই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন দ্বারাই

কৃষ্ণ সাধন-ব্যবস্থা। ফলিতার্থে যাহা সাধন, তাহাই সাধ্য ; যাহা ঔষধ, তাহাই খাদ্য। এমন সুখাদ্য ঔষধও আর নাই, এমন ঔষধ-ময় খাদ্যও আর নাই! অতএব "চেতো-দর্পণমার্জ্জনং" ইত্যাদি গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে জীবদুঃখ-দয়ার্দ্র গৌরাঙ্গদেব ইহা জীবের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন!

"ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।" শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ সংসারকে অনেকস্থলে অরণ্য-সাদৃশ্যে "ভবাটবী" "ভবারণ্যং ঘোরং" ইত্যাদি বলিয়াছেন। বনের প্রধান বিপদ দাবাগ্নি বা বনাগ্নি। তাহাতেই বন ও বনবাসী, উভয়েরই সর্ব্বনাশ। আমরাও "ভবাটবিনিবাসিনঃ"—সুতরাং বিষয়-বাসনা-দাবানলে আমরা অহরহ দহ্যমান। শাস্ত্রেও বাসনাকে বহ্নিশিখা সহই উপমিতা করা হইয়াছে ; আর উপভোগকে বলা হইয়াছে বিষয়রূপ ঘৃতাহুতি। মনু বলেন,—

"ন জাতু কামঃকামানামুপভোগেন
শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"
উপভোগে বাসনা হয় না প্রশমিত।
ঘৃতাহুতিযোগে বহ্নি শিখাই বর্দ্ধিত॥

বাসনায় লক লক বহ্নিশিখা বিশ্বলেহন করিয়াও নির্ব্বাপিত হয় না ; অবশেষে নিজের আগুণে নিজে পুড়িয়া মরে। দাবাগ্নি বনের বৃক্ষ-কাষ্ঠে আশ্রয় নিয়া, বন পোড়াইতে পোড়াইতে—নিজের আধার বিস্তৃত ও অধিকার বর্দ্ধিত করিতে করিতে—বনবাসী প্রাণীগণকে পোড়াইয়া, অবশেষে নিজের আশ্রয় সমেত নিজে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। দাবাগ্নির এই প্রকৃতি বাসনাগ্নিরই অনুরূপ। বাসনাগ্নি জীবকে কোটিকল্প পোড়াইয়া, অবশেষে ভোগাবসানে নিজে পুড়িয়া ভস্ম হয়। সেই ভস্ম মাখিয়াই জীব শিব সাজে! যাহাহউক, ভীষণ ভবারণ্যে বিষম-বিষয়-বাসনা দাবদাহ। এ দারুণ দাবানলে জীবের ইহকাল-পরকাল সব পুড়িল—জীবের কপাল পুড়িল! এ দিগ্দাহ—সর্ব্বদাহ নির্ব্বাপণের কি কোন উপায় নাই? দয়াল গৌরাঙ্গ বলেন,—আছে কৃষ্ণকীর্ত্তন! উহাই "ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।"

"দহে ভব-দাব-জীব বাসনা-দাবদাহন।
হরিনাম-বরিষায় পায় সর্ব্ব-নির্ব্বাপণ॥"

হরিনাম সুধা রস সিঞ্চনে ভবের সকল জ্বালা জুড়ায়। হরিনাম-বর্ষাধারা বর্ষণে ভব-দাবানল নির্ব্বাপিত হয়। এই ভবদাবানল-নির্ব্বাণকেই ভক্তি-মার্গীয় ভাগবত-ধর্ম্মের 'নির্ব্বাণ' বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণ বা সাযুজ্য-নির্ব্বাণঃভক্তের পিপাসার জল নহে। শাক্তভক্তচূড়ামণি শ্রীরামপ্রসাদ কি মনোহর ও গোচ্চর কথাই বলিয়াছেন—"চিনি হতে চাইনে মা! চিনি খেতে ভাল-বাসি।"

ভবতাপ-প্রতাপ প্রশমিত নাহইলে, যথার্থ ভগবৎসেবার অধিকারই হয় না। নিজের একটা জ্বালা-যন্ত্রণা লইয়া, তজ্জনিত একটা প্রকাণ্ড নিজত্ব-(আমিত্ব) বোধের বোঝা লইয়া কি প্রাণেশ্বরের সেবা করা যায়? জ্বালায় প্রাণ দিলে আর 'কালায়' প্রাণ দিতে প্রাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? তবে কি না, কালায় প্রাণ দিলে যে জ্বালা, সে ত ভক্তের গলার মালা! বিষয়-বাসনা থাকিতে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হয়না। অহৈতুকী

ভক্তি ভিন্ন আত্মনিবেদন হয় না। আত্মনিবেদন ভিন্ন প্রকৃত ভজন বা কৃষ্ণ-সেবনও হয় না। একটি পদে আছে,—

"না গেলে প্রেম ষোলআনা,—
(আমার) ষোলকলা কালোশশীর মন ত ওঠেনা"

অতএব কৃষ্ণ-কীর্ত্তনামৃতসিঞ্চনে ভবমহা-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলে, ষোলআনা মনটি কৃষ্ণে সমর্পণ—অর্থাৎ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্ম-নিবেদন কদাচ সম্ভাবিত নহে।

"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং।"

অর্থাৎ জীবের কুশলরূপ কুমুদ বিকশিত করিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনই চন্দ্র-কর-বর্ষণ স্বরূপ। তাপ ও প্রভা, বহ্নির এই দুটি ধর্ম্ম। প্রভার আলোক-আহ্লাদন ক্রিয়া, তাপের দহন-নির্যাতন-ক্রিয়া। চন্দ্রিকার প্রভা আছে, কিন্তু তাপ নাই। চদি ধাতুর অর্থই আহ্লাদন। আহ্লাদময়ী চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ সম্ভাষণে আহ্লাদে কুমুদ হাসিয়া উঠে। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের চিরসুধাময়ী চন্দ্রিকাচুম্বনে জীবের জীবন-সরোবরে "প্রেমানন্দভরে কুশল-কুমুদ-রাশিও হাসিয়া উঠে।

আবার চন্দ্রকে শাস্ত্রে 'মন' বলিয়াছেন। বেদ পুরাণাদিতে বিরাট পুরুষের দেহ বর্ণন-স্থলে চন্দ্রকে তাঁহার 'মন' বলা হইয়াছে। আরো বহুশাস্ত্রের বহুস্থানে মনকে চন্দ্র এবং চন্দ্রকে মন বলা হইয়াছে। এই তত্ত্ববাদিনী একাধিকা ঔপনিষদী শ্রুতিও রহিয়াছে। ফলে চন্দ্রতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বে আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক একত্ব-সম্বন্ধ-রহস্য বর্ত্তমান। অতএব মনশ্চন্দ্র-কিরণেই কুশল-কুমুদরাশি বিকাশিত হয়। যখন মনশ্চন্দ্র অবিদ্যা-মেঘাবৃত, তখন তাঁহার কিরণ-সুধাবর্ষণ ও কুশল-কুমুদ-হর্ষণ, উভয় কর্ম্মই স্থগিত।

কিন্তু—"সেই চাঁদ-মুখ হেঁসে উঠে।
অগ্নি জলে কুমুদ ফোটে॥"

ফলে আমাদের মনটি মোহ-মেঘ-মুক্ত দিব্য প্রভাযুক্ত না হলে আর কুশলের আশা নাই। সোজা কথা—মন ভাল না হলে মঙ্গল নাই। মঙ্গল কেবল সাত্ত্বিক মনঃপ্রসন্নতার ফল। এই মায়া-মোহ, পাপ-তাপ, রোগ-শোক, জরা-মৃত্যুময় সংসারে মঙ্গল কোথায়? যে ভগবান ভগবদ্ভক্ত জগতের প্রতিকার্য্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-হস্ত দর্শন করেন; যিনি ঈশ্বরের "করালবদনাং ঘোরাং" কাল-শক্তিকে "স্মেরাননসরোরুহাং" দর্শন করেন, যিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ঈশ্বরের প্রচণ্ড দণ্ডকেও অনুগ্রহ স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মনস্বী ও যথার্থ শ্রেয়ো-লাভের অধিকারী। একটি বঙ্গীয় প্রবাদ-পদ্য এই—

"মন যার ভাল, সেই আছে ভাল।
নিত্য হয় আয়ুক্ষয়, কুশল কোথা বল?"

আর কিছু অকুশল হঠাৎ না বুঝিলেও, "কুতঃ কুশলমস্মাকমায়ুর্যাতি দিনে দিনে" বাক্যটীর সত্যতা আমরা কতকটা স্বতঃই বুঝিতে পারি। কিন্তু আয়ুক্ষয়ও ভগবানের প্রাকৃতিক বিধান; অতএব ভক্তের দৃষ্টিতে তাহাও অকুশল নহে। "সাধুর জীবন-মৃত্যু একই সমান।" এই অনিত্য পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকে চির রক্ষা করাই "শমন দমন" নহে। জীবন-মৃত্যু যাঁহার কাছে সমান হইয়া গিয়াছে, যিনি "নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি" শমন দমন

তাঁহারই হয; তিনিই মর্ত্ত্যে "মৃত্যুঞ্জয়!" অথবা ভগবদ্ভক্তের অল্পায়ুষ্মত্তায়ইবা আক্ষেপ কি?

"জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানিচ।
নতু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥"

(ভাবানুবাদ)

পাঁচদিনো বাঁচা ভাল কৃষ্ণভক্ত হয়ে।
বিফল অভক্ত হয়ে কোটিকল্প রয়ে॥

অপর, যথার্থ দীর্ঘজীবীত্ব কালগত নয়, উহা কার্য্যগত।

যে যাহাই হউক, জীবন্মুক্ত বা সাধক, ভক্তের মোহমুক্ত মন সদাই প্রসন্ন, সুতরাং তাঁহার কুশলাকুশল অভিন্ন। মনের অপ্রসন্নতাই অকুশল-বুদ্ধির ফল; উহা তমোগুণের কার্য্য; আর নিত্য-চিত্ত-প্রসন্নতাই সর্ব্বমঙ্গল-প্রতীতির পরিণাম; উহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ফল। সত্ত্বগুণ চন্দ্র-কিরণবৎ, প্রকাশক—অথচ সুস্নিগ্ধ। অত-এব মনই চন্দ্র, সত্ত্বগুণ তাহার কৌমুদী, চিত্ত-প্রসন্নতা সেই কৌমুদীর বিমল বিভা। সেই বিভায় কুশল-কুমুদের বিকাশ। অবিদ্যা-মেঘ-মোচন দ্বারা মনশ্চন্দ্রকে সত্ত্বজ্যোতির্ম্ময় করিয়া ভক্ত সাধকের কুশল-কুমুদ বিকাশিত করাই কৃষ্ণকীর্ত্তনের কার্য্য। এই জন্যই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে বলা হইয়াছে—"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং।"

অপিচ, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" মহা-প্রভুরই অভিপ্রেত এইরূপ উপদেশোক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।"

অতএব এই যে সর্ব্বশ্রেয়ঃসার সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, তাহাও কৃষ্ণ-কৃপায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে সুলভ হয়। যেখানে ফুল ফোটে, সেইখানেই মধুকর যোটে। যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তন, সেইখানেই কৃষ্ণভক্ত-সমাগম। অতএব—"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

"বিদ্যা-বধূ-জীবনং।" কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিদ্যারূপা বধূর জীবনরক্ষার অনন্যসাধন, অথবা জীবনস্বরূপ সর্ব্বস্বধন। "বিদন্তি অনয়া" এই ব্যুৎপত্তিতেই অভিধানে "বিদ্যা" শব্দের নানার্থ। অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র, ইষ্টদেবতত্ত্ব, গুণ-কলা-তত্ত্ব, সরস্বতী, শক্তি-দেবী ভগবতী, ইত্যাদি। আশ্চর্য্য ও আন-ন্দের বিষয় এই যে, ইহার যে কোন অর্থ গ্রহণ করা যায়, তদ্দ্বারাই কৃষ্ণকীর্ত্তনকে "বিদ্যাবধূজীবনং" বলা যায়। সাধিলে, অধ্যয়-নাদিজনিত জ্ঞানের চরম পরিণতি বা পরম সারস্বতী সিদ্ধি কৃষ্ণভক্তের করতলগত; এই সত্যটি স্বয়ং সরস্বতীকান্ত স্বরূপে সম্পূজিত আমাদের "নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত" স্বীয় চৈতন্যাবতারের কৃষ্ণকীর্ত্তন-সর্ব্বস্ব চারুচরিত্রে বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান ত কৃষ্ণ-নামের গৌণ-ফল, কারণ তাহার পরিণাম মোক্ষ; কিন্তু—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ-সাম্রাজ্য লক্ষ্মীঃ।"

(ভাবানুবাদ)

মুকুন্দের পাদপদ্মে সান্দ্রানন্দা ভক্তি যাঁর।
মোক্ষ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী লুটে পাদপদ্মে তাঁর॥

অতএব মোক্ষ-সাধন ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞানরূপা বিদ্যা-বধূর জীবন যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন,

তাহা বলাই বাহুল্য। অশুদ্ধ চিত্তে মোক্ষ-কারণ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়না; সংসারে চিত্ত-শুদ্ধির প্রধান সাধনই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। মন্ত্রতত্ত্ব-রূপিণী বিদ্যারও জীবন এই কৃষ্ণকীর্ত্তন। অন্যান্য মন্ত্রের কথা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বলিব না। কলির সর্ব্বজন-সাধারণের সংসার-ত্রাণ-মন্ত্র সেই তারকব্রহ্ম মন্ত্র স্মরণ করুন।—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মহাপ্রভু শিখাইয়াছেন যে, এই মহামন্ত্র স্বতএব জীবন্ত—জাগ্রত, নিত্য-শুদ্ধ-সাধিত; এমন কি, গুরুদীক্ষা-নিরপেক্ষিত। এই তারকমন্ত্র বৈষ্ণব-শৈব-শাক্তাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই আরাধ্য; কারণ অন্তে তারক-ব্রহ্মনাম সকলেরই সম্বল। "অদ্য মে কাশি-কাদেবী রামরূপা ভবিষ্যতি" ইত্যাদি শাক্ত-ভক্ত-মুমূর্ষূক্তিস্বরূপ সুপ্রচলিত শ্লোকার্দ্ধের ভাবও ঐ তাৎপর্য্যানুগত। সাধক-সমাজে স্ব স্ব কুলধর্ম্ম-ভেদে কুলমন্ত্রোপাসনা-ভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও, তারকমন্ত্র সকলেরই সাধ্য, আরাধ্য, জপ্য, ভাব্য, সেব্য। এ মন্ত্র নিত্যসিদ্ধ স্বতঃসাধারণ-ইষ্টতত্ত্ব। ইহাতে গুরুকরণ—পুরশ্চরণাদিরও অপেক্ষা নাই। এ মন্ত্র সম্বন্ধে "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে" শ্রীচৈতন্যোক্ত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, যথা—

"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥"

অপিচ, কৃষ্ণকীর্ত্তন-জনিত সত্ত্বগুণো-দয়ে সর্ব্বমন্ত্রই সজীব হয়। অতএব ইষ্ট বা মন্ত্রতত্ত্বরূপিণী বিদ্যা-বধূর জীবন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, সন্দেহ নাই। গুণতত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, দেবীতত্ত্বরূপিণী এই বিদ্যাবধূ। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব নির্গুণ বা গুণাতীত হইলেও, উপাস্য সগুণ ঐশতত্ত্বের সারতম-তত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বগুণের গুণমণি! ইহার 'গুণ-ক্রিয়াশক্তি মহাদেবী যোগমায়া সর্ব্ব-গুণতত্ত্ব-সঞ্জীবনী। সুতরাং কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গুণতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব বা দেবীতত্ত্বরূপিণী বিদ্যা-বধূর জীবন।

কৃষ্ণ কীর্ত্তন জগৎ-জীবন। ভৌতিক মারীভয়ে জীবনরক্ষা হইতে আধ্যাত্মিক মারীভয়ে আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত এই কৃষ্ণকীর্ত্তন-সাধ্য। কৃষ্ণনামে মরা জগৎ বাঁচে। মাথুর-লীলায় কৃষ্ণহারা মরা-বৃন্দাবন কেবল কৃষ্ণ-নামে বাঁচিয়া ছিল। এ মরা-ভারত যদি কোন দিন বাঁচে, তবে কৃষ্ণনামেই বাঁচিবে। "নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরিল, বোল হরিবোল!" ইত্যাদি কৃষ্ণকীর্ত্তন পদ আমরা মুখে গাইয়া থাকি বটে, কিন্তু নামের সর্ব্বসঞ্জীবনী শক্তি না বুঝিলে, উহার যথার্থ অর্থ বুঝা যাইবে না। কামাসক্তির সঙ্কোচক শৈত্যে হৃদয় অতীব সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু নামা-সক্তির নব-বসন্ত-সমাগমে উহা নবজীবিত ও সংবর্দ্ধিত হয়। এ নাম জগৎ-জীবন—বিশ্বরসায়ন। এ নামে রত্নাকরের হৃদয়-শ্মশানে ফুল ফুটিয়াছে, জগাই-মাধাইর মনোমরুভূমে বান ডাকিয়াছে! ফলে যে ভাবে ভাবুন, যে অর্থে বিচার করুন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন "বিদ্যাবধূ-জীবনম্।"

"আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং।" আহা! এ বাক্যের স্মরণে—উচ্চারণেও আনন্দ! একেত অপার অম্বুধি—তাতে আবার তাহার বর্দ্ধন, সে না জানি কেমন! চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, ইহাই জানা আছে।

কবি কালিদাস "কুমারসম্ভবে" উমা-শশী দর্শনে সমুদ্র-গম্ভীর শিবের চকিত-চিত্ত-চাঞ্চল্য বর্ণন-ছলে এইরূপ বলিয়াছেন,—

ঈষৎ চঞ্চল হল মহেশের মন।
যেমন মাত্র চন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন॥

চন্দ্রোদয়ে সিন্ধু-হৃদয়োচ্ছ্বাস যেরূপ স্বাভাবিক, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, হৃদয়-গগনে, কৃষ্ণ-চন্দ্রের শুভদর্শনে, আনন্দসিন্ধুর সমুচ্ছ্বাসও ততোধিক—স্বাভাবিক।

"(নামে) দুখ-বিন্দু না রহিবে, বোল্ হরিবোল।
(নামে) সুখ সিন্ধু উথলিবে, বোল্ হরিবোল্॥"

আনন্দময়ের নাম আনন্দময়। তাহার স্মরণে-মননে, শ্রবণে কীর্ত্তনে, জপনে-স্তবনে, পঠনে-রচনে, সর্ব্ববিধ আস্বাদনেই আনন্দ! তবে "কীর্ত্তন" শব্দের বিশেষত্বে এই তাৎপর্য্য পাওয়া যায় যে, কীর্ত্তনে স্মরণ-মনন-শ্রবণাদি সমস্তই যুগপৎ সিদ্ধ হয়। অন্য সর্ব্ববিধ আস্বাদনই এক কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত। কৃৎ—বর্ণনে; অতএব গানে, কথনে, স্তবনে, আলোচনে, ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণনই আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দ-অম্বুধি! তাঁহার উচ্ছ্বাসে এক দিন সমস্ত ভারত প্লাবিত হইয়াছে। আজিও সে প্লাবন-তরঙ্গের প্রসার প্রশমিত হয় নাই; ধীরগতিতে ক্রমে জগৎ ব্যাপ্ত হইতেছে। সভ্য মানব-সমাজ যদি যথার্থ সত্য-পিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু হয়, তবে এক দিন না এক দিন জগৎ গৌরপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণ ভজিবে। গৌরাঙ্গের কৃষ্ণভজন কেবল হিন্দুরই একচেটিয়া নহে, তাহা গৌরাঙ্গ নিজ লীলাতেই দেখাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন; তবে কি না, অধিকার-ভেদে পরিণাম-(বৈষ্ণবী ভাষায় 'প্রাপ্তি') ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। আধ্যাত্মিকতায় হিন্দুর অধিকার অবশ্য অগ্রগণ্য এবং ভারতীয় প্রকৃতির সাহায্যে সুসম্পন্ন। প্রাকৃতিক অনুকূলতা-বলেই কৃষ্ণ-ভজনের গূঢ়তম রসতত্ত্বের আস্বাদনে হিন্দুরই উপযোগিতা বা অধিকার অধিক। তবে হিন্দু যদি কিছু না করে, আপন দোষে আপনি মরে, তাহার ফল সে পাইতেছে—পাইবে। হিন্দুর যেন হইয়াছে "ময়রার সন্দেশ-বৈরাগ্য।" দেশ শুদ্ধ লোককে সন্দেশ খাওয়াইয়া এখন নিজের বেলায় শুধু চাউল-জল; কারণ সন্দেশে অরুচি! আমাদেরও এখন হইয়াছে সেই দশা।

সে যাহাহউক, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দ-সিন্ধু দীনবন্ধু গৌরাঙ্গের প্রেম-প্লাবন-তরঙ্গ-রঙ্গ আমরা কি বুঝিব? আমরা বিষয়-বিষাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জীব, আমরা আনন্দাম্বুধির ভাব কিরূপে ধরিব? আমাদের হৃদয়-গোষ্পদ সিন্ধুর বিন্দুপাতেই বিপ্লাবিত হইতে পারে। সামান্য, স্বল্পসত্ত, অনিত্য বিষয়ানন্দই আমাদের সুপরিচিত; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দের অসাধারণত্ব কিরূপে ধারণ করিব?

শুনিয়াছি, সে আনন্দে কুষ্ঠরোগের চর্ম্মভেদ বা পুত্রশোকের মর্ম্মচ্ছেদ—কোন যাতনা থাকেনা। সে আনন্দ বিত্তনাশ বা সর্ব্বনাশেরও অপেক্ষা রাখে না! সে আনন্দের কণার জন্য রাজা কৌপীন পরে, বিলাসী ভস্ম মাখে, কৃপণ ধন-কুম্ভ ফেলে, যুবক যুবতী-মুখ ভোলে। অধিক কি,—সে আনন্দে ব্রহ্মা তপস্বী, শিব

শ্মশানবাসী; কলিতে স্বয়ং কৃষ্ণ নাকি গৌর-সন্ন্যাসী! পার্থিব ভোগের সহিত তাহার তুলনা বাতুলতা মাত্র। উহা অপার্থিব চরম পরমার্থ। উহা জগজ্জীবের প্রতি শ্রীগোলকের মহাপ্রসাদ! যে উহার অণু-কণা বা অন্ততঃ অমৃতাঘ্রাণও পাইয়াছে, তাহারও আনন্দ-সিন্ধুতে তরঙ্গ উঠিয়াছে!

"সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরে যায় যথা।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দে নিরানন্দ তথা॥"

ফলে নিরানন্দের কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার আছে, (নচেৎ তাহার উপায়ইবা কি?) কিন্তু কৃষ্ণানন্দরসাস্বাদের অধিকার বহু দূরে। কৃষ্ণতত্ত্বের দিকে একটু অগ্রসর হইতে হইলেও অন্তঃকরণে একটু সাত্ত্বিক উল্লাস-ঔজ্জ্বল্য চাই। সে আনন্দময়ের দরবারে বিষাদ-বিমলিনচিত্তের প্রবেশ-নিষেধ —এক পাগ্‌লা বৈষ্ণব গাইয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ আমার বড় বাবু, তাঁর দর্‌বারে।
যাবি যদি, মন জল্‌দি ধোপাবাড়ী দে॥"

হায়! ভাবিতে অশ্রু অসম্বরণীয় হয়, আমাদের মসী-মলিন-মন, আমরা আপন দুর্গন্ধে আপনি কুণ্ঠিত, আমাদের আশা কোথায়? তবে সাধু-গুরুর কৃপায় আমরা অন্তরে দীন ভিখারী হইতে পারিলে, বুঝি কৃষ্ণ-দরবারের দ্বারে আঁচল পাতিতে পারি। ভগবদ্গীতার "অপিচেৎ সুদুরাচারো" পড়িলে বড় আশা হয়, আবার "ভজতে মামনন্যভাক্‌" পড়িলেই যেন হতাশ হইয়া পড়ি! অতএব উপায় কি? উপায় কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন। কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দই কৃষ্ণভজনে অনন্যচিত্ততা জন্মায়। সে আনন্দে চিত্তের পূর্ব্বানুভব-অভ্যস্ত ইতরানন্দ সমূহ চন্দ্র-কিরণে খদ্যোৎ-দ্যুতিবৎ অভিভূত ও অলক্ষিত হইয়া যায়। আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ দয়াল-গৌরাঙ্গ এই আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন কৃষ্ণকীর্ত্তন কলির জীবের দ্বারে দ্বারে বিলাইয়াছেন। আমরা তৎফলে আনন্দ-সিন্ধুর বিন্দু পাইলেও বাঁচিয়া যাইব।

"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্‌।"

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদ লাভ হয়; অথবা প্রতিপদে অমৃতের পূর্ণাস্বাদ লাভ হয়। আবার "পূর্ণামৃত" শব্দে প্রকৃত অমৃত বুঝায়। অমৃতের লক্ষণ যাহাতে পূর্ণ, এমন অমৃতই পূর্ণ বা প্রকৃত অমৃত। সাধারণতঃ "অমৃত" সংজ্ঞক অনেক বস্তুই হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে দুগ্ধকে এবং জলকেও আমরা অমৃত বলি। লৌকিক ভাষায় বিষও "অমৃত"। "আম্র" নামক একটা ফলেরও নাম "অমৃত-ফল"। যাহা একটু বেশি ভাল লাগে, তাহাকেই আমরা 'অমৃত' বলিয়া অমৃত-সেবার সাধ মিটাই। "শিশিরে বহ্নিঃ" হইতে "বালভাষিতম্‌" পর্য্যন্ত আমাদের অমৃত। একটি কৌতুক-কবিতা আছে—

"কেচিৎ বদন্ত্যমৃতং সুরেশলোকে।
কেচিৎ বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু॥
ব্রুমো বয়ং সকলশাস্ত্র-বিচারদক্ষাঃ।
জম্বীর-নীর-পরিপূরিতমৎস্যখণ্ডে॥

ইহার ভাবানুবাদ-পদ্য এইরূপ হয়—

কেহ বলে স্বর্গে সুধা, কেহ নারী-মুখে।
মোরা বলি "টকের মাছে" সর্ব্বশাস্ত্র দেখে॥

ফলে আসল সুধা দুর্লভ হইলেও আমাদের ঘরে নকল সুধার ছড়াছড়ি। তবে আসল সুধা কি সেই সুরেন্দ্র-লোক-বিদ্যমান সুরাসুর-দ্বন্দ্ব-নিদান সুধাকেই বলিব? তাহাই কি পূর্ণ বা প্রকৃত অমৃত?

সাধু-গুরু-মুখে শুনা যায়, কৃষ্ণ-প্রেমামৃতই প্রকৃত অমৃত। তাহাই কৃষ্ণপারিষদ দেবগণ পান করিয়া অমর বা অমৃতীভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণ-বিমুখ বিষম বিষয়ভোগ-কামুক অবিদ্যা-মদমত্ত অসুরগণ তাহাতে বঞ্চিত। তাহাদের ভাগ্যে বিষ। তাহারা বিষয়-বিষ-বিলাসী। আর আমরা—দেবও নহি, দানবও নহি, আমরা মানব; কিন্তু যদি গুরু-কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-কণা পাই, তবে দেবত্বও চাই না; আর যদি কেবল বিষয়-বিষ খাই, তবে দানবত্বও পাই না! অর্থাৎ দানবেরও অধম হই। পুরাণকর্ত্তারা অনেক বড় বড় দানবের ইতিহাস বলিয়াছেন। তাহারা বিষ্ণু-বিরোধী হইয়া, শত্রু-ভাবে সাধিয়াও তাঁহার কৃপা পাইয়াছে। আর আমরা একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া বিষয়-বাসনা-বিষার্ণবে আকুল হইয়া ভাসিতেছি।

বিষয়-বিষে বিরক্ত ও ভীত হইয়া ভাগবতামৃতের ভিখারী হইতে হইবে। কেহ বলেন, স্বর্গের অমৃত মর্ত্ত্য মানবে পায় না। সে কোন্ অমৃত, আমরা তাহা বুঝি না; কিন্তু সাধু গুরু বলেন, স্বর্গামৃতের কথা কি, মোক্ষামৃতও মর্ত্ত্য মানব তুচ্ছ করিতে পারে, যদি কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পায়! অতএব কৃষ্ণ-প্রেমামৃতই সর্ব্বামৃত-সার প্রকৃত অমৃত বা পূর্ণামৃত। দয়াল গৌরাঙ্গ সেই দেব-দুর্লভ অমৃত কলির জীবের সুলভ করিয়া দিয়াছেন! কলিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রতি পদে পদে সেই পূর্ণামৃত আস্বাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ বস্তু হন চারি ধর্ম্মে পরিচিত।
নাম-রূপ-গুণ-কর্ম্ম অনাদিবিহিত॥"

"নাম-রূপ-গুণ-লীলা কৃষ্ণ-তত্ত্ব চারি;
একাধারে নামে এই চারি পেতে পারি॥"

কৃষ্ণনামের এই অসাধারণ বিশেষত্বই নামের স্বয়ংকৃষ্ণত্ব। এহেন কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের প্রতিপদেই যে কৃষ্ণচন্দ্র বিরাজমান। সুতরাং প্রতিপদই সুধার আধার।

সংগীত-কীর্ত্তনের পদাবলী সমূহের কোন পদ নাম-প্রধান, কোন পদ রূপ-প্রধান, কোন পদ গুণপ্রধান ও কোন পদবা লীলা-প্রধান থাকে; বিমিশ্রভাব-প্রধানও থাকে। পূর্ণভাবের পদগুলিতে প্রায় ইহার সকল তত্ত্বই অল্পাধিক থাকে। অতএব কীর্ত্তনের প্রতি পদেই নামাদি (এক নাম থাকিলেই অপর ত্রিতত্ত্বও থাকিল) আছেই এবং তৎসর্ব্বগত সুনির্ম্মল তত্ত্বাকাশে আমাদের শ্যাম-সুধাকর সমুদিত আছেনই! সুধার আর ভাবনা কি? অতএব "প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই বিশিষ্ট বিশেষণ স্বরূপ সত্যসুধাময় বাক্যটি শ্রীগৌরাঙ্গের বদন-সুধাকর বিগলিত।

"সর্ব্বাত্মস্নপনং"—কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বাত্মা রসাভিষিক্ত করেন; অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রসে সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ অন্তরাত্মার অভিসেচন বা আর্দ্রীকরণ হয়। সোঝা কথায় বলা যায়—হরিসংকীর্ত্তনে দেহ-মন-প্রাণ যেন গলে যায়! গলে যাওয়া এবং স্নপন—অর্থাৎ ভিজে যাওয়া অবশ্য এক কথা নহে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ স্থলে এক বলিলেও বোধ হয় ভাবানুবন্ধে আঘাত বা রসাস্বাদে ব্যাঘাত না হইতে পারে।

সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ ভগবানের সেবা কর্ত্তব্য। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যে বিষয়-সেবা হইবে, তাহা

বিরক্তভাবে; কিন্তু যে ভগবৎসেবা হইবে, তাহা অনুরক্তভাবে। আসক্তি-অনুরক্তি বিষয়মুখী হইলেই জীবের বন্ধন, আর ভগবৎ-মুখী হইলেই মোচন। ভক্তি—"পরানুরক্তি-রীশ্বরে"। সেই অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতার সঙ্ মাত্র; ফলিতার্থে উহা প্রকৃতির অতি-অধীনতা—প্রবৃত্তির কৃতকিঙ্করতা। শ্রীচরিতামৃত বলেন—

"নিত্যকৃষ্ণদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

যাহাহউক, আমাদের সেই হারানিধি কৃষ্ণদাসত্ব প্রার্থনীয় হইলে, কৃষ্ণ-সেবানন্দ-রসে "সর্ব্বাত্মস্নপন" প্রয়োজন। ভক্তের ভক্তি-গদগদ কীর্ত্তনে ভক্তবৎসল হরি সেবিত ও সুপ্রীত হন। বুঝি সেই লোভেই ভক্ত-গীত-কীর্ত্তনে ভগবান না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"
মম ভক্ত যথা আমারে গায়।
হে নারদ! আমি রহি তথায়॥

হরি-সংকীর্ত্তনে যে ভাগ্যবান ভক্ত ভগবদাবির্ভাব অনুভব করেন, তিনিই সার্থক সর্ব্বাত্মস্নপন লাভে যথার্থ কৃতার্থ হন। সংকীর্ত্তনে তাঁহারই 'দশা' (ভাব-সমাধি) হয়। সেই সময়ে তিনি কীর্ত্ত্যমান পদের ভাব-ভাবিত চিত্তে জগৎ ভুলিয়া, কেবল সেই জগচ্চিন্তামণি কৃষ্ণধনের দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি দ্বারা সর্ব্বাত্মস্নপিত ও অমৃতীভূত হন।

সংকীর্ত্তনে 'দশা' হওয়া প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। যদি তাহাতে কালধর্ম্ম-কৃত কৃত্রিমতা বা আভিনয়িকতা না থাকে তবে তাহা যে শত-সহস্র জন্মের সুকৃতি-সৌভাগ্যার্জ্জিত ফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেরূপ দশা একদিন একবার যাহার হয়, তাহার বোধ জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যথার্থ ভাব-সমাধি-ফলে ক্ষণকাল জন্যও সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ-সেবানন্দরসে তাহার সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মস্নপন হওয়ায়, সে নূতন মানুষ হইয়া যায়!

অপর, 'দশা' ব্যতীতও কৃষ্ণকীর্ত্তনে একটু ভাবাবেশ হইলেও যেন সর্ব্বাত্মস্নপন অনুভূত হয়। তখন মদনমোহনের মাধুর্য্য-রসে মনোপ্রাণ একটু মগ্ন হইলেই বাহ্যে-ন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ বিরাম পায়। সকলেই যেন যুগপৎ স্ব স্ব ভোগ্য বিষয় পাইল, এইরূপ ভাবানুবন্ধ হয়। তখন ক্ষুধা থাকে না—তৃষ্ণা থাকে না। প্রেয়সীর রূপরাশি, শিশুর মধুর হাসি, মুদ্রার মুখ-শশী তখন মনে থাকে না। তখন সকল মোহাকর্ষণ, সকল চিত্তোত্তেজনা, সকল ভোগ-প্রলোভন, সকল বিলাস-বাসনা,—এক কথায়—সর্ব্বাত্মার সর্ব্ব-পার্থিব-সন্তর্পণ-ভাব-কামনা যেন কিঞ্চিৎ কালের জন্যও কেন্দ্রীভূত হইয়া সেই যোগীন্দ্র-হৃদয়ানন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দনে আকৃষ্ট ও বিনিবিষ্ট হয়।

ভক্তগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহিরঙ্গ সাধনে বাহিরে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই করেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরঙ্গ কৃষ্ণসেবানন্দ-রসে পূর্ণ সাত্ত্বিক সর্ব্বাত্মস্নপন লাভ করেন। এই বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বাহ্যান্তর দুই হয় ইহার সাধন।
বাহ্যেতে সাধক-দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয় গোবিন্দে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গোবিন্দ-সেবনই ভক্তির লক্ষণ।

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"
(নারদ-পঞ্চরাত্র)

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়েশ্বরের সেবা ভিন্ন সর্ব্বাত্মস্নপন কিরূপে সম্ভবে? শ্রীচরিতামৃত বলেন—

"আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।"

বড় শক্ত কথা। এই কলিকালে জ্ঞান, যোগ বা কর্ম্মমার্গে ইহা দুঃসাধ্য সাধন। ভক্তিমার্গেই ইহা সুসাধ্য। ভক্তিভাবন কৃষ্ণকীর্ত্তনই ইহার সাধন এবং তাহাই সাধকের অনন্তঅবলম্বন। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন "সর্ব্বাত্মস্নপনম্"।

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।" এ হেন যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, তাহার পরম বিজয়—অর্থাৎ জয়জয়কার! শ্রীকৃষ্ণের নামের জয়, প্রেমের জয়, রূপের জয়, গুণের জয়, লীলা-বিলাসের জয়! আর এই সমস্ত তত্ত্ব-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পরম বিজয়! এই স্থানে একটি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন নিবেদন করিলা'ম।

মন!
কর হরেকৃষ্ণ-হরিনাম।
স্মর হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

১। ধর হরেকৃষ্ণনাম, কর কৃষ্ণরূপ ধ্যান,
কর কৃষ্ণ-গুণ-গান, (কর) কৃষ্ণলীলা-রস পান॥
২। কলিতে কৃষ্ণনাম বিনে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাবিনে;
এই বেলা মন! বুঝে শুনে, নামে সঁপ প্রাণ॥
৩। কৃষ্ণনাম যে প্রাণাধিক, তাহতে কি প্রাণ অধিক?
তেমন প্রাণে ধিক্!
(ছার) প্রাণের ভাগো, যা হয় হ'ক্‌গে,
তুমি ছেড়নারে নাম॥
৪। (কৃষ্ণ) নামের মাঝে নাগর-সাজে,
ব্রজেন্দ্রনন্দন্ বিরাজে,
রাধারাণী বামে রাজে, বিচিত্র বিধান!
কর হরে কৃষ্ণ হরিনাম॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ভূ-গোল পরিচয়।

৯ম পাঠ।

সিংহ রাশিস্থ মঘানক্ষত্র (Sickle)(১)

প্রভাবতারা ও তোমর তারা সংযোজিত করিয়া যোগরেখা পূর্ব্বাভিমুখে বর্দ্ধিত করিলে, তোমর তারা হইতে ৪ হাত দূরে অবস্থিত একটী শুভ্রবর্ণ ২য় শ্রেণীর তারা দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইবে। এই তারাটীর নাম "খ্যাতি"। [২]। এই খ্যাতি তারা পাশ্চাত্যে সিংহহৃৎ—(Regulus) নামে অভিহিত। খ্যাতিতারা মধুচক্র নামক

---

[১] বরাহমতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঋষিরেখা মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। দ্রষ্টব্য—

[২] এই খ্যাতির গর্ভে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে শ্রী বা লক্ষ্মীর জন্ম হয়। দ্রষ্টব্য—
"দেবৌধাতা বিধাতারৌ-ভৃগোঃখ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেব দেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা"
ইতি বিষ্ণুপুরাণ ১।৮।১৩

তারাদ্বয়ের পূর্ব্বভাগে ৮ হাত অন্তরে অবস্থিত। প্রভাকরতারা ও সোমতারা এই তারাদ্বয়ের সংযোগরেখাকে ভূমিকল্পনা করিলে এবং খ্যাতিতারাকে শীর্ষকোণস্থ তারা কল্পনা করিলে, একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বিমানে অঙ্কিত করা যায়। খ্যাতি-তারা এবং সিংহরাশিস্থ অপর তারা চতুষ্টয়ের সংহতিকে মঘা নক্ষত্র বলে।

খ্যাতি তারার এবং তাহার ২ হাত উত্তরস্থ ৪র্থ শ্রেণীর একটী তারা এবং এই ২য় তারার ২।০ হাত দূরে ঈশান কোণস্থিত "সিংহককুৎ" নামক ৩য় শ্রেণীর একটী তারা এবং সিংহককুৎ তারার ৪ হাত দূরে বায়ুকোণস্থ "মণি" নামক ৫ম শ্রেণীস্থ তারা, এবং মণিতারার নৈর্ঋৎ কোণস্থ ১ ফুট দূরস্থিত ৪র্থ শ্রেণীস্থ একটী তারা, এই তারা-পঞ্চকে লাঙ্গলাকৃতি মঘা নক্ষত্র গঠিত হয়। খ্যাতিতারা মঘানক্ষত্রের যোগতারা। মঘা নক্ষত্র পাশ্চাত্যে কর্ত্তনাস্ত্র (Sickle) নামে অভিহিত। মঘা নক্ষত্র দ্বারা তারাময় সিংহের সম্মুখভাগ গঠিত। মঘা নক্ষত্র হইতে শুক্র গ্রহ "মঘাভূ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। [৩]

সিংহ রাশিস্থ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র।

তারাদ্বয়ে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র গঠিত। তারাদ্বয় উত্তর-দক্ষিণভাবে অবস্থিত, এবং পরস্পর ৩ হাত অন্তরে স্থিত। উত্তরস্থ তারাটীর নাম "শিবা" এবং দক্ষিণস্থ তারা-টীর নাম অর্জ্জুন। [৪]

শিবাতারা এই নক্ষত্রের যোগতারা। শিবা সিংহককুৎ তারার পূর্ব্বভাগে ৪ হাত অন্তরে স্থিত। এই নক্ষত্রে তারাময় সিংহের পশ্চাৎভাগ গঠিত।

সিংহরাশিস্থ ৪। ৬ তারা = পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। অর্জ্জুন ও শিবাতারার যোগরেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে ধ্রুবতারা উপলক্ষিত হইবে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র হইতে বৃহস্পতি গ্রহ পূর্ব্বফল্গুনীভব নামে খ্যাত। [৫]

সিংহ রাশি (Leo)।

কর্কট রাশির পূর্ব্বভাগস্থ ৩০ অংশে সিংহ রাশি অবস্থিত এবং মঘানক্ষত্রের ১৩.২০ এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের ১৩.২০ এবং উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের ৩.২০ এই

---

[৩] শ্রীক্ষেত্রে, গ্রহগণের প্রস্তরময়ী যে সকল মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে শুক্রগ্রহের স্ত্রীমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। শুক্রগ্রহ মঘাভূ, সুতরাং কবিকল্পনায় একই গ্রহ শ্রী বা লক্ষ্মী এবং শুক্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৌ-রাণিকগণ উভয়বিধ রূপের সামঞ্জস্য করণার্থে শুক্রের 'লক্ষ্মীসহজ' নাম দিয়াছেন।

দ্রষ্টব্যঃ—

[৪] পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের অপর নাম অর্জ্জুনী নক্ষত্র।

দ্রষ্টব্যঃ---

ঋক্‌বেদ ১০।৮৫।১৩।

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের ১০° অংশ উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ লক্ষ্য নামক যৌথতারাজগৎ অবস্থিত। এই যৌথতারাজগৎ সপ্তর্ষি-মণ্ডলস্থ ১৭ তারা।

[৫] অঙ্গিরা-পত্নী শিবার গর্ভ হইতে বৃহস্পতির জন্ম হয়।

দ্রষ্টব্যঃ—

মহাভারত বনপর্ব্ব।

রাশির অন্তর্ভুক্ত। সিংহের সম্মুখভাগ অশ্লেষানক্ষত্রে এবং পশ্চাৎভাগ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গঠিত এবং পাশ্চাত্যমতে উত্তর ফল্গুনীর যোগতারা তারাময় সিংহের পুচ্ছাগ্রে অবস্থিত।

সিংহরাশিস্থ সিংহককুৎ নক্ষত্রের পশ্চিম ভাগ হইতে সৈংহিক নামক উল্কা-বৃষ্টি পতিত হয়। এই উল্কা-বৃষ্টি অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে হইয়া থাকে। ১৭৮৮ শকাব্দে সৈংহিক উল্কাবৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল।

কন্যারাশিস্থ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র।

খ্যাতিতারা এবং অর্জ্জুন তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ-রেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, অর্জ্জুন তারার ৪ হাত পূর্ব্বভাগে যে একটী ২য় শ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল তারকা দৃষ্ট হয়, ঐ তারার নাম "সিংহলাঙ্গুল"। সিংহলাঙ্গুল তারা এবং তৎদক্ষিণস্থ পাশ্চাত্য কন্যা রাশিস্থ ক্রপদ তারা, এই তারা-সংহতিকে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র বলে। সিংহলাঙ্গুল তারা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের যোগতারা।

সিংহলাঙ্গুল তারা পাশ্চাত্যে সিংহলাঙ্গুল (Denebola) নামে খ্যাত। পর্জ্জন্য দেব এই নক্ষত্রের অধিপতি।

কন্যা রাশিস্থ হস্তা নক্ষত্র।

ধ্রুব ও অত্রিতারা সংযোজিত করিয়া, ঐ সংযোগ-রেখা অগ্রভাগে প্রসারিত করিলে, ঐ রেখা একটী ক্ষুদ্রতারা-মণ্ডলে নীত হইবে। এই তারামণ্ডলের নাম করতল মণ্ডল। করতল মণ্ডলের পঞ্চতারা করতলমণ্ডলাকৃতি। এই পঞ্চতারাসংহতির নাম হস্তা নক্ষত্র। তারাময় করতল বায়ুকোণে প্রসারিত লক্ষিত হয়। অঙ্গুষ্ঠ তারা এই নক্ষত্রের যোগতারা, তর্জ্জনী, অনামিকা কনিষ্ঠা এবং মণিবন্ধ হস্তের অপর নক্ষত্রচতুষ্টয়ের নাম। পাশ্চাত্যে করতল মণ্ডল কাক (corvus) নামে অভিহিত।

কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্র।

তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ তারার যোগরেখা পুঃ পুঃ উঃ দিকে প্রসারিত হইলে, অঙ্গুষ্ঠ তারার ৮ হাত দূরে একটী ১ম শ্রেণীর তারকা, দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। এই তারার নাম চিত্রা [৬]। কেবল মাত্র

[৬] শতপথব্রাহ্মণমতে চিত্রা নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে যে,—

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২

১৩। সুর এবং অসুরগণ উভয়ে প্রজাপতির সন্তান, এবং প্রত্যেকেই স্বর্গরাজ্যের আধিপত্যের জন্য ব্যাকুল। স্বর্গরাজ্যে অধিরোহণ জন্য অসুরগণ 'রৌহিণ' নামক যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

১৪। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তদ্দৃষ্টে চিন্তামগ্ন হইলেন, কারণ অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলেই সুরগণের স্বর্গচ্যুতি হইবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ইন্দ্র ১ খণ্ড আষাঢ় বা ইষ্টক হস্তে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

১৫। এবং অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শুন, আমার নিজের জন্য আমি এই ইষ্টক যজ্ঞকুণ্ডে দিতেছি; তৎশ্রবণে অসুরগণ বলিলেন—ভাল, দিতে পার। এইরূপ যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ সমাপ্তপ্রায় হইল।

১৬। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র কহিলেন, আমার ইষ্টক আমি বাহির করিয়া লইব। এই বলিয়া ইন্দ্র স্বীয় ইষ্টক ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ কুণ্ডের

চিত্রাতারা দ্বারা চিত্রা নক্ষত্র গঠিত [৭] এবং চিত্রাতারা চিত্রানক্ষত্রের যোগতারা।

বিশ্বকর্ম্মা বা ইন্দ্র এই নক্ষত্রের অধিপতি।

আকারে এই তারা শস্যশীর্ষবৎ। এজন্য পাশ্চাত্যগণ এই তারাকে শস্যশীর্ষ (Spica) নাম দিয়াছেন।

কন্যারাশি।

সিংহ রাশির পূর্ব্বস্থ রবিমার্গরেখার ৩০°তে কন্যারাশি অবস্থিত।

উত্তরফল্গুণী নক্ষত্রের ১০°, হস্তানক্ষত্রের ১৩.২০ এবং চিত্রানক্ষত্রের ৬.৬০ কন্যা রাশির অন্তর্ভুক্ত। তারাময় কন্যাগঠনে উত্তরফল্গুনী বা হস্তানক্ষত্র উপাদানরূপে গৃহীত নহে। চিত্রাতারা তারাময় কন্যার মস্তকে অবস্থিত এবং এই রাশিস্থ অপর তারাগণ দ্বারা কন্যাদেহ নির্ম্মিত। কন্যা রাশির পাশ্চাত্য নাম কুমারী (Vergenes বা Virgo) [৮]

করিমুণ্ড মণ্ডল।

কন্যারাশির উত্তরভাগে যে বিস্তীর্ণ অতি ক্ষুদ্র তারকারাশি দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ তারকা-রাশি আকারে করিমুণ্ড সদৃশ, এজন্য এই তারকামণ্ডল করিমুণ্ডমণ্ডল নামে অভিহিত হইতে পারে। করিমুণ্ড উত্তর শিরে পূর্ব্বাগ্যে স্থাপিত।

পাশ্চাত্যে এই তারামণ্ডল মিসর রাজ্ঞী বেরিণীর কেশ পাশ (Coma Berenices) নামে খ্যাত।

সারমেয় যুগল মণ্ডল।

চিত্রশিখণ্ডির পুচ্ছতলে এবং করিমুণ্ড-মণ্ডলের উত্তরে একটী ক্ষুদ্র তারামণ্ডল আছে, এই তারামণ্ডলের নাম—সারমেয়-যুগল-মণ্ডল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মধ্যভাগস্থ ইষ্টক আকৃষ্ট হইলে, যজ্ঞকুণ্ড পতিত হইল এবং সেই সঙ্গে ২ নির্ম্মাণকারী অসুরস্থপতিগণ ভূপতিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রচ্যুত ইষ্টক সকল লইয়া তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা অসুরবধ করিতে লাগিলেন।

১৭। তদ্দৃষ্টে সুরগণ ইন্দ্রসন্নিধানে সমবেত হইয়া বলিলেন, "চিত্রং" অর্থ আশ্চর্য্যং।

এই ঘটনা হইতে এই তারার নাম চিত্রা হইল।

[৭] পঞ্জিকায় চিত্রানক্ষত্রের দশভুজা মূর্ত্তি লক্ষিত হয়।

[৮] গ্রীস্ দেশস্থ আথেন্স্ নগরে 'আইকেরিয়াস্' নামে এক ব্যক্তি বাস করিত এবং তাহার 'এরিগনি' নামে একটী কন্যা ছিল। মদিরাদেব ব্যাকাস তাঁহার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মদিরাদেব দ্রাক্ষা-রোপণ শিক্ষা দেন।

এই দ্রাক্ষাজাত মদ্য পানে উন্মত্ত কৃষক-গণ আইকেরিয়াস্কে হত্যা করে। কন্যা "এরিগনি" সারমেয় "মৈর" সাহায্যে পিতার কবর অন্বেষণ করিয়া মৃত পিতৃদেহ দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া কবর সন্নিহিত বৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করেন। স্বর্গপতি দ্যুঃ (বৃহস্পতি) কুমারী এরিগনিকে কন্যা রাশি রূপে বিমানে স্থাপন করেন এবং তৎপিতা আইকেরিয়াস্কে ভূতেশ (Bootes) এবং সারমেয় 'মৈরকে' "প্রোসা-য়ন" (সরমা) নামে স্বর্গে স্থাপন করেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন।

১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

ভূ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সারমেয় যুগল মণ্ডল।

এই তারামণ্ডলের ২টী তারা প্রধান। সর্ব্ব-প্রধান তারাটী ৩য় শ্রেণীর এবং ইহার নাম জ্যেষ্ঠকালকাঞ্জ। [৯] অপরটী ৪র্থ শ্রেণীর এবং উহার নাম কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ। ক্রতু ও পুলস্ত তারা সংযোজিত করিয়া সংযোগরেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ তারা, পুলস্ত তারার ৮ হাত পূর্ব্ব দিকে লক্ষিত হইবে।

কনিষ্ঠ কালকাঞ্জ তারার পূর্ব্বদিকে ৪ ফুট দূরে, জ্যেষ্ঠ কালকাঞ্জ তারা অবস্থিত। এই তারামণ্ডলে "রৌহিণ" নামক বক্রাকৃতি একটী বাষ্পস্তবক আছে। ঐ বাষ্পস্তবক পাশ্চাত্যে M. 51. সংখ্যায় চিহ্নিত।

অথর্ব্ববেদে কালকাঞ্জগণের আদি উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। [১০]

কিন্তু ২টী কালকাঞ্জ আকাশে উড্ডীয়মান হইল এবং তাহারা সারমেয় যুগলরূপে বিমানে বিরাজমান রহিল। দ্রষ্টব্য—

কালকাঞ্জাঃ বৈনাম অসুরাঃ আসন্। তে সুবর্গায় লোকায় অগ্নিং অচিন্বত। ইতি প্রক্রম্য। স ইন্দ্র ইষ্টকাং আবৃহৎ। তে উর্ণনাভয় অভবন্। দ্বৌ উদপতস্তাম্। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাম্।

ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—
১।১।২।৬

[৯] কালকাঞ্জ নামে অসুরগণ স্বর্গারোহণ মানসে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। প্রত্যেকে এক এক খানি ইষ্টক প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ-বেশধারী ইন্দ্র তাহাতে ১ খণ্ড ইষ্টক স্থাপন করিয়া বলিলেন, এই ইষ্টক চিত্রা এবং এই ইষ্টক আমার। অসুরগণ আকাশে উঠিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্র স্বীয় ইষ্টক বাহির করিয়া লওয়ায় অসুরগণের সোপান খলিত হইল। যাহারা ভূপতিত হইল তাহারা উর্ণনাভিরূপে রহিল

[১০] কালকাঞ্জদ্বয় আকাশ মার্গে

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ-লিখিত উপাখ্যান দ্বারা সারমেয় যুগলের স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্যে সারমেয় যুগল (Canis venatici) নামে খ্যাত এবং জ্যেষ্ঠ কালকঞ্জ (cor caroli) নাম খ্যাত।

পাশ্চাত্যে সারমেয় যুগল (Canis Venatici নামে খ্যাত এবং জ্যেষ্ঠ কালকাঞ্জ (cor caroli) নামে খ্যাত।

সারমেয় যুগলের উপাখ্যান তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা [১১]

উড্ডীন হইল এবং বিমানে তাহারা দেবভাবে স্থিত রহিল।

দ্রষ্টব্যঃ—

যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জাঃ দিবি দেবাঃ ইব শ্রিতাঃ।

ইতি অথর্ব্ববেদ ৬। ৮০। ২

[১১] কালকাঞ্জ নামে এক অসুর জাতি ছিল। তাহারা স্বর্গারোহণার্থ এক সোপান নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক অসুর এক এক খানি ইষ্টক সোপানে অর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ-বেশ-তিরোহিত দেবরাজ এই বলিয়া নিজের এক খণ্ড ইষ্টক সোপানে স্থাপন করিলেন, "এই চিত্র ইষ্টক (চিত্রা-তারা) আমার রহিল" ক্রমে সোপান নির্ম্মাণ শেষ হইলে অসুরগণ স্বর্গারোহণে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণছদ্মবেশী ইন্দ্র নিজের ইষ্টক সোপান হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইলেন। ভগ্ন সোপান ভূপতিত হইতে লাগিল। অসুরগণ আকাশে বিক্ষিপ্ত হইল। ভূপতিত অসুরগণ উর্ণনাভি হইল। দুইটী মাত্র অসুর লম্ফ প্রদানে স্বর্গে উঠিল। ইহারাই সারমেয় যুগলরূপে অবস্থিত।

তুলারাশির স্বাতি নক্ষত্র।

করিমুণ্ড মণ্ডল ও সারমেয় যুগল মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে ভূতেশ মণ্ডল। ভূতেশ মণ্ডলের সর্ব্ব প্রধান তারার নাম নিষ্ঠ্য। চিত্রশিখণ্ডি-

দ্রষ্টব্য

যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জাঃদিবি দেবাঃ ইবশ্রিতাঃ
ইতি অথর্ব্ববেদ ৬। ৮০। ২

যৌ উদপততাং। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাম।
ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
১। ১। ২। ৬

কালকাঞ্জা বৈ নাম অসুরাঃ আসন্। তে সুবর্গায় লোকায় অগ্নিং অচিন্বত। পুরুষ ইষ্টকাং উপাদধাৎ পুরুষ ইষ্টকাং। স ইন্দ্রঃ ব্রাহ্মণঃ ব্রুবাণঃ ইষ্টকাং উপাধত্ত এষামে চিত্রা নাম ইতি। তে সুবর্গলোকং আরো-হোহন্। স ইন্দ্রঃ ইষ্টকাং আবৃহৎ তেবা কীর্যান্ত। যে বা কীর্যান্ত। তে উর্ণনাভয়ঃ অভবন্। যৌ উদপততাম্। তৌ দিব্যৌ শ্বানৌ অভবতাং।

ইতি তৈঃ ব্রাঃ। ১। ১। ২। ৭৬। ৪। ৬

গ্রীক দেশে এই উপাখ্যান রূপান্তরে চলিত ছিল। যথা—অসুরদ্বয় ওতস্ এবং এফিয়ল্‌তেস্, স্বর্গারোহণ জন্য অলিম্পস্ পর্ব্বতোপরি অশুণ পর্ব্বত এবং অশুণ (অশ্ম ?) পর্ব্বতোপরি পিলিয়ন পর্ব্বত স্থাপন করিল। তদৃষ্টে আপল্লন (Apollon) দেব অসুর দ্বয়ের বিনাশ সাধন করিলেন। হিব্রু বাইবেলে ও এই উপাখ্যান রূপান্তরে লক্ষিত হয়। যথা :—

সৃষ্টি অধ্যায় ১৩।

১। মানব জাতির এক মাত্র ভাষা ছিল।
২। পাশ্চমাভিমুখ মানব জাতি সিনায় দেশে সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন।
৩। তাহারা পরামর্শ করিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ ও দগ্ধ করিল।
৪। তাহারা নগর ও ত্রিদিবস্পর্শী সোপান

মণ্ডলের শিখণ্ডের বক্র রেখা প্রসারিত করিলে বর্দ্ধিত বক্র রেখা প্রথম শ্রেণীর কুঙ্কুমবর্ণ তারা ভেদ করিয়া চিত্রাতারায় মিলিবে এবং ধ্রুব তারা ও কংস তারা সংযোজিত করিয়া ঐ যোগ রেখা বর্দ্ধিত করিলে ঐ প্রথম শ্রেণীর কুঙ্কুম বর্ণ তারায় দর্শকের নেত্র নীত হইবে। ঐ তারার নাম নিষ্ট্যা [১] এবং এই তারাকেই স্বাতি নক্ষত্র বলে। এই তারা স্বাতি নক্ষত্রের যোগ তারা, রোমে এই তারা (Arcturus) নামে বিদিত। এই তারা কুঙ্কুম বর্ণ ও অতি উজ্জ্বল। এবং দেখিতে অতি সুন্দর, নিষ্টিম্বর তারা হইলেও অতিদ্রুতগামী। প্রতি বিপলে ২৮ মাইল গমন করে।

তুলারাশিস্থ রাধা বা বিশাখা নক্ষত্র।

কন্যা রাশির দঃ পূঃ কোণে তুলারাশি। মরিচী ও নিষ্ট্যা তারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা বর্দ্ধিত করিলে, চিত্রতারার অগ্নিকোণস্থ একটী শুভ্রবর্ণ—দ্বিতীয় শ্রেণীর তারায় দর্শকের দৃষ্টি নীত হইবে। এই তারার নাম বামাকীলকা। বামাকীলক তারার ৪। ৫ হাত দূরে অগ্নিকোণে ও ঈশান কোণে দুইটী তারা দৃষ্ট হইবে। এই তারাত্রয়ে একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত রহিয়াছে ; বামা কীলক তারা এই ত্রিভুজের শীর্ষ দেশে অবস্থিত। এবং এই ত্রিভুজের ভূমি রেখার আর একটী তারা অবস্থিত আছে। এই তারা চতুষ্টয়ে রাধা নক্ষত্র গঠিত [২]; মতান্তরে পঞ্চ তারায় রাধা নক্ষত্র গঠিত। ক্রান্তি মণ্ডল এই রাধা

নির্ম্মাণে কৃত-সংকল্প হইল।

৫। মানব নির্ম্মিত নগর দর্শনাভিলাষে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে পৃথিবী তলে অবতরণ করিলেন।

৬। ঈশ্বর বলিলেন, দেখ মানব জাতি এক এবং তাহাদের ভাষা এক। তাহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না।

৭। চল, মর্ত্তে যাই, এবং মানবের ভাষা বিপর্য্যয় সাধন করি।

৮। ঈশ্বর মানবজাতি ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিলেন। মানব নগরনির্ম্মাণে বিরত হইল।

৯। নগর বাবেল Babel নামে খ্যাত হইল, কারণ তথায় ভাষা বিপর্য্যয় ঘটিল।

পুষ্পিকা ১। অসুরগণের ভাষা বিপর্য্যয়ের উল্লেখ বেদে দৃষ্ট হয়। যথা :—শত পথ ব্রাহ্মণ ৩। ২। ১। ২৩।

পুষ্পিকা ২। কৃত্তিবাসের রামায়ণে লিখিত রাবণের স্বর্গ-সোপান-নির্ম্মাণ-কল্পনা মৌলিক নহে।

[২] সূর্য্য সিদ্ধান্ত লিখিত যোগ তারাগণের ধ্রুবক ও বিক্ষেপ দৃষ্টে বোধ হয়, এই তারা চতুষ্টয়ের পূর্ব্বস্থ তারা চতুষ্টয় বিশাখা নক্ষত্র। কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতির্ব্বিদগণ এই নব নক্ষত্রের স্থাপন করিয়া সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত বৃশ্চিকরাশিস্থ চতুস্তারকময় রাধা নক্ষত্রকে অনুরাধা নক্ষত্র নাম দিয়াছেন এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত অনুরাধা নক্ষত্রের জ্যেষ্ঠা নাম দিয়াছেন। এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারা ত্রয় দ্বারা ধনুঃরাশিস্থ মূলা নক্ষত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। গণক কালিদাস সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারাত্রয় আধুনিক অনুরাধা নক্ষত্র ভুক্ত করিয়া আধুনিক অনুরাধা নক্ষত্রের কলেবর সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত সম্মত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যথা স্থানে রাখিয়াছেন, এজন্য কালিদাস মতে অনুরাধা সপ্ত তারাত্মিকা সর্পাকৃতি।

নক্ষত্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অবস্থিত। রাধা নক্ষত্রের এক অংশ বা শাখা ক্রান্তি মণ্ডলের উত্তরে অবস্থিত এবং অপর অংশ বা শাখা ক্রান্তি মণ্ডলের দক্ষিণে অবস্থিত, এই জন্য রাধা নক্ষত্রেরঅপর নাম বিশাখা নক্ষত্র। পৌরাণিক জ্যোতির্বিদের গূঢ় অভিসন্ধি ক্রমে এই নক্ষত্রের রাধা নাম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে এবং অধুনা এই নক্ষত্র বিশাখা নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত, এই নক্ষত্রের উত্তরস্থ তারার নামসৌম্যকীলকএবং দক্ষিণস্থ তারার নাম তড়িত্।

তুলারাশি।

(Libra)

তুলারাশি কন্যা রাশির দঃ পূঃ কোণে অবস্থিত এবং চিত্রা তারা হইতে আধুনিক বিশাখা নক্ষত্রস্থ সৌম কীলক তারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তুলা পঞ্চ তারায় গঠিত। ধট মস্তকে কীলক তারা। ধটযুগের উভয় পার্শ্বস্থ ধটকর্কটদ্বয়ে কীলক তারা ও তড়িৎ তারা দ্বয়। শিক্যদ্বয় তলে সর্প মণ্ডলস্থ "৩" তারা ও শার্দ্দূল মণ্ডলস্থ তারা। এই রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে দিবা মান ও রাত্রিমান সমান হয় বলিয়া এই রাশির নাম তুলা বা মানদণ্ড।

বৃশ্চিক রাশিস্থ অনুরাধা নক্ষত্র।

তুলার দঃ পূঃ কোণে একটী সুদৃশ্য বৃশ্চিক দর্শক দেখিতে পাইবেন, এই বৃশ্চিকের বক্ষদেশে পারিজাত নামক একটী অত্যুজ্জল রক্ত বর্ণ তারা। তারাটী দেখিতে মঙ্গল গ্রহ সদৃশ, এজন্য এই তারা গ্রীকে মঙ্গলসম (Antares) নামে খ্যাত। পারিজাত তারার ৪ হাত উঃ পঃ কোণে বাণি তারা। তারাটী তৃতীয় শ্রেণীস্থ এবং শুভ্রবর্ণ। এই বাণি তারার ২ হাত দঃ পঃ কোণে দিব্যচঞ্চলা তারা, এই তারাটী ২য় শ্রেণীর ও শুভ্রবর্ণ। এই দিব্যচঞ্চলা অনুরাধা নক্ষত্রের যোগতারা। দিব্য চঞ্চলা তারার ২ হাত দক্ষিণে রয়ী তারা, তারাটী শুভ্রবর্ণ। রয়ী তারার ২ হাত দক্ষিণে বিদ্যুৎ তারা, তারাটী পঞ্চম শ্রেণীস্থ ও শুভ্র বর্ণ। বাণি দিব্যচঞ্চলা, রয়ী ও বিদ্যুৎ এই তারা চতুষ্টয়ে অনুরাধা নক্ষত্র গঠিত। রাধা (=বিশাখা) নক্ষত্রের পরবর্ত্তী বলিয়া এই নক্ষত্রের অনুরাধা নাম। এই অনুরাধা নক্ষত্রে বৃশ্চিকের বাহু দ্বয়, 'হাত' গঠিত।

বৃশ্চিক রাশিস্থ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

রক্তবর্ণ পারিজাত তারা ও তাহার ১ হাত দূরে দ্রোণ তারা ও অগ্নি-কোণস্থ সুগ্রীব তারা, এই তারা ত্রয়ে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র গঠিত, নক্ষত্রটী দেখিতে কর্ণভূষণ (পাশক) সদৃশ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বৃশ্চিকের বক্ষ দেশে অবস্থিত। পারিজাত তারা দেখিতে অতি মনোহর। এ জন্য বেদে জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্র বলিয়া বর্ণিত [৩] কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে জ্যেষ্ঠা রোহিণী নামে কথিত। [৪]

জ্যেষ্ঠা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ হইতে পারে। অথর্ব্ববেদ মতে জ্যেষ্ঠার পূর্ণ নাম জ্যেষ্ঠঘ্নি [৫]। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

[৩] জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রং অরিষ্ট মূলং
ইতি অথর্ব্ববেদ ১৯। ৭। ৩

[৪] কৃষ্ণ যজুঃ বেদ ৪। ৪।

[৫] জ্যেষ্ঠঘ্ন্যাং জাত বিচৃতো র্যমস্য।
ইতি অথঃ বেঃ ৬। ১১০। ২।

[৬] এবং সায়ণাচার্য্য এই মত বিকশিত করিয়াছেন [৭] কিন্তু এই নক্ষত্রের প্রাচীন তম নাম ইন্দ্র ছিল [৮] এবং জ্যেষ্ঠা ইন্দ্রের নামান্তর মাত্র। আবার ইন্দ্রই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের দেবতা। কেহ বা বলেন, নক্ষত্র মালার আদি নক্ষত্র এক সময়ে এই নক্ষত্র ছিল এবং সেই জন্য ইন্দ্রের জ্যেষ্ঠা নাম [৯] রক্তবর্ণ পারি-জাত তারার গ্রীক নাম মঙ্গলসম (Antares) (...) এবং ইহার লাটীন নাম বৃশ্চিকহৃৎ (Cor scorpionis) বোবিলানে এই নক্ষত্রের নাম রাজ নক্ষত্র (Kekkab Dar lugal) ছিল এবং ইহার অধিপতি দেব কামরাজ।

বৃশ্চিক রাশি।

অনুরাধা নক্ষত্রের তারা চতুষ্টয়ে বৃশ্চিকের দাড়া গঠিত। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের তারাত্রয়ে বৃশ্চিকের বক্ষ গঠিত। এবং জ্যেষ্ঠা তারার পরবর্ত্তী তারাত্রয়ে বৃশ্চিকের উদর গঠিত। এবং ধনুঃরাশিস্থ মূলা নক্ষত্র বৃশ্চিকের পুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মূলা নক্ষত্র ধনুঃরাশির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রে মূলাকে বৃশ্চিকপুচ্ছ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

(ধনুঃ রাশিস্থ)

মূলা নক্ষত্র

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্ব সীমায় পূর্ব্বে দৃষ্ট-বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেশে যে পঞ্চ তারা আছে, ঐ তারাপঞ্চকের আকার অরিষ্ট (=লগুন) মূল বা মাত্রাহীন "ব" কার সদৃশ। তারা পঞ্চককে শঙ্খাকৃতি বলিলেও বলা যায়। এই অরিষ্ট মূলাকৃতি বা শঙ্খাকৃতি তারাপঞ্চকে মূলা নক্ষত্র গঠিত। মূলার পূর্ণনাম অরিষ্ট মূল [১০] বা মূল-বর্হণী [১১]। মূলা নক্ষত্রের স্কন্দদেশস্থ অর্থাৎ উত্তরস্থ তারাদ্বয় অতীব চাকচিক্যময় এবং দেখিতে নৃচক্ষু সদৃশ [১২]। পূর্ব্বস্থ তারার নাম শুক, পশ্চিমস্থ তারার নাম সারণ (১৩)। এবং মূলার পঞ্চ তারার পূর্ব্বস্থ তারার নাম পঞ্চজন। এই পঞ্চজন মূলার আধুনিক যোগতারা এবং শুক তারা মূলার প্রাচীন যোগতারা [১৪]। মতান্তরে মূলা কুক্কুর-সিংহ-লাঙ্গুল সদৃশ এবং নব বা একাদশ তারায় গঠিত। মূলার দেবতা নিঋতি (=রাক্ষসেশ্বর)। বেবিলনে এই নক্ষত্র সারউর ও সারগাজ নামে খ্যাত ছিল। (সার=কুকুর)।

---

[৬] জ্যেষ্ঠং এষাম অবধিষ্মেতি তৎ জ্যেষ্ঠঘ্নী ইতি তৈঃ ব্রাঃ ১। ৪। ২। ৮

[৭] তস্যাং জ্যেষ্ঠয়াং জাতিঃ পুত্রঃ জ্যেষ্ঠস্য পিতৃ ভ্রাতৃ আদেঃ হন্তা ভবতি। ইতি সায়ণ।

[৮] ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ। ইতি শত পথব্রাহ্মণ ২। ৩। ৩। ৮

[৯] Bentley ...

[১০] জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রং অরিষ্ট মূলং। ইতি অথঃ বেঃ ১৯। ৭। ৩

[১১] মূলং এষাং অবৃক্ষাম্ এতি তৎমূল বার্হিণী ইতি তৈঃ ব্রাঃ ১। ৪। ২। ৮

[১২] বেদমতে মূলার তারাদ্বয় যমের সারমেয় দ্বয় এবং দেখিতে নৃচক্ষু সদৃশ যথা যৌতে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতু রক্ষৌ নৃচক্ষুসৌ। ইতি ঋক ১০। ১৪। ১১

[১৩] বিচৃতৌ নক্ষত্রৌ পিতরৌ দেবতা আষাঢ়া নক্ষত্রং আপো দেবতা, ইতি। তৈঃ সং ৪। ৪। ১০। ২।

[১৪] বৈদিক কালে নক্ষত্রগণের তারা সংখ্যা অধিক ছিল না, মূলা নক্ষত্রের তারা সংখ্যা দুইটী মাত্র ছিল।

প্রাচীন ইরানে এই নক্ষত্রের নাম বনন্ত ছিল। এবং ইহার দেবতা নারগণ। (নরক রাজ)।

বনন্ত নক্ষত্র হইতে ইরানে ছায়া-পথ বনন্ত নামে অভিহিত ছিল। [১৫]

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

শ্রাবণ ও পঞ্চজন তারা সংযোজিত করিয়া ঈশান কোণাভিমুখে রেখা টানিলে পঞ্চজন তারা হইতে ১০ হাত ঈশান কোণে একটী ২য় শ্রেণীর শুভ্র বর্ণ তারা দৃষ্টিগোচর হইবে, এই তারার নাম তুলসী এবং এই তারা পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রের যোগতারা। তুলসী তারার ২॥ হাত পশ্চিমে ৩য় শ্রেণীর অপর একটী তারা দেখিবে। ঐ তারার নাম বিভীষণ। তুলসীর ৩ হাত দক্ষিণে ২য় শ্রেণীর একটী তারা ও বিভীষণের ৬ হাত অগ্নিকোণে ৩য় শ্রেণীর আর একটী তার এই তারা চতুষ্টয় ইষ্টকাকৃতি এই জন্ত ইহার নাম আষাঢ় নক্ষত্র [১৬] কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতিষিকগণ এই নক্ষত্রকে সূর্পাকৃতি বলেন।

ধনুঃ রাশিস্থ।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র।

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের পূঃ উঃ দিকে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। এই নক্ষত্র ৪ তারায় গঠিত। বিভীষণ ও তুলসী তারাদ্বয় সংযোজিত করিয়া ঐ যোগ রেখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত করিলে, তুলসী তারা হইতে ৬ হাত পূর্ব্বে সূর্পরখা তারা। তারাটী ২য় শ্রেণীর ও শুভ্রবর্ণ। তারা চতুষ্টয়ের অপর তারাত্রয় মধ্যে একটী তারা সূর্পধার ১॥ হাত পশ্চিমে, অপর ২টী ১হাত পূঃ দঃ। তারা চতুষ্টয় ইষ্টকাকৃতি বলিয়া আষাঢ় নাম পাইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক জ্যোতিষিকগণ আষাঢ় নক্ষত্রের রূপ সূর্পাকৃতি বলেন।

ধনুঃ রাশি।

মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এ নক্ষত্র ত্রয়ে ধনুঃরাশি গঠিত। মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রদ্বয়ে অশ্বারোহী পুরুষ, এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনু গঠিত। কেহ ২ বলেন পুরুষের জন্মা দেশ অশ্বাকৃতি। [১৭]

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমাদিগের ধর্ম্মের মূল কি?

বিংশ শতাব্দীর এই উন্নত সভ্যতার দিনে, বঙ্গীয়-সমাজের এই সুপরিমার্জ্জিত-পাঠক-মণ্ডলী মধ্যে, এই বিজ্ঞান-প্রসাদ-লব্ধ অনুবাদ, জড়বাদ, জীববাদ, হিতবাদ প্রভৃতি বহুবাদের দিনে, যদৃযুক্তিবাদ বলে যাহা বহু দিন হইল, অজ্ঞানাচ্ছন্ন-কুসংস্কার বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই পুরাতন কথার নূতন অবতারণা দেখিয়া শিক্ষিত-সমাজে হয়ত কেহ উপহাস করিতেও পারেন। এ স্থলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বোধ হয় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়, আমরা আর্য্য-সন্তান, দেবকল্প মনিষী পূর্ব্ব পুরুষগণ-কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া যে ধর্ম্মমত মানব-স্মৃতির অতীত-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, বিধর্ম্মীদিগের বিষমবিদ্বেষবহ্নি

[১৫] শুক ও সারণ তারার মধ্যে শুক-তারা-ও যোগ তারা বলিয়া গণ্য ছিল।

[১৬] আষাঢ়—ইষ্টক। ইতি শত পথ ব্রাহ্মণ ৭। ৪। ২। ৩২

[১৭] ধনুঃ তুরঙ্গ জংঘেং ইতি।

প্রয়োগেও, একই মাতৃস্তন্যে পোষিত সনাতন ধর্মদ্রোহী ভ্রাতৃদিগের অস্বাভাবিক আক্রমণে মুখে কেবল মাত্র 'আর্য্য' নাম স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্যতঃ আমাদিগের অন্তঃসার শূন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারে জাতীয় ও ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সাংসারিক-অবস্থা, দেশ, কালাদিও বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহার লোপ সাধনে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান হইলেও আজও যাহা অপ্রতিহত প্রভাবে অনুবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; এমন কি, বিপক্ষ পক্ষ যতই কেন প্রবল হউক না, সুদূরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কালেও যাহার উচ্ছেদ সাধন সংঘটিত হইবে না বলিয়া এখনও আমাদিগের বিশ্বাস, তাহা কেবল ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ, এধারণা আমাদিগের নাই। সুতরাং নিতান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াই বহুবার খণ্ডন সমর্থনের পরও এই পুরাতন প্রশ্নের অবতারণা 'আমাদিগের' ধর্ম্মের মূল্য কি?

আমরা অল্প শক্তিবিশিষ্টমানব। জীবনের প্রায় সমস্ত কার্য্যেই আমরা পরের মুখাপেক্ষী। পরের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবনের একদণ্ড কালও অতিবাহিত করা অসম্ভব। এ সাহায্য আমরা দুই কারণে গ্রহণ করি। প্রথমতঃ, আমরা নিজের সুবিধার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থী হই। হয়ত, কোন একটা কাজ আমি নিজে করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনাকে তজ্জনিত ক্লেশ বা পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য অপর কাহাকেও দিয়া সেই কাজটা করাইয়া লইলাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা অনন্যোপায় হইয়াই সাহায্যের আশায় অপরের শরণাপন্ন হই। একটা সাধারণ দৃষ্টান্তেই বিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে, মনে করুন, কোন একটা কূট গাণিতিক প্রশ্নের বিশেষ চেষ্টাতেও সমাধান হইতেছে না, তখন অগত্যা বিনীতমস্তকে একজন বিজ্ঞতর-গণিতবিদের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই; নচেৎ তাহা অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। সাংসারিক কার্য্য প্রতিক্ষণেই আমাদিগকে পরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় মুখ তুলিয়া থাকিতে হয়, অন্তর্জগতের জটিল-প্রশ্ন সমূহের সমাধানের আশায়ও আমাদিগকে সেইরূপ সর্ব্বদা মহাজনদিগের উপদেশ বাক্যের জন্য উন্মুখ থাকিতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের মুহুর্মুহু উদীয়মান-সংশয়সমূহ নিরাসের উপযোগী সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বিশেষতঃ মানব মাত্রেই অল্প বিস্তর ভ্রমাকুল; তাই মঙ্গল নিদান করুণাময় পরমেশ্বর স্থান, কাল, বা অবস্থাভেদে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য, সেই ২ সম্প্রদায়-প্রচলিত ধর্ম্ম-তত্ত্বের-কূট সংশয় সমূহের মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম জগতের নিয়ামক রূপে,—নিরপেক্ষ ভাবে স্বয়ং বা কোন মনস্বী মহাত্মার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া, পৃথক্ ২ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ ২ ধর্ম্ম গ্রন্থ-প্রচার করিয়াছেন। তাই ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া খৃষ্টীয়ের পবিত্র বাইবেলের প্রতি এত আদর, ত্রিপেটক বৌদ্ধের জীবন সর্ব্বস্ব, জেন্দ আবেস্তা পার্শীর প্রাণপ্রিয় বস্তু, মুসলমানদিগের কোরাণ-শরিফ প্রাণাধিক প্রিয়তর। ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরও সুতরাং এই জাতীয় একটা কিছু আছে। তাহারও আপত্তি থাকিলেও,

মতের অনুরোধে অগত্যা আমাদিগের বলিতে হইবে—শ্রুতি ও স্মৃতি। অন্ততঃ এক বেদ বলিলেই আর অধিক কিছু বলিতে হয় না। কোন ২ উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকেরও 'শ্রুতি কোরাণের ন্যায় একখানি গ্রন্থ বিশেষ, ও স্মৃতি কেবল অশৌচ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা মাত্র। আর পুরাণাদি জনব্যাসিশান-লিখিত পিলগ্রিমস্ সংপ্রোগ্রেস্ জাতীয় কতিপয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা মূলক পুস্তক মাত্র, এই অপূর্ব্ব ধারণা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময়ে কেহ ২ উদ্ধতভাবে এই মতেরই পোষকতা করিতে অণুমাত্রও লজ্জিত হ'ন না। সুতরাং আজ কালকার সুশিক্ষিত ও সুসভ্য বঙ্গীয় সমাজেরও এই চিরপ্রচলিত শ্রুতি-স্মৃত্যাদির বোধ হয় একটা স্থূল ব্যাখ্যার প্রয়োজন। শ্রুতিশব্দে ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎ শ্রুত যে প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি, তাহাই অভিহিত। কেহ ২ বলেন, ত্রিকালদর্শী দেবকল্প ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যাদিতে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হইয়া যে সমস্ত উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতি পদবাচ্য। শ্রুতি ও বেদ একার্থবোধক শব্দ। দর্শন শাস্ত্রাদির প্রকরণ প্রয়োগগত পরস্পর কিঞ্চিৎ বিসংবাদ থাকিলেও শ্রুতি বা বেদ অনন্তকাল ব্যাপক ও অপৌরুষেয় ইহাই চির প্রসিদ্ধমত। সাম, শুক্ল ও কৃষ্ণযজুঃ, ঋক্ ও অথর্ব্বরূপ মন্ত্র সংহিতা চতুষ্টয় ও তাহাদিগের আনুষঙ্গিক-ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষদ্ সমস্তই সাধারণতঃ শ্রুতি নামে নির্ব্বাচিত। স্ত্রী শূদ্রাদির শ্রুতি উপদেশ গ্রহণের অধিকার অভাবনিবন্ধন ও বেদের ২ শ্লোক। অর্থের সাধারণ লোক বুদ্ধিতে ধারণা না হওয়ায়, সর্ব্ব সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে শ্রুতি রহস্যাভিজ্ঞ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধ-মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক, সার সংগ্রহ পূর্ব্বক বেদার্থের অনুবাদরূপে লোক বা দেশাচার সাপেক্ষ বা সাধারণ লোক বুদ্ধির গ্রাহ্য আখ্যায়িকা মূলক যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহারই সাধারণ নাম স্মৃতি ও পুরাণ। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিরচিত বিংশ ধর্ম্ম সংহিতা ও তাহাদিগের সমন্বয় ও ব্যাখ্যা রূপে রঘুনন্দনাদি-বিরচিত ধর্ম্ম শাস্ত্র; পুরাণ, ইতিহাস, ও কণাদ প্রবর্ত্তিত বৈশেষিক, গৌতম প্রবর্ত্তিত ন্যায়, কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্য, পতঞ্জলি প্রবর্ত্তিত যোগ, জৈমিনী প্রবর্ত্তিত পূর্ব্ব মীমাংসা ও বাদরায়ণ ব্যাস প্রবর্ত্তিত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত আচার্য্যগণ স্থাপিত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন; সাধারণতঃ দর্শন নামেই পরিচিত। দর্শনগুলি যুক্তি বহুল হইলেও তাহাতে বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত ও তাহাদের উপকরণও শ্রুতি হইতে সংগৃহীত; সুতরাং বেদ মূলক ও ক্রান্তদর্শী ঋষি—প্রণীত বলিয়াই ইহারা শ্রুতি প্রকোষ্ঠে সন্নিবেশিত। বস্তুতঃ মীমাংসা দর্শনদ্বয় শ্রুতিবৎ পূজিত ও আদৃত। শিবোক্ত তন্ত্র সাধন শাস্ত্র। উহা কলিকালে শ্রুতিবৎ প্রামাণ্য ও অগ্রগণ্য।

সাধারণ ভারতবাসীর ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি হইলে কি হয়, আজ কাল বঙ্গীয় সমাজের যাহারা অগ্রণী, যেই উচ্চশিক্ষিত মণ্ডলী হইতে বঙ্গ আলোক প্রাপ্ত, [illegible] বাঙ্গলা ভারতীয় অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা অনেক [illegible] ও [illegible] [illegible]

শিখরে সমুত্থিত; সুতরাং সাধারণ ভারত-বাসীর অপেক্ষা বাঙ্গালীর,—অন্ততঃ উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালীর কিছু বিশেষত্ব থাকা চাই। এ অবস্থায় অন্য সাধারণ ভারত-বাসীর সহিত একতানে 'আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি' বলিলে, সেই বিশেষত্বের অপলাপ করা হয় বলিয়াই, বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সনাতন সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করণানন্তর মিল, হক্‌সলে কোমৎ প্রভৃতিকে নবীন ধর্ম্ম গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের নব প্রচারিত মত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহারই ঘোষণায় বদ্ধ পরিকর হন। এরূপ নব প্রচারকের সংখ্যা অধিক না হইলেও, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট ও প্রবেশেচ্ছু-নবযুবক দলের নেতা ও মুখপাত্র। শ্রোতৃগণ তাহাদিগের নবীন বৈজ্ঞানিক-মতে বিশেষ সারবত্তা উপলব্ধি না করিয়াই, পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্মবিশ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও কুসংস্কারমূলক জ্ঞানে, তাহারই জয়ঘোষণায় সমাজ-শরীরে তুমুল আলোড়ন বিলোড়ন উত্থাপিত করিয়া, সনাতন ধর্ম্মে সাধারণের আস্থা অপনয়নে উদ্যত হন। অথচ স্বপ্রচারিত ভিত্তিহীন মতেও কোনমতে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ না হইয়া সমাজ-কলেবরে ভীষণ ধর্ম্মহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত করেন। তাই আজ মৃত্তিকা খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন-তৃণগাছির ন্যায় বঙ্গীয়-সমাজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গুরুত্ব শূন্য অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান হইয়া কি দুরবস্থাই না সহ্য করিতেছে। তাই বাঙ্গলায় সমাজ-বন্ধন এক্ষণে যেরূপ শিথিল, ভারতীয় অপর কোন প্রদেশে সেরূপ কিনা, সন্দেহ। যথেচ্ছাচার বাঙ্গলায় দিন ২ কি পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা সমাজ-চিন্তাশীল-মাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ।

হোটেলে আহারের ন্যায় তৃপ্তি বোধ হয় জগতে আর কোন জাতীয় আহারে নাই বলিয়া এক জাতীয় যুবকের বিশ্বাস। * অপর এক শ্রেণীর, প্রকাশ্য স্থানে বারবনিতার নৃত্যগীত নানা বিলাসাদিতে কৌতুক অনুভব ও মাদকাদি সেবন অণুমাত্রও দোষাবহ বলিয়া যেন ধারণা হয় না। এইরূপ নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ও অত্যাচার পর্য্যবেক্ষণ করিলে বাঙ্গালার সমাজ-বন্ধন কোন কালে সুদৃঢ় ছিল কি না, এই রূপ বিষম-সন্দেহ উপস্থিত হয়। এক ধর্ম্মানুশাসনের শৈথিল্যেই যে এই বিষাদ কালিমাময়সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেরই অনুভব সিদ্ধ। সেই ধর্ম্মানুশাসন ঈশ্বর-প্রণীত ও ঈশ্বর প্রণোদিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে সংকলিত না হইলে, উহা মূলচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় হইয়া কোন মতেই একেবারে অনেকের আশ্রয়রূপে উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না †।

* হিন্দু-হোটেল, হিন্দু-আশ্রম, হিন্দু-নিবাস জাতীয় আহার নিকেতনের সংখ্যা দিন ২ কিরূপ মাত্রায় লাভ বৃদ্ধি হইতেছে। দেখিয়া সমাজ-চিন্তক মাত্রেই কাতর হইতেছেন। কেহ ২ ইহাদিগের 'হিন্দু' নাম দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, অনেক স্থলে হিন্দু আবরণের অন্তরালে করাল-মূর্ত্তি ম্লেচ্ছাচার লুক্কায়িত।

† বিস্তৃত যুক্তি জিজ্ঞাসুকে অধ্যাপক ফ্লিন্টের Theism নামক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে অনুরোধ করি।

সুতরাং আমাদিগের ধর্ম্ম রাজ্যের নিয়ন্তা হুকসলি, কোমথ, ডারুইন বা অপর কেহ হইতে পারেন না। এ অবস্থায় অনন্তকাল প্রচলিত শ্রুতি স্মৃতি আমাদিগের হৃদয়ের যে স্থান টুকু অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে কোন্ যুক্তি বলে তাঁহাদিগকে অপসারিত করিব ?

শ্রুতি স্মৃতিই আমাদিগের ধর্ম্মের মূল; এ বিষয়ের সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ বিসংবাদ না থাকিলেও, কেহ ২ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-পুঙ্গবের সহিত সমস্বরে দুই একটি যুবকধুরন্ধর মুখ বিনিসৃত 'বেদ জড়োপাসক কৃষকের গান, স্মৃতি ক্রূরমতি-ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপর বিধি নিষেধ মাত্র, এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতির লক্ষণ নির্ব্বাচন শ্রুতিগোচর হয়। আর্য্যাদিগের ভাগ্যহীন দেশের ন্যায় তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রও পৌনঃপুনিক আক্রমণের বিষয়ীভূত, মহৎকে নিম্নপদবীতে আনয়ন জন্য এবম্বিধ পিশুন-প্রয়াস, বোধ হয়, চির-প্রচলিত ও সর্ব্বজনীন। এরূপ হেয় নিন্দার প্রতিবাদও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইলেও, ইহা আমাদিগেরই অনুমোদিত সুশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল জানিয়া, পরমত চর্ব্বিত চর্ব্বনকারী করুণার্হ যুবকবৃন্দকে দোষ না দিয়া, আমাদিগেরই অদূরদর্শিতার জন্য দুর্ব্বিষহ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। আজ যদি বঙ্গদেশে সমাজ-বন্ধন এত শিথিল না হইত, সামাজিক শিক্ষার গুরুত্বে আজ যদি লোকের অণুমাত্রও আস্থা থাকিত, যদি সাধারণের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোচনা ও ধর্ম্ম শিক্ষার কিছু মাত্র প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, আজ বাঙ্গালী জাতিকে ভারতীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা অন্যান্য-বিষয়ে অভ্যুদয়শীল হইলেও, ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ গতিশূন্য, নির্জ্জীব অথচ স্বেচ্ছাচারে উচ্ছৃঙ্খল থাকিতে হইত না।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তি যদি নিতান্ত শিথিলই হইত, তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া এই বিজ্ঞান সাম্রাজ্যের নবযুগেও, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী স্বীয় ধর্ম্ম-মতকে এরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ হইতেন না। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় জনকের বিনাশ সাধনে দৃঢ় ব্রত হওয়ায়, সেই পাপে মাতৃ-ভূমি হইতে চির নির্ব্বাসিত হইয়া, দেশান্তরের আশ্রয় লইয়া এক ভারত-বর্ষ ব্যতীত সমস্ত পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডেই সুবিশাল রাজ্য-বিস্তার করিয়াছে। পুরা-তত্ত্ব সমালোচনা করুন, প্রাচীন জাতির ইতিহাস পাঠ করুন, জগৎ তন্ন ২ করিয়া অনু-সন্ধান করুন, দেখিবেন প্রতিদ্বন্দ্বী নবীন-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রাচীন ধর্ম্মগুলি ক্ষোভে লজ্জায় কিরূপে বিস্মৃতির সর্ব্বাচ্ছাদক অঞ্চলের অন্তরালে অপসৃত হইয়া অনন্তকালের জন্য তাহরই ক্রোড় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ভারত-প্রতিবাসী অনাদিসভ্য চীন স্বীয়-প্রাচীন ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া অভিনব-বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া তাহারই কেন্দ্র স্থানীয় হইয়াছে। সেই অতি প্রাচীন কালের সুসভ্য মিশর (ইজিপ্ট) পুরাতন প্রকৃতি-পূজা ত্যাগ করিয়া, এক্ষণে মহম্মদীয় ধর্ম্মেই বিশেষ গর্ব্বিত। পারস্য তৈজসোপাসনা পদ-দলিত করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। গ্রীস্ রোমের অভ্যুদয়-

সূর্য্য অস্তমিত হইতে না হইতেই, খৃষ্ট ধর্ম্মের ক্রীড়া ক্ষেত্ররূপে পরিণত হওয়ায় পিথাগোরস্-প্লেটো সিসরো-সম্পূজিত দেবমণ্ডলী হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অনন্তকালের জন্য জগতীতল পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহাদের মাহাত্ম্য খ্যাপনকারী ধর্ম্ম গ্রন্থ, তদ্দেশবাসী কর্ত্তৃকই ভূতপ্রেতোপাসনামূলক বলিয়া ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই ভারতবাসী, সেই অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, কোনও বিজাতীয় ধাতুও প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার বিকৃতি বা উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহা হইয়াছে, তাহাতে অদ্যাপি মূল ভিত্তি টলিত হয় নাই, ঈশ্বরের নিতান্ত প্রকোপ উপস্থিত না হইলে হইবেও না—ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক বিশ্বাস। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমরা অনেক সময়ে, খৃষ্ট ধর্ম্ম-পরায়ণ অধ্যাপক মোক্ষমূলরের আমাদিগের বেদ শাস্ত্রের জীবনব্যাপী তন্ময়ত্ব দর্শনে, জর্ম্মণ পণ্ডিত শোপেনহরের উপনিষৎ শ্রুতির প্রতি আর্য্যোচিত শ্রদ্ধা অনুভব করিয়া * বিস্বৎ আনিবেশান্তের, আমাদিগের শাস্ত্রাদির প্রতি ঐকান্তিক আস্থা দর্শনে পুলকিত হইও; আমাদিগের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্মরণে তাৎকালিক বিমল-চিত্ত-প্রসাদ লাভ করি। পরক্ষণেই ক্ষুদ্র গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণে অসমর্থ ব্রাহ্মণকুমারের মুখ অনেক সময়ে শুষ্ক হইতে দেখিয়া, আমাদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিষয়ক অজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া, বিষাদ-সাগরে নিমজ্জমান হইয়াও, তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় জীবনীশক্তির অণুমাত্রও চালনা করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না—আমরা এতই নিস্তেজ ও গতি হীন! অথচ আমরা দর্প করিতে ত্রুটি করি না। 'আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুসভ্য জাতি।' যাহাহউক, আমাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি শ্রুতি-স্মৃতির আদর ইদানীং দিন ২ একটু বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছি; ইহা যদি নির্ব্বাণ কালের দীপ সন্দীপ্তি না হয়, তবে অবশ্য পুনর্জ্জীবনের আশা আছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
(বারাণসী)

আহার।*

(সূচনা।)

ভারতবর্ষের পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র ধর্ম্মানুশীলন-যুগে, কুসুমিত-তরুরাজি-শোভিত, হোম-ধূমগন্ধ-মোহিত, সামগানমুখরিত, শ্যামল-ধর্ম্ম-কুঞ্জে তপস্তপোজ্জ্বলকান্তি স্বধর্ম্ম-নিরত ঋষিগণ যখন তদ্গত-চিত্তে

* Schopenhauer writes, 'In the whole world, there is no study so benificial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.

Vide Max mullers India, what can it teach us. Lec VII.

* প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে যে সকল সামগ্রী ভোজন করা নিষেধ, শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্ক প্রয়োগে তাহারই হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিবার কথা গত পৌষ

তাঁহাদিগের অন্তরের দেবতার চরণ-মূলে হৃদয়-কুসুম-গ্রথিত ভক্তিপুষ্পহার সমর্পণ করিতেন, তখন তাঁহাদিগের দিব্যজ্ঞানোদ্দীপ্ত বিমল-বদনমণ্ডল হইতে এক অপূর্ব্ব পুণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া যেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ের তত্ত্বালোচনা করিয়া সেই সকল তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তাঁহাদিগের সংসার চিন্তাশূন্য অনাবিল ধর্ম্ম-জীবন আরও পবিত্র করিয়াছেন এবং সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতের হৃদয়ে এমন কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার রোপিত করিয়া গিয়াছেন যে, কোন দিনই তাহার আর উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিয়া ভারতবর্ষকে কতবার আঘাত করিয়াগিয়াছে, সেই আঘাতে কত ধর্ম্মের উন্নত সুদৃঢ় স্তম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের বিলুপ্তির কথা এখনও স্বপ্নের অগোচর—তাহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সেই মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত—সেই যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা—সেই যম, আপ-

---

মাসের হিতবাদী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ-প্রবন্ধ-লেখককে কলিকাতার কালীঘাটস্থিত সভা-সমাজ হইতে মহিমানাথ পদক পুরস্কার দিবার কথা হয়। মহিমানাথ পদক প্রাপ্ত সেই প্রবন্ধ হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমি আজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেছি। প্রবন্ধটী অতিশয় দীর্ঘ। তাই তাহার "সূচনা" ও "প্রথমাধ্যায়" আপনার নিকট পাঠাইলাম। প্রবন্ধটী যেরূপভাবে বিভক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা খুবই দীর্ঘ। যাহা হউক, আর অধিক কি লিখিব। অনুগ্রহ করিয়া পত্রোত্তরে বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

আমি যে উপায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধটী ভাগ করিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

১। সূচনা।

প্রথমাধ্যায়।

১। তিথি প্রকরণ।
২। তিথিগত ধাতু বিকার।
৩। প্রতিপদাদি তিথিতে নিষিদ্ধ-দ্রব্য সমূহের তালিকা।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

১। হিন্দু জাতির রসায়ন।
২। রসগুণ ও দ্রব্যগুণ।
৩। রসোৎপত্তি।
৪। কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির গুণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

১। খাদ্যাখাদ্যের সাধারণ বিভাগ।
২। নরবিভাগ ও তৎসংক্রান্ত খাদ্য বিভাগ।

চতুর্থাধ্যায়।

তালিকা ও তুলনা।

(অর্থাৎ সাধারণ সমুদয় খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ এবং প্রতিপদাদি তিথিতে কয়েকটী নিষিদ্ধ খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণের সহিত তাহাদিগের তুলনা)

পঞ্চমাধ্যায়।

১। কুষ্মাণ্ডাদি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মের বিশদ যুক্তি।

ষষ্ঠাধ্যায়।

১। শাস্ত্রকারদিগের নিষেধ অন্ধ বাতুলতা নহে।
২। নিষেধ প্রতিপালনার্থ শপথ বাক্যের আবশ্যকতা কি?

শ্রীরাজেন্দ্রলাল লাল আচার্য্য বি, এ।

ভৃগু, সম্বর্ত, কাত্যায়ন—সেই বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ—সেই লিখিত, দক্ষ গৌতম, সেই শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যাহা ভারত-বক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—যত দিন ভারত থাকিবে, ততদিন তাহার অস্তিত্ব ও জীবন থাকিবে—যতদিন ভারতবাসী আছে, তত দিন তাহার পূজা হইবে। শত সহস্র বৌদ্ধ—বিপ্লব, লক্ষ লক্ষ মুসলমান-বিপ্লব, কোটী কোটী হিন্দু-বিদ্বেষী ধর্ম্মত্যাগী কালাপাহাড়—কিছুতেই কিছু হইবে না। ভারতবাসীর অধীত অধ্যয়নীয় সেই সকল পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ—সেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতির স্মৃতি—ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন—সেই কল্পসূত্র, আরণ্যক-উপনিষৎ প্রভৃতি ভারত-হৃদয়ের শোণিততুল্য অমূল্য গ্রন্থরাশির কোন দিনই বিনাশ নাই। গ্রন্থ বিশেষের শিথিল গ্রন্থি হয়ত ছিঁড়িয়া যাইবে—কিন্তু ভারতের রক্তের সহিত, মজ্জার সহিত, মাংসের সহিত, সেই সকল গ্রন্থের সম্বন্ধ, তাই তাহাদিগের বিনাশ নাই। গ্রন্থের মর্ম্ম, ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত হইয়াছে—গ্রথিতই থাকিবে। ধর্ম্মের বন্ধন—ভক্তির বন্ধন—স্নেহের বন্ধন কি কখনও ছিঁড়িয়া যায়?

পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারাই সেই পূর্ব্বতন ভারতের পুরাতন সমাজের নেতা, শিক্ষক, গুরু—আদর্শ। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত-বিধি নিয়মেই তখনকার সমাজ চলিত—রাজ্য চলিত—পৃথিবী শাসিত হইত। অধ্যয়ন করিবার অধিকার তখন সকলের ছিল না। তাঁহারাই শাস্ত্র ভাঙ্গিতেন, তাঁহারাই আবার তাহা গড়িতেন—তাঁহারাই বিধিব্যবস্থার স্রষ্টা, তাঁহারাই তাহার পরিবর্ত্তক, আবার তাঁহারাই তাহার পরিমার্জ্জক ও সংশোধক। তখনকার জনসাধারণ তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত—ধর্ম্মের মত শ্রদ্ধা ও ভয় করিত—বেদবাক্যের মত তাঁহাদিগের কথায় প্রাণপাত করিয়াও বিশ্বাস করিত—রাজাজ্ঞার ন্যায়, নির্ম্মল-হৃদয়ের তপ্ত-শোণিত ঢালিয়াও তাঁহাদিগের অনুশাসন প্রতিপালন করিত। হেতুবাদ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস, ইচ্ছা, বা প্রয়োজন, তখন কাহারও ছিল না। যে যাহার আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিত। তাহাই তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম ছিল। তাই—শাস্ত্রকারগণও কোন বিধির কোন হেতু প্রদর্শন করিয়া যান নাই। তখনকার যুগ বিশ্বাসের যুগ ছিল—এখন যুক্তির যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমাদিগের শাস্ত্রে যে সকল বিধি নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সে সমুদয়ের ভিতর যে কোনটীর মূলেই যুক্তি নাই, তাহা নহে। তবে আবার ইহাও সত্য যে, অনেক নিয়মের মূলে যুক্তির অভাব আছে বলিয়া সচরাচর বোধ হয়। এই সকল বিধি ব্যবস্থা প্রধানতঃ দ্বিজবর্গের জন্যই প্রচলিত হইয়াছিল। দ্বিজেতর জাতি আপন আপন অবস্থা ভেদে তাহা গ্রহণ এবং প্রতিপালন করিত।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিকতার পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহারা সকল কার্য্যই সেই চক্ষে দেখিতেন! প্রাতরুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় প্রাতরুত্থান পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই তাঁহাদিগের সর্ব্বদর্শী চক্ষুর তীক্ষ্ণ পরীক্ষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। মানবজীবনের সকল কার্য্যকেই তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অংশের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু একবার বলিয়াছিলেন :—

"আহার শরীর ও আত্মা উভয়ের মঙ্গলের জন্য। অতএব আহার একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া আহার করিবে। আহারকে একটি ধ্যানস্বরূপ করিয়া তুলিবে, তবেই আহার করিয়া দেহ ও আত্মার মঙ্গল হইবে। আহার অতি গুরুতর, অতি পবিত্র কার্য্য। এই জন্য শাস্ত্রে নির্জ্জনে মৌনী হইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে প্রফুল্লান্তঃকরণে আহার করিবার ব্যবস্থা আছে।" * আমরা সেই সকল পবিত্রমনা ঋষিদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝি না বলিয়া তাঁহা-দিগের কৃত-কার্য্যের অপলাপ করিবার অধিকার আমাদিগের নাই, আমরা মূর্খ বলিয়া তাঁহাদিগে সেই নিষ্কলঙ্ক গৌরবরবির শান্তোজ্জ্বল-কিরণ-রাশি কলঙ্কের কালিমা-চিহ্নিত অন্ধকার-আবরণে আচ্ছাদিত করি-বার অন্যায় অধিকার আমাদিগের নাই—আমরা কিছু বুঝি না বলিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিবার গুরুতর ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রকারগণ তাঁহা-দিগের কৃত কোন শাস্ত্রেই কোন একটি বিধিনিয়মেরও হেতুবাদ দেন নাই। ইহা-রও যে কোন উদ্দেশ্য নাই তাহা নহে। যে সকল লোক তাঁহাদিগের এই সকল বিধি নিয়ম মানিয়া চলিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহার হেতুবাদ জানিলেও তাহা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আরও একটি কথা আছে—অনেক সময় হেতু প্রদান করিলে বিজ্ঞাপিত তথ্যের মূল্য কমিয়া যায়। লোকে মনে করে, "এ-ই—!" , ইহারই জন্য আবার "এই" করিতে হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।' এতদ্ভিন্ন, হেতুবাদ না দিলেও তখন চলিত। যে উদ্দেশ্যে যে বিধি ব্যবস্থা-পিত হইত, সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য হেতুবাদের আবশ্যক হইত না। বিনা কারণ প্রদর্শনেই লোকে তাহা মানিয়া লইত।

একজনকে লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। "সমাজ মানব জীবনের দুশ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়, অপরিহার্য্য, অবশ্য-কর্ত্তব্য নিয়ম-পত্র। কোন কোন দার্শনিক বলেন 'মানুষ-জন্মাবধিই-স্বাধীন'—অর্থাৎ জন্মাবধিই সমাজের রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, ব্যবহার এবং শাসনের অন্তর্ভূত নহে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে—কেবল তাঁহা-দিগের উচ্চমস্তিষ্কের স্বেচ্ছাকৃত কল্পিত সত্য মাত্র।............জন্মের পর হইতেই যদি আমরা একটি শিশুর চরিত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহাহইলে দেখিতে পাইব যে, সেই চরিত্রের প্রত্যেক অঙ্গ—প্রত্যেক চিত্র—এমন কি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

---

* সাহিত্য—অগ্রহায়ণ ১২৯৮।

হিন্দু পর্য্যন্ত কোন জাতীয়, স্থানীয় এবং পারিবারিক ঘটনাবলীর অমানুষিকী ক্ষমতার ছায়া মাত্র। মানুষ, সমাজের অনুলিপি—প্রতিবিম্ব—নিখুঁৎ অবিকৃত চিত্র।.........
............পাঁচ জনে মিলিয়া একটি ব্যবসা আরম্ভ করিলে, সেই ব্যবসায়ে তাহাদের প্রত্যেকেরই যেমন এক একটি অংশ থাকে—তাহাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টা যত্ন ও উদ্যমে যেমন সেই আরব্ধ কার্য্য দিন দিন উন্নতি লাভ করে—মনুষ্য বিশেষ বা জাতি বিশেষের স্বেচ্ছাকৃত সমাজবন্ধনেও তাহাদিগের তেমনি এক একটি অংশ আছে। সেই সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, উন্নতি, অবনতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদিগের অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশিত্ব যে শুধু জীবিত-মনুষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভক্ত, তাহা নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালকে সমাজ এক সূতায় গ্রথিত করিয়া রাখে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের এক একটি নিয়ম—মানব সাধারণের সেই অখণ্ডনীয় বন্ধনের অনুবর্ত্তী—বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগৎ, বর্ত্তমান মানবমণ্ডলী এবং এখনও যাহারা ভবিষ্যতের অন্ধকার-যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসের সংযোগ-সূত্র। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সূত্র সমষ্টি তাহাদিগের নৈতিক ও প্রাকৃতিক বন্ধনের ছুশ্ছেদ্য-শৃঙ্খল। সমাজ অতীতের জীবন্ত স্মরণ-চিহ্ন—বর্ত্তমানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল—ভবিষ্যতের সত্যপথ-প্রদর্শক, ধ্রুবতারা। যত দিন মানুষ, ততদিন সমাজ—যতদিন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ততদিন সমাজের আয়ু এবং বিস্তৃতি।" * এই সমাজ—এই সমাজ-বন্ধন। সেই সমাজের যাঁহারা নেতা ছিলেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা যে সকল বিধি নিয়ম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক সমাজ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল না—দিতে পারেও নাই, কারণ সকলেই জানিত যে, যাঁহাদিগের নেতৃত্বের অধীনে তাহারা সৈনিক—তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী—তত্ত্বান্বেষী—সাধুপুরুষ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক জনকে লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেকেই যে বিদ্বান্ হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে—এবং সে সিদ্ধান্ত ও ভ্রমাত্মক। শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আবার একজনের জন্য নহে—তাঁহাদিগের নেতৃত্বাধীন সমাজের মঙ্গলের জন্য—সমাজের প্রত্যেকের জন্য। কারণ তাহাদিগের প্রত্যেকের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। কিন্তু এরূপ স্থলে, যখন সমাজের সকলেই সমান শিক্ষিত নহে—যখন কতক শিক্ষিত, কতক অর্দ্ধ শিক্ষিত, আর কতক বা একেবারেই নিরক্ষর, তখন, কোন একটি বিধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার সময় সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি যুক্তি তর্ক দিয়া প্রস্তাবিত বিধির উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদ্‌রূপে বুঝাইয়া দিতে হয়, তাহাহইলে বিধি ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত দিবার

* নব্যভারত। মল্লিখিত "মানুষ ও সমাজ"

জন্ত অধিক দূর যাইতে হইবে না। যখন কোন একটি রাজানুশাসন লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন কি ভারতবাসী সকলকেই আহ্বান করিয়া যুক্তির সাহায্যে, তর্কের সাহায্যে সেই প্রস্তাবিত রাজ—বিধির উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহা পালন করিবার আদেশ দেওয়া হয়? তাহা করিতে হইলে রাজ-বিধি প্রণয়নে অসম্ভব হইত। দেশের যাঁহারা নেতা, কেবল তাঁহারাই ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এবং ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহার পর তাহা বিধিবদ্ধ হয়—আর সেই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-অনুসারে সমগ্র-ভারতবাসী শাসিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি সে রাজবিধির মূলে কোন যুক্তি বা হেতু নাই? যুক্তি আছে। তবে সকলের জন্ত সে সকল হেতুবাদ আবশ্যক করে না। শুধু এই টুকু জানা থাকিলেই হইল যে, দেশের যাঁহারা মুখপাত্র—সকলের যাঁহারা নেতা, তাঁহারাই যুক্তি তর্ক দিয়া সেই বিধি-বিশেষের উপকারিতা বা অনুপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বুদ্ধি, ক্ষমতা ও শক্তির অনুরূপ বিচার করিয়াই উক্ত বিধির প্রচলন করিয়াছেন। সাধারণ সমাজের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সমাজ ইহা অপেক্ষা আর অধিক আশা করে না—আশা করিতেও পারে না।

"এখন অনেকে বলেন, আমাদের সমাজ কুসংস্কার ও যুক্তিবিহীন অন্ধবিশ্বাস পরিপূর্ণ—আমাদের সমাজ ভ্রমান্ধ। তাঁহাদিগের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কুসংস্কার কিছু থাকিতে পারে—সকল দেশের সকল সমাজেই তাহা আছে। কিন্তু সেই জন্ত সমাজকে পদদলিত করা—অতলজলে নিক্ষেপ করা—আপনাকে সেই সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় শৃঙ্খল—বন্ধনের বহির্ভূত মনে করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে—মূর্খের কার্য্য। অন্ধ বিশ্বাস দুর্ব্বল-হৃদয়ের-ধর্ম্ম। কুসংস্কার যদি কিছু থাকে, তবে, তাহা থাকিতে দাও। যদি সম্ভব হয়, ধীরে ধীরে তাহা দূর কর। তাই বলিয়া একেবারে গোড়া কাটিয়া ফেলিও না—অংশ বিশেষ যদি দূষিত হইয়া থাকে, তবে তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা দেখ—সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিও না। তাহা করিতে গেলে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। ভগ্ন প্রসাদ সংস্করণের মত, ভালটুকু যেমন আছে, তেমনি রাখিয়া তাহারই সহিত বেশ মিলাইয়া মিশাইয়া মন্দের স্থানে ভাল আনিয়া বসাও। আমাদের সমাজ কত পুরাতন। কত ঝড় তুফান ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যাহা পুরাতন—যাহা কালের তীক্ষ্ণ-অঙ্কুশাঘাত সহিয়াও টিকিয়া আছে—অসময়ের অগ্নি-পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্ত কৃত-কার্য্যই হইয়াছে—তাহার ভিতর কিছু না কিছু সত্য অবশ্যই আছে।............কত অতীত বংশ—কত অতীত সম্প্রদায়ের বিচক্ষণতার ফল বর্ত্তমান সমাজ। যদি তাহাদিগের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে, তবে তোমার সমাজকে ভক্তি কর—নষ্ট করিও না। উন্নত কর—সে তোমাদেরই উন্নতি। যদি তোমরা এখন পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত বিধি নিয়মগুলি অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগকে অপমান করিতে কুণ্ঠিত না হও—তবে তোমাদিগের পরে যাহারা আসিবে, তাহারাও যে আবার তোমাদিগকে "অন্ধ, বাতুল"

বলিয়া তোমাদেরই মস্তকে পদাঘাত করিবে। তাই সমাজকে সম্মান করিয়া তোমার অতীত পুরুষকে সম্মান কর।"*

ধর্ম্মের বন্ধন দুশ্ছেদ্য বলিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া, আর্য্য তপোধনগণ আমাদিগের প্রাত্যাহিক জীবনেরও সকল কার্য্য ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের দেশের রমণীগণই অধিক ধর্ম্মপরায়ণ—পুরুষ জাতি আপনার অভাব-অভিযোগ-ব্যথিত কার্য্য-ক্লান্ত জীবনের কুটিল কুহেলিকা লইয়াই ব্যস্ত। অবসর সময়েও তাহার চিন্তা সহস্র পথে ধাবিতা। কিন্তু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন দেবচরণবিনিঃসৃতা সন্ধ্যার শান্ত-অন্ধকার নিঃশব্দ মানবচরণ-সঞ্চারে স্বর্গের সুবর্ণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া পল্লীগ্রামে সহস্রকোলাহল চঞ্চল সজীব গৃহ-স্থাঙ্গনে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে, তখন শুদ্ধবেশপরিহিতা গৃহস্থ-কুলবধূগণ প্রজ্বলিত মৃন্ময়-প্রদীপ হস্তে নুপুরশিঞ্জিত কোমল-চরণে সমান ভক্তির সহিত তুলসী বেদীকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নারায়ণজ্ঞানে তুলসী-চরণ প্রান্তে প্রদীপটী রাখিয়া ভক্তিপূর্ণ অগাধ বিশ্বাসে গললগ্নবাসে প্রণাম করিয়া ধন্যা হয়। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োজ্যেষ্ঠা বঙ্গ হিন্দু-ললনাগণ অবগাহন-স্নানান্তে, আবক্ষনিমজ্জিতা হইয়া আর্দ্র বসনা-ঞ্চলে ভাসমান কলসী আবৃত করিয়া স্তিমিলিত নেত্রে, মুক্ত-বেশে, সিক্ত-কেশে যুক্তকরে স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অসহনীয় শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও হিন্দুরমণীগণ সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সুদূরতীর্থক্ষেত্রে দেবদর্শনে যাত্রা করেন—এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রত-নিয়মাদির জন্য দীর্ঘ-উপবাসান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া তাঁহারা জল গ্রহণ করেন না—ধর্ম্মের জন্য অনশন বা অর্দ্ধাশনে হিন্দুরমণী কাতরা নহেন। প্রাত্যাহিক জীবনে, ধর্ম্মের অগণিত কঠোর অনুশাসন সমক্ষেও তাঁহারা ভক্তিবিমিশ্রিত ভয়ের সহিত হেটমুণ্ডে, যুক্ত-করে অবস্থান করিয়া থাকেন। হয়ত আধুনিক পরিমার্জ্জিত-রুচি নব্য সভ্য আমরা এই সকল দেখিয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিব, ইহা অন্ধকুসংস্কার পূর্ণা লজ্জাহীনা বর্ব্বরতা মাত্র!

তাই প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ—আমরা এখন তাহা মানিতে চাহি না। আমরা শিক্ষিত—আমরা পরিমার্জ্জিত-রুচি—আমরা হেতুবাদের পরিপোষক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখনকার যুগ বিশ্বাসের যুগ ছিল, আর এখনকার যুগ যুক্তির। সরল-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এখন বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ সেই সকল পুরাতন বিধি নিয়ম ধার্য্য বলিয়া মানিয়া চলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অন্ধ (!!) বিশ্বাস যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত প্রদীপের মত প্রভাহীন হইয়া যাইতেছে। অন্ধতমোরাশিসমা-চ্ছিন্না নিস্তব্ধা সুপ্তারজনীতে শস্প-খদ্যোত শোভিত-তরুরাজিপরিবেষ্টিত শান্ত-বাপী জলে যেমন খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক এক একবার জলিয়া উঠে, আবার পার্শ্বস্থ

* নব্যভারত। "মল্লিখিত মানুষ ও সমাজ"

নিশীথিনীর তামসময়ী অন্ধকারের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়, সেই প্রকার রমণী-দিগের যাহারা গুরু—রমণীদিগের যাহারা শিক্ষক, তাহারা উক্ত বিধি নিয়ম যথার্থত চাহে না, বরং উহাদিগকে উন্মাদগ্রস্ত বিকৃত-মস্তিষ্কের অর্থহীন-প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে। মানব অনুকরণ-প্রিয় এবং শিষ্য বা শিষ্যা গুরুদেবেরই অনুকরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু * "মনের সহিত দেহের যে অতি-ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আহারের তারতম্য বা ভিন্নতা অনুসারে আমরা কেবল যে শারীরিক অবস্থা ভিন্নতা অনুভব করি, তাহা নহে, মানসিক অবস্থার ভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। ফলতঃ আমাদের মানসিক-অবস্থা যে বহুল পরিমাণে আমাদের শারীরিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আহারের ফলে উদরাময়, শিরঃ-পীড়া প্রভৃতি শারীরিক অবস্থার নানাবিধ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকলেই জানেন যে, সে বিকৃতি শুধু শরীরে সম্বন্ধ না থাকিয়া মন পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উদরা-ময় বল, শিরঃপীড়া বল শারীরিক যে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই মনের অবস্থারও ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয় ঘটে, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি স্বল্পাধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি, সে সমস্তের সমান গুণ নয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণাগুণের যে আলোচনা আছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। আমরাও নানাবিধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া একথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কিন্তু বায়ু, পিত্ত প্রভৃতি বৃদ্ধি হইলে মানসিক অবস্থারও বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে মানসিক উগ্রতা ও চঞ্চলতা জন্মে, পিত্ত বৃদ্ধি হইলে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে মানসিক অবসাদ ও অলসতা হইয়া থাকে। এসকল নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়, অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু এ সকল অতি-স্থূল-কথা—ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্বও আছে।.........কিন্তু যে স্থূলতত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, কেবল মাত্র তদ্দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায় যে, আহার-ভেদে মানসিক অবস্থার ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। আহার-বিশেষে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। কিন্তু যেখানে রাগদ্বেষাদি প্রবল, বা মনে শান্তি স্থৈর্য্য প্রভৃতির অভাব, সেখানে ধ্যান ধারণা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মচর্য্যার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিত্ত-স্থৈর্য্য ও চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। অতএব যে আহার চিত্ত-স্থৈর্য্য ও চিত্ত-শুদ্ধির বিরোধী, সে আহার ধর্ম্মচর্য্যারও বিরোধী। এবং যাহা ধর্ম্মচর্য্যার বিরোধী, তাহা আত্মারও বিরোধী; ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না।

* সাহিত্য—ফাল্গুন, ১২৯৮

এবং এই জন্যই আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহার ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।" এইত গেল আহার সম্বন্ধে স্থূল কথা। কিন্তু তিথি ভেদে আহার্য্য-সামগ্রীর মধ্যে কতকগুলি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আছে। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলেই প্রথমে বুঝিতে হয় "তিথি" কি।

প্রথমাধ্যায়।

তিথি প্রকরণ। তিথি কি, কেমন করিয়াই বা তাহার উৎপত্তি এবং ক্রমাভিব্যক্তি, সে সকল কথা সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নহে। তবে সেই সম্বন্ধে সাধারণ দুই চারিটি কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক।

তিথি—১। তন-ইথিন্ বাহুলকাৎ। নাদিলোপশ্চ

২। অত (সাতত্য গমনে) + ইথিন্। উণাদি।

তিথি—১। তনোতি বিস্তারয়তি চন্দ্রকলাঃ ইতি।

২। তন্যতে চন্দ্র কলা ইতি বা।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া, পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ পর্য্যন্ত দিন দিন চন্দ্রের যে জ্যোতি, তাহারই নাম তিথি ও চান্দ্রমাস।

\ "যে কাল বিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি।" "অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশিকলার নাম তিথি।"*

তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা। অমাবস্যার পর প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হ্রাস হয় তাহাকে কৃষ্ণ এবং যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল পক্ষ বলে। সূর্য্যমণ্ডল-বিনিঃসৃত চন্দ্র যে ত্রিংশদ্ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশ ভাগ গমন করিয়া থাকেন, তাহাই এক এক তিথি। রাশির পরিমাণ ১৫০ দণ্ড। তাহারই ১২ এর ৩০ ভাগে (অর্থাৎ ত্রিশ ভাগের বার ভাগে) ৬০ দণ্ড হয়। সুতরাং এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

* "চন্দ্রের প্রথম-কলা অগ্নি, দ্বিতীয়-কলা রবি, তৃতীয় বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষট্‌কার, ষষ্ঠ বাসব, সপ্তম ঋষি সকল, অষ্টম অজএকপাদ, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে

* "অমাষোড়শ ভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥
অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে॥"
সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

* বিশ্বকোষ।

ষোড়শ কলা সর্ব্বদা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে সোম ওষধিকে প্রাপ্ত হয়, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গো সকল তাহা পান করে, সেই গো সম্ভূত ক্ষীর সমূহ অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক মন্ত্রঃপূত হইয়া যজ্ঞীয় অগ্নিতে পূত হয়, তাহাতে শশী পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।"

এখন দেখা যাউক কেমন করিয়া প্রতিপদাদি ভিন্ন ভিন্ন তিথির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শীঘ্রগামী-চন্দ্র * সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নে এবং মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে অমাবস্যার দিন অবস্থান করে। সেই জন্যই সমুদয় সূর্য্যরশ্মি চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়। চন্দ্রের নিম্ন বা পার্শ্বদেশ—কোনও দিক্ দিয়াই আর রবিরশ্মি প্রকাশিত হইতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের এইরূপ গতিবিশেষের জন্য এবং সূর্য্যের কিরণ সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয় বলিয়াই আর চন্দ্রমণ্ডল একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরে শীঘ্রগতি দ্বারা সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়া চন্দ্র পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া থাকে এবং সূর্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং এই সময়েই চন্দ্রের সেই পঞ্চদশ অংশের একাংশ দর্শনযোগ্য হয়। সেই প্রথম ভাগ দিয়া সূর্য্যরশ্মি বহির্গত হইবার নিমিত্ত সকলেই সেই ক্ষীণ নবোদিত চন্দ্রের প্রথম কলা দেখিতে পায়। ঐ কলানিষ্পত্তি পরিমিত কালই প্রতিপদ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতেও এইরূপ হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বেদ পণ্ডিতগণ স্ফুট গণনা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে পর এক একটী তিথি হয়। এই প্রকারে ৩৬০ অংশ গমন করিলে পর প্রতিপদাদি একটী তিথি হইয়া থাকে।

চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ আমরা দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন তপনকিরণ-সম্পাতে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত এবং উজ্জ্বল থাকে, সেই সময় তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিনই পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল রবিকরোদ্ভাসিত অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই জন্যই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছে।

প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পাই যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন তিথির সহিত মনুষ্যশরীর সম্বন্ধবদ্ধ; অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত

তিথিগত ধাতু বিকার

* সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামী চন্দ্রঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী সূর্য্যঃ তথা সতি, তয়োর্গতি বিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্রমণ্ডলং অন্যূনমনতিরিক্তং সূর্য্যমণ্ডলস্যাধোভাগে ব্যবস্থিতং ভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেনাভিভূতত্বাৎ চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপরিতনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশৌ দ্বাদশভিরংশৈঃ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তথা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভাগেষু দর্শনযোগ্যঃ ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধীয়তে। তৎকলানিষ্পত্তি পরিমিতকালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি এবং দ্বিতীয়াদিষু বর্ণনীয়ং।"

সিদ্ধান্তশিরোমণি।

কফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন তিথিতে কোন ধাতু হয়ত অতিশয় উষ্ণ হয়, কোন ধাতু অতিশয় স্নিগ্ধ হয়—কেহ বা অতিশয় উগ্র, কেহ ঈষদুষ্ণ—আর কেহ বা অতিশয় চঞ্চল এবং কেহ ঈষচ্চঞ্চল ভাব ধারণ করে। ভিন্ন ঋতুতেও মানবশরীরে এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। কেন যে মানবধাতু এই প্রকার বিকার ভাবাপন্ন হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইরূপই যে হইয়া থাকে ইহা জানা থাকিলেই হইল। * তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে,

প্রতিপদে—শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণ রসাশ্রিত হয়।

দ্বিতীয়ায়—পৈত্তিক-ধাতু অতীব উষ্ণ হয় এবং বায়ু ও রুক্ষ হয়।

তৃতীয়াতে—শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং বায়ু ক্রূর ভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রূরতায় ধমনীতে অতিশয় শারীরিক রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।

চতুর্থীতে—শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক উভয় ধাতুই রুক্ষ হয়, সেই সঙ্গে বায়ুও ক্রূর ভাব ধারণ করে। এতদুভয় ধাতুর রুক্ষতায় এবং বায়ুর ক্রূরতায় মলাধারস্থ মল যথাযথরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না। তাই বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়। ধাতুত্রয়ের উক্ত বিকার-নিবন্ধন কোষ্ঠ সমুচিত পরিষ্কার না হওয়ায়, মলাধারে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় এবং "উদ্বেগ" অর্থাৎ অসুখোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে।

পঞ্চমীতে—পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হয়।

ষষ্ঠীতে—শৈত্যের ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সপ্তমীতে—রক্ত এবং পিত্ত উভয়ই তরল হয়।

অষ্টমীতে—পাকস্থলী দুর্ব্বল হয়, সুতরাং অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

নবমীতে—শ্লেষ্মা উষ্ণ হয় ও সেই সঙ্গে বায়ুও কুপিত হয়।

দশমীতে—অম্লের সহিত ক্রূরপিত্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একাদশীতে—শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরোৎপাদক-রসের সঞ্চার হইয়া নাড়ী ভারাক্রান্ত হয়।

দ্বাদশীতে—রক্ত এবং ক্রূরশ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বায়ু ক্রূর ভাব ধারণ করে।

ত্রয়োদশীতে—বায়ু মন্দগামী এবং রক্ত অত্যন্ত গাঢ় হয়। বায়ু মন্দগামী হইবার জন্য সেই গাঢ় শোণিত যথোপযুক্তরূপে মানব-শরীরে চালিত হইতে পারেনা, স্থানে

---

* "পক্ষদ্বয়ে প্রতিপদি কফ ধাতুর্ভবেৎ পুনঃ।
লবণেন সমাযুক্তো দ্বিতীয়ায়াং তথৈবচ।
পিত্ত ধাতুশ্চ বায়ুশ্চ ক্রমাচ্চ ভৃশ মুষ্ণতাং।
তীক্ষ্ণত্বঞ্চ সমাপ্নোতি তৃতীয়ায়াঞ্চ শোণিতং॥
অত্যন্তমুষ্ণতাং প্রাপ্তং বায়ুশ্চ ক্রূরতাং গতঃ।
ক্রূরেণ বায়ুনারক্তং সাচীভাবেন চালিতং॥
চতুর্থ্যাং পিত্ত ধাতুশ্চ শ্লৈষ্মিকো ধাতুরেবচ।
দ্বৌধাতুরুক্ষতাং প্রাপ্তৌ বায়ুশ্চক্রূরভাবগঃ॥
রুক্ষাভ্যাঞ্চ তদা তাভ্যাং ক্রূরভাবেন বায়ুনা।
মলাধারাম্মলং সর্ব্বং নিঃসৃতং ন যথোচিতং॥
তে নৈব হেতুনাধীরবেদনোদ্বেগ এবচ।
ভবেৎ তেনাহি লোকানাং আমরোগস্য লক্ষণং।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।
তান্ত্রিক চিকিৎসা শাস্ত্র।

স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্যই দূষিত ভাব ধারণ করে।

চতুর্দ্দশীতে—"অপান বায়ু" (গুহ্যদেশস্থ বায়ু) উর্দ্ধগামী হওয়ায় "আনাহ" (কোষ্টবদ্ধ ও মূত্ররোধক রোগ) রোগ এবং উদর ও স্তম্ভিত হইবার সম্ভাবনা।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়—চন্দ্রের ষোড়শকলার ক্রিয়া কাল পূর্ণতালাভ করায়, শৈত্যের পর উষ্ণতা এবং উষ্ণতার পর শৈত্যের সঞ্চার হয়।

[কৃষ্ণ পক্ষে উষ্ণতা ও শুক্লপক্ষে শৈত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাস ও উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত শৈত্যের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। শীতোষ্ণতায় এই হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় বিনা অত্যাচারেও স্বভাবতঃই কিছু অধিক পরিমাণ কফ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। নাড়ীতে এই প্রকার কফ সঞ্চার নিবন্ধন পাচিকা শক্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে এবং শরীরে কফোৎপত্তি লক্ষণও আংশিক প্রকাশিত হয়।

প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিতে ধাতুবিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় পক্ষের তিথি সম্বন্ধে ঐ একই কথা।

তিথিগত ধাতু-বিকার হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিকার (অর্থাৎ স্বাভাবিক ধাতুর অস্বাভাবিক-ভাবপ্রাপ্তি) উপশমের চেষ্টা করিয়া উপশম করিতে পারিলে অনাময় এবং না পারিলে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিলে, অগ্নি আরও প্রজ্জলিত ভিন্ন নির্ব্বাপিত হয় না। আহার বিহার প্রভৃতি দ্বারাই আমরা আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগুলির পোষকতা করিয়া থাকি। বিহারের কথা এখন ছাড়িয়া দিতেছি। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, কিরূপে আহারের দ্বারা ধাতুবিকারের পোষকতা করা হয়? কথাটী অবশ্য নিতান্তই সহজ ও সরল। তত্রাচ তাঁহাদিগের জন্য বলিতে হয় যে, যে দ্রব্যের সহিত যে বিকারের পরিপোষকতা সম্বন্ধ আছে, সেই দ্রব্য সেই বিকারের পোষকতা করে! স্থূলভাবে উত্তর দিতে গেলে ইহার অধিক আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিপদাদি তিথিতে নিষিদ্ধ, দ্রব্য সমূহের তালিকা।

যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য আছে, তেমন পৃথিবীর সকল দ্রব্যেরই আপন আপন নিজ স্বগুণ আছে সুতরাং আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার (পান ভোজন ইত্যাদি) করিয়া থাকি, তাহার সমস্তই এই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। অন্যান্য দ্রব্যের কথা পরিত্যাগ করিয়া আহার্য্য সামগ্রীর বিচারে অগ্রসর হওয়া যাউক।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদিগের আহার্য্য সামগ্রীর সংখ্যা বড় কম নহে। পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন খাদ্য সামগ্রীর সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ "গোলালুর" নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ১৭৯২ সালে গোলালু প্রথমে ভারতে আনীত হইয়াছে। যাহাহউক, আমাদিগের আহার্য্য সকল দ্রব্যগুলির গুণাবধারণ করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নয়। তাই, প্রতিপদাদি তিথিতে যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, কেবল তাহাদিগেরই গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

গুণনির্দ্ধারণ করিবার অগ্রে, কোন্ তিথিতে কোন্ সামগ্রী ভক্ষণ করা অবৈধ, তাহাই স্থির করা আবশ্যক। নিম্নলিখিত তালিকাটী "তিথি-তত্ত্ব" হইতে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা হইতেই, কোন্ তিথিতে কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজন করা অনুচিত, তাহা জানা যাইবে।

(তালিকা)

পক্ষ	তিথির নাম	নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম	ঐ সকল দ্রব্যের সাধারণ নাম
শুক্ল এবং কৃষ্ণ	প্রতিপদ	কুষ্মাণ্ড	কুম্‌ড়া
ঐ	দ্বিতীয়া	বৃহতী	বিলাতি
ঐ	তৃতীয়া	পটোল।	পটোল
ঐ	চতুর্থী	মূলক।	মূলা
ঐ	পঞ্চমী	বিল্ব।	বেল
ঐ	ষষ্ঠী	নিম্বুক।	নিম
ঐ	সপ্তমী	তাল।	তাল
ঐ	অষ্টমী	নারিকেল।	নারিকেল
ঐ	নবমী	তুম্বা বা অলাবু।	লাউ
ঐ	দশমী	কলম্বী।	কল্‌মি শাক
ঐ	একাদশী	শিম্ব।	সিম
ঐ	দ্বাদশী	পুতিকা।	পুঁইশাক
ঐ	ত্রয়োদশী	বার্ত্তাকু।	বেগুণ
ঐ	চতুর্দ্দশী	মাষকলায়।	মাষকলায়
ঐ	অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা	মাংস।	মাংস

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবের মুক্তি অর্থে কাহার মুক্তি হইল, অর্থাৎ চিত্তের ও বুদ্ধিতত্ত্বের মুক্তি, অথবা চিত্তস্থ ও বুদ্ধিস্থ-চিদাভাসের মুক্তি হইল? আপত্তিকারিগণ এইরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, যদি চিত্ত বা বুদ্ধিতত্ত্বের মুক্তি হয়, তাহা হইলে যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ অস্তিত্ব (যাহা চিরকাল আছে) কখন নাস্তিত্ব (তাহা নাই) বা নাস্তিত্ব কখন অস্তিত্ব হইতে পারে না, এক চৈতন্য ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, সমস্তই কল্পনা বা কল্পনার ছায়া মাত্র, সুতরাং ঐ কল্পনা বা কল্পিত-বুদ্ধির মুক্তি অসম্ভব। যদি চিদাভাস বা চৈতন্যের প্রতিবিম্বের মুক্তি বলা হয়, তাহা হইলেও নিতান্ত হাস্যজনক হয়, যেহেতু চৈতন্য বা জ্ঞানের আভাস বা প্রতিবিম্ব কোন বস্তু নহে। উহাও চৈতন্য বা জ্ঞানের ছায়া মাত্র, সুতরাং প্রতিবিম্ব বা ছায়ায় উন্নতি, অবনতি, বদ্ধ, মুক্তি, ইহার তুল্য হাস্য-জনক বিষয় আর কি হইতে পারে?

অতএব জীবের অবনতি, উন্নতি, বদ্ধ, মুক্তি প্রভৃতি আকাশ-কুসুম ও মরিচিকার জলভ্রান্তি তুল্য। বেদান্তও তাহাই বলেন যে ঘটাকাশ ও যাহা মহাকাশ ও তাহাই এবং দর্পণাভাব হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না, তৎকালে যাহার প্রতিবিম্ব সেই প্রকৃত বস্তু থাকে (এই প্রবন্ধের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মহর্ষি দত্তাত্রেয় তাঁহার অবধূতগীতায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে এক ব্রহ্ম ব্যতীত জীব বা জড় কোন পদার্থ নাই যথা—

আত্মানং সততং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈকং নিরন্তরম্।
অহং ধ্যাতা পরং ধ্যেয়ং অখণ্ডং খণ্ড্যতে কথং॥
ন জাতো ন মৃতোঽসি ত্বং ন তে দেহঃ কদাচন।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ॥
জন্ম মৃত্যু র্নতে চিত্তং বন্ধ মোক্ষৌ শুভা শুভৌ।
কথং রোদিষি রে বৎস নাম রূপং ন তে ন মে॥

বঙ্গার্থ। সমস্তই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই। যখন আত্মা অখণ্ড, তখন আমি ধ্যান-কারী, তিনি (ব্রহ্ম) ধ্যেয়, এক আত্মা দুই ভাগে কিরূপে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ অখণ্ড বস্তু কি প্রকারে খণ্ডিত হইবে? তুমি জন্ম গ্রহণও কর নাই, মরিবা না এবং দেহও কিছুই নহে, সমস্তই যে ব্রহ্ম, ইহা বহু শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। তোমার জন্ম মৃত্যু বা চিত্তের বন্ধ মোক্ষ শুভ ও অশুভ কিছুই নাই এবং নাম রূপ তোমার বা আমার নহে, অতএব বৎস! কেন রোদন কর।

হরি বোল হরি! সমস্ত মীমাংসা করিয়া আসিয়া আবার ফিরে গণ্ডুষ! সুতরাং মীমাংসার সার মর্ম্ম সরল ভাবে এস্থানে

উদ্ধৃত না করিলে ঐ কূটতর্কের মীমাংসা কঠিন হইবে, মীমাংসার সার এই—

১। এক জ্ঞান বা চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, ইহাই সচ্চিদানন্দব্রহ্ম।

২। জ্ঞান বলিলে জ্ঞানের এক দিকে জ্ঞাতা, আর এক দিকে জ্ঞেয় বস্তু চাই এবং উভয়ের সংযোজক জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি ও চাই। যেমন আমাদের হৃদয় ও পৃষ্ঠ-পঞ্জরের মধ্যে মেরুদণ্ড আছে, উহার এক পার্শ্বে হৃদ-পদ্ম সহিত বক্ষ ও অন্য পার্শ্বে অস্থিময়-পৃষ্ঠ হইতেছে, সেইরূপ জ্ঞানক্রিয়া শক্তির এক দিকে জ্ঞাতা, অন্য দিকে জ্ঞেয় রহিয়াছে। জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তি থাকিতে পারে না, আবার জ্ঞাতা যাঁহা জ্ঞাত হইবে, সেই জ্ঞেয়-বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তিরও কোন অর্থ থাকে না অতএব এক জ্ঞান বলিলে তাহার তিনটী অঙ্গ জ্ঞাতা, জ্ঞানের ক্রিয়া, শক্তি এবং জ্ঞানের বিষয়, এই তিনটী আবশ্যক।

৩। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই পরিবর্ত্তন শীল, অর্থাৎ বিষয় মাত্রেই পরিবর্ত্তন-শীল, কল্য যাহা জল ছিল, অদ্য তাহা বাষ্প হয়, আবার অদ্য যাহা বাষ্প দেখি, কল্য তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু ঐ জল-জ্ঞান, বাষ্প-জ্ঞান, বায়ু-জ্ঞান পৃথক পৃথক হইলেও উহার জল, বাষ্প, বায়ু বাদ দিলে জ্ঞাতাই জ্ঞান, উহা অদ্বিতীয় উহার পরিবর্ত্তন নাই।

৪। যখন এক নিত্য-জ্ঞাতা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন জ্ঞেয়-বিষয় কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং জ্ঞেয়-বিষয় জ্ঞাতার জ্ঞান ক্রিয়া শক্তির ভাব প্রবাহ মাত্র।

৫। জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি অর্থে; এক দিকে জ্ঞানানুভূতি-প্রকাশ-শক্তি, অন্য দিকে জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ বা সৃষ্টি শক্তি বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে দুইটিই এক শক্তি জ্ঞানানুভূতির বাহ্য বিকাশ, যাহা জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ্য তাহাই।

৬। জ্ঞানানুভূতির প্রকাশ বলিতে হইলে কোন একটী ভাবকে বোধ বা অনুভব করা বুঝায়, মনে কর একটী সিংহ কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু আমার যদি কখন সিংহ জ্ঞান বা বোধ না থাকে, তবে আমি কি কখন চিন্তা দ্বারা সিংহ কল্পনা করিয়া একটী সিংহ-মূর্ত্তি জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি? কিন্তু চিন্তা বা কল্পনা ব্যতীত ভাবের বিকাশ হয় না। অতএব ঐ জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি প্রথমতঃ বোধ বা অনুভূতি রূপে প্রকাশ হইয়া মানসক্ষেত্রে চিন্তা বা কল্পনা রূপে ভাবের আকার নির্ম্মাণ করে, আবার ঐ আকার প্রথমোক্ত অনুভূতি বা বোধ রূপে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করেন। ঐ আদি ভাবসমূহই বিষয়-বীজ, উহাই দৃশ্যজগতের বীজস্বরূপা পঞ্চতন্মাত্র। যখন মূল বিষয় পাঁচটী, তখন অনুভূতি মূলে পাঁচ প্রকার হওয়া আবশ্যক, ঐ পাঁচ প্রকার অনুভূতির দ্বার-স্বরূপ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্ব। যখন জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে, তখন ঐ বিষয় রূপ ভাব সমূহ এবং তাহার অনুভূতি, মূল-শক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, ঐ জ্ঞান বুদ্ধি ও মনের অগোচর ও অপর পারস্থিত। যেহেতু, জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তি

হইতে ভাবগ্রাহি·বুদ্ধি মন, এবং বুদ্ধি মনের দ্বার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-তত্ত্বের বিকাশ হয়। যখন ঐ ভাব-সমূহ শক্তির মধ্যে লুকায়িত হয়, তখন ঐ ভাব গ্রাহি বুদ্ধি মনও ঐ ক্রিয়া শক্তির মধ্যেই বিলীন হয়। কেবল মাত্র নিত্য জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্র; যাহা অবশিষ্ট থাকে, ঐ নিত্য জ্ঞানই জ্ঞাতা (সৎ-চিৎ-আনন্দ) নিত্যই সৎ (অস্তিত্ব) জ্ঞানই চিৎ ঐ জ্ঞাতাই স্বয়ং চিরানন্দময়, অতএব বিষয় রূপ ভাব-সমূহ জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তির কল্পনা মাত্র। নিত্য জ্ঞানানন্দের (জ্ঞাতার) বন্ধ মুক্তি কিছুই নাই।

৭। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কল্পিত-ভাবের মধ্যে জ্ঞানাভাস আছে এবং ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রিয়া শক্তি ত্রিগুণান্বিতা, তন্মধ্যে তমোগুণ কর্ত্তৃক ঐ ভাব সমূহ মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থে পরিণত হইলে তদভ্যন্তরস্থ জ্ঞানাভাস অপ্রকাশ হয়! তদনন্তর ঐ জড়স্থ গূঢ় সত্ব ও রজোগুণের বিকাশ হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত মত প্রাণ মন ও বুদ্ধি তত্ত্বের বিকাশ হয়, অর্থাৎ যেন প্রস্তর বা মৃত্তিকা নানা জাতীয় উজ্জ্বল তৈজস-তত্ব আকর্ষণ করিয়া লইয়া উহাদের রাসায়নিক শক্তি প্রভাবে উজ্জ্বল মণি বা উজ্জ্বল কাঁচে পরিণত হইয়া তদ্বারা যেন বুদ্ধিরূপ দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতে (ব্রহ্মাণ্ডে) যত প্রকার ভাব (অর্থাৎ ভাবময় সূক্ষ্ম ও স্থূল তত্ব) আছে, সেই সেই সমগ্র-ভাবের (অর্থাৎ ভাবময় সূক্ষ্ম ও স্থূল তত্ত্বের) এক এক কণা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রিত হইয়া একটী সংশ্লিষ্ট ভাবময়-কেন্দ্রে পরিণত হয়। উহাতে দৈব, আসুরিক, পৈশাচিক, পাশব, জাড্য প্রভৃতি সমস্ত ভাবের কণা অর্থাৎ কিয়ৎ-পরিমাণ অংশ থাকায়, উহাকে পূর্ণের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলা যায় (উহাই মানব তত্ব) এই জন্য মানবকে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলে।* ঐ সংশ্লিষ্ট-ভাবময় কৈন্দ্রিক-দর্পণে যে চৈতন্য বা জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাও তদাকারে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, মানবাত্মা ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা তাঁহার পুত্র-স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ছায়া বা প্রতিবিম্ব এই দুইটী বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, ছায়া দ্বারা বস্তু আবৃত হয়, কোন স্থূল-বস্তুর ছায়া সূক্ষ্ম-বস্তুর উপর পড়িলে ঐ সূক্ষ্ম-বস্তু স্থূল-বস্তুর ছায়ায় ঢাকিয়া যায়, কিন্তু প্রতিবিম্ব সেরূপ নহে, ইংরাজিতে ছায়াকে Shed ও প্রতিবিম্বকে Refliction কহে, অস্পষ্টবস্তুর আলোকে বস্তুর যে যৎসামান্য স্থূল আভাস পড়ে, তাহাই ছায়া এবং উজ্জ্বল-দর্পণে বস্তুর যে পূর্ণাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, উহাকে প্রতিবিম্ব কহে! পার্থিব অন্যান্য-জীব দুই চারিটীর ভাবের ছায়া মাত্র এবং মনুষ্য পূর্ণ ভাবময় জ্ঞানাভাসের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার ভাব আছে, সেই সমস্ত ভাব অংশতঃ মনুষ্যে আছে, তবে ভাবের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার পরিমাণের ন্যূনাতিরেক অনুসারে বুদ্ধিরূপ কৈন্দ্রিক-দর্পণের উজ্জ্বলতা ও

---

* হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৩।৪।৫।৬ সংখ্যায় ৫৩ পৃষ্ঠায় আমার কৃত মুক্তি ও অমরত্ব প্রবন্ধের প্রারম্ভে ১হইতে ৪ সূত্র এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

মলিনতা নির্ভর করে, তদ্ধেতু প্রতিবিম্ব ও (Refliction) স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হয়। এই জন্য মনুষ্যের মধ্যে কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী, কেহ বিষয়ী ইত্যাদি।

৯। উপরোক্ত এক একটী ভাবময়-তত্ত্ব মানুষের মানসিক ও শারীরিক এক একটী বৃত্তির এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা-তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বাদশ আদিত্য, জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অংশুমান্ রবি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কোন কোন মতে মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য—* স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিকপাল, রসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ইত্যাদি। দয়া, ক্ষমা, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তির অধিষ্ঠাতা দেব, অসুর, পিশাচ প্রভৃতি আছে, উহারাই মানবের শারীরিক ও মানসিক এক একটী বৃত্তি প্রকাশের সাহায্য-কারক। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মানবে তাহার ক্ষুদ্র ২ অংশ থাকায় ঐ সকল অংশ একত্রিত হইয়া মানবের বুদ্ধি-মন-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইয়াছে। ঈশ্বর যেমন সমগ্র-জগতের কেন্দ্র, মানব সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ২ অংশ বা ভাব সমষ্টির কেন্দ্র। ঈশ্বর জ্ঞান বা চৈতন্যময়, এই জন্য চিৎ-দর্পণই তাঁহার জ্ঞান-প্রকাশের শক্তি, মানব ঐ জ্ঞান বা চৈতন্যের ভাবরূপ চিত্ত বা অন্তঃকরণময়, এই জন্যই চিত্ত-দর্পণে ঐ চৈতন্যের ভাবময় প্রতিবিম্ব বিকাশ হয়।

১০। উজ্জল দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ার সংক্ষেপ হেতু এই যে, যেমন শব্দ কম্পনগতি (Vibration of sound) দ্বারা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। রূপ (অর্থাৎ বস্তুর বর্ণ বা রং) কম্পনগতি (Vibration of colour) দ্বারা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ বস্তুর তৈজসরূপ বা বর্ণ ঐ কম্পন গতি দ্বারা দর্পণেও প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ঐ দর্পণস্থ-বিম্ব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, প্রকৃত-বস্তুর মুখ যে দিকে থাকে, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের মুখ তাহার বিপরীত দিকে থাকা চক্ষে অনুভূত হয়, প্রথমতঃ বস্তুর রূপ বা অকৃতি জিনিষটা কি স্থির হইলে উহার প্রতিবিম্ব যে কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পদার্থে যে সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, ঐ আলোক সেই পদার্থের অণুসকলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় তদাকার ধারণ করে, উহাকেই রূপ বা আকৃতি বলে। ঐ আকৃতি পূর্ব্বোক্ত অণুপ্রতিবিম্বিত জ্যোতি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঐ আণব-জ্যোতি পূর্ব্বোক্ত কম্পন দ্বারা জ্যোতির ফোকস্ (Focus) স্বরূপ যে চক্ষু, ঐ চক্ষুতে প্রতিভাত হয়। জ্যোতিও তৈজস, চক্ষুও তৈজস, দর্পণও তৈজস, তদ্ধেতু দর্পণেও ঐ অণুবিম্বিত জ্যোতি প্রতিভাত হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, প্রতিবিম্ব পদার্থ শূন্য নহে, ঐ প্রতিবিম্ব পদার্থের অণুমিশ্রিত

* সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভেদে বিষ্ণু এবং সূর্য্য, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র একই তত্ত্ব মৎকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, হিন্দু-পত্রিকার ৩য় খণ্ডের ১ম ২য় সংখ্যা ২৫ পৃঃ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা।

জ্যোতি হইতেছে অতএব উহা তৈজস অণু।

১১। এখন ভয়ানক কঠিন-সমস্যা, যাহাকে আমরা রূপ বা জ্যোতি বলি, জ্ঞানের বা চৈতন্যের সেই প্রকার রূপ বা দৃশ্য-পদার্থ প্রতিবিম্বত জ্যোতি নাই, উহা নিরাকার, তবে উহার (অর্থাৎ নিরাকার চৈতন্যের) প্রতিবিম্ব কিরূপ হইবে? এই জন্য এই প্রবন্ধের প্রথমেই কথিত হইয়াছে যে, অন্তর্জগতের ভাষা নাই, বাহ্য-জগতের ভাবের যে সকল ভাষা আছে, তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলনা হয় না, তবে বাহ্য দৃষ্টান্তের সহিত অংশতঃ কিঞ্চিৎ মিল থাকায় সেই সেই বাহ্য জগতের একদেশ ব্যাপী দৃষ্টান্ত খাটাইয়া লইতে হয়, তদ্‌ভিন্ন ভাষা দ্বারা প্রকাশের উপায় নাই।

১২। যেমন সূর্য্যের আলোক কোন বাহ্য-বস্তুর উপর পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করিয়া দর্পণে সেই আকার প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানাভাস অন্তঃকরণে যে ভাবের আকার ধারণ করে, তাহা বুদ্ধিতে তদাকারে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ যেমন জ্যোতির ফোকস্, বুদ্ধি সেইরূপ জ্ঞানের ফোকস্। সূর্য্যের জ্যোতি বাহ্য বস্তুর ভাব প্রকাশ করে, জ্ঞানের জ্যোতি অন্তরের আধ্যাত্মিক-ভাব প্রকাশ করে, উভয়ই প্রকাশ স্বরূপ * অতএব বুদ্ধিস্থ জ্ঞান-বিম্ব একেবারে অবস্তু নহে,* উহা বুদ্ধিস্থ ভাব সমূহের সহিত অবিমিশ্রত থাকায়, বুদ্ধি যতই নির্ম্মল হইবে, ভাবময় জ্ঞান-বিম্বের ততই অধিক বিকাশ হইবে। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত ভাব-জ্ঞানই জীবাত্মা, সুতরাং বুদ্ধি যতই নির্ম্মল হইবে ও অণুবীক্ষণ দর্পণের ন্যায় হইবে ভাব জ্ঞানময় জীবাত্মার ততই অধিক বিকাশ হইবে (অর্থাৎ জ্ঞানমণ্ডল বৃহৎ ও স্পষ্টীকৃত হইবে) ও জীব মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে।

১৩। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট ভাব সমষ্টির কেন্দ্রই মানবতত্ত্ব, যখন ঐ কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন চিত্ত দর্পণরূপ বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও জ্ঞান জ্যোতি ধারণোপযোগী হইয়া নিত্য জ্ঞান প্রকাশরূপিণী (চিদ্দর্পণ সদৃশা) বিদ্যার অঙ্গীভূত হইবে এবং জীবাত্মাও পূর্ণ ভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া মুক্ত ও সর্ব্বেশ্বরের অঙ্গীভূত হইবেন।

১৪। এক্ষণে জীবাত্মার দিক দিয়া দেখিলে জীবের অবনতি, উন্নতি, বদ্ধ মুক্তি, সমস্তই আছে, পরমাত্মার দিক দিয়া দেখিলে

টীকা * সূর্য্যের জ্যোতি দ্বারা ভূর্ভুবস্ব অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ বিকাশিত হয় এবং সেই দেবের অর্থাৎ দীপ্তিমান সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ ভর্গ হইতে বুদ্ধি প্রেরিত অর্থাৎ বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, অতএব ভৌতিক-জ্যোতি ও আধ্যাত্মিক-জ্যোতি উভয়ই প্রকাশ স্বভাব।

* চৈতন্য নিরাকার হইলেও জীবের বুদ্ধি মন একেবারে নিরাকার নহে। তবে ঐ বুদ্ধি মনের রূপ আমাদের স্থূল-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, মন বুদ্ধির সূক্ষ্ম জ্যোতি বা বর্ণ আছে; যোগ বলে তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আধুনিক কোন যোগী মানস জ্যোতি বা বর্ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনেও অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিলে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় দেবতা-দিগের রূপ দর্শন হইতে পারে বর্ণিত আছে। (বেদান্ত দর্শন পাদ সূত্র পৃষ্ঠা)

এক নিত্য জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই কেন না, এই জগৎ তাঁহার শক্তির ভাব প্রবাহ মাত্র। ঐ এক একটী ক্ষুদ্র ২ ভাবের মধ্যে জ্ঞানাভাস যাহা অণুর ন্যায় * প্রবিষ্ট হইয়া সেই ভাবের অধীন হয়, সেই অণুপ্রবিষ্ট ভাবরূপ অন্তঃকরণে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা ও নানাভাব সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বুদ্ধি ও উজ্জ্বল হয়। ও ঐ বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞান-মণ্ডল পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা কল্পিত ভাবের আবরণাংশ দূরীভূত এবং নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ প্রকাশাংস সত্য-জ্ঞানের অধীন হয়। যত দিন ভাবের কল্পিত আবরণ অর্থাৎ ভ্রান্ত-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয়, তত কাল বুদ্ধিতে ভাবময় জ্ঞানাভাস সেই সেই ভাবে বা ভাবাকারে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু কল্পিত আবরণ দূরীভূত হইলে ভ্রান্ত জ্ঞান দর্পণরূপা বুদ্ধির ভ্রান্তি দূরীভূত হয় এবং তাহা নিত্য জ্ঞান দর্পণের সহিত মিলিত হয় ঐ নিত্য—জ্ঞান-দর্পণই বিদ্যা বা মহাশক্তি, উহাই ভগবদ্গীতোক্ত মহদ ব্রহ্ম, উহাই পুরাণোক্ত মহৎ বুদ্ধিরূপা ভবানী।

যত কাল জীবাত্মা মুক্ত না হয়, ততকাল দিবা রাত্রের ন্যায় ইহ পরলোক গতায়াত করে, পরলোকই পূর্ব্বোক্ত পিতৃলোক। কিন্তু সাধনা দ্বারা জীবে সুখময়—স্বর্লোকস্থ বিশেষ—কোন (উচ্চতর) দেবতত্ত্বের অধিক বিকাশ হইলে তাহার আকর্ষণে জীব (মরণান্তে) পিতৃলোকের পরিবর্ত্তে স্বর্লোকে গমন করিয়া যে পরিমাণ সুখের বিকাশ হয়, সেই পরিমাণ কাল স্বর্গসুখানুভব করিয়া ঐ সুখ ভোগান্তে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার লইয়া পুন জন্ম গ্রহণ করে * এবং ক্রমে ২ সাধনা দ্বারা যতই জ্ঞান জ্যোতি বিকাশ হয়, জীবাত্মা ততই মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

এতাবতায় সাব্যস্ত হইল বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত ধী-মনোময় জ্ঞানই জীবাত্মা, উহারই ইহ পরোলোক গমন, উন্নতি, অবনতি, বদ্ধ, মুক্তি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ঐ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জ্ঞানাভাস মনোময় হইয়া স্নায়ুযোগে ইন্দ্রিয় ও দেহের প্রত্যেকাংশে ব্যাপ্ত হওয়ায় দেহাত্ম-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ দেহেই আমি এই জ্ঞান হয় ও দেহের সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ জ্ঞান হয়। ক্রমে সাধনা দ্বারা যতই অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞানের বিকাশ হয়; ততই দেহাত্ম জ্ঞান মানসাত্ম-জ্ঞানে মানসাত্মজ্ঞানে বুদ্ধ্যাত্ম এবং বুদ্ধ্যাত্ম জ্ঞানে সত্যপরমাত্ম জ্ঞানে পরিণত হয়। এক্ষণে একটী তর্ক উঠিতে পারে যে, সাংখ্য মত খণ্ডনের সময় কথিত হইয়াছে যে, সাংখ্যের পৃথক ২ পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া কীটাণু হইতে মানব যোনি ভ্রমানান্তর মুক্তি লাভ করিয়া যাহা ছিল

* উহা ভৌতিক পদার্থের অণুর ন্যায় নহে, যেমন আমাদের মনে যে সামান্য এক একটী ভাব বা চিন্তা উদিত হয়, উহা আমাদের মূল জ্ঞান প্রতিবিম্বিত সমষ্টি ভাবের এক একটী ক্ষুদ্র অংশ বা অনুরূপ প্রোক্ত অণু তদ্রূপ।

টীকা * তেজ, জ্যোতি, আকর্ষণ বিক্ষেপণ প্রভৃতির প্রকৃত মৌলিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে স্বর্গের রহস্য ভেদ হইতে পারে, কিন্তু যোগবল ব্যতীত জড় বিজ্ঞান দ্বারা উহার প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার হইতে পারে না।

তাহাই হয়, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য শূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন বিপক্ষবাদীরা বলিতে পারেন যে, তোমার বেদান্তোক্ত নিত্য-জ্ঞানের আভাস ও ভাব সংযুক্ত হইয়া জন্ম জন্মান্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনঃ নিত্য জ্ঞানে পরিণত হয়, অতএব চিদাভাসময় জীবের মুক্তি দ্বারা নিত্য জ্ঞান কি এক মাত্রা বৃদ্ধি হয়? যদি তাহাই হয়, তবে জ্ঞান নিত্য সত্য শাশ্বত অনন্ত ইত্যাদি বাক্যের অর্থ থাকে না, যদি জীবাত্মার মুক্তি দ্বারা নিত্য জ্ঞান পরবর্দ্ধিত না হয়, তবে সাংখ্যের মতের প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে; বেদান্ত মতেরও সেই দোষ দাঁড়ায়; তাহা হইলে এত লেখা লিখি বকা বকির আবশ্যক কি?

উপরোক্ত প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা এই পুর্নজন্ম তত্ত্বের অন্তর্গত নহে,-এই পুনর্জন্ম তত্ত্বে উহার এইরূপ উত্তরই যথেষ্ট, যে, সমুদ্রের জলবিম্ব কখন সমুদ্র পদ বাচ্য হইতে পারে না এবং আপনার দেহস্থ এক বিন্দু শুক্র কখনই আপনার পূর্ণ-দেহ নহে। এখন যদি অনন্ত সমুদ্রের একটি জলবিম্ব কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদ্র বিশেষে পরিণত হয় কিম্বা এক বিন্দু বীর্য্য পূর্ণ একটী মানুষ হয়, তবে ঐ অণুর বৃদ্ধিত্ব ও উন্নতি স্বীকার করিব না কেন? সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ঠিক যে অবস্থায় ছিল, মুক্ত হইয়াও ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু বেদান্তোক্ত জীবাত্মা তদ্রূপ নহে— বেদান্তোক্ত জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রতিবিম্ব একেবারে অবস্তু নহে, যেমন কোন বস্তুর প্রতিবিম্বে পূর্ব্ব বর্ণিত মত ঐ বস্তুর তৈজস অণু আছে, সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্বে চিদ্বীজ আছে, শাস্ত্রেও উহাকে চিদ্‌বীজ বলে, ঐ চিদ্‌বীজ প্রকৃতির গর্ভস্থ হইয়া শিশু জীবাত্মা রূপে প্রসূত হয়, সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আত্মজ সম্বন্ধ। প্রকৃত পক্ষে-পুত্র পিতা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তবে পুত্র যেরূপ পিতার অংশ, জীবাত্মা পরমাত্মার তদ্রূপ অংশ নহে, উহা স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, এই জন্য আভাস বা প্রতিবিম্ব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কল্পিত ভাবের মধ্যে কল্পনাকারীর জ্ঞানের আভাস থাকে উহা দৃশ্যে বস্তুর অণু বা অংশের ন্যায় নহে অথচ জ্ঞানের আভাস ও জ্ঞানের ন্যায় প্রকাশ স্বভাব, ঐ আভাস পূর্ণ প্রকাশ হইলে উহাই পূর্ণ জ্ঞান। অতএব জীব মুক্ত হইলে নিত্য সত্য—জ্ঞানময় হয়। অনন্ত নিত্য জ্ঞানের অংশাংশি বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এই জন্যই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, জীবাত্মার পক্ষ হইতে দেখিলে জীবের উন্নতি, বদ্ধ, মুক্তি সমস্তই সম্ভব, নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মার পক্ষ হইতে দেখিলে আত্মার উন্নতি, বদ্ধ, মুক্তি অসম্ভব, যেহেতু সত্য জ্ঞানের বিকাশ হইলে সমস্তই মায়াময় বদ্ধ মুক্তি মায়ার কল্পনা মাত্র দৃষ্ট হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই সৃষ্টি কল্পনা বা সৃষ্টি ক্রিয়া ও জীবের বদ্ধ মুক্তি কি উদ্দেশ্য শূন্য ইহা কি ঈশ্বরের ক্রীড়া মাত্র অনন্ত কালই কি তিনি উদ্দেশ্য শূন্য ক্রীড়া করিতেছেন? এক এক সৃষ্টির প্রারম্ভও যাহা সমাপ্তও কি তাহাই? আ-

ব্যার পুনরারম্ভ কি ঠিক সেই প্রকার? সৃষ্টির মূলতঃ উন্নতি, অবনতি কি কিছুই নাই?

ইহার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রশ্নের উত্তর পুনর্জ্জন্ম তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্গত। ঐ সৃষ্টিতত্ত্ববিশদরূপে লিখিতে হইলে একখানি গ্রন্থের ন্যায় প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ফলতঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মানব বুদ্ধির অগম্য হইলেও যখন মানবাত্মা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা তাঁহার নিত্য জ্ঞানের আভাস স্বরূপ (কেবল পার্থিব-ভাবের সহিত মিশিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে) তখন সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য-জ্ঞান কিয়দংশ মানব মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইতে পারে, যাহাহউক এই ক্ষুদ্রতর জীব চিন্তারূপ সাধনা দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা পৃথক সৃষ্টি তত্ত্ব প্রবন্ধে যথাসাধ্য বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিব। *

তবে এখন সংক্ষেপতঃ এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট, যে অনন্ত সত্য জ্ঞানে এক অদ্বিতীয় নিত্য শাশ্বত, উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু সৃষ্টি পরিবর্ত্তন শীল এবং তাহার উন্নতি অবনতি থাকায়, কার্য্যে যাহা আছে, কারণেও তাহা আছে, অতএব বস্তুর যেরূপ উন্নতি আছে, সৃষ্টি ক্রিয়া শক্তিরও তদ্রূপ উন্নতি আছে। ঐ ক্রিয়া শক্তিই পূর্ব্ব বর্ণিত মত জ্ঞানের সৃষ্টি প্রকাশ্য (সত্ত্বময়) মহদ্দর্পণ স্বরূপ। মানবাত্মার মুক্তি বলিলে পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হওয়া এবং বিশুদ্ধ-ভাবের সহিত উজ্জ্বল বুদ্ধি (সূর্য্য উদয়ে যেমন প্রদীপের আলোক সৌরালোকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ) পূর্ণ-জ্ঞান জ্যোতিতে বিলীন হইয়া যাওয়া বুঝায়। বিশুদ্ধ ভাবময়-নির্ম্মল-বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞান জ্যোতি সেই মহজ্জ্যোতিতে মিলিত হওয়ায় ঐ মহদ্দর্পণের উজ্জ্বলতা পরিবর্দ্ধিত হয়। ধূমকেতু সৌরাকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া সূর্য্যে মিলিত হইলে যেমন সূর্য্য তেজের বৃদ্ধি অর্থাৎ উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ একটী জীব মুক্ত হইয়া জ্ঞানময় হইলে জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তিরূপ জ্ঞান দর্পণের উজ্জ্বলতা ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। যেমন ইহলোকে একজন জ্ঞানী মহাত্মা জন্মিলে তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা মানব-সমাজ উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান জ্যোতির অণু সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজে জ্ঞান-চর্চ্চা ও সমাজ সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়। সেইরূপ একজন জ্ঞানী মুক্তি লাভ করিলে জ্ঞানের দর্পণরূপ কারণ শক্তি যে উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হইবে ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যেমন বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির জ্ঞান-জ্যোতিতে সমাজ বিশুদ্ধ হইয়াছিল এখনও তাঁহাদের সেই জ্ঞান-জ্যোতিতে স্বদেশ ও বিদেশস্থ সমাজ উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই সেইরূপ মহাত্মার মুক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া শক্তিময় জ্ঞান দর্পণ উজ্জ্বল হইলেও নিত্য জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, জগতের জ্ঞানের বিকাশ অধিক হইতেছে ও হইবে, তবে ইহার মধ্যে কালের অবনয়ন ও উন্নয়ন প্রণালী-অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু মোটের উপর সৃষ্টির এক এক আবর্ত্তনে জগতে সত্ত্বগুণের পরিবর্দ্ধন হেতু জ্ঞানমণ্ডল যে বৃদ্ধি হইতেছে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে

টীকা * বিগত বর্ষের ১ম ২য় সংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিমূর্ত্তির ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব তৎপরে এপর্য্যন্ত আর লিখিত হয় নাই, ভবিষ্যতে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে। যদি এই ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা ঐ গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা হওয়া সেই ইচ্ছাময় সর্ব্ব-নিয়ন্তার অভিপ্রেত হয়, তবে অবশ্যই ইচ্ছা সফল হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশঙ্কর-স্তোত্রং।

১। যৎপাদপঙ্কজরজঃ স্মরণেন পুংসা
মিষ্টার্থ-সিদ্ধিরচিরাৎকরবিল্বতুল্যা।
সম্পদ্যতে তমমলং সুখচিৎস্বরূপং
শ্রীশঙ্করং গুরুবরং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ১।

লোকানামভয়ঙ্কর শ্রুতিশিরোবাক্যোদ্ধৃত-
জ্ঞানতঃ।
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকারজাত কুমলং নির্ম্মূলমুন্মূ-
লয়ন্।
নাম্নোঽর্থকতামপি প্রকটয়ন্ যোজ্ঞানি-
নামগ্রণীঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ সমু-
জ্জৃম্ভতাং ২।

চার্ব্বাকাদিভিরার্য্যগর্হ্যচরিতৈঃ সম্মোহিতে
ক্ষমাতলে।
কার্পণ্যেন পরিপ্লুতে নরচয়ে মিথ্যাফলা-
ন্বেষণাৎ।
স্বাংশেনাবিরভূৎ জনান্ সুখয়িতুং—
যোযোগী সর্ব্বজ্ঞঃ
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ
সমুজ্জৃম্ভতাং ৩।

শ্রীমদ্ব্যাসমহর্ষি-নির্ম্মিত পরব্রহ্মাববোধাবহং
সূত্রাণাং নিচয়ং সুভাষ্যকলনে নালঙ্কৃতং
যোব্যধাৎ।
দেবৈরপ্রতিমপ্রভাবিলসিতৈঃ সানন্দমারা-
ধিতঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ
সমুজ্জৃম্ভতাং ৪।

দুস্তর্কপ্রকর প্রকামবিগলৎ দানাম্বু গন্ধোৎ-
কটান্।
বেদান্তোপবনোপমর্দ্দন দুরাধর্ষ কৃতা-
বুদ্যতান্।
দ্বৈতীভ-প্রবরান্ মমর্দ্দ নিতরাং যঃ সিংহ-
বৎ নির্গতঃ।
সোঽয়ং বিশ্বনুতো মদীয়-হৃদয়ে শম্ভুঃ
সমুজ্জৃম্ভতাং ৫।

যাঁহার পাদ-পদ্মের রজঃ স্মরণে হস্তস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায় মানবদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, সেই নির্ম্মল, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, গুরুবর শ্রীশঙ্করকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি ১।

জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ যে শঙ্কর লোকদিগের অভয়-দাতৃ শ্রেষ্ঠ বেদবাক্যের দ্বারা দুষ্কৃত জনিত-অজ্ঞান-সমূহকে সমূলে নাশ করতঃ স্বীয় নামের (অর্থাৎ শং মঙ্গল করেন' যিনি এই নামের) স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ২।

পৃথিবীস্থ মানবগণ সমস্ত সজ্জন-বিগর্হিত-চার্ব্বাকদিগের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মিথ্যাফলান্বেষণে রত হইলে, যিনি মানবদিগকে সুখী করিবার জন্য স্বীয় অংশে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, ৩।

যিনি মহর্ষিবেদব্যাস-নির্ম্মিত সূত্র সমূহকে স্বীয় রচিত-ভাষ্য দ্বারা শোভিত করিয়া-ছিলেন, অসীমপ্রভাবশালী দেবগণের আরাধ্য, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। ৪।

যিনি কুতর্ক সমূহের দ্বারা বিগলিত মদ-জল, বেদান্তরূপ উপবন মর্দ্দনে নিরত, দ্বৈত-বাদীরূপ গজ সমূহকে সিংহের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, বিশ্বজনস্তুত সেই শঙ্কর আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ৫।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরহরি শাস্ত্রী।

৮ম বর্ষ। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ৭ম, ৮ম সংখ্যা।

১৮২৩, ১৩০৮।

হিন্দু-পত্রিকা

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১।০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৵০

"আমিত্বের প্রসার"—১মখণ্ড। ইহাতে ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিমাই ৮পেজি ১৩০পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধান। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ৸০ আনা মাত্র। হিন্দুর দৈনিক কার্য্যাবলী কিরূপে আত্মপ্রসারের অনুকূল এই গ্রন্থে তাহা চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে!

যশোহর হিন্দু পত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে বাগের হাটের ডিপুটিমাজিষ্ট্রেট্ বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—আপনার "আমিত্বের প্রসার" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে একাধিক বার অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। পাঠান্তে বিশেষ প্রীতি এবং উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া উজ্জ্বল রত্নরাজি সংগ্রহ করত যে অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই সাদরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। যিনি এই ঘোর দুর্দ্দিনে, এই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার যুগে এরূপ উজ্জ্বল পবিত্র গ্রন্থরত্ন প্রচার করিয়া সাধারণের মঙ্গল বিধান করেন, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সফল হইয়াছে, তিনি মানব কুলের পরম বন্ধু, ভগবানের প্রিয় পাত্র। ভগবানে ভক্তি হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

"কোটি জন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ ময়ি ভক্তিঃ প্রজায়তে"

আমিত্বের প্রসারের গ্রন্থকারের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং ভগবদ্ভক্তি দেখিলেই বুঝা যায় ইহাদের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ভিন্ন এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ নব্য-শিক্ষিত দলের মধ্যে কাহারও দ্বারা প্রচারিত হওয়া সম্ভব নহে।

Babu Purnendu Narayan Sinha M. A. B. L. of Bankipore, author of Bhagabat Purana: A Study, writes:—

It is very valuable addition to the religious literature of the day. It is sickening to see so much selfishness in this world. It looks as if Srikrishna preached the highest ethical and religious truths in vain. It seems the holy teachers, the Acharyas, the Avatars trod the Indian soil in vain. Ah! the other day Sri Chaitanya flooded all Bengal with his devotional outpourings. And what is Bengal to day. Any attempt to do away with the selfishness, the gross materality of the day is welcome. But your book is far above the average. It is learned and at the sometime original on many points. Your chapter on Brahma-charya is excellent. The quotations are apt, various and rare and all most authoritative, I wish you could embody the chaper on the Five Yajnas with that on Grihast Asram; you could then enrich that chapter and bring the treatment of sacrifices to its proper place. Similarly I think you could begin with the Sudra and end with the Brahmana to shew the evolution of virtues. But as it is, it is good reading. What I like specially is your adaption to modern life of the teachings of old. That is most urgently needed to keep up the spirit and change the form. It is a good book yours and I like it.

শ্রী শ্রী হরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। কার্ত্তিক ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা

"স্বরজ্ঞান" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

-০:০:০-

আমি হিন্দু-পত্রিকার একজন গ্রাহক। শ্রাবণ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বরজ্ঞান' নামক প্রবন্ধ-লেখকের বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমার এক অভিযোগ আছে। প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না; কিন্তু উহাতে যে "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" গীত হইয়াছে, তাহাই আমার প্রতিবাদের বিষয়।

আমার প্রথম প্রতিবাদ এই যে, আমার গুরুদেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিনা কারণে আক্রমণ করা হইয়াছে। প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন—"কেহ বা যোগের 'যো' পর্য্যন্ত না জানিয়া কলিকাতা সহরে যোগে যাগে যোগের দোকান খুলিয়া আপামর সাধারণকে যোগ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রথমেই পঞ্চ মুদ্রা প্রণামী না দিলে যোগের দোকানে প্রবেশ করিবার যো নাই।" ইহার আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিবাদ করিতেছি।

আমার গুরুদেব যোগ জানেন কি না এসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা প্রবন্ধকারের নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার অর্ব্বাচীনতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমার গুরুদেব যোগ-সিদ্ধ কৈবল্য পদস্থিত সাধু। পরলোকগত কাশীর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার গুরু ছিলেন। আমার গুরুদেব ব্যতীত উক্ত মহাত্মার আরও কয়েক জন যোগসিদ্ধ শিষ্য উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই আধ্যাত্মিক সাধনে পারদ্রষ্টা। (স্বয়ং সিদ্ধ না হইলে অন্যকে উপদেশ দিবার আদেশ

লাহিড়ী মহাশয় কাহাকেও দিতেন না)। ভগবান্ স্বয়ং ইঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ থাকিয়া ইঁহাদিগকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমার ন্যায় অধমগণকে উদ্ধার করিতেছেন।

এম্ ডি, এল্ এম্ এস্, এম্ এ, বি এল্, বি এ, প্রভৃতি উপাধিধারী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, অনেক মুন্সেফ, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি, অনেক সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত, অনেক সাধু সন্ন্যাসী ইঁহাদের নিকট বিশেষতঃ আমার গুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি যোগে পারদ্রষ্টা কিনা তাঁহার শিষ্যবর্গই তাহার প্রমাণ।

তিনি যে ভূতভবিষ্যৎবেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ—তিনি যে যোগ দ্বারা দুঃসাধ্য রোগ আরাম করেন, তিনি যে যোগ প্রভাবে দূর দেশ গমনক্ষম—ইহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। বিশেষতঃ তিনি যে "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন" এই লক্ষণাক্রান্ত সদ্গুরু তাহা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়।

আমার গুরুদেব যে যোগের দোকান খুলিয়াছেন বলা হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তিনি সভায় বক্তৃতাদি করিয়া কখনও ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই; তিনি কাহাকেও অযাচিতভাবে গায় পড়িয়া উপদেশ দেন না। তিনি স্বস্থানে আত্মানন্দে বিরাজ করিতেছেন; যে কেহ সংসারতাপে তপ্ত হইয়া তাঁহার চরণ, তলে আইসে তিনি তাহাকেই উপদেশ দিয়া শীতল করেন। পরেশ মণির ন্যায় লৌহবৎ মলিন জীবকে স্পর্শ দ্বারা স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল শিবত্বপদ দেখাইয়া দেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-মিশন্-ইনষ্টিটিউশন্ নামক বিদ্যালয়কে যোগের দোকান বলা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী (এণ্ট্রান্স্) শিক্ষার সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়ান হয়। ইহাতে দোষের বিষয় কি?

তিনি যে আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বটে। ইহাই তাঁহার গৌরবের বিষয়। তিনি যদি আমার ন্যায় অধমকে না উদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইত?

শিষ্যের নিকট যে পঞ্চ মুদ্রা গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বলিতেছি। আমরা যে সাধনে দীক্ষিত, সেই পথের পথিক অনেক সিদ্ধ, সাধু, সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে এই পথে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে ৫৲ টাকা দিবার প্রথা আছে। আমার গুরুদেব কিম্বা অন্য কোনও উপদেষ্টা ঐ টাকা হইতে এককপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। ঐ টাকা সমস্তই সাধু সেবার জন্য প্রেরিত হয়। ইঁহারা শিষ্যগণের নিকট কখনও কোনও কারণে কোনওরূপে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না।

যাহা বলা হইল তাহাতেই বোধ হয় লেখকের ভ্রান্ত-ধারণা নষ্ট হইবে। তবে যদি জানিয়া শুনিয়া সাধুনিন্দা দ্বারা স্বমাহাত্ম্য-খ্যাপনের চেষ্টা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। 'কাঠকুড়ানী' 'রাজার মাকে ডাইন' বলিলে রাজার মা

কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে ডাইন হয় না, কিম্বা সেই সুযোগে কাঠকুড়ানী কখনও রাজ-মাতার স্থানে উন্নীত হয় না।

আমার দ্বিতীয় প্রতিবাদ এই যে "রাম কৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য বিবেকা-নন্দস্বামী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের অযথা নিন্দা করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত সাধু মহাত্মা আছেন। ইঁহারা অনেক সৎকার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের অযথা নিন্দা করা হইয়াছে। ইঁহাদের নিন্দা করিয়া লেখক অন্ততঃ নিজের এক-দেশ দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

আপনার হিন্দু-পত্রিকা ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসর্গীকৃত। ইহা যে সাধুনিন্দার যন্ত্র-স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। প্রবন্ধটীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ সাধুনিন্দা, পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা ও স্বমা-হাত্ম্যখ্যাপনে ব্যয়িত হইয়াছে। সাধু-নিন্দারূপ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রবন্ধকারের মূল আলোচ্য-বিষয় যে কতদূর সহজ বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে "সব শেয়ালের এক ডাক" অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে মতভেদ হয় না। সুতরাং যিনি সাধু-নিন্দা দ্বারা নিজের সাধুত্ব প্রমাণে প্রয়াসী তিনি নিশ্চয়ই নিজে অসাধু। ভবিষ্যতে যেন আর সাধুনিন্দা হিন্দু-পত্রিকায় স্থান না পায় সে বিষয়ে সাবধান হইবেন।

আমার তৃতীয় প্রতিবাদ এই যে, প্রব-ন্ধের আর এক স্থানে আমার গুরুদেবকে আক্রমণ করা হইয়াছে। গুরুদেব তাঁহার স্বকৃত-গীতার টীকায় লিখিয়াছেন যে, "পিঙ্গলাসাধনকারী দেবলোক পথে উত্ত-রোত্তর গমন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ গুণাতীতঅবস্থা প্রাপ্ত হন। সে অবস্থা হইতে তাঁহার আর পতন (অর্থাৎ সংসারে পুনরাগমন) হয় না। ইহার উপর প্রবন্ধকারের বড়ই রাগ। তিনি বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মলোক অনিত্য, কিন্তু কোন হঠাৎযোগী গীতার অনুবাদে ওস্তাদী করিয়া বলিয়াছেন যে, পিঙ্গলা-সাধনকারী ইত্যাদি"। ঘরে বসিয়া মুদ্রিত পুস্তক একটু আধটু পড়িয়া যোগী সাজিলে ইহার অধিক তত্ত্ব জানিবার ও জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই।" ইহারও আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিবাদ করিতেছি। আর বনে দৌড়াদৌড়ি করিয়া হস্ত লিখিত পুঁথি রাশি রাশি উদরস্থ করিয়া প্রবন্ধকার যে কিরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিতেছি। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন:—

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতাযান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরত-
র্ষভ। ২৩॥

এখানে ভগবদ্ বাক্যে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, এককালে অনাবৃত্তি এবং অন্য কালে আবৃত্তি (পুনরাগমন) হয়, ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন। তৎপরে শুনুন;—

অগ্নির্জ্যোতি রহঃশুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো-
জনাঃ ॥২৪॥

এখানে দেখুন ভগবান্ বলিতেছেন যে, দেবযান পথগামী ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্ম লাভ করেন। তৎপরে আবার শুনুন;—

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য-
নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

এখানে ভগবান্ বলিতেছেন যে, পিতৃযান-গামী পুনরাবর্ত্তন করেন। সুতরাং দেবযান-সাধক যে পুনরাবর্ত্তন করেন না তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। পরিশেষে ভগবানের স্পষ্ট উক্তি শুনুন।—

শুক্লকৃষ্ণগতীহ্যেতে জগত: শাশ্বতে মতে।
একয়াযাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

দেবযানগমী অনাবৃত্তি ও পিতৃযানগামী যে পুনরাবৃত্তি লাভ করে, তাহা ভগবান্ নিঃসংশয়রূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় দেখুন যে আমার গুরুদেবের কথা ঠিক, না প্রবন্ধকারের কথা ঠিক। গীতার উপর কে ওস্তাদী করিয়াছেন বিচার করিবেন।

গুরুদেব তাঁহার ব্যাখ্যার পোষক-ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন; যথা—"এতেন (দেবযানেন) প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"। অর্থাৎ দেবযানগত আর মানব আবর্ত্তে (জন্ম-মৃত্যুরূপ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ইহাতেও প্রবন্ধকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই। গুরুদেবের মতের পোষক-অনেক-শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উদাহরণ রূপে কয়েকটী দিতেছি—

১। প্রশ্নোপনিষদ্ ১। ১০—"অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তন মেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি।"

২। মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩। ১। ৬—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো-হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥"

কিছু দিন "অরণ্যে রোদন" করিয়া প্রবন্ধকার যে "স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" লাভ করিয়াছেন, তাহারই ভরসায় বুক বাঁধিয়া গীতার শ্রীভগবদ্‌বাক্যের বিরুদ্ধে ও শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে অতি সাহসী হইয়াছেন। গুরুদেব শ্রুতিসম্মত বাক্যই বলিয়াছেন। সাধুর বাক্য কখনও শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না,—
"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি"
অসাধুর বাক্যই শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়।

আমার বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়ের অসাবধানতা বশতঃই শাস্ত্রের নামে অশাস্ত্র হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে। মহাশয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হইবেন।

আরও কিঞ্চিৎ বলিতে চাই; তাহা অনাবশ্যক হইলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" গীতার এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ-বোধে অসমর্থ হইয়াই প্রবন্ধকার ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইহার অর্থ নির্ণয় করা উচিত।

পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। আরও দেখুন;—"তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৮।২।১৫)। আবার দেখুন;—অথহৈবোঽনন্তমপারমক্ষয্যং লোকং জয়তি যঃ পরেণাদিত্যম্।"(তৈত্তিরীয় ব্রা-

ঋণ ৩।১১।৮)। তবে ভগবান্ কি এখানে শ্রুতি বিরুদ্ধে ও পরবর্ত্তী নিজ উক্তির(২৬ শ্লোক) বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছেন? তাহা কথনই নয়। তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে; সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা ও অপেক্ষাকৃত আরও নিকৃষ্টাবস্থা ব্রহ্মলোক নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যে স্থলে সাযুজ্য লাভার্থে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলা হইয়াছে, সেখানে বলা হইয়াছে যে, পুনরাবর্ত্তন নাই আর যেখানে অন্য অর্থে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলা হইয়াছে সেখানে অবশ্যই পুনরাবর্ত্তন আছে। সুতরাং ভগবানের এই উক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ উক্তির (২৬শ্লোক) কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্মলোক গত ব্যক্তি সাযুজ্য লাভ না করিলেও মানব আবর্ত্তে আর প্রত্যাবৃত হয় না। ব্রহ্মলোকাখ্য বিবিধ লোকে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অর্থাৎ ভ্রমণ করে। "তেষু ব্রহ্মলোকেষু" বৃহদারণ্যকের পূর্ব্বোদ্ধৃত এই বচনে ব্রহ্মলোকাখ্য বিবিধ লোক থাকা প্রমাণিত হইতেছে। দেবযান ও পিতৃযান উভয়ের চরম গতিস্থান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ই প্রশ্নোপনিষদে ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা—"তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্"। এখানে পিতৃযান রূপ চন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পরেই আবার দেবযান রূপ সূর্য্যলোক ব্রহ্মলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা;—"তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি"। (প্রশ্নোপনিষদ্ ১।১৬।১৭) সুতরাং কোনও স্থলে ব্রহ্মলোক ক্ষয়িষ্ণু আবার কোথাও অক্ষয় বলিয়া কথিত হইলে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।৬।৭ শ্লোকে ক্ষয়িষ্ণু ব্রহ্মলোকের কথা দেখুন;—

"এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥৬॥
প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া-যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি ॥৭॥

আবার ঐ উপনিষদেই ১১ শ্লোকে অক্ষয় ব্রহ্মলোকের কথা দেখুন;—

"তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্য-দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥১১॥

(পুরুষঃ=হিরণ্যগর্ভ ইতি)

(উদ্ধৃত শ্রুতি-বচনগুলির ভাষ্যকার-সম্মত অর্থই গ্রাহ্য)।

সুতরাং ভগবান্ ব্রহ্মলোককে প্রথমে ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া পশ্চাৎ যে আবার অক্ষয় বলিলেন, তাহাতে অসামঞ্জস্য নাই।

কিন্তু ব্রহ্মলোক শব্দে যাহাই লক্ষিত হউক না কেন, দেবযানগতসাধক যে পুনরাবর্ত্তন করেন না, তাহা শ্রুতি সম্মত কথা। ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রে কোথাও কোনও প্রমাণ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, বি, এ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

স্বরজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম-প্রবন্ধ আমি দেখিয়াই হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত করি, আমি নানাবিধ কার্য্যে বিব্রত থাকায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ দেখিতে পারি নাই। কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা করা হিন্দু-পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে, প্রবন্ধ লেখকগণ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হইলে আমরা সুখী হইব। কোন মত ভ্রমাত্মক বিবেচিত হইলে তাহা দেখাইবার অধিকার আমার আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরকে নিন্দা করার অধিকার আমার নাই, একথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যদিগের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করেন এটি শুনিয়া ছিলাম, কয় মুদ্রা জানিতাম না। স্বরজ্ঞান-প্রবন্ধ, লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ৫৲ মুদ্রা না দিলে কাহাকেও যোগ শিক্ষা দেওয়া হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন যে, টাকা লওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধু সেবার জন্য প্রেরিত হয়। ৺ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় না কি ঐরূপ কয় মুদ্রা লইয়া যোগ শিক্ষা দিতেন এবং তজ্জন্য অনেক লোকে অনেক কথা বলিত। যে সমুদায় সাধুর সেবা হয়, তাঁহারা কোথায়, মুদ্রা কাহার নিকট প্রেরিত হয়, কে তাহা ব্যয় করেন, কে তাহার হিসাব রাখেন, ঐ হিসাব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করায় বাধা কি? ইত্যাদি অনেক কথা লাহিড়ী মহাশয়ের জীবিত অবস্থায়ই উঠিয়া ছিল। এইক্ষণও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বন্ধে এইরূপ কথা উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু এই টাকা সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত করিলে, সাধারণের একটি বিশেষ উপকার হয়। যদি এ কথা বলা হয় যে, যাঁহারা টাকা দেন তাঁহাদেরই ঐ টাকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, অপরের নাই; তাহা হইলে আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই। আমি টাকা লই বা না লই, অপরে দিউক বা না দিউক, তাহাতে আপনার কি? কিন্তু যদি বলি যে টাকায় আমার কোন অধিকার নাই, আমি দেশের উপকারার্থ উহা লই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমার পক্ষে উহার হিসাবাদি সাধারণকে দেখানই কর্ত্তব্য।

বিষয়টি যখন প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইয়াছে, তখন উহার মীমাংসা হইলে মন্দ হয় না।

"স্বরজ্ঞান" প্রবন্ধ অনেক কথার সহিত আমাদের মতের পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রবন্ধ শেষ না হইলে আমরা কিছু বলিব না। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ইহাও অনুরোধ করি যে, তিনি যেন ব্যক্তি বিশেষকে শ্লেষ বা বিদ্রূপ না করিয়া, যদি তাহার কোন ভ্রম থাকে, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দেন।

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমি উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই বিদ্রূপাংশ উঠাইয়া দিতাম, এবং উহা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। আশা করি পাঠকগণ এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

হিঃ পঃ সঃ।

৬

(বাৎসল্য)

—•:o:•—

ভাব বিশ্বের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডে ভাবেরই বিভিন্ন জাতীয় বহি-র্বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। জগতের ভাব অব্যক্ত অপ্রকট অদৃশ্য অস্পৃশ্য, আর জাগতিক পদার্থ অথবা জগদ্ভাবের বহিঃ-সত্তা ব্যক্ত প্রকট দৃশ্য সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ যোগ্য। রামকে আহ্বান করিবার যে ভাবটী অনভিব্যক্ত-অবস্থায় মনে ছিল, তাহাই উত্তেজক কারণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়-শক্তি সমযোগে "রাম! এস" এই শ্রবণ-যোগ্য শব্দাকারে পরিস্ফুট হয়। কোনও কবির মনোভাবের অন্তর্নিধ অবস্থাই তাঁহার কাব্য। একটী শাখাকাণ্ড পত্রাদি প্রচুর বিশাল-বৃক্ষকে দর্শন করিলে ও যেমন তদ্দ্বারা আমরা ঐ বৃক্ষের বীজভাব পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, সেইরূপ কবির কাব্য দেখিয়া পড়িয়া তাঁহার অন্তরস্থভাব অর্থাৎ যাহা ঐ কাব্যের অপ্রকট অবস্থা, যাহাকে সাধারণতঃ কবিহৃদয়ের কবিত্ব বলা যাইতে পারে, তাহা অনুমান করা যায়। যেহেতু ঐ ভাবই কাব্যের অসাধারণ কারণ। নিবিষ্ট-চিত্তে একখানি চারুচিত্র সন্দর্শন করিলে, তাহাতে বিশদরূপে পরিস্ফুট, চিত্রকরের মনের ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্ররচয়িতার মনের ভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত না হইলে চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যতক্ষণ চিত্রে নিজের মনের ভাব স্পষ্টরূপ প্রতিভাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রকর আরাম পান না, যখন তুলিকায় মনের ভাবটী ফুটাইতে পারিলেন, তখনই বিরাম লাভ করিলেন, শ্রম সার্থক হইল। বালক আকুল-ক্রন্দনে কর্ণপীড়া জন্মাইতেছে। ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। চক্ষু দুটী জলভারে কাতর! দুই একটী ধারা গণ্ডদেশ দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে! এরূপ দেখিলে আমরা কি মনে করি? তাহার অন্তরস্থ অতৃপ্তি দুঃখ যেন সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া বিদ্য-মান, ইহাইত মনে করি! যে দুঃখ যে অতৃপ্তি তাহার অন্তঃকরণে ভাবরূপে বাষ্পা-কারে অল্পে অল্পে কম্পিত হইতে ছিল, তাহারইত জল ঝড় সদৃশ পরিণতি স্বরূপ এই বাহ্যদৃশ্যটী! অধরে হাসির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, এ হাসি কি? আন্তরিক সন্তো-ষের মূর্ত্তি বিশেষইত। যে সন্তোষ ভাবা-কারে অন্তরে ছিল, তাহাই বদনমণ্ডলে হাসির আকারে দেখা দিয়াছে। আবার মুখ পাংশুবর্ণ, ললাটদেশ অ কুঞ্চিত, কপো-লদেশে করতল বিন্যস্ত, এ ক্লান্তদৃষ্ট নয়ন পথের পথিক হইলে চিন্তাভাব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই উপস্থিত এমন মনে হয় নাকি? দুরভিসন্ধিব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী চপলচাহনী দে-খিলেই বুঝা যায়, মনের কলুষভাব ব্যবহারে লোচনে বদনে আপনিই ফুটিয়া পড়িতেছে। বস্তুতঃ বলিতে গেলে জাগতিক দৃশ্য ভা-বেরই প্রতিমামাত্র। যেমন প্রতিমার প্রতিপরমাণুতে সাধক প্রকৃত দেবতার উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ ভাব গ্রহণে সমর্থ ভাবুকব্যক্তি জগতে যাবতীয় বস্তুতে ভাবেরই

অন্তঃস্রোত অনুভব করিয়া ভাবভরে গলিয়া পড়েন।

সংসার ভাবেরই প্রতিনিধি। দৃশ্য ও ভাবের পার্থক্য এই যে, ভাব সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য অথচ সর্ব্বব্যাপী, আর ভাবের বাহ্যবিকাশ স্থূলগ্রাহ্য সীমাবদ্ধ সামগ্রী। ভাবের সামর্থ্যে শত শত চিত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু চিত্রের সাহায্যে সেই চিত্র সম্বন্ধীয় ভাবের পরিজ্ঞান হয় মাত্র। ভাব অদৃশ্য হইলেও লক্ষ লক্ষ চিত্র ব্যাপিয়া আছে, আর চিত্র ভাবস্ফূর্ত্তি স্বরূপ হইলেও নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিশ্ব অর্থাৎ আত্মভাবের স্থূলবিকাশ সসীম গ্রাহ্য, আত্মভাব অনন্ত অসীম দুরবগাহ। সখা সামান্য স্থানে অবস্থান করেন, সখ্যভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইতে পারে। পুত্র দৃশ্যমান ক্ষুদ্র, কিন্তু বাৎসল্য-ভাব বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। পুত্র যেমনই হউক না কেন, আয়তনে সংসার অবৃত করিতে কখনও পারিবে না, পুত্রভাব কিন্তু অসংখ্য জীব জন্তুর উপর বিদ্যমান থাকিতে পারে।

এই ভাবের উদ্দীপনই ভবের উপায়। ভাবুক সাধকগণ বলেন, ভাবেই ভগবানকে লাভ করা যায়। সর্ব্বভূতে আত্মভাব অথবা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনই অনন্তজ্ঞানের ও অক্ষয়ভক্তির অসীমভাণ্ডার গীতাশাস্ত্রে অধ্যাত্মরাজ্যের প্রধান শিক্ষা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বভূতে আত্মভাব আর কিছুই নহে, কেবল এই বিরাট বিশ্বের সমস্তই আত্মভাবের বিকাশ মাত্র এই টুকু অবধারণ করা। মুখের হাসিতে অথবা চখের চাহনীতে যেমন মনের ভাব প্রকটিত; এই বিশাল সংসারের তাবদ্ বস্তুতে, আত্মভাব অথবা ভগবদ্ ভাব তদ্রূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত। জগতের বস্তু নিচয় সেই মহাভাবের সেই ভগবদ্ভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই টুকু ধারণা করিতে পারিলেই আত্মভাব প্রাপ্তি অথবা ভগবদ্ভাবাবাপ্তি সংঘটিত হয়। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ সেই বিরাট আত্মভাব বা ভগবদ্ভাব বিশ্বের প্রতিপদার্থে এমন কি সেই স্ফটিক স্তম্ভেও দেখিয়াছিলেন, কাজেই সহর্ষে উৎসাহের সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন "জগতের সর্ব্বত্র সেই ভগবান্ আছেন, জগৎ তাঁহার অধিষ্ঠানভূত প্রতিমা, স্ফটিকস্তম্ভে তিনি কেন থাকিবেন না! অবশ্যই আছেন।" হিরণ্যকশিপুর জ্ঞান নেত্র তখন ও উন্মীলিত হইয়া ছিল না। তিনি এই বিশ্বব্যাপী ভাবও দর্শন করিতে না পারিয়া বৃথা আড়ম্বর করিয়াছিলেন। অতএব সাধনার পথে ভাবের অভাব হইলে চলিবে না।

ভাবের সৌলভ্যসংঘটনমানসে ঐ অসীমভাবও সাধক কর্ত্তৃক শান্ত দাস্য বাৎসল্যাদি রূপে পরিগৃহীত হয়। অনবধারিত বা অনির্দ্দিষ্ট পদার্থ গ্রহণ করা কষ্টকর, কাজেই শ্রেণীবিভাগ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান-প্রবন্ধের আলোচ্য বাৎসল্যভাব। এই ভাবের রহস্য পুত্রে ভগবদ্ভাব অথবা ভগবানে পুত্রভাব। সান্ত কে অনন্ত চিন্তা করিতে সসীমকে অসীমচিন্তা করিতে পারাই আত্মভাবের প্রকৃত লক্ষ্য। ক্ষুদ্র-বটবীজ বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত ও বিস্তৃত হইতে চায়। সামান্যাকার-ডিম্ব প্রকাণ্ড-প্রাণিশরীর রূপে পরিণত হইতে

চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে নিপুণনেত্রে অবলোকন করিলে সংসারের সকল পদার্থের অভ্যন্তরেই ব্যাপিত্ব লাভের চেষ্টা দেখা যাইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সসীম অসীম হইতে চায়, ইহাই বিশ্বের মূলতত্ত্ব। সঙ্কীর্ণতার অপনোদন এই সংসারের মজ্জাগত চেষ্টা। মহাসিন্ধু-বারিবিন্দু মন্ত্রবলে কমণ্ডলু মধ্যে আবদ্ধ, আবার সে যাহা ছিল, তাই হইতে চায়। প্রকৃতি তাহাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করে, যেহেতু চিরন্তন ভাবের সহকারিণী বই প্রকৃতির গতি আর কিছুই নহে।

সর্ব্বভূতাত্মা হওয়াই জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলেরই মূললক্ষ্য। আমার পুত্রটীতেই যদি আমার পুত্রভাব আবদ্ধ রহিল, তবে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজনীন উদ্দেশ্যের দ্বার অনর্গল হইল কৈ? অপরের পুত্রেও পুত্রভাব প্রসারিত করা আবশ্যক। এই রূপে সমস্ত জগতে পুত্রভাব উপস্থিত হইলে পুত্রবাৎসল্য লাভে জগতের কিছুই বঞ্চিত হইল না। তখন মনে হইবে, জগৎ পুত্রময় না পুত্র জগন্ময়, পুত্র ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই, বিশ্বই যেন পুত্র রূপে উপস্থিত। এইরূপ ভাবই জগতে পুত্রগত বাৎসল্য ভাবের প্রণেতা। আমি আমার পুত্রটীকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, যাহা কিছু সংসারের সার সুন্দর মনোহর সমস্তই যদি আমার পুত্রকে দিতে পারি, হৃদয়ের আবেগ যেন তাহা হইলে নিবৃত্ত হয়। সরস সুপাত্ত সম্মুখে উপস্থিত হইলে নিজে না খাইয়াও পুত্রকে দিতে ভালবাসি, পুত্র খাইলেই যেন নিজের পরিতৃপ্তি হয়। যদি অপরের পুত্রের উপরও এইভাব অর্পিত হয়, তবে পুত্রজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা অনেক অপগত হয়। এই প্রসারই জগতের প্রার্থিত বস্তু। আমি পরপুত্রের কল্যাণ কামনা করি না, পরের পুত্র যদি বাৎসরিক পরীক্ষার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, আমার পুত্র না পায়, তবে আমি হৃদয়বিদারি দারুণ-দুঃখশেলের আঘাতে কাতর হই। অপরের পুত্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি ব্যথিত মর্ম্মপীড়িত। সে পরের ছেলে সোণার চাঁদ হইলেও কোলে করিয়া আনন্দ পাই না, প্রাণ যেন ফাকা ফাকা বোধ হয়। নিজের আবলুশ কাষ্ঠের মত মনোরম (!) বর্ণবিশিষ্ট নাসিকারন্ধ্রে কফলাঞ্ছিত পুত্রটীকেও কোলে করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়ায়, চব্বিশ ঘণ্টার অস্থি পীড়াপ্রদ পরিশ্রমও যেন কোন্ অজ্ঞাতলোকে পলায়ন করে। অপর বাটীর নির্ম্মলচন্দ্রকে দেখিলেও মুখের উপর অমাবস্যার অন্ধকারের আবির্ভাব হয়, আপন বাটীর অমর্থনামধেয় কৃষ্ণ আসিলেও আঁধার হৃদয়ে নবজ্যোৎস্নার উদয় হয়। জগতের এই মহামোহ এই অসাধারণ সঙ্কীর্ণতা বিনাশ করিবার জন্যই বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব। পুত্রে সর্ব্বাত্মভাব অথবা সকলে পুত্রভাবই উক্ত যন্ত্রণার শান্তিবারি। শ্রীনন্দ ও শ্রীমতী যশোমতী ভগবান্‌কে পুত্রভাবে ভাবিতেন, তাঁহারা পুত্রে জগতের যাবতীয় ব্যাপার স্থাপন করিয়াছিলেন। জগতে তাঁহাদের যাহা কিছু সমস্তই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এই জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কৃষ্ণের অদর্শন সময়ে তাঁহারা জগৎ ভুলিয়া যাইতেন কেবল

ভাবিতেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণই তাঁহাদের জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শয়নে ভোজনে জাগরণে বিচরণে স্বপনে মনে মনে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতেন না। নন্দ যশোদার মনে জগতের জন্য যত টুকু স্থান ছিল; তাহা পূর্ণ করিয়াই কৃষ্ণ বিরাজমান থাকিতেন এবং নন্দের পাদুকাবন্তকে বহন করিয়া বাৎসল্য-ভাবের উদার রহস্য মধুর পরিণাম জগৎকে শিক্ষা দিয়াগিয়াছেন। এ জগৎ আর কিছুতেই নমেনা দমেনা টলেনা চলেনা গলেনা, বারম্বার ক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া করিতে অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান। সংসার কেবল স্নেহে গলিয়া যায়। প্রভু ভাবে শঙ্কা সঙ্কোচ সবই আছে। প্রভুকে যতই কেন আপন ভাবি না, তাঁহার কাছে প্রাণ খুলিতে পারি না, সখার কাছে প্রাণের কথা মনের ব্যথা বলি বটে, কিন্তু প্রতিদানের জন্য প্রাণ লালায়িত। বন্ধু যদি হৃদয়ের দ্বার আমার কাছে খুলিয়াছেন, আমি ও তাঁহার জন্য অর্গলবদ্ধ করি না, সখার জন্য ইহার অতিরিক্ত হয় না, কিন্তু বাৎসল্য ভাব বড় সুন্দর! বড় সরস! শঙ্কা নাই সঙ্কোচ নাই। গালি দিলেও কোলে করিয়া বাৎসল্য চরিতার্থ হয়, আমিত্ব কিন্তু তাহাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাণ অকপট-স্নেহ-রসে গলিতে থাকে। একটুও আপত্তি করে না আর ভবিষ্যৎ ভাবে না। নন্দ পাদুকা-বহনের আদেশ দিতেন, যশোদা রজ্জু দিয়া বন্ধন করিতেন, বিন্দু মাত্র সঙ্কোচও ছিলনা। প্রভুকে তুমি বলিলে বিপদ্ অদূরবর্ত্তী, সখাকে বলিলেও যেন কত কি মনে উৎকণ্ঠা সখাকে। এত সরল ব্যবহার করিতে বাৎসল্য ভাবই শিক্ষা।

বাৎসল্যের বিজয়পতাকা নন্দ যশোদা প্রভৃতির কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। পুত্রে সর্ব্বাত্মভাব বা ভগবদ্‌ভাব তাঁহাদের যথাযথ উদিত হইয়াছিল। পুত্র সসীম সর্ব্বাত্মভাব (যাহা প্রচ্ছন্নভাবে পুত্রভাবরূপে প্রকাশিত) উদিত হইলেই মূল উদ্দেশ্য সমর্থিত হইল। বাৎসল্য ভাব এই সর্ব্ব-জনীনতার পরিপোষক। যে ভাবেই হউক ভগবান্‌কে ভাবিতে পারিলে ভাবুকের ভব-যন্ত্রণা দূর হয়, কবে এ মরুভূমিতে ভাবের কুসুম ফুটিবে, ভগবান্ জানেন, তাঁহার ভাব তিনিই বুঝেন, ভবের ভাবনায় আর যেন কাতর হইতে হয় না। ভাবময়! এই টুকুই সর্ব্বান্তঃকরণে পবিত্রচরণ-প্রান্তে মনে কামনা করি।

ভক্তিকাম

শ্রী————ভারতী—

ব্রহ্মচারি-আশ্রম

যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

২০০ দুইশত বৎসরের অধিক হইল, যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন মহম্মদপুর নামক স্থানে রাজা সীতা-রাম রায়ের রাজধানী ছিল। সীতারাম স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না, তৎকালীন মহম্মদপুরের কোন ইতিহাসও নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালী কুলতিলক, পুরা-

লোক, কীর্ত্তিমান্ স্বাধীন রাজার কোন জীবন-চরিত্র পাওয়া যায় না। শ্রুতি পরম্পরায় অনেকটা অবগত হইবার কথা, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ মহম্মদপুরে মহামারীতে জনপদটী একরূপ লোক শূন্য হইয়া যায়। সত্য-ঘটনা জানিবার কোন বিশেষ সুবিধা নাই। স্থানীয় বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাই লিখিত হইল। সকলে একরূপ বলেন না। সীতারামের জীবন বৃত্তান্ত এক্ষণে উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। প্রাচীন-লোকের নিকট বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাই বর্ণিত হইল। যে যে স্থানে মতদ্বৈধ আছে, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল।

সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস রাঢ় দেশে গিধোন নামক স্থানে ছিল। তাঁহার পিতা মুরসিদাবাদের নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন, তিনিই এই প্রদেশের কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং মহম্মদপুরের উত্তর দিকে ৬। ৭ ক্রোশ দূরে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানেবাস করেন। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী সূর্য্যাকুণ্ড গ্রামে উমা চরণ দাস নামক এক ব্যক্তি বলেন যে, তাঁহার পিতা ৺গিরীশ চন্দ্র দাস, সীতারামের প্রপৌত্র ৺রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্র। তিনি বলেন যে, সীতারামের পিতার নাম উদয় নারায়ণ রায়। উদয় নারায়ণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মী নারায়ণ, কনিষ্ঠ সীতারাম। লক্ষ্মী নারায়ণ হরিহর নগরে বাস করিতেন, অদ্যাপি সেই স্থানকে রাজবাড়ী বলে। সেই বংশে দেবনারায়ণ রায় নামক একটী দত্তক পুত্র এক্ষণেও আছেন। সীতারামের শ্যামসুন্দর ও সূর নারায়ণ নামক দুই পুত্র থাকেন, শ্যাম সুন্দরের কোন সন্তান ছিল না। সূর-নারায়ণের প্রেমনারায়ণ নামে একটী পুত্র ছিলেন। প্রেমনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত রায়, তাঁহার পুত্র থাকে না, একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, সেই কন্যার একমাত্র সন্তান্ই পূর্ব্বোক্ত ৺গিরিশ চন্দ্র দাস। সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় খাসবিশ্বাস কুলোদ্ভব ছিলেন। নিজে রাজা হইয়া রায় উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কিছু পাওয়া যায় না। বাল্যজীবন বৃত্তান্ত ও কিছু অবগত হওয়া যায় না।

সীতারামের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা ছিল, তাঁহার পিতার চাকুরীর সময় হইতেই তাঁহার স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি তখন হইতেই সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ক্রমশঃ কতকগুলি শিখ, হিন্দু-স্থানী ও পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করেন। মহম্মদপুর একটী গ্রামের নাম নহে। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সমূহের নামই মহম্মদপুর। যেখানে সীতারামের রাজধানী ছিল, তাহার নাম নারায়ণপুর। রাজবাড়ীকে সাধারণ লোকে মামুদপুরের রাজার বাড়ী বলিয়া থাকে।

কথিত আছে যে, সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ৺দশভুজার বাটির নিকটে মহম্মদ আলি নামে একটি ফকিরের একটি আশ্রম ছিল, উক্ত ফকির একজন উত্তম সাধক ছিলেন। সীতারাম বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত

ফকিরকে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। ফকির সীতারামের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্য স্থানে গমন করেন এবং সীতারামকে তাঁহার নামানুসারে নগরের নাম করণ করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম ফকিরকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং ফকিরের নামানুসারে রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখেন। সীতারাম তাঁহার রাজধানীর নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রামের নাম দেবতা-দিগের নাম-অনুকরণে রাখেন, উক্ত ফকিরের কবর-স্থান অদ্যাপি মহম্মদপুরে দৃষ্ট হয়। মহম্মদপুরের বর্ত্তমান-অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থা দেখিলে সহজে অনুমিত হয় যে, সীতারাম পুণ্যাত্মা, উদারচেতা ও স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ভূষণায়ও তাঁহার একটী রাজধানী ছিল। তথায় তাঁহার একটী সেনানিবেশ ছিল। এক্ষণে ঐ বাড়ী ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। মেনাহাতী ও হামলাবাঘ নামক তাঁহার দুইটী প্রধান সেনাপতি ছিল। ইহাদিগের অন্য কি নাম ছিল তাহা অপ্রকাশিত। সীতারাম তাহাদিগকে এই নামে আহ্বান করিতেন। মেনাহাতী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বীর ছিলেন, তাঁহারই ভুজবলে সীতরাম এতদূর উন্নতি সাধন করেন। ইনি জাতিতে শিখ ছিলেন। রাজধানীর মধ্যে অনেক হিন্দু-স্থানীর বাস ছিল, অদ্যাপি সে স্থানকে কায়েপটী বলে। এক্ষণেও ৮।১০ ঘর রাজপুত ও তাহাদের পুরোহিত কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণের বাস আছে। উক্ত রাজপুতদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সীতারামের সৈনিক শ্রেণী ভুক্ত ছিল। রাজধানীর অন্তর্গত ঘুষইচ গ্রামে কতকগুলি পাঠানের বাস আছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও সীতারামের সৈনিক শ্রেণীভুক্তছিল এরূপ প্রকাশ। তিনি যুদ্ধার্থ অস্ত্র শস্ত্র স্বীয় রাজধানীতে প্রস্তুত করাইতেন, রাজধানীতে কর্ম্মকার পটী বলিয়া একটী স্থান আছে, তথায় অনেক কর্ম্মকারের বাস ছিল। ১৮৩৬ সালে মহামারীতে এ স্থানের অধিকাংশ লোকই কালের করালকবলে পতিত হয়, শেষে অবশিষ্ট সকলে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের পাকাবাড়ী ইত্যাদি জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে।

সীতারামের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও আছে। অট্টালিকাদি অধিকাংশ ভগ্ন হইয়া স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে দেওয়ালগুলি কতকটা ভাল আছে। বাড়ীটী ভয়ানক জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে। তথায় যাওয়াও কঠিন, যাইতেও সহসা কাহারও সাহস হয় না। রাজবাড়ীর পার্শ্বে তাঁহার নির্ম্মিত গড় অদ্যাপি আছে।

সীতারামের রাজত্ব সময়ে এই রাজধানীতে সমস্ত জাতিরই বাস ছিল। অনেক ধনী ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যথেষ্ট ছিলেন এবং এই স্থান একটি বিদ্বৎ-সমাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তিনি মহম্মদপুরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান। তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর ও দেবসেবার জন্য অনেক লোককে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া অক্ষয়পুণ্যসঞ্চয় ও চিরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি

সে সমস্ত তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ ভোগ দখল করিতেছেন। সীতারাম-প্রদত্ত সনন্দও তাঁহাদের নিকট আছে। ন্যায়বান্ বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত সম্পত্তি খাস করেন নাই, সীতারামের সেই সনন্দ দেখিয়া জমি নিষ্কর বন্দোবস্ত ঠিক রাখিয়াছেন সীতারাম উদারচিত্তে যাচকের যাচ্ঞা পূর্ণ করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে যাহাতে প্রজার কোন কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ চেষ্টা করিতেন। তিনি জল-কষ্ট নিবারণের জন্য মহম্মদপুরে রামসাগর, সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি বহু সংখ্যক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য অনেক স্থানেও তিনি অনেক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। জলাশয়ই তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি। প্রবাদ আছে যে, জলাশয় খননের জন্য তাঁহার সহিত সর্ব্বদা ২২০০ দ্বাবিংশ শত লোক থাকিত। যেখানে জল কষ্ট শুনিতে বা বুঝিতে পারিতেন, তথায় জলাশয় খনন করাইতেন। মহম্মদপুরে অনেক পুষ্করিণী রহিয়াছে। শুনা যায় যে, কোন গৃহস্থের জলের জন্য অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। এই সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে মহম্মদপুরের রামসাগর অত্যন্ত প্রধান দীর্ঘিকা, সম্ভবতঃ এরূপ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা যশোহর জেলায় আর নাই, অন্যান্য জেলায়ও খুব কম থাকিতে পারে। বর্ত্তমান সময় মহম্মদপুরে জলকষ্ট নিবারণের এই এক মাত্র জলাশয় রহিয়াছে। অন্যান্য পুষ্করিণীর মধ্যে কতকগুলিতে জল থাকে না, কতকগুলির জল খারাপ হইয়া যায়। রামসাগরের জলে অনেক লোকের উপকার হইতেছে। এই জলাশয়ের জন্য প্রত্যহ লোকে মহাত্মা সীতারামের নাম স্মরণ করিতেছে ও তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছে। রামসাগরে প্রতিবৎসর ৺দশহরা স্নানের দিন ৺গঙ্গা পূজা হইয়া থাকে এবং অনেক দূরের লোকে গঙ্গাস্নান ফল কামনায় এখানে স্নান করিয়া থাকে। ইহার উত্তর-তীরে মহম্মদপুর-পোষ্ট আফিস স্থাপিত। কৃষ্ণ সাগরের জলে ধূমাইল বা ধোয়াইল ও তন্নিকটবর্ত্তী ৩। ৪ ক্রোশের লোকের উপকার হইতেছে। কৃষ্ণসাগরও খুব বড় পুষ্করিণী। তাহার জল ও ভাল থাকে। সুখসাগরের জলে কোন উপকার হয় না। তিনি এই সুখসাগরে পুষ্করিণীর মধ্যে অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে গ্রীষ্মকালে সপরিবারে বাস করিতেন। এক্ষণে সেই অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তদুপরি বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে, চতুর্দ্দিকে জল রহিয়াছে।

তিনি মহম্মদপুরে রাজবাড়ীর উপরে ৺দশভূজা ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজধানীর অন্তর্গত কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায় (শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি) ও তাহার অনতিদূরে ৺গোপাল পুরে ৺বুড়াশিব স্থাপনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। প্রত্যেক বিগ্রহের স্বতন্ত্র মন্দির ও প্রাঙ্গণ আছে। মন্দিরগুলি দেখিতেও অতি মনোহর। তিনি এই সমস্ত বিগ্রহের সেবার জন্য অনেক ভূমি নিষ্কর বৃত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সেই সম্পত্তি হইতে মন্দিরে রীতিমত দেবসেবা, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, রাস, রথ, দোলযাত্রা ইত্যাদি সমস্ত পর্ব্বই সম্পাদিত হইতেছে।

পূর্ব্বে খুব সমারোহের সহিত সমস্ত-পর্ব্ব হইত, এক্ষণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তিনি আরও অনেক দেবমন্দির ও দেব-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বৃত্তি না থাকায় সেবা বন্ধ হইয়া যায়, এক্ষণে তাঁহাদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। দুই একটী ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে উপরি উক্ত বিগ্রহগুলির সেবাইত নাটোরের বড় তরফের মহারাজা।

৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ীর উত্তর দিকে একটী পুষ্করিণী আছে, উক্ত পুষ্করিণীর নিম্নদেশ হইতে চারিধার সমস্তই ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান। প্রবাদ আছে যে, উক্ত পুষ্করিণী সীতারামের গুপ্ত-কোষাগার ছিল, তিনি অনেক সময় ইহার মধ্যে ধনরত্নাদি রাখিতেন। এই পুষ্করিণীতে এক্ষণও সকল সময় জল থাকে; অনেক-লোকে স্নানাদি করেন। দেবসেবা অদ্যাপিও রীতিমত চলিতেছে, দ্বিপ্রহরে অন্ন ও রাত্রিতে রুটি পায়স ইত্যাদি ভোগ প্রত্যহ দেওয়া হয়। এই ভোগের প্রসাদ অতিথিদের পাইবার ব্যবস্থা আছে। পুণ্যশ্লোক সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল যে, মহম্মদপুরে অতিথিগণের কোন কষ্ট না হয়। তিনি সেইরূপ ভোগেরও বন্দোবস্ত করিয়া যান, ভোগের বন্দোবস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে, তথাপি যথেষ্ট অতিথির উদর পূর্ণ হইতেছে, ৺দশভুজার বাড়ীতে রীতিমত দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজা ইত্যাদি ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ও ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে রীতিমত রথ, ঝুলন, রাস, গোষ্ঠ ইত্যাদি সমস্ত পর্ব্বই রীতিমত হইয়াথাকে সমস্ত ব্যয়ই মহাত্মা সীতারাম-দত্ত সম্পত্তি-আয় হইতে চলিতেছে। পরে নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ দয়াবতী দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা ৺রাণী ভবানী মহম্মদপুরে শ্রীরাম চন্দ্র ও কানাই নগরে বলরামজী স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ পূজা ও ভোগ চলিতেছে। উক্ত মহারাণী কৃত একটী গড় এখানে রহিয়াছে। সীতারামের স্থাপিত-দেব-মন্দিরগুলি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থান-গুলিও অত্যন্ত জঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে। ৺দশভুজা, লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরেকৃষ্ণ রায়ের ৩ তিনটী মন্দিরে তিনটী সংস্কৃত কবিতা পাথরে খোদা আছে, উক্ত তিনটী কবিতা নিম্নে লিখিত হইল।

৺দশভুজার মন্দিরে

১. ২ ৬ ১

১। মহী ভুজ রস ক্ষৌণী শকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতা সীতারাম রায়েন মন্দিরং॥

৺লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে

. ৬ ২ ৬ ১

২। লক্ষ্মীনারায়ণ স্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে
নির্ম্মিতং পিতৃ পুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরং॥

৺হরেকৃষ্ণরায়ের মন্দিরে

৫ ২ ৬ ১

৩। বাণ দস্রাঙ্গ চন্দ্রৈঃ-পরিগণিত শকে কৃষ্ণ-তোষাভিলাষী
শ্রীমদ বিশ্বাস খাসোদ্ভব কুল কমলোদ্ভাসকো-ভারভূনাঃ
ব্রাজৎশিরোমণিযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতি নগরে ভক্তি-মানুৎ সমর্প্প॥

কবিতা তিনটীতে প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে যে, সীতারাম কর্ত্তৃক ৺দশভুজার মন্দির ১৬২১, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ১৬২৬ ও হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দির ১৬২৫ শকে স্থাপিত হয়। শ্লোকাঙ্কিত-প্রস্তর তিন খণ্ডের মধ্যে ২ দুই খণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর প্রস্তরখণ্ড অট্টালিকা হইতে খলিত হওয়ায় মহম্মদপুরের ৺মূর্ত্তির কাছারীতে রহিয়াছে। উক্ত প্রস্তরখণ্ড অপরিষ্কার থাকাতে সমস্ত পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং কবিতাগুলি শুনিয়া লিখিত হইল। এখানে কয়েক জন ভদ্রলোকের উক্ত শ্লোকত্রয় কণ্ঠস্থ আছে।

সীতারাম ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। নিজে সামান্য-অবস্থা হইতে রাজত্ব লাভ করেন। সুতরাং অনেক সময়ে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত ও শাসন-প্রণালী ইত্যাদি চিন্তায় কাটাইতে হইত। এরূপ অল্প-সময়ের মধ্যে তিনি যে অনেক-কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াগিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। তাঁহার কীর্ত্তি-আদি দর্শন করিলে এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলে স্বভাবতঃ মন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়।

সীতারাম বিলাসী ছিলেন। সুখসাগর তাঁহার বিলাসিতার প্রধান পরিচয়। রাজধানীর অনতিদূরে চিত্তবিশ্রাম বলিয়া একটী গ্রাম আছে, উক্ত গ্রামের নিম্নে পশ্চিম দিকে তখন ছত্রাবতী নদী প্রবাহিত ছিল, এক্ষণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে উহার প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বে মধুমতী নদী প্রবাহিত আছে। উক্ত গ্রামের স্বাভাবিক-শোভা অতি মনোহর ও শান্তিপ্রদ ছিল বলিয়া, তিনি উক্তগ্রামের নাম চিত্তবিশ্রাম রাখেন, অনেক সময়ে তিনি তথায় থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে কতকগুলি মুসলমানের বাস, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তথায় সীতারামের একটী বাড়ী ছিল, এক্ষণ তাহার কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত মহম্মদপুরের নিকট শ্যামগঞ্জ, সূর্য্যাকুণ্ড ও হরিহরনগরে তাঁহার বাড়ী অদ্যাপি আছে। সীতারাম বিলাসী ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মাতিক্রম করিতেন না। তিনি কোন ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন এরূপ শুনা যায় না, বস্তুতঃ এরূপ পবিত্রচেতা পুণ্যাত্মার চরিত্রে কোন দোষ থাকা সম্ভবনহে, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি নির্ম্মল চরিত্র নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। অজ্ঞলোকেরা তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারে, কিন্তু তাহা মিথ্যা। জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান্ লোকে কেহ এরূপ বলেন না।

সীতারামের রাজ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন যে, তিনি প্রথমে নবাবের কার্য্যকারক "রায় রহিয়া" হইয়া আসেন, ক্রমশঃ নিজে সমস্ত অধিকার করিয়া স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, নবাব সীতারামের উপর বিশেষ কোন কারণে সন্তুষ্ট হইয়াই হউক, অথবা এপ্রদেশ অনাবাদী জঙ্গলময় থাকাতে কয়েক বৎসরের জন্য জায়গীর স্বরূপ সীতারামকে এ প্রদেশ ভোগ দখল করিতে দেন, শেষে নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করিবার কথা ছিল, কিন্তু সীতারাম ইত্যবসরে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, এইরূপে ক্রমশঃ অধিকার স্থাপনা করিয়া

নবাবের অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। শেষে নবাব সমস্ত জানিতে পারিয়া সীতারামের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। কয়েক বার যুদ্ধ ঘটে, কিন্তু সীতারাম নবাব-সেনাদিগকে পরাস্ত করিয়া জয় লাভ করেন। নবাবের জামাতা আবুতারা একবার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ভূষণায় নবাবের সেনা নিবেশ ছিল, তথায় তিনি থাকিয়া সাধারণ লোকের উপর অনেক অত্যাচার করেন। সীতারাম তাহার অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তক কাটিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া তদীয় সেনাপতি মেনাহাতী যুদ্ধে আবুতারাকে পরাস্ত করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া সীতারামের সমীপে আনয়ন করেন। নবাব ইহাতে নংপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতারামের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। সীতারাম ও মেনাহাতীর যুদ্ধ কৌশল অত্যন্ত বেশী থাকায়, নবাবসৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হন। মেনাহাতী থাকিতে সীতারামকে পরাস্ত করা সহজসাধ্য নয় মনে করিয়া নবাব পক্ষ হইতে তাঁহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করা হয়। মেনাহাতীকে সম্মুখ-সমরে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য, এজন্য নবাব পক্ষ হইতে একটী সৈনিক গোপনে ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে মেনাহাতীকে হত্যা করে। মেনাহাতীর সমাধি অদ্যাপি মহম্মদপুরে আছে। অপর সেনাপতি রামারায়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মেনাহাতীকে যখন গোপনে হত্যা করা হয়, তখন নবাব-সেনা ভূষণায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকে এবং সীতারামের সৈন্য ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধার্থ ভূষণাভিমুখে যাত্রা করে, এদিকে মহম্মদপুরে মেনাহাতীকে নবাব-সেনা গুপ্তভাবে হত্যা করে, সৈন্যদের শ্রেণী ভঙ্গ হইবে বলিয়া সীতারাম তখন এই হত্যা-সংবাদ প্রকাশ করেন না, অন্য সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠাইয়া অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া নবাব-সৈন্যকে সে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মেনাহাতীর মৃত্যুতে সীতারাম একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। অপরদিকে নবাবসৈন্য মেনাহাতীর হত্যাসংবাদে উল্লাসিত হইয়া হঠাৎ সীতারামের মহম্মদপুরের রাজধানী অবরোধ করেন। তখন সীতারামের অধিকাংশ সৈন্য ভূষণায় ছিল। সৈন্যসংখ্যাও তত বেশী ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সীতারাম অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নবাবসেনার সম্মুখীন হন। অবশেষে নবাবসেনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীতারামকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে নবাব গোচরে লইয়া যায়।

সীতারাম মুরসিদাবাদে নীত হইলে নবাব স্বয়ং তাঁহার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। তথায় অভিরাম রায় নামক একটী উকীল সীতারামের অনুকূলে তর্ক বিতর্ক করেন। বিচারকালে সীতারাম নবাবের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। নবাব কিছু কর্কশভাবে সীতারামের সহিত ব্যবহার করেন। বীরের হৃদয়ে তাহা অসহ্য, তিনি তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। প্রবাদ আছে, যবনের অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে

শ্রেয়ঃ এই বিবেচনায় স্বাধীনচেতা মহাত্মা সীতারাম নিজ অঙ্গুরী সহিত বিষাক্ত-অঙ্গুরী চুষিয়া নিজের জীবন নিজেই নাশ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, উক্তযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি মহম্মদপুরে আত্মহত্যা করেন; কিন্তু তিনি মুরসিদাবাদেই আত্মহত্যা করেন, অধিকাংশ লোকেই এইরূপ বলে। সম্ভবতঃ তিনি ঢাকাতেই নীত হয়েন, কারণ এই সময়েও ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, ইহার দশ বৎসর পরে মুর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, সীতারামের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণে নবাব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে তদীয় রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন। এ দিকে নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ রঘুনন্দন তখন নবাব-সরকারের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। তিনি নাকি এই জমিদারী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে সীতারামের মৃত্যুর পরেই মহম্মদপুরে লোক পাঠাইয়া ঘোষণা করিয়া দেন যে, নবাব সীতারামকে হত্যা করিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে, সীতারামের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সমস্তই মুরসিদাবাদে লইয়া হত্যা করিবেন। তচ্ছ্রবণে সীতারামের স্ত্রী পুত্রাদি সকলে নৌকারোহণে জলমগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হন। তাঁহার বংশে কেহই জীবিত থাকেন না, এইরূপ প্রকাশ। কিন্তু ইহাও পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন। শূরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যশোহরের ইতিবৃত্তে প্রেমনারায়ণকেই সীতারামের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর ও অন্যান্য পরিবারবর্গ আত্মহত্যা করেন; শূরনারায়ণ লুক্কায়িত অবস্থায় থাকেন। তিনি জীবিত না থাকিলে এরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যাইত না। সূর্য্যকুণ্ড নিবাসী উক্ত উমাচরণ দাস মহাশয়কে মহম্মদপুর অঞ্চলের সকলেই সীতারামের দৌহিত্র-বংশীয় বলিয়া থাকেন। সীতারামের পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। রঘুনন্দন সীতারামের বংশে কেহই নাই বলিয়া স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে সীতারামের সমস্ত সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লন। সেই হতে এ দেশ অর্থাৎ ভূষণা প্রদেশ নাটোর রাজার অধীন হয়; শেষে ঐ বংশের রাজা ৺রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের সময় এখানকার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হওয়ায়, অন্যান্য জমিদারগণ খরিদ করেন। এক্ষণ মহম্মদপুরে নাটোরের বড় তরফের মহারাজের কেবল সেবাইতী স্বত্ব মাত্র আছে। সীতারাম তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগের যে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি তাঁহার অধীনে আছে। তদ্দ্বারা সেবা আদি চলিতেছে।

জনশ্রুতিপরম্পরায় এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, যখন ব্রিটীশগভর্ণমেণ্ট ভূষণা বন্দোবস্ত করেন, তখন সীতারাম-প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির সনন্দ দেখিয়া ও তদ্বিবরণ অবগত হইয়া প্রকাশ করেন যে, সীতারামের উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, তাঁহার সহিত জমিদারী বন্দোবস্ত করা হইবে এবং একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আদেশ করেন যে, এই

নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, উপস্থিত হইবেন। তখন সীতারামের সম্পত্তি নাটোরের রাজার হাতে ছিল; তখন ৺রাণী ভবানী রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, সীতারামের পৌত্র প্রেমনারায়ণ তখন জীবিত ছিলেন; ৺রাণী ভবানী প্রেমনারায়ণকে তখন নাটোর লইয়া যাইয়া যত্নপূর্ব্বক রাখেন। প্রেমনারায়ণ গভর্ণমেণ্টের আদেশ অবগত ছিলেন না। নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে ৺রাণী ভবানীই সমস্ত সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লন; প্রেমনারায়ণকে দৈনিক ১৲ এক টাকা ভাতা দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, এরূপ কিছু সম্পত্তি তাঁহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং তাঁহার চাকর ইত্যাদির আবশ্যক বলিয়া তদুপযুক্ত কতকগুলি লোককে কিছু চাকরাণ জমি দিয়া তাঁহার কার্য্য করিতে আদেশ দেন। শেষে নাটোরের জমিদারী বিক্রীত হইলে সে বন্দোবস্ত আর থাকে না। প্রেমনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিতেন, অদ্যাপি তাহাকে রাজবাড়ী বলে। প্রেমনারায়ণ সম্বন্ধে এই ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা জানা যায় না। সীতারামের দৌহিত্র-বংশীয় উল্লিখিত উমাচরণ দাস মহাশয়ের নিকট শুনিয়া লেখা হইল। অদ্যাপি সেই বাড়ী ও কিছু সম্পত্তি উক্ত দাস মহাশয়ের দখলে আছে। সীতারামের পুত্র শূরনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বোধ হয়। তিনি শেষে সামান্য সম্পত্তি লইয়া সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে সীতারামের বংশে কেহই নাই, কেবল উক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আছেন; তাঁহারও সন্তানাদি কিছুই নাই।

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[৮ম ও ৯ম]

১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ।

১। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ।

২। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।

৩। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ।

৪। প্রাণভৃচ্চ।

৫। ভেদব্যপদেশাৎ।

৬। প্রকরণাৎ।

৭। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ।

৮। ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।

৯। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

১০। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ।

১১। সা চ প্রশাসনাৎ।

১২। অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ।

১৩। ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ।

১৪। দহর উত্তরেভ্যঃ।

১৫। গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ।

১৬। ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ।

১৭। প্রসিদ্ধেশ্চ।
১৮। ইতর পরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ।
১৯। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূত স্বরূপস্তু।
২০। অন্যার্থশ্চ পরামর্শ।
২১। অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্।
২২। অনুকৃতেস্তস্য চ।
২৩। অপি চ স্মর্য্যতে।

১। 'স্ব' শব্দের প্রয়োগ হেতু স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ঠান উক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

২। মুক্ত পুরুষেরাই সে স্থান প্রাপ্ত হন, ইঁহার উল্লেখ থাকাতে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৩। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান দ্বারা সাংখ্য-প্রতিপাদিত প্রধান সূচিত হন না; কারণ ঐ সমুদায় শব্দ দ্বারা প্রধানকে বুঝায় না।

৪। স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতি অধিষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মাকেও বুঝায় না।

৫। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য পরিব্যক্ত থাকাতেও জীবাত্মাকে বুঝায় না।

৬। প্রকরণের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম হওয়াতেও জীবাত্মা বুঝায় না।

৭। ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষীত্ব, এই দুই বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না।

৮। সম্প্রসাদ বা সুষুপ্তির অতিরিক্ত তত্ত্ব-নির্দ্দেশ হওয়ায় "ভূমা" শব্দে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

৯। ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও ভূমার ধর্ম্ম অভিন্নরূপে উপপন্ন হওয়ায়, 'ভূমা' পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১০। 'অক্ষর' পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; যেহেতু উহা আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতেরই আধার।

১১। অক্ষরের প্রশাসনই এই আধারের হেতু।

১২। শাস্ত্রে অক্ষরকে অন্যান্য (অবিদ্যা) পদার্থ হইতে প্রভিন্ন করাতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩। ঈক্ষণের বিষয় হওয়াতেও "অক্ষর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৪। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৫। "ব্রহ্মে গতি" এবং "ব্রহ্মলোক" পদের শ্রৌত উল্লেখ থাকাতেও ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; ইহাই একটী "লিঙ্গ" অর্থাৎ চিহ্ন।

১৬। "ধৃতি" হেতুও "দহর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত; কারণ বিশ্ব-ধৃতি-মহিমা ব্রহ্মেই উপলব্ধ হয়।

১৭। দহরের এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ থাকাতেও তদ্দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৮। জীবাত্মার উল্লেখ থাকাতেও অসম্ভবত্ব হেতু দহর পদে জীবাত্মা বুঝায় না।

১৯। পরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২০। "জীবাত্মা" পদের অভিপ্রেত অর্থ স্বতন্ত্র।

২১। অল্প বা সূক্ষ্মাকাশ পদে বিশ্ব-

ব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্ববোধজনিত অনুপপত্তি-আশঙ্কার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

২২। ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপতার অনুকৃতি হইতেও ব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত।

২৩। ঔপনিষদী স্মৃতিতেও বিশ্বজ্যোতিভাবে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১ম সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষৎ (১১—২।৫) বলেন,—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাং বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

স্বর্গ, পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ আর।
অনুস্যূত সত্তায় যাঁহার॥
মনঃপ্রাণ সমস্তই যিনি।
জান তাঁরে, পরমাত্মা তিনি॥
অপর প্রসঙ্গ পরিহারে।
অমৃতের সেতু জান তাঁরে॥

ব্রহ্মই এস্থলে অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত পরিষ্কৃত। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" এই বাক্যের প্রয়োগেই উহা স্পষ্টীকৃত।

"সেতু" শব্দের প্রয়োগে পদার্থান্তরের অপেক্ষা সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে। যাহা এক কূল হইতে অপর কূল সহ সংযোজিত হয়, তাহাই সেতু; অতএব "সেতু" এক কূল হইতে অপর কূল রূপপদার্থান্তর-প্রাপ্তির অপেক্ষা সূচনা করে; কিন্তু ব্রহ্ম "অনন্তমপারম্"; তিনি আবার কোন্ দাস্ত সপারের দুইপার-সংযোজক হইবেন? ফলে "সি" ধাতু-নিষ্পন্ন "সেতু" পদের প্রকৃত অর্থ সংযোজন বা একত্রীকরণ বটে, কিন্তু পারদ্বয়-সংযোজন-সেতুত্ব অবশ্য এখানে অভিপ্রেত নয়; কেবল সংযোজনত্ব বা মিলনত্বই এখানে অভিপ্রেত। অতএব যাঁহাকে জীবের অমৃতত্বসম্মিলন সংসিদ্ধ হয়, তিনিই অমৃতের সেতু। "বিধরণত্বমাত্রমত্র সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবত্তাদি।"

সমস্তই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যেমন লবণসমষ্টির অন্তর্ব্বাহ্যভেদ-বিশেষত্ব নাই; উহা মোটের উপর আস্বাদবিশেষের সমষ্টি মাত্র; তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বেরও জ্ঞেয়ত্বের অন্তর্ব্বাহ্যভেদ-ভাব নাই; উহা মোটের উপর জ্ঞানসমষ্টি স্বরূপ। যথা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৭—৫।১৩) বলিতেছেন—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।"

সৈন্ধব-সমষ্টিসার, নাহি তাহে যে প্রকার,
অন্তর্ব্বাহ্য-ভেদ-বিশেষত্ব;
আস্বাদ-সমষ্টিসার; ব্রহ্মতত্ত্ব সে প্রকার,
প্রজ্ঞান-সমষ্টি মাত্র সত্তা।

সমস্তই ব্রহ্ম,—অর্থাৎ "ব্রহ্মই সর্ব্বপদার্থ" বলিলে, ব্রহ্মের বহুরূপত্ব বুঝায় না; পরন্তু প্রকৃতি-রূপত্ব বুঝায়। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রকৃতি ব্রহ্মেরই রূপ।

২য় সূত্র।—স্বর্গ-পৃথিবী ইত্যাদির আধার বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির সর্ব্ববন্ধ-স্খলিত মুক্ত পুরুষও ব্রহ্মতত্ত্বেই যুক্ত; অতএব মুক্তের মিলনাধিকরণ ব্রহ্মতত্ত্বগত। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

হৃদয়ের হয় গ্রন্থিভেদ।
হয় সর্ব্ব সংশয়ের ছেদ॥
সমস্ত কর্ম্মের হয় ক্ষয়।
পরাবর দর্শনে নিশ্চয়॥

এস্থলে "পরাবর" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। অপিচ,—"যথাবিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ, পরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্।"

নামরূপ-বিমুক্ত বিজ্ঞানবান জন।
প্রাপ্ত হন পরাৎপর পুরুষ পরম॥

এই সমস্ত উক্তিগুলিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মই মুক্ত পুরুষের আশ্রয়, কিন্তু প্রধান বা অন্য কোন তত্ত্ব নহে।

৩য় সূত্র।—স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির আধার-তত্ত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি কখনও হইতে পারে না; কারণ উক্ত সূত্রোক্ত শব্দেই তাহা সূচিত হইবার নহে। পরম পূত শাস্ত্র সমূহের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, চিৎসত্ত্বই বিশ্ব-কারণ; সুতরাং অচিৎসত্ত্ব প্রধান তাহা কিরূপে হইবে? এই চিৎ-সত্ত্বই ব্রহ্ম।

৪র্থ।—জীবাত্মাও সেই কারণবশেই স্বর্গ-পৃথিব্যাদির আধারতত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। পবিত্র শাস্ত্র সকল ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ বলেন, কিন্তু জীবাত্মা চিৎসত্ত্বা প্রভৃতি ব্রহ্ম-সমধর্ম্মিতা পাইলেও তাঁহাকে তাহা বলা হয় নাই।

৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্র।—অপিচ, শাস্ত্রে বলেন, একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হও। এই স্থলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য সূচিত হইতেছে। আত্মাকেই এ স্থলে 'জ্ঞেয়' এবং জীবকে 'জ্ঞাতা' বলা হইয়াছে। আত্মাই স্বর্গ-পৃথিবী প্রভৃতির আধার, কিন্তু জীব কদাচ নহে। বিশেষতঃ আলোচ্য অধ্যায়টির বিষয়ই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। মুণ্ড-কোপনিষদে (১। ১। ৩) দৃষ্ট হয়,—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—অর্থাৎ—

"হে আর্য্য! জানিলে কা'য়,
সমস্ত জানিতে পারে?"

যদি ঐ উক্তিটি দ্বারা জীবাত্মাকেই বুঝায়, তাহা হইলে আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয়-বিপর্য্যই ঘটিয়া যায়। তাহা হইলে যাহা হয়, তাহা অদ্ভুত ও অসঙ্গত।

৭ম সূত্র।—বেদান্তসূত্রের ২য় পাদের প্রথম অধ্যায়ের ১১শ সূত্রের আলোচনায় যাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিচারিত হইয়াছে, সেই মুণ্ডকোপনিষদের (৩। ১। ১) উক্তিই এইরূপ,—

"প্রেমেবদ্ধ পাখীদুটি সখা পরস্পর।
প্রেমভরে বাস করে একবৃক্ষ-পর॥
সে দু'য়ের একটি মধুর ফল খায়।
অপরটি সাক্ষীরূপে চেয়ে দেখে তা'য়॥

এই পাখীদুইটির মধ্যে ভোক্তাটি জীব ও দ্রষ্টাটি ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আলোচ্য বিষয়ের মূলতত্ত্ব; তবে জীবাত্মার উল্লেখ কেবল অবান্তরভাবে কৃত। অতএব স্বর্গ-পৃথি-ব্যাদির আধারতত্ত্ব ব্রহ্ম। যদি তর্কচ্ছলে বলা যায় যে, ব্রহ্মের উল্লেখই অবান্তরভাবে কৃত হইয়াছে, তবে তাহা অসঙ্গত হয়; যেহেতু অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিধায় উহার সমাধান আনুষঙ্গিক বা অবা-ন্তর আলোচনায় কুলায়না; পরন্তু অধিকতর বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনারই প্রয়োজন। জীবাত্মার অনুভূতি সকলেরই স্বতঃসাধারণ-পরিচিত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক বিধায়, উহার অবা-ন্তর উল্লেখ আপত্তিজনক হয় নাই।

৮ম সূত্র।—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত (৭-২০।২৪)

"ভূমা"শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য কি না, তদালোচনাই এই সূত্রের বিষয়।

নারদ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন। আমরা তৎপ্রসঙ্গে নারদের প্রশ্নাবলী ও সনৎকুমারের উত্তরাবলী শাস্ত্রে দেখিতে পাই। নারদ জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভগবন্! নামের অধিক কিছু আছে কি?"

উত্তর—"নামের অধিক বাক্য।"

প্রশ্ন—বাক্যের অধিক কিছু আছে কি?

উত্তর—"বাক্যের অধিক মন।"

এইরূপে উভয়ের প্রশ্নোত্তর-প্রবাহ চলিয়া, উহা "প্রাণ"-প্রসঙ্গে উপনীত হইল। এই "প্রাণ" হইতে অধিক আর কিছুরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সূত্রের মূল আলোচ্য বিষয় ছান্দোগ্য-উপনিষদের উক্তি এই,—

"ভূমানং ভগবো জিজ্ঞাসে যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।"

হে আর্য্য! ভূমার জ্ঞান বাঞ্ছে মম মন।
যাঁহাতে দেখেনা অন্য, শুনেনা জানেনা অন্য,
যিনি পূর্ণ, ভূমা তিনি হন॥
যাহা হতে দেখে অন্য, শুনে অন্য—জানে অন্য,
যে অপূর্ণ, 'অল্প' পদে তাঁহারি গণন॥

এই ভূমাবিষয়িণী উক্তির পরেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, আশা হইতেও প্রাণ গরীয়ান্; সুতরাং এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রাণই বুঝি ভূমা, যেহেতু প্রাণাপেক্ষা অধিকতর গরীয়ান্ আর কিছুরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বিচার্য্য বিষয়ই ব্রহ্ম, কিন্তু প্রাণ নহে। নারদ সেই জ্ঞানই পাওয়ার প্রার্থী হইয়াছিলেন, যে জ্ঞানে "মৃত্যাত্মদুঃখ-নিবৃত্তি" রূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়; কিন্তু (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন) প্রাণতত্ত্ব-জ্ঞানের পরমপুরুষার্থদায়িনী শক্তির উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না; অতএব প্রাণ কদাচ 'ভূমা' হইতে পারে না। নারদকে সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার শেষে "আশা হইতে প্রাণ অধিক" এইরূপ সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইলেই নারদ নীরব হইলেন; আর প্রশ্ন করিলেন না। তখন সনৎকুমার ব্যাখ্যা করিলেন যে, "অতিবাদী" হওয়ার উপযোগিতা কেবল প্রাণতত্ত্ব-জ্ঞানে নির্ভর করিলে, উহা অন্তঃসারশূন্য হয়; যেহেতু তত্ত্বতঃ প্রাণ স্বয়ংই মিথ্যা; এবং তৎপরে বলিলেন যে, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যজ্ঞানসম্পন্ন। এই স্থলে নারদ একটি নবতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রার্থক হইলেন এবং সনৎকুমারও তাঁহাকে বুদ্ধি হইতে ভূমা-তত্ত্ব পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলেন। এই ভূমাতত্ত্ব প্রাণতত্ত্বের অতিরিক্ত শিক্ষার ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলিতার্থে এই উভয় তত্ত্বে পরস্পর প্রকৃত সংস্রব নাই।

সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সম্প্রসাদতত্ত্বের পরে ভূমাতত্ত্ব উক্ত হওয়ায়, প্রাণ কদাচ ভূমা নহে। "সম্যক্ প্রসীদত্যস্মিন্নিতি" এই অর্থে "সম্প্রসাদ" পদে সুষুপ্তি বুঝায়; কারণ সুষুপ্তিই সম্যক্ প্রসন্নতাপ্রদ। সুষুপ্তিকালেও প্রাণ জাগ্রত থাকে; সুতরাং এই সূত্রে "সম্প্রসাদ" শব্দে প্রাণ বুঝাইলেও ভূমা শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়, কিন্তু প্রাণ বুঝায়

না; কেননা ভূমাতত্ত্ব প্রাণতত্ত্বের পরে অতিরিক্ত তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"আত্মতঃ প্রাণ" (ছাঃ উঃ ৭-২৬।১।১) প্রাণ স্বয়ংই আত্মা হইতে উৎপন্ন। আত্মাই মূল পদার্থ; আত্মা পদার্থান্তরসাপেক্ষ নহে। অতএব "ভূমার প্রতিষ্ঠা কোথায়?" নারদের এইরূপ প্রশ্নে উত্তর হইল যে,—"স্বে মহিম্নি" অর্থাৎ স্বমহিমায়। ইহাতেই সর্ব্বসংশয়ের নিরাকরণ হইতেছে। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ভূমা সেই বিশ্বকারণ পরমাত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

৯ম সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পবিত্র শাস্ত্রবাক্যে ভূমার যেরূপ লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, অতএব ভূমাই ব্রহ্ম। "যাহাতে অন্য আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, (ইত্যাদি ইত্যাদি,) তাহাই ভূমা" এই বাক্যের সহিত "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১) এই বাক্যের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, যখন আত্মাই সমস্ত, তখন তাহাতে আর অন্য কি দৃষ্ট হইতে পারে?

ছান্দোগ্যোপনিষদের এই আলোচ্য অধ্যায়টিতে ভূমাকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, এবং অমৃততত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বকেও আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। অতএব লক্ষণসাম্য হেতু ভূমাই ব্রহ্ম, তাহাতে সংশয় নাই।

১০ম সূত্র—এ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩—৮।৭।৮) উক্ত "অক্ষর" শব্দে অবিনাশী ব্রহ্মকে বুঝায় বা অক্ষর পদেই বাচ্য অ-উ-ম-প্রকটিত প্রণব বুঝায়।

"কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।"

কিসে ওতঃপ্রোত এই অনন্ত অম্বর?
কহ (যাজ্ঞবল্ক্যযোগী), অবধান কর গার্গি!
বর্ণন করেন হেন ব্রাহ্মণনিকর,—
যে অম্বর এ ভুবন যা হতে করে পোষণ,
আধার সে অম্বরের সেই সে অক্ষর।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে অম্বর সর্ব্বাধার, তাহার আধার ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এই অম্বর যে অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বিশ্বের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতেছে, তাহাই 'অক্ষর' অর্থাৎ অবিনাশী ব্রহ্ম। "ওঁকারঃ এবেদং সর্ব্বং" অর্থাৎ প্রণবই এই সমস্ত বিশ্ব, এইরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনুপপত্তি নাই; কারণ উক্ত বাক্য ওঙ্কারের স্তুত্যর্থক; যেহেতু প্রণব সাধনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

১১শ সূত্র।—এ সূত্রের বিচার্য এই যে, 'অক্ষর' কদাচ অচিৎসত্ত্ব প্রধানের প্রতিপাদক নহে। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি। (বৃঃ উঃ ৩-৮।৯)।

হে গার্গি! এ অক্ষরের প্রশাসন-বলে।
চন্দ্র-সূর্য্য স্ব স্ব কার্য্য সাধে নভস্থলে॥

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, চিৎস্বরূপ হইতেই প্রশাসন সম্ভব; সাংখ্যোক্ত অচিৎস্বরূপ প্রধান হইতে তাহা অসম্ভব। অচিৎসত্ত্ব কর্দ্দমের প্রশাসনে কদাচ ঘটাদির সংগঠন সাধিত হয় না।

১২শ সূত্র।—এ সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ ব্রহ্ম এই ভূত-প্রপঞ্চ হইতে

স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ, তদ্রূপ অক্ষরকেও শাস্ত্রে ভূতপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম ও অক্ষরে যে কেবল লাক্ষণিক তত্ত্ব-সাম্য-জনিত একত্ব, তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য অনিত্য-ভূত-প্রপঞ্চের সহিত পার্থক্য-সাম্য-জনিত একত্ব ফলেও অক্ষরই ব্রহ্ম।

প্রধান ও জীবাত্মা হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিভিন্ন, অপিচ সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত, এবং অক্ষরও তাহাই বলিয়া বর্ণিত; অতএব অক্ষরই ব্রহ্ম।

"অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ, অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্তৃ, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ।" (বৃঃ উঃ, ৩-৮। ৮৮) অর্থাৎ (হে গার্গি!) অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দেখেন, অশ্রুত হইয়াও শুনেন, অমত হইয়াও মনন করেন, অজ্ঞাত হইয়াও জানেন, ইত্যাদি।

স্থলান্তরে, উক্ত অক্ষরে চক্ষু-কর্ণ-বাক্য-মনের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, অথচ উহাতে তত্তৎ শক্তির কারণ-তত্ত্ব নিহিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা অক্ষরেরও সর্বো-পাধিশূন্যতা সিদ্ধান্তিত হওয়ায়, "অক্ষর" পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

১৩শ সূত্র।—প্রশ্নোপনিষদের (৫।২) একটি উক্তির বিচার এই সূত্রের বিষয়। উক্তিটি এই,—

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈ-কতরমন্বেতীতি প্রকৃত্যা শ্রূয়তে। যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীতেতি।"

সত্যকাম! এ ওঙ্কার প্রণব-ব্রহ্ম অপর।
ইঁহারে জানিলে লভে এ দুয়ের অন্তর॥
ত্রিমাত্র প্রণব এই, এতে ধ্যান ধরে যেই,
সেই পায় পরম পুরুষ পরাৎপর।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই ত্রিমাত্র-প্রণবের ধ্যান-ধারণায় যে পরমপুরুষের প্রাপ্তি হয়, তাহা পরমাত্মা ব্রহ্ম বা অপর কোনরূপ আত্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্ব।

সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, ধ্যান-ধারণায় বিষয় পরমাত্মা ব্রহ্ম। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষ, সুতরাং ধ্যেয়; কিন্তু অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং অধ্যেয়। "স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরুষং পুরিশয়ম ঈক্ষতে"।

দেহ-দুর্গবাসী সেই পরম পুরুষে।
জীবঘন-আত্মাহতে প্রধান হেরে সে॥
(জ্ঞানেন্দ্রিয়—আর তার বিষয়নিকর।
তদতীত তিনিই পুরুষ পরাৎপর॥)

উপরোক্ত ঔপনিষদী উক্তিদ্বয় ফলিতার্থে এক তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিতেছে। প্রকৃত বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, এই হেতুই এক মাত্র প্রকৃত বস্তু ব্রহ্মই উক্ত উক্তিদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছেন; কিন্তু প্রাণ নহে। প্রাণ যদিও দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, কিন্তু ফলিতার্থে মায়াকল্পিত অবস্তু। গৌণ-ব্রহ্ম, "হিরণ্যগর্ভ" বা "সূত্রাত্মা"ও প্রকৃতই অপ্রকৃত বস্তু বা অবস্তু। বেদান্তের সার সিদ্ধান্তই এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই বিশ্ব, ব্রহ্মই" একমেবা-

১৪শ সূত্র।—এই সূত্রেরও বিচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্রুতিবাক্য। নিম্নে সেটি উদ্ধৃত হইল।

"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরিকং বেশ্ম দহরস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদ সত্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।"

ব্রহ্মপুরী এই দেহ, সূক্ষ্ম হৃদপদ্ম গেহ,
তাহে সূক্ষ্ম অন্তর-আকাশ।
আশ্রয়ি সে সূক্ষ্মধাম, যে তত্ত্ব বিরাজমান,
আবশ্যক সে তত্ত্বজিজ্ঞাস।

বিচার্য্য এই, শাস্ত্র যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মপুরী এই দেহে সূক্ষ্ম হৃদ্ স্থানে সূক্ষ্ম-অন্তরাকাশতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইহার সারভূত তত্ত্ব বা লক্ষ্য কি, তাহাই অনুসন্ধেয়। উহা কি কেবল মূলভৌতিক সূক্ষ্মব্যোম মাত্র? অথবা উহা জীবাত্মা কিম্বা সেই পরাৎপর পরমাত্মা? পরবর্ত্তী বিচারমতে শাস্ত্রোক্তি অনুসারেই "সূক্ষ্ম অন্তরাকাশ" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়। নিম্নোক্ত বর্ণানুসারে অন্তরাকাশ গৌণ গণ্য।

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।

শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, অজর অমর নিত্য,
অশোক—অক্ষুৎ-তৃষ্ণ যেই।
যিনি সদা সত্যকাম, সত্যের সঙ্কল্পবান,
হন সত্য এই আত্মা সেই॥

এই বর্ণনা ভৌতিক আকাশ বা জীবাত্মা, এ দুয়ের কোনটীতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। শালগ্রাম শিলায় যদ্বৎ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, ধ্যানধারণাধিগমাভাবে "ব্রহ্মপুর" দেহমধ্যে হৃদপদ্মে তদ্বৎ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।

১৫শ সূত্রে।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম বা পরব্যোম ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরব্যোমে বা ব্রহ্মলোকে জীবের প্রাত্যহিক গতিবিশেষ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুগভীর সুষুপ্ত সময়ে জীবাত্মার ব্রহ্মগতি বা ব্রহ্মলোকে গতি এবং জাগরণে পুনরাবৃত্তি হয়। ব্রহ্মলোক ব্রহ্মের আধিকরণিক তত্ত্ব, সুতরাং পরমার্থতঃ ব্রহ্মসহ অভিন্ন, ইহাই এস্থলে বিবৃত।

১৬শ সূত্র।—এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্মব্যোমের জগদ্ধৃতি-লক্ষণ উক্ত হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বোধব্য, যেহেতু ব্রহ্মেরই জগদ্ধৃতি-লক্ষণ শ্রুতি-বিশ্রুত। শাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম ব্যোমতত্ত্বকে কেবল মাত্র পাপাতীতই বলা হয় নাই; অপিচ বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা এরূপ নিয়মিতভাবে জগৎ-পোষণ হইতেছে যে, যাহাতে জগৎ বিপ্লুত না হইয়া যায়। যথা "য আত্মা সঃ সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি"। "বৃহদারণ্যক" বলেন, একমাত্র সেই অমৃতস্বরূপের আদেশেই আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য যথাব্যবহিতভাবে স্বকার্য্য সাধনার্থ সমুদিত রহিয়াছেন। মূলব্রহ্মের বশেই বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থই স্ব-সত্তায় সংস্থিত। অতএব "সূক্ষ্মাকাশ" বা "পরব্যোম্" পদে ব্রহ্মতত্ত্বই বোধিত।

১৭শ সূত্র।—এই সূত্রের সমাধেয় এই যে, সূক্ষ্মব্যোম ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধক; যেহেতু ইহার অন্যান্য অবান্তর অর্থ থাকিলেও এস্থলে মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থই ব্রহ্ম। "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বাহিতা" (ছাঃ উঃ ৮। ১৪)।

আকাশপদেতে হন পরিব্যক্ত যিনি।
নাম-রূপ-উপাধির প্রকাশক তিনি॥

"সর্ব্বাণি বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।" (ছাঃ উঃ ১।৯)

আকাশপদেতে যাঁর পরিচয় জ্ঞাত।
এই সর্ব্বভূত হয় তাঁহাতেই জাত॥

আকাশ পদে অবশ্য জীবাত্মা বুঝায় না, ইহা ভৌতিক ব্যোমকেই বুঝায়; কিন্তু সূক্ষ্মব্যোমের যে লক্ষণাদি শাস্ত্রোক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বই বিজ্ঞেয়; নচেৎ উহা অতীব অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হয়।

১৮শ সূত্র।—ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্মব্যোম কদাচ জীবাত্মাবোধক হইতে পারে না; যেহেতু শাস্ত্রোক্তিমতে উহা অসম্ভব। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮.৩।৪) উক্ত হইয়াছে, "অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি নিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ।"

এই যেই 'সম্প্রসাদ'—দিবা-বিভাসিত।
এ মর্ত্ত্য শরীর হতে হয়ে সমুত্থিত॥
পরজ্যোতিরূপে পরে পরিণতি পায়।
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আত্মা বলে তায়॥

এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বা আপাততঃ জীবাত্মাই সমর্থিত বোধ হয়; কিন্তু (এই পাদেরই) পরবর্ত্তী ২০শ সূত্রে নিষ্পন্ন হইবে যে, মুখ্যার্থকভাবে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গই পরমাত্মাবোধক। ফলিতার্থে উপরোক্ত উপনিষদ্-বাক্যেও পরমাত্মাই পরম লক্ষ্য। কারণ স্বরূপস্থ আত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু উপাধি-নির্ম্মুক্ত; কিন্তু জীবাত্মা সোপাধিক ও সসীম; এবং "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বা "অপহতপাপ্মা" প্রভৃতি বিশেষণ জীবাত্মায় অপ্রযোজ্য। জীবাত্মা অবিদ্যোপাধিগত; অবিদ্যাতেই অজ্ঞান, অজ্ঞানেই পাপ; অতএব সূক্ষ্মব্যোমসহ জীবাত্মা তুলনীয় নহেন; পরন্তু পরমাত্মাই বটেন।

১৯শ সূত্র।—এই সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জীবাত্মার বিষয় কথিত হওয়ায়, "সূক্ষ্মব্যোম্" জীবাত্মাবোধক কেন না হইবে? এরূপ তর্ক উত্থাপিত হইলে, তদুত্তর এই যে, উহাতে মুক্ত জীবাত্মার বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে; মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক তত্ত্ব। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জীবাত্মা যখন অবিদ্যা-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্ হন, তখন তিনি ব্রহ্মই হন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রজাপতি কর্ত্তৃক জীবাত্মার প্রকৃত-তত্ত্ব-বিকাশ বিবৃত হইয়াছে। মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তত্ত্ব-পক্ষে প্রভেদ নাই। যদি "সূক্ষ্মব্যোম" মায়াপাশ-মুক্ত জীবাত্মাকে লক্ষ্য করে, তবে তাহা পরমার্থতঃ পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করে, বলা যায়।

২০শ সূত্র।—এ সূত্রের বিচার এই যে, যদি সূক্ষ্মব্যোম জীবাত্মাকে বুঝায়, তবে তাহার অর্থ-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য; অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রকৃত-পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপ-নির্ণয় অভিপ্রেত নয়; পরন্তু পরমাত্মার স্বরূপনির্ণয়ই অভিপ্রেত।

২১শ সূত্র।—যদি এরূপ তর্ক ধরা যায় যে, সূক্ষ্মব্যোমের সূক্ষ্মস্বরূপ লক্ষণটি বিশ্বব্যাপী পরমাত্মায় কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যায় যে, তিনি এই রূপেই ধ্যানাধিগত হইয়া থাকেন।

ঔপনিষদী শ্রুতি কেবল আমাদিগকে

আমাদের ধারণাধিগম্যভাবে সূক্ষ্ম হৃৎপদ্মে ব্রহ্মচিন্তার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষুদ্রস্বরূপ সূক্ষ্মত্ব জ্ঞাপন করেন নাই।

২২শ সূত্র।—মুণ্ডকোপনিষদ্ ও কঠোপনিষদুক্ত একটি শ্রুতিবাক্যের বিচার এই সূত্রের বিষয়। শ্রুতি যথা—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (মুঃ উঃ ২।-২।১০)

সূর্য্য তথা নাহি জ্বলে, নাহি চন্দ্র-তারা তথা।
নাহি ঝলে এবিদ্যুৎ, অগ্নিআর লাগে কোথা॥
তিনি ভান্ত, সর্ব্বভাতি তাঁরে অনুসরি রয়।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত হয়॥

এই স্থলে এই ভাতি বা জ্যোতি কোন ভৌতিক জ্যোতিষ্ককে লক্ষ্য করিতেছে না; এস্থলে জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মই লক্ষিত। শাস্ত্রে ব্রহ্মই "জ্যোতিষাং জ্যোতি" বাক্যে বাক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মই মৌলিক আলোচ্য বিষয়; অতএব সিদ্ধান্তিত তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব,—অপর কোন ভৌতিক তত্ত্ব নহে।

২৩শ সূত্র।—ঔপনিষদী স্মৃতিও ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্যোতির অপ্রকাশ্য স্বয়ংপ্রকাশ—অর্থাৎ "জ্যোতির জ্যোতি" ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন; যথা গীতা,—

"নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে—তদ্ধাম পরমং মম॥"

রবি না বিভাসে তাহা, না চন্দ্র না অগ্নিতথা।
সে মম পরমধাম, নাহি ফেরে গেলে যথা॥
অপিচ।—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।"
আদিত্যগত যে তেজ বিকাশে বিশ্বসংসার।
যে তেজ চন্দ্রে—অনলে, সে তেজ জান আমার॥

এতবতা জ্যোতির জ্যোতি ভাবে অন্য কোন ভৌতিক জ্যোতিই প্রতিপাদিত নহে; পরন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত।

(ক্রমশঃ)

দুর্গামূর্ত্তি—দুর্গোৎসব।

(ধ্যান)

"জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।
আপাদলম্বিতা-মালাং সর্ব্বরত্নবিভূষিতাং।
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং॥
ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং দক্ষিণেন বিচিন্তয়েৎ॥
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেবচ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
অধস্তান্ মহিষং তদ্বৎ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ দানবং খড়্গপাণিনং॥
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্গদন্ত্রবিভূষিতং।
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং॥

বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটিভীষণাননং।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং ।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং ॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥"

জটাজুট কেশপাশে, অর্দ্ধেন্দু ললাটে হাসে,
ত্রিনয়না পূর্ণেন্দুবদনা।
তপ্তস্বর্ণ-সুবরণা, সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা,
নবীনা সর্ব্বভূষণা ॥
সুচারু-দশন-ধরা, পীনোন্নত-পয়োধরা,
শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গি ধরে।
মহিষ-মর্দ্দিনী মা'র আপাদলম্বিত ভাব,
সর্ব্বাস্ত্র তাহে শোভা করে ॥
নলিন-নাল-নিন্দিত দশবাহু সুশোভিত,
দশঅস্ত্র তাহে ঝলমলে।
ত্রিশূল দক্ষিণ করে, খড়্গ চক্র ততঃপরে,
তীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি সমুজ্জলে ॥
খেটকাস্ত্র বামকরে, পূর্ণ চাপ তারপরে,
পাশ ও অঙ্কুশ পরে তার।
সর্ব্বশেষ-সব্য-করে ঘণ্টা বা পরশু ধরে,
(রণরঙ্গময়ী মূর্ত্তি মা'র !)
নিম্নদেশে ছিন্নমুণ্ড মহিষাস্থ সুপ্রকাণ্ড,
তদুদ্ভূত খড়্গী সুররিপু ।
শূলে হৃদি বিদারিত, নির্গতান্ত্র-বিভূষিত,
রক্তে রক্তময় বীরবপু ॥
বিস্ফারি আরক্ত আঁখি, নাগপাশে বদ্ধ থাকি,
ভ্রূকুটি ভীষণ মুখভঙ্গি।
দংশিয়া অসুর-অঙ্গ, দেবীর বাহন সিংহ,—
বমন-বদন-রক্তরঙ্গী ॥

দেবীর দক্ষিণ পায়, সিংহ-পৃষ্ঠে শোভা পায়,
তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদেশে।
শ্রীপদের বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষের অঙ্গে স্পৃষ্ট,
(অসুর কৃতার্থ কৃপাবেশে !)
প্রসন্নবদনা সদা, দেবী সর্ব্বকামপ্রদা,
সাধকের শত্রুবিনাশিনী।
দৈত্য-দানবের দর্প সগর্ব্বে করিয়া খর্ব্ব,
সর্ব্বদেব-স্তুতি-বিলাসিনী ॥

যে রূপটি বর্ণিত হইল, সে কেবল রণ-রঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিনীর রূপ। এ রূপের ধ্যানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ নাই; কেবল দনুজ-দলনী সিংহবাহিনী দশভুজা মা! ধনদা লক্ষ্মী, জ্ঞানদা বাণী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, বল-বীর্য্য ও বংশবিধাতা কার্ত্তিকেয়, এই সমস্ত দেব-দেবিতত্ত্ব সর্ব্ব-শক্তিময়ী মা দুর্গারই বিভিন্ন শক্তির মূর্ত্তি-বিকাশ মাত্র। ফলে দুর্গোৎসব-পদ্ধতিতে উহাঁ-দের পৃথক্ ২ ধ্যান-মন্ত্র সমন্বিত পৃথক্ ২ পূজা আছে; আবার মহাদেবীর মহাপূজার সমষ্টী-ভূত ভাবেও উহাঁদের পূজা সর্ব্বদেবতত্ত্বময়ী দুর্গাপূজার অন্তর্ভূত। কোন্ পূজাইবা দুর্গোৎ-সবের অন্তর্ভূত নয়? দুর্গোৎসবে অনন্ত পূজা। পূজা না কার? "অজ্ঞানায় নমঃ, অধর্ম্মায় নমঃ, চৌরেভ্যো নমঃ, বেশ্যাভ্যো নমঃ" পর্য্যন্ত নমস্কার-মন্ত্রগুলি সমন্বিত যে সব পূজা, তাহা কেবল দুর্গোৎসবেরই বিশ্বোদার ক্রোড়ে স্থান পায়! সংসারের ধবল পৃষ্ঠটি ঈশ-সৃষ্ট, আর কৃষ্ণ পৃষ্ঠটি, কি বাস্তবিক "সয়-তান্"-সৃষ্ট? এ সমস্যার সমাধানে হিন্দুশাস্ত্রে 'সয়তান' কল্পনা আবশ্যক হয় নাই। "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম"। শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ একই

চাঁদের লীলা। শুভাশুভ, সু-কু, শ্বেত-কৃষ্ণ, আলো-অন্ধকার বা স্বর্গ-নরক, সব এক তত্ত্বেরই যেন পরস্পর-সাপেক্ষ দুটা পিঠ,—মূল বস্তু এক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। তবে যে দ্বৈত-দ্বন্দ্ব-বোধ, তাহা অবিদ্যার ঐন্দ্রজালিক কুহকমাত্র! তাহা সেই মায়াতীত মায়াময়ের মায়া-মোহেরই মহিমা! তাই বলি, দুর্গোৎসবে—দুর্গাপূজায় মহাপূজা—বিশ্ব-পূজা! "চোরের পূজা—বেশ্যার পূজা" না থাকিলে, এই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মপূজার সর্ব্ব-ময়ত্ব এবং মহামহত্ত্ব সামান্য মানবীয় দর্শন-শাস্ত্র কিরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে? মানুষের বেদ-বেদান্ত এ মহাপূজার মূর্ত্তিমন্ত!

আর একটি নিবেদন, এই মহাশক্তি-পূজা শত্রু-বিজয়ার্থ—তথা আত্মবল-বিধা-নার্থ শ্রীভগবান রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্বোধিত। তৎপূর্ব্বে বসন্তে বাসন্তী-দুর্গোৎসবের এই সিংহবাহিনী মহিষ-মর্দ্দিনীর পূজা হইত; এখনও হইয়া থাকে; কিন্তু "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ" হেতু-মূলে শারদীয় দুর্গোৎসবই শক্তিসাধনায় সুপ্রতি-ষ্ঠিত। বঙ্গে এই শারদীয়া মহাপূজারই বহুলপ্রচার। এই পূজার বলেই বাঙ্গালী একদিন শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্থানীয় প্রকৃতি উদ্ভিদের পক্ষে যেরূপ অনুকূল, মানুষের পক্ষে সেরূপ নহে। জল-বায়ু-মৃত্তিকা প্রভৃতির গুণগত প্রাকৃতিক পোষণ-শক্তি উদ্ভিদ্ ও মনুষ্যের পক্ষে পরস্পর প্রতিকূল এবং বিরোধী, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। উদ্ভিদ্‌বিরল বালু-কঙ্করাদিপূর্ণ উচ্চ ও শুষ্ক ভূমির প্রকৃতিই মানবের স্বাস্থ্য-পক্ষে পরম অনুকূল। যাহাহউক, বোধহয় এই জন্যই বাঙ্গালার মানুষ স্বভাবতঃ মৃদু, দুর্ব্বল, রোগপ্রবণ, অলস, অকর্ম্মঠ ও অকষ্ট-সহিষ্ণু হইবার কথা। পায় হয়ও তাহাই। তবে বাঙ্গালীর যে উন্নতি হইয়াছে, আমাদের বোধহয় সে কেবল দুর্গোৎসবের ফল। অনেকে হয়ত একথায় হাসিতে পারেন; কিন্তু নিরুপায়! "মনের কথা খুলিলে লোকে পাগল বলে" এরূপ প্রবাদ-বাক্যও প্রচলিত আছে। আমরা না হয় কোথাও "পাগল" গণিত হইব, কিন্তু এই মনের কথাটি নিবেদন না করিয়া পারিব না। বাঙ্গালীর যা কিছু উন্নতি, তাহার অন্ততঃ প্রধান কারণ দুর্গোৎসব। ইদানীং সেই দুর্গোৎসবের অবনতি;—হায়! বাঙ্গা-লীরও অবনতি। শরীরের বিষয়ে যাহাই হউক, মস্তিষ্ক বিষয়ে বাঙ্গালী সুপ্রশংসিত। সমগ্র ভারতের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা বঙ্গেই চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তারপর হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চাতেও বঙ্গ অগ্রগণ্য। ভগবদ্ভক্তিই হৃদয়-বৃত্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণতি। দেখুন বঙ্গের শ্রীগৌরাঙ্গ! স্থলবিশেষে অধিক বলিতে গেলেই ফলিতার্থে কম বলা হয়; অতএব গৌরাঙ্গসম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। আজ সমগ্র সভ্যজগৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গৌরাঙ্গ-চরিত্রের দিকে চাহিয়াছে! এই জগদারাধ্য গৌরাঙ্গ বঙ্গেরই সন্তান। আমাদের বোধ হয় ইহা দুর্গোৎসবের ফল! মহাশক্তি যোগমায়া কাত্যায়নী দ্বাপরে বৃন্দা-বনে রাধা-কৃষ্ণ লীলা আনিয়াছিলেন, সেই মহাশক্তি যোগমায়া দুর্গা কলিতে বঙ্গে গৌরাঙ্গ-লীলা আনিয়াছেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-

মণ্ডলে শুনা যায়, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শিবাবতার, তাঁহারই সাধনাকর্ষণে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। উত্তম কথা; কিন্তু শিবই তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, তিনি মহাশক্তি-সহযোগেই 'শিব'—নতুবা 'শব' মাত্র! অতএব শিবের সাধনে কৃষ্ণচৈতন্যের আগমন কলিতার্থে শক্তি-সাধনেরই ফল বলিতে হয়। বলিতে কি, বঙ্গের যতকিছু উন্নতি—যতকিছু গৌরব, তাহার অন্ততঃ প্রধান কারণ মহাশক্তিসাধনময় দুর্গোৎসব।

কেবল যে, বুদ্ধিবল বা হৃদয়-বলেই বাঙ্গালী বিখ্যাত, তাহা নহে; একদিন বাহুবলেও বাঙ্গালী বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য—বাঙ্গালী সীতারাম ইতিহাসের পবিত্র মন্দিরে বীরপূজায় পূজিত। বাঙ্গালী সেনাপতি মৃণ্ময় (মেনাহাতী) মালীকরাজ, মাণিকচাঁদ; আর আমাদের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরও আদরাভিনন্দিত বীর মোহনলালের বীরত্বাভিনয় সেদিনও বাঙ্গালীর বাহুবলের সাক্ষ্য দিয়াছে। তারপর হইতেই বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান নির্জ্জীবতার আরম্ভ। প্রায় সেই হইতে বাঙ্গালীর জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসবও নির্জ্জীব হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে২ বাঙ্গালী হিন্দুর সগুণব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত পক্ষেই পৌত্তলিকতায় দাঁড়াইয়াছে। মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব দেখে কে? সে চক্ষু আর কৈ? আমরা পাশ্চাত্য জড়সর্ব্বস্ব শিক্ষার মোহে মজিয়া, জড়াভিভূত চিত্তের প্রত্যক্ষে—জড়-চক্ষের সাক্ষ্যে জড়ময়ী প্রতিমায় কেবল পুত্তলিকাই দেখিতেছি। আমরা পৌত্তলিক না ত কি? এইরূপ সজ্ঞান-পুতুল-পূজা একরূপ প্রহসন বিশেষ। জড় পুতুলে ভক্তি আসে না; সুতরাং ভক্তিশূন্য প্রহসন-গণ্য পূজায় শক্তিসাধনা কিরূপে সম্ভবে? কাজেই বাঙ্গালী বিকল, দুর্ব্বল, অলস, বিরস, মৃত ও ম্লান। মা দুর্গার দয়ায় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব আধ্যাত্মিকতায় ও ভক্তি-বিশ্বাস-প্রবণতায় পুনঃসঞ্জীবিত না হইলে, বাঙ্গালীর শক্তি-সাধন বা সজীবতা-সম্পাদনের আর আশা নাই।

যে বাঙ্গালী একদিন বনের বাঁশের লাঠি কাটিয়া অপূর্ব্ব সমর-বীরত্ব দেখাইয়াছে, সে বাঙ্গালীর বাহুবলও নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় নহে। লাঠিই বাঙ্গালীর জাতীয় অস্ত্র বা দণ্ড। "যার লাঠি, তার মাটি"—ইহা বঙ্গেরই প্রবাদবাক্য। শুনা যায়, বাঙ্গালী "লাঠিয়াল" একদিন অপূর্ব্ব শিক্ষার গুণে লাঠির ঘূর্ণনে তীর-তরোয়াল—এমন কি—বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত নাকি ফিরাইয়াছে। লৌহ নাই, বারুদ নাই, শুধু কাষ্ঠদণ্ডে যে জাতির এ বীরত্ব, রাজা সে জাতিকে রীতিমত রণবিদ্যায় দীক্ষিত ও অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করিলে, তাহারও বাহুবল বোধহয় জগতের অন্যান্য সামরিক জাতির বাহুবলের নিকট নিতান্ত হীনপ্রভ হইত না। কিন্তু বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দশা দেখিলে, সে কথা আর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বাঙ্গালী ভাত চিরকাল খায়, কিন্তু "ভেতো বাঙ্গালী" তাহার প্রাচীন পরিচয় নয়। কেন এমন হইল? এতদুত্তরে যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বিশ্বাসানুরূপ উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মনোহর চক্রবর্ত্তী, মহাদেব ঘোষ, শ্রীধর

মিত্র, কার্ত্তিক সর্দ্দার, রঘুরাম দাস প্রভৃতি ভীমতুল্য বলশালী বাঙ্গালীর কাহিনীও বেশি পুরাতন নহে। ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গে কৃচিৎ কেহ হয়ত এখনও বীর আছেন। সুরেশ বিশ্বাস এখনও পাশ্চাত্য রণরঙ্গ-ভূমে সেনাপতিত্ব করিতেছেন; এখনও কেহ হয়ত বিনা অস্ত্রে বাঘ মারিতেছেন; কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। ফলে জাতিগত-ভাবে বাঙ্গালীর বাহুবলের পতন বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তিসাধনোৎসব দুর্গোৎসবের পতন হইতেই প্রধানতঃ সূচিত; পরে আনু-ষঙ্গিক অপর বিবিধ অপুরুষকারিতায় উহা পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অধুনা শোচ-নীয় কাপুরুষতায় পরিণত। সমাজের রুচিরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এখন যেন বঙ্গা-ঙ্গনাও আর বীরপুরুষ-পক্ষপাতিনী নহেন। বোধ হয়, এখন তাঁহারাও অনেকে "যাত্রার দলের ছোকরা" জাতীয় মেয়েলী পুরুষের ভাব-মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়েন! হা লজ্জা! হা বিড়ম্বনা! এখন যার হাত একটু শক্ত, সে চাষা; যে একটু বীর-ভাবের ভক্ত, সে গোঁয়ার; যে একটু বেশি আত্মসম্মান-তেজস্বী, সে বদ্‌রাগী! এখন যে তেড়ী-কাটে—গান গায়, মৃদুহাসে—বাঁকা চায়; মুখ মেয়েলী—নরম গা, থিয়েটারের অভি-নেতা, সে-ই নায়ক—সে-ই নাগর; 'বাসরঘরে' তারই আদর! বুঝি বঙ্গীয় যুবক-সমাজ এখন এই আদর্শেই আত্মগঠন করিতেছে! যদি এ সন্দেহ সত্য হয়, তবে অধঃপাতের আর বাকী কি? এখনও যাঁহারা বাঙ্গালীর "মুখপাত্র" আছেন, তাঁহারা এখনও চিন্তা করুন, এ দুর্দ্দশার হেতু কি, এ রোগের নিদান কি, এ বিষ-বিটপীর মূল কোথায়? ফলে একমাত্র পৌরুষ-সাধনার উপেক্ষাতেই এ অবস্থা ঘটিয়াছে। এই পৌরুষ-সাধনা কি? ব্যায়ামচর্চ্চা, পুষ্টিকর আহারাদির ব্যবস্থা, সামরিক শিক্ষা ইত্যাদি বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে এ সাধনার বহিরঙ্গ; কিন্তু সভক্তি-শক্তিপূজাই ইহার অন্তরঙ্গ-সাধন।

এখন বাঙ্গালীজাতিতে বীর-সাধনার উপ-যোগী পৌরুষ-উপকরণের যেন অত্যন্তা-ভাব ঘটিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমরক্ষেত্রে বাহুবলে রাজার সাহায্য করা দূরে থাক্, নিজ গৃহে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষায়ও অপটু! এখন বাঙ্গালী, জোরে মেঘ ডাকিলেও 'জৈমিনি' স্মরিয়া 'পৈত্রিক প্রাণ'টি বুকে করিয়া শশব্যস্ত হন! এখন কেবল বাঙ্গালীর—

"চিলকাঁছা—ফুলকোঁচা মাটিতে লোটান!
বাঙ্গালীর ব্রহ্মঅস্ত্র দে-দৌড়-সটান!!"

হাসিবেন না, ইহা কাঁদিবার কথা। এটি বাঙ্গালী কবির অশ্রুজলে-লেখা ব্যঙ্গ-কবিতা। বস্তুতঃ সমগ্র বাঙ্গালীজাতিটার উপরে যেন উচ্ছেদের কালো ছায়া পড়িয়াছে। অধুনা এ জাতিতে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ শুধু যেন এই ধ্বংস-পুরযাত্রী জাতির আপাততঃ কথঞ্চিৎ বংশ-রক্ষার জন্য। কেহ বা কপালে ঘা দিয়া বলেন, কেবল ব্যাকরণের লিঙ্গভেদ রক্ষার জন্য! ধ্বংসোন্মুখ বংশ বিড়ম্বনা মাত্র।

বঙ্গের দুর্গোৎসব বিশিষ্টভাবে হিন্দুর হইলেও, সাধারণভাবে সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশিষ্ট বাঙ্গালী মাত্রেরই জাতীয় উৎসব। ভারতের কোন২ মুসলমান-প্রধান প্রদেশেও এইরূপ "মহরম" উৎসব হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশিষ্ট সাধারণ জাতীয় উৎসবে পরিণত। মুসল-মানের এই মহরম উৎসবটিও আমাদের দুর্গোৎসবের ন্যায় শক্তি ও সজীবতা—পৌরুষ ও পটুতা লাভের অলৌকিক উপায় স্বরূপ। তবে কি না, আমাদের দুর্গোৎসব আজ মৃতপ্রায়; মুসলমানের মহরম আজিও জীবন্ত ও জাগ্রত। দেশে দুর্গোৎসবের

বিরলতা ঘটিয়াছে বলিয়া বলিতেছি না। মপস্বলে এখনও কোন২ একটি মাত্র পল্লীগ্রামেও শতাধিক দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরাদিতে অনেক দুর্গোৎসব হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে লক্ষ্মীপূজার ন্যায় প্রায় ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব হয়। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? একটী জীবন্ত উৎসবের যে শক্তি-সাফল্য, শত শবোৎসবেও তাহা সম্ভাবিত নহে। যদি বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবনের সজীবতা রক্ষার একান্ত আবশ্যকতা থাকে, তবে আমাদের দুর্গোৎসব-সঞ্জীবনই তাহার প্রধান সাধন। শাস্ত্রবাক্যে আশ্বাস, প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস, দুর্গা-পদে ভক্তি ও শক্তি-সেবায় অনুরক্তি; দুর্গোৎসবের অপর সহস্র বহিরঙ্গ-উপকরণের মধ্যে এই চারিটী অন্তরঙ্গ-উপকরণ থাকিলে, আমাদের এই জাতীয় জীবনের জীবনস্বরূপ উৎসব আবার জীবন্ত হইবে। ফলে আমাদের চেষ্টা বড়জোর কাঁদাকাটি ও মাথা-কোটাকুটি মাত্র; কিন্তু দেবীর দয়া দেবীর দয়ারই সাপেক্ষ। তবে কি না, খাঁটি কান্না নিষ্ফল হয় না। আমার "না কাঁদিলে মা-ও মাই দেয় না" ইহা অস্মদ্দেশেরই প্রবাদ-বাক্য। "বালানাং রোদনং বলং"—মায়ের দয়া পাইতে হইলে, বালকের রোদনই এক মাত্র বল। তবে কথা এই, রোদনের অভিনয়েও এ মাকে ভুলান যায়, কিন্তু খাঁটি রোদন ভিন্ন সে মা ভুলেন না। আমরা "রাবণ-বধ" পালায় রাম সাজিয়া, আভিনয়িক দুর্গোৎসব করিয়া, দেবী-প্রতিমার সমক্ষে খুব কাঁদিতে পারি; নীলপদ্মের অনুকরে স্বীয় পিঙ্গলাক্ষ উৎপাটনে খুব প্রস্তুত হইতে পারি; কিন্তু আমাদের জাতীয় যথার্থ দুর্গোৎসবে যখন আমরা দেবীপদে অঞ্জলি দিতে দিতে—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্॥"

ইত্যাদি পাঠ করি, তখন এ কাষ্ঠ-নেত্রে এক বিন্দু জল আসিলেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি,—আমাদের সাধের দুর্গোৎসব সার্থক হইতে পারে।

দুর্গোৎসবে মাতৃর্গা সর্ব্বভক্ত-কল্পলতা।—

"দয়া নিদ্রা চ ক্ষুত্তৃপ্তিস্তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিপুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাহি দেবতাহি সা॥
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীচ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতীচ সা॥
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রহ্মণ্যশক্তি বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু চ।
তপস্বীনাং তপস্যা সা গৃহীণাং গৃহদেবতা॥
নৃপাণাং রাজলক্ষ্মীচ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধুনাং ত্রয়ী দুস্তরতারিণী॥"

আর কি চাই? ভবসিন্ধু পার হইয়া আর কিছু চাই কি? ভবসিন্ধু-পার যদি মুক্তি হয়, তবে আরো চাই। অমুক্ত প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে না। অতএব মুক্তিতেও সেই ভক্তি চাই, যাহাতে মুক্ত্যতীত কৃষ্ণধন পাই। ভবসিন্ধুর এ পারেই থাকি বা ও পারেই যাই, মায়ের কাছে জীবের জীবনসর্ব্বস্ব—সারসর্ব্বস্ব যথাসর্ব্বস্ব ধন কৃষ্ণধনকে চাই। আর যদি মাঝে ডুবি, যেন কৃষ্ণধন বুকে করিয়া ডুবি! দুর্গোৎসবে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জগন্মাতা যোগমায়া দুর্গার কাছে তঁাহারি মাধুর্য্যতত্ত্বরূপ—তাঁহারি প্রাণপুত্তলীস্বরূপ কৃষ্ণধনের চারু চরণ চাই। কুলকুণ্ডলিনী না কুলাইলে, সেই অকুলকাণ্ডারী গোকুলবিহারীকে কিরূপে পাইব? কৃষ্ণময়ী ব্রজগোপীও তাঁহার কাছেই কৃষ্ণধন পাইয়াছিলেন; পাইবার জন্য তাঁহার কাছেই চাহিয়াছিলেন,—

(ওমা) ত্রিপুরে-ত্রিপুরেশ্বরি-হেশিবে হেশুভঙ্করি!
'বিপদনাশিনী' বেদে বলে।
দেহি দুর্গে কৃষ্ণধন, হর বিচ্ছেদ-বেদন,
নিবেদন চরণকমলে॥ (দাশুরায়)

জনৈক—দুর্গোৎসবের প্রসাদভিখারী।

শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। অগ্রাহয়ণ ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ব্বাচন

-০:০:০-

১। বর্ত্তমান আদম সুমারীতে ঐ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত গাইট সাহেব প্রত্যেক জেলার প্রধানকার্য্যকারককে নিম্নলিখিত মর্ম্মে চিঠি লিখিয়াছেন ;—

— হিন্দুদিগের মতে বর্ত্তমান-সমাজে যে জাতি যেরূপ গৌরবান্বিত ও সম্মানিত; তাহাদিগকে সেই ভাবে আদম সুমারীর বিবরণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা আবশ্যক। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলার সুশিক্ষিত অধিবাসীদিগের দ্বারা এক একটী সমিতি গঠিত করিতে হইবে। এই সমিতির সভাপতি কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ কিংবা স্কুলের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর অথবা অন্য কোন সরকারী কার্য্যকারক হইলে ভাল হয়। যাঁহারা ঐ সমিতির সভ্যরূপে মনোনীত হইবেন, তাহাদিগের নাম আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। এবং তাঁহাদের মতামত ১৫ই জুলাইর মধ্যে আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রিজলী সাহেব বঙ্গদেশের জাতি বিভাগের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার একটী নকল এই সাথে পাঠান যাইতেছে। এই তালিকায় যে জাতিকে যে স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, হয়ত কোন জেলাতে সেই জাতি তদপেক্ষা উচ্চতর বা নিম্নতর গৌরব ও সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন। যদি সেরূপ কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। ঐ তালিকায় যে যে কারণে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন-স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইলে তাহারও কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। রিজলী সাহেবের বিবরণীতে নিম্নলিখিত জাতিদিগের কোন উল্লেখ নাই। উপযুক্ত স্থানে উহাদিগকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গালার বক্তেলিয়া, ভড়, ভাটিয়া জাতি। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয়-দেশের চকমা জাতি; ভাট বা চারণ জাতি। চাষা ধোপা ও চষাত জাতি। উত্তর বঙ্গের দেশী, কোহ ও রাজবংশী জাতি। উত্তর পূর্ব্ববঙ্গের দোয়াই ও হাইজঙ্গ জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের গাঁড়ার, কাচারু জাতি। রঙ্গপুর ও কুচবিহারের কলিতা জাতি। কাণ জাতি। পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গের করঙ্গ জাতি। উত্তরবঙ্গের খান জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের কোচমণ্ডি জাতি। পশ্চিম বঙ্গের কোনিয়া জাতি। মধ্য বঙ্গের কোটাল জাতি। কোচবিহারের অধিবাসী কুরিসাজান জাতি। পশ্চিমবঙ্গের লেট জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের লোহাইট কুরী জাতি। দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গের মঘ জাতি। উত্তরবঙ্গের মেচ জাতি। কুচবিহারের মোরাঙ্গিয়া জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের নর বা নট জাতি। উত্তর বঙ্গের পালিয় জাতি। মধ্য বঙ্গের পুরো জাতি। মেদিনীপুরের রাজু জাতি। রংরেজ জাতি। বাঁকুড়ার সামন্ত জাতি। রাজসাহী ও দিনাজপুরের সাঁওতাল জাতি। মেদিনীপুরের শিয়ালগির ও শুকলি জাতি। ঢাকার সূর্য্যবংশী জাতি। বাঁকুড়ার তেলিঙ্গা জাতি। পার্ব্বতীয় ত্রিপুরার ত্রিপুরা জাতি।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা শূদ্র ও তাহাদিগের নিম্নস্থ জাতিদের সামাজিক-পদ গৌরব বিচার করিতে হইবে:—

(১) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের পৌরহিত্য করে কি না?

(২) ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের জল ব্যবহার করে কি না?

(৩) তাহাদের নিকট হইতে ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজল গ্রহণ করে কি না?

(৪) তাহাদের পৌরহিত্য করায় ব্রাহ্মণেরা সমাজে পতিত হয় কি না?

(৫) তাহাদের নিকট হইতে উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতিরা অপক্ব খাদ্য দ্রব্য লয় কি না?

(৬) উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতিরা তাহাদের নিকট হইতে পক্ব খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে কি না?

(৭) গ্রামস্থ-পরামাণিক তাহাদের ক্ষৌরকার্য্য করে কি না?

(৮) গ্রামস্থ রজকে তাহাদের কার্য্য করে কি না?

(৯) গ্রাম্য-কূপ হইতে তাহারা জল উঠাইয়া লইতে পারে কি না?

(১০) তাহাদের স্পর্শে অপবিত্র হইতে হয় কি না?

(১১) তাহারা গোমাংসাদি খায় কি না?

বঙ্গদেশের বিভিন্ন-জাতির শ্রেণী-বিভাগ।

১। বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে।

যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশাখাদিগের পৌরহিত্য করেন, তাঁহারা অশূদ্র-যাজী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কতকটা সমাজে ম্লান হইয়াছেন,

যাঁহারা পাচক, মষ্টান্ন-প্রস্তুতকারী, অথবা পূজক, তাঁহারা যদিও জাতিচ্যুত হন নাই, তথাপি সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মুসলমানদিগের রন্ধন করা খাদ্য-দ্রব্যের আঘ্রাণ লইয়াছিলেন বলিয়া পিরালী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত আছেন। নবশাখাদিগের নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিদিগের পৌরহিত্য যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকে বর্ণবিপ্র বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতিরা তাঁহাদের জল ব্যবহার করে না। শবদাহনের সময় যে ব্রাহ্মণেরা কার্য্য করে তাহারা ও অগ্রদানী এবং আচার্য্য ব্রাহ্মণগণও পতিত। ভাট ব্রাহ্মণগণও ঐ শ্রেণী-ভুক্ত।

২। নিম্নলিখিত জাতিরা নবশাখা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রাজপুত—

ক্ষত্রী—

বৈশ্য—বৈশ্য বঙ্গদেশে নাই। কিন্তু উত্তর ভারত হইতে আগত আগরওয়াল জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়।

বৈদ্য—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী জাতি। পূর্ব্ব বঙ্গের বৈদ্যেরা কায়স্থদিগের সহিত বিবাহাদি কার্য্য করায় হেয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন।

কায়স্থ—লিপিকর জাতি।

আগরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়—চাষ ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জাতি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় উপবীত ধারণ করে।

৩। নবশাখা বা সৎশূদ্র। ইহাদিগের জল সকলে ব্যবহার করে। ভাল ব্রাহ্মণে ইহাদের পুরোহিতের কাজ করে এবং গ্রাম্য-নরসুন্দরে ইহাদের ক্ষৌর-কার্য্য করে। বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কাঁশারি, মেদিনীপুরের কৃষি ব্যবসায়ী কাষ্ঠ জাতি, কুম্ভকার, কুরি, মধুনাপিত, মালাকর, মোদক, পরামাণিক, সদ্গোপ, পাতিয়াল, শাঁখারি, পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্র জাতি, তাম্বুলী, তাঁতি, তেলি ও তিলি।

৪। নিম্নলিখিত জাতিদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পতিত, কিন্তু ইহাদিগের জল সকলে ব্যবহার করে।

গোপ বা গোয়ালা—পাবনা জেলার গোয়ালের ব্রাহ্মণ পতিত নহে। কিন্তু যে গোয়ালারা গোরু রাখে, তাহাদের জল ব্যবহৃত হয় না। চাষী, কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য)

৫। উক্ত জাতি অপেক্ষা নিম্নলিখিত জাতি হীন বটে, কিন্তু ইহাদের জল ব্যবহৃত হয়, ভুইয়া, বৈষ্ণব।

৬। জুগী—শব কবর দেয় এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিও ব্রাহ্মণের সাহায্য না লইয়া নিজেরাই করে।

৭। সুবর্ণবণিক—বৈশ্য বলিয়া দাবী করে।

৮। স্বর্ণকার—স্বর্ণ চুরি করার দরুণ পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে

৯। সূত্রধর।

১০। কলু, শুড়ি বা সাহা, কাপালি, পূর্ব্ববঙ্গের কর্ণি জাতি, শুকলী, চাষা ধোপা, ধোপা কোন কোন স্থানে ইহাদের জল ব্যবহৃত হয়, ধোপা, ভাস্কর করালি।

বঙ্গদেশের আদমসুমারীর কমিশনার

সাহেবের প্রশ্নোত্তরে কলিকাতা-সমিতি নিম্নলিখিত-অভিমত দিয়াছেন :—বিভিন্ন জাতির শ্রেণী বিভাগ করিতে এই সমিতির কোনরূপ ক্ষমতা না থাকায় ও হিন্দুদিগের সাধারণ-মতে বিভিন্ন-জাতির শ্রেণী বিভাগ কিরূপ প্রচলিত আছে ; কেবল মাত্র তাহাই নিরূপণ করার ভার এই সমিতির প্রতি অর্পিত থাকায় এবং এতদ্বিষয়ে নানারূপ মতের ও ব্যবহারের পার্থক্য দৃষ্ট হওয়ায়, আবহমান কাল প্রচলিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র—এইরূপ শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে এই সমিতি আর কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

গাইট সাহেবের এই চিঠিতে বঙ্গদেশের অনেক জাতির মধ্যে বিষম-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, যে সকল জাতি এতকাল পরস্পর সৌহার্দভাবে বাস করিতেছিল, এখন তাহারা এই জাতি বিভাগ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে। যেখানে পূর্ব্বে বন্ধুতা ছিল, এখন সেখানে ঘোর শত্রুতা চলিতেছে। এমন কি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্বন্ধে নানারূপ বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। বঙ্গদেশের দুইটী প্রধান জাতি, কায়স্থ ও বৈদ্যকে, এ বিষয়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত দেখা যাইতেছে। বৈদ্যেরা এইটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি। সুতরাং তাঁহারা বৈশ্য শ্রেণী ভুক্ত এবং তাহাদের মতে কায়স্থেরা শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত বিধায়, তাঁহারা কায়স্থদিগের অপেক্ষা জাতিতে বড়। অন্যপক্ষে, কায়স্থেরা এইটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত বিধায় বৈদ্য অপেক্ষা জাতিতে শ্রেষ্ঠ। বঙ্গদেশের বহির্ভাগে ক্ষত্রী ও রাজপুতদিগের মধ্যেও ঐরূপ বিবাদ চলিতেছে। ক্ষত্রীরা বলিতেছেন যে, তাঁহারা প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত এবং রাজপুতেরা অনার্য্য জাতি। অন্যপক্ষে, রাজপুতেরা নিজদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি এবং ক্ষত্রীদিগকে শঙ্কর জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কায়স্থ, বৈদ্য ও ক্ষত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এ সম্বন্ধে সভা সমিতিও করিতেছেন। বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজে যেরূপ ভাবে বর্ণভেদ প্রচলিত আছে, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত বলা যায় না। এবং উহাই হিন্দু জাতির পতনের কারণ, বেদ-বিদ্যা-বিশারদ-পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বৈদিককালে কোনরূপ বর্ণ-ভেদ প্রথা ছিল না। অধ্যাপক ওয়েবার সাহেব বলেন যে, সে সময়ে কোন বর্ণ-বিভাগ ছিল না। সমস্ত লোক একই জাতি এবং একই বিশ নামে অভিহিত হইত। অধ্যাপক মোক্ষমুলার বলেন যে "মনুসংহিতায় যেরূপ বিভিন্ন জাতির উল্লেখ দেখা যায় এবং বর্ত্তমান সমাজে যেরূপ প্রচলিত দেখা যায়, বাস্তবিক বৈদিকসময়ে সেরূপ কোন জাতি বিভাগছিলনা। বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ্। ঋগ্বেদে উহা কোন স্থলে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অনার্য্যদিগের গাত্রবর্ণের সহিত আর্য্যদিগের গাত্রবর্ণের পার্থক্য সূচনা করিবার জন্য ঋগ্বেদে "আর্য্যবর্ণ" এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। [ঋগ্বেদ ৩। ৩৪ ৯] ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ এই শব্দে কোন জাতি বিশেষকে বুঝাইত না, কেবল ঋক্‌রচনা-কারীকেই বুঝাইত। [ঋগ্বেদ ৭.৬৪, ৯৩

৭। ৮৯] বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় শব্দে সৈনিক জাতিকে বুঝায়, কিন্তু ঋগ্‌বেদে ঐ শব্দে বলবান বুঝাইত এবং উহা দেবতাদিগের প্রতিই ব্যবহৃত হইত। [৭। ১১, ৬] বিশ এই শব্দে জন সাধারণকে বুঝাইত [৮। ৩৫, ১৮।] ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে কেবল শূদ্র এই কথাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূক্তটী অন্য তিন বেদেও অবিকল উদ্ধৃত হওয়ায়, কেবল সেই সেই স্থলেই শূদ্র কথাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যজুর্ব্বেদের পুরুষ মেধ-অধ্যায়ে বধ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের নামের ন্যায় শূদ্রের নামের ও উল্লেখ আছে।

পঞ্চনদ-দেশই আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। তথায় শতদ্রু (সাটলেজ,) পরুষ্ণী (রাভি), অশিক্লী (চিনাব), বিতস্তা (ঝিলাম) এবং অর্জিকীয়া (বিয়াস) এই পাঁচটী নদী ছিল। [১০। ৭৫] সিন্ধু ও সরস্বতী নদী লইয়া কখন কখন সাতটী নদীর উল্লেখ দেখা যায়। [ঋগ্‌বেদ ৭। ৩৬] আর্য্যগণ পাঁচটী নদীর ধারে অধিনিবাস স্থাপন পূর্ব্বক পাঁচটী পৃথক জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পঞ্চ জন বলা হইত। যদু, তুর্ব্বশ, অনু, দ্রুহ্যু, এবং পুরু এই পাঁচটী জাতি।

যাস্কমুনি বৈয়াকরণ পাণিনীর একশতাব্দী পূর্ব্বে এবং খৃষ্টের নয়শতবৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকৃত বৈদিক অভিধান নিরুক্ত শাস্ত্রে মনুষ্য শব্দের নিম্ন-লিখিত প্রতি শব্দগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য, নর, ধব, জন্তু, বিশ, ক্ষিতি, কৃষ্টি, নহুষ, হরি, মর্য্য, মর্ত্ত্য, মর্ত্ত, ব্রাত, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, আয়ু, যদু, অনু, পুরু, জগৎ তস্থু পঞ্চজন, বিবস্বৎ, পৃতন।

পরবর্ত্তী পৌরাণিকেরা ঐ পঞ্চজাতিকে যযাতির পুত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একজন অসভ্য ম্লেচ্ছজাতির রাজা বলিয়া খ্যাত আছেন। হিন্দু মাত্রেই জানেন যে, যযাতির পুত্রদিগের মধ্যে কেবল পুরুই রাজত্ব পাইয়াছিলেন। অন্যান্য পুত্রগণ পিতার জরা ভার নিজেরা লইতে অস্বীকার করায় অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে পুরুজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিলেন। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৯, ১০৮ ও ১৩০ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশতি সূক্তে সমস্ত জাতির নাম পাওয়া যায়। প্রথম-মণ্ডলের ৭ ও ১৭৬ সূক্তে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে আর্য্যদিগের প্রথম ও প্রধান উপনিবেশ সেই পাঁচটী স্থানের, "পঞ্চ-ক্ষিতির," উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ-মণ্ডলের ১১ ও ৫৪ সূক্তে এবং অষ্টম মণ্ডলে ৩২ সূক্তে ও নবম-মণ্ডলের ৫৫ ও অন্যান্য সূক্তে "পঞ্চজনের" উল্লেখ আছে। তাহাদিগকে "পঞ্চকৃষ্টি" বা পাঁচটী কৃষি-ব্যবসায়ী জাতিও বলা হইয়া থাকে। [২। ২-১০; ৪। ৩৮-১০] পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা এই বৈদিক কিম্বদন্তী পরিহার-পূর্ব্বক "পঞ্চ-জনের" দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচটী জাতির উল্লেখ বুঝিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের মতে যেন এই পাঁচটী জাতিতেই সমস্ত মানব জাতি বিভক্ত ছিল।

ঋগ্‌বেদে দশ সহস্র শ্লোক আছে। বড়

বড় পণ্ডিতদিগের মতে উহা সাত আট শত বৎসর ধরিয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে লোকের আচার, ব্যবহার, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নিয়মপদ্ধতি, পারিবারিক রীতিনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও পরস্পর যুদ্ধ এবং দার্শনিক ও জ্যোতিষিক বিষয়ক-প্রস্তাবনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে, কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উহাতে কোন বর্ণভেদের উল্লেখ নাই।

অন্য পক্ষে, সে সময়ে যে কোন বর্ণভেদ ছিল না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। নবম-মণ্ডলের ১১২ সূক্তে শিশুঋষি সোম পবমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "দেখ আমি স্তোত্র রচনা করি, আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা পাথরের উপর শস্য চূর্ণ করেন; আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিয়া থাকি।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের সময়ে জাতি ভেদ ছিল না। কারণ, তাহা হইলে পিতা চিকিৎসক, মাতা শস্যচূর্ণকারিণী এবং নিজে স্তোত্র রচয়িতা এরূপ কখন হইতে পারিতনা।

পৌরাণিক গ্রন্থকারগণ বলেন যে, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে সাধনা বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বেদে আমরা এরূপ কোন কথাই দেখিতে পাই না। বাস্তবিক বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও ছিলেন না, ক্ষত্রিয়ও ছিলেন না। তিনি একজন বৈদিক ঋষি মাত্র ছিলেন এবং বৈদিক ঋষিদিগের ন্যায় কখন পুরোহিত, কখন সৈনিক, কখন গৃহস্থের কাজও আবশ্যক মত করিতেন।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এইদুই পরিবারেরমধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ইহা হইতে পৌরাণিক-লেখকগণ নানারূপ গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। যাগ, যজ্ঞ, স্তোত্র রচনা করিয়াই ঋষিগণ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। তাঁহারা কোন স্বতন্ত্র-সমাজ ভুক্ত ছিলেন না। সমগ্র ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় যে, ঋষিগণ, ধন, জন, গো, অশ্ব, প্রভৃতির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এখন দেখা যাউক পুরুষ সূক্তে—এ সম্বন্ধে কি আছে! ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত।

১। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

অনন্ত শির (অবয়ব) যুক্ত, অনন্ত চক্ষু (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যুক্ত, অনন্ত পাদ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) যুক্ত বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, এবং তিনি মানবের নাভি প্রদেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিতস্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

২। পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

এই বিশ্ব জগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে, তৎসমস্তই এই পুরুষ, ইনি মোক্ষের অধিপতি এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎজীব, যাহা অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, ইনি তৎসমুদয়ের অধিপতি। অথবা যে পুরুষ ভোগ্যান্নের দ্বারা কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া জগদবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৩। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

এই সমুদায় তাঁহার মহিমা, ইহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। প্রকৃত-পুরুষ ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। বিশ্বস্থ-তাবৎ পদার্থ পরম-পুরুষের অংশ মাত্র কিন্তু ইহার ত্রিপাদ-স্বরূপ অমৃত অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকব্যাপী বিনাশ রহিত স্বরূপ স্বীয়-রূপেই অবস্থিতি করিতেছেন।

৪। ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥

ত্রিপাদ-পুরুষ অজ্ঞানময়-সংসারের বহির্ভাগে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার অংশ সৃষ্টিস্থিতি সংহার হেতুক মায়াজগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। মায়াজগতে আগমনান্তর তিনি বহুবিধরূপ ধারণ করিয়া চেতনাচেতন তাবৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

৫। তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ॥

সেই নিরাকার পরম-পুরুষ হইতে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল এবং সেই বিরাট দেহের উপরে অর্থাৎ বিরাট-দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জন্মিলেন। সর্ব্ববেদান্তবেদ্য পরমাত্মা মায়া দ্বারা বিরাট-দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন, তখন তিনি দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধ-রূপ ধারণ করিলেন এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্টি হইল।

৬। যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দেবতারা যখন এই দেহাভিমানী পুরুষকে হবিস্বরূপ করিয়া সেই পরম পুরুষের মানস যজ্ঞ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেহাভিমানী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার আদি পুরুষের আরাধনা করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত ঋতু তাঁহাদের পূজোপকরণের আজ্য স্বরূপ, গ্রীষ্ম কাষ্ঠস্বরূপ এবং শরৎ হবি স্বরূপ হইয়াছিল।

৭। তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥

সৃষ্টি সাধনসমর্থ এবং তত্ত্বজ্ঞানী দেবতারা সেই অগ্রজাত দেহাভিমানী যজ্ঞীয় পুরুষকে মানস-যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন।

৮। তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ যে॥

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে দধিযুক্ত-আজ্য সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই পরম পুরুষ ঐ যজ্ঞ হইতে গ্রাম্য, বন্য ও বায়ব্য পশু সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৯। তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্ মন্ত্র এবং সামমন্ত্র গায়ত্র্যাদি ছন্দ এবং যজুর্ম্মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

১০। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাত অজাবয়ঃ॥

সেই যজ্ঞ হইতে ঘোটক, অন্যান্য দন্ত-পংক্তিধারী পশুগণ, গাভী, ছাগ ও মেষগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

১১। যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥

দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল? কোন্ অংশকে মুখ? কোন্ অংশকে বাহু, কোন্ অংশকে উরু, কোন্ অংশকে পদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল?

১২। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে, ক্ষত্রিয়কে বাহু, বৈশ্যকে উরু এবং শূদ্রকে পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৩। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥

চন্দ্র মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ চন্দ্রকে বিরাট পুরুষের মনস্বরূপ, সূর্য্যকে চক্ষুস্বরূপ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে মুখস্বরূপ এবং বায়ুকে প্রাণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৪। নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥

নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে বিরাট পুরুষের নাভি-স্বরূপ, দ্যৌঃ অর্থাৎ স্বর্গকে মস্তকস্বরূপ, ভূমিকে পদস্বরূপ, ভুবন সকল এবং দিক সকলকে কর্ণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৫। সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥

দেবতারা যখন যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ পশুকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মানসিক যজ্ঞ সম্পাদনকালে দেহাভিমানী পুরুষ দেবকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, তখন গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দকে ঐ যজ্ঞের সাতটী পরিধি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল এবং দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্যকে ঐ যজ্ঞের কাষ্ঠস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

১৬। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥

দেবতারা যে মানস যজ্ঞ করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, উহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূর্ব্বে বিরাট পুরুষকে উপাধি-স্বরূপ করিয়া দেবতারা যে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা উপাসকেরা সর্ব্বদাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কোলব্রুক সাহেব বলেন যে, এই সূক্তটী ঋগ্বেদের সময়ের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। ওয়েবার ও মোক্ষমূলর সাহেব

এবং অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই সূক্তটী অপেক্ষা কৃত আধুনিক। আধুনিক হউক বা না হউক, এমন কি মহীধর ও সায়ণাদি প্রাচীন ভাষ্যকারগণও এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই সূক্তটী একটীরূপক মাত্র। দ্বাদশসূক্তে চারি জাতির উল্লেখ আছে। ঐ সূক্ত-রচয়িতা তখনকার লোকদিগকে বিভিন্ন ব্যবসানুযায়ী চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে বিরাট পুরুষের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। নবম-সূক্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঋক, সাম, এবং যজুর্ব্বেদের পরে জাতি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যজ্ঞাদির সময়ে দেবতাদিগের স্তোত্র পাঠ করার অধিকার কেবল পুরোহিতদিগের ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণকে মহাপুরুষের মুখস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য তরবারী এবং শূল ধারণ করার অধিকার কেবল ক্ষত্রিয়দিগের ছিল বলিয়া রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগকে পুরুষের বাহুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। বৈশ্যকে উরুস্বরূপ বলা হইয়াছে,—কারণ, উরুদেশই শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা বল-সম্পন্ন অঙ্গ এবং বৈশ্যই কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিধায় সমাজের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিল। শূদ্রকে পদ স্বরূপ বলা হইয়াছে, কারণ, তাহারা বিশেষ পরিশ্রমী ছিল; সমস্ত শরীর যেরূপ পদদ্বয়ের উপর থাকে, সেইরূপ সমস্ত সমাজও কৃষক ও শ্রমজীবীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এই সূক্তে যে জাতি-প্রথা-সৃষ্টির কথা কিছু বলা হইতেছে না, তাহার প্রমাণ ইহাতেই আছে। দ্বাদশঋকে বলা হইতেছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

প্রশ্ন করা হইতেছে যে, দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল? কোন্ অংশকে মুখ, কোন্ অংশকে বাহু, কোন্ অংশকে উরু, কোন্ অংশকে পদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে যে,— ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে, ক্ষত্রিয়কে বাহুস্বরূপ, বৈশ্যকে উরুস্বরূপ, এবং শূদ্রকে পদস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা হইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং অলঙ্কারের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছে বলিলে, ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, "ব্রাহ্মণো মুখমাসীৎ" শব্দের অর্থ ইহা নয় যে, ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণকে মুখ স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। মুখ এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই এক বচনান্তপদ। এরূপ তর্ক হইতে পারে যে, উভয় শব্দই কর্ত্তৃকারক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধে রাজন্য এক বচন এবং বাহু দ্বিবচন সুতরাং এক বচনান্ত কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না; রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অতএব "রাজন্যঃ বাহূ কৃতঃ" অর্থাৎ রাজন্যকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। সুতরাং বাহুর অস্তিত্বের পূর্ব্বে

রাজন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই রূপে "উরূ তদস্য যদ্বৈশ্য" ইহাতে উরুর অস্তিত্বের পূর্ব্বে বৈশ্যের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। কিন্তু শূদ্র সম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে 'পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাঁহার মুখ, বাহু ও উরু স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন এই কথা বলার পর, 'অজায়ত' শব্দ থাকা সত্বেও, "পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" ইহার অর্থ শূদ্র তাঁহার পদদ্বয় স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন, এইরূপ করাই যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত, এবং ইহাই প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাষ্যকারগণেরই অভিমত।

আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে পুরুষ সূক্ত হইতে জাতি প্রথার সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র পাওয়া যায় যে, আর্য্যদিগকে যখন চারিটী শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোচ্চ স্থান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তৎপরবর্ত্তী স্থান এবং শূদ্রকে সমাজে সর্ব্বনিম্ন স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই সূক্ত হইতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই চারি জাতিরই পূর্ব্বপুরুষ একই ছিল। মহাভারতে পাওয়া যায় যে, এই চারি জাতিরই ভাষা এক ছিল।

ইত্যেতে চত্বারোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব-অধ্যায়-১৮৮,১৮৯।

এই স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, পুরুষ সূক্তে বর্ণ বা জাতি কথার কোন উল্লেখ নাই। আমরা অবগত আছি যে, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সমাজ ও ভাষা পৃথক ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভাষা একই ছিল। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে স্বতন্ত্র বংশোদ্ভূত হইত, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা কখনও এক হইতে পারিত না। বেদে শূদ্রকে কখন অনার্য্য বলা হয় নাই। অধ্যাপক মোক্ষ মূলর বলেন যে, শূদ্র যে আর্য্যদিগের হইতে পৃথক জাতি ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বরঞ্চ হিন্দু শাস্ত্র হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কালে চারি জাতিই একই জাতি ছিল।

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব অধ্যায় ১৮৮, ১৮৯।

মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে, সর্ব্ব প্রকার খাদ্য খায় এবং সর্ব্ব প্রকার কার্য্যই করে এবং অশুচি, সে শূদ্র।

সর্ব্বভক্ষ্যরতি র্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃস বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

এস্থলে 'ত্যক্তবেদঃ,' অর্থাৎ যে বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে, এই কথাটীর উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে বলিলে বেদাধ্যয়নে অনধিকারী এরূপ কোন কথা বলা হয় না। ধর্ম্মকার্য্য ও যজ্ঞক্রিয়া করার পক্ষে যে শূদ্রদিগের কোন বাধা ছিল না, তাহাও মহাভারতে দৃষ্ট হয়।

সমস্ত লোককে যখন চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তখনও তাহারা একই জাতির ন্যায় বাস করিত। যে শ্রেণীর লোকে যেরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিত, তদনুসারে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্র বলা হইত, ঐ সমুদয় শব্দে এখনকার মত কোন জাতি বিশেষকে বুঝাইত না, কেবল পুরোহিত, সৈনিক, বাণিজ্য ও কৃষিব্যবসায়ী এবং অন্যান্য নীচ কার্য্যকারী লোকদিগকে বুঝাইত।

অনেকের মনে এরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা আছে যে, শাস্ত্রে যখন শূদ্রদিগকে কালবর্ণ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে, তখন আর্য্যজাতিরও শূদ্রদিগের মধ্যে বংশ গত পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাহাদের এটী মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কে আর্য্যজাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহারাও বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া উক্ত আছে। ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ, বৈশ্যেরা গৌর-বর্ণ ও শূদ্রেরা কালবর্ণ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া মহাভারতে উক্ত আছে। মহাভারতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই চারিটী জাতি আদিতে একই ছিল।

যেরূপ শ্বেতকায় জাতিদিগের মধ্যে বর্ণের অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই-রূপ লাল, কালো ও গৌরবর্ণের জাতিদিগের মধ্যেও সেই সেই বর্ণের অনেক ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। ইউরোপ বাসীরা সাধারণতঃ শ্বেতকায় বিশিষ্ট কিন্তু তাহাদের মধ্যেও শ্বেতবর্ণের অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক ও পুরোহিত প্রভৃতির ন্যায় যে সকল লোক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের মুখ সাধারণতঃ শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট হয়। আবার সৈনিক পুরুষ গণ সর্ব্বদা যুদ্ধ ও মৃগয়া কার্য্যে উত্তেজিত থাকায় তাহাদের মুখশ্রী রক্তিম দৃষ্ট হয়, যেন তাহাতে প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, তাহারা সকল প্রকার সাহসিক কার্য্য করিতেই প্রস্তুত। ব্যবসায়-জীবী সর্ব্বদা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে বলিয়া তাহার গৌরবর্ণ মুখ এবং ওষ্ঠ দেখিয়া বুঝা যায় যে, পার্থিব সমস্ত সুখকর দ্রব্য তাহার আয়ত্বাধীন আছে। আবার হলধারীর রৌদ্রতপ্ত-কৃষ্ণবর্ণ মুখ দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাহার জীবন দুঃখ পরিপূর্ণ। কি শ্বেতকায় ইউ-রোপবাসী, কি লোহিতকায় আদিম আমেরিকাবাসী, কি গৌর বর্ণ চীনবাসী, কি কৃষ্ণ বর্ণ নিগ্রোজাতি, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব জাতি সম্বন্ধেই এই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ, বৈশ্যগণ পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ।

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিত স্তথা॥

মহাভারত-ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদ শান্তিপর্ব্ব-
১৮৮-১৮৯ অধ্যায়।

এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, শ্বেত-বর্ণ সত্ত্বগুণের, রক্তবর্ণ রজোগুণের এবং কৃষ্ণ-বর্ণ তমোগুণের পরিচায়ক।

আর্য্যগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসানুসারী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পরও, অন্য শ্রেণীর ব্যবসা অবলম্বন ও সেই দলভুক্ত বলিয়া পরিচিত হওয়ার পক্ষে, বিশেষ কোন বাধা ছিল না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, আমি লোকদিগকে গুণ ও কর্ম্মানুসারে চারি বর্ণে বিভাগ করিয়াছি।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, যাঁহা-দিগের সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ,

যাঁহাদিগের রজোগুণ প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহাদিগের তমোগুণ প্রধান, তাহারা শূদ্র। যাহাতে এক সময়ে তমোগুণ প্রবল আছে, তাহাতে অন্য সময়ে সত্ত্বগুণাধিক্য হইতে পারে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বংভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৪অ-১০।

অর্থাৎ প্রত্যেক গুণই অন্য গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া স্বয়ং প্রবল হইতে পারে। আবার মহাভারতে দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে কোন জাতি প্রথা ছিল না, পরে মনুষ্যগণের বিভিন্ন কার্য্যানুসারে তাহারা বিভিন্ন জাতিতেবিভক্ত হইয়াছিল।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বং হি সৃষ্টং কর্ম্মভি র্ব্বর্ণতাং গতম্।
মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮-১৮৯ অধ্যায়।

পরে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কি প্রকার হয়? উত্তর—যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং বেদাধ্যয়নশীল তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি সাহসী এবং সর্ব্বগুণান্বিত তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য অথবা পশুপালন এবং বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি বৈশ্য। এবং যিনি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অন্তর ও বাহিরেঅশুচি তিনিই শূদ্র। অতঃপরে আরও পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে :—

শূদ্রে চেত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

যদি শূদ্রবংশোদ্ভূত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তি শূদ্র নহে এবং যদি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, তবে সে ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ নহে।

যস্যয়া লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং
যদান্যত্রাপি দৃশ্যতে তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ
শ্রীমৎভাগবৎ পুরাণম্।

কোন এক জাতির নির্দ্দিষ্ট গুণগুলি অন্য কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হইলেও তাহার বর্ণ তাহার গুণের দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
মনুসংহিতা।

যাহাদের জাতি কুল অপরিজ্ঞাত, তাহাদের কার্য্য দেখিয়াই তাহাদের জাতি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তুতে গচ্ছন্তি যুগেযুগে,
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।
মনুসংহিতা।

মানবগণ ইহজীবনে স্বীয়তপ ও বীর্য্য প্রভাবে বর্ণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পাইয়া থাকে।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
মনুসংহিতা।

কার্য্য গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া পড়ে।

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যোভবেদ্-গুণৈঃ।
মনুসংহিতা।

আর্য্যপুরুষ এবং অনার্য্যনারী হইতে উৎপন্ন সন্তান ও সদ্গুণ বশতঃ আর্য্য হইতে পারেন।

বর্ণান্তর গমন মুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্। গৌতম।

জাতির পরিবর্ত্তন গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে হইয়া থাকে।

অত্রিমুনি বলেন—যিনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যায়ন করেন এবং যিনি আসক্তি-বিহীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা অবলম্বনে যুদ্ধাদি কার্য্য করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়। যিনি বাণিজ্য, কৃষি বা গোপের কার্য্য করেন, তিনিই বৈশ্য। যিনি লবণ, মাংস, মধু ইত্যাদি বিক্রয় করেন, তিনিই শূদ্র। যে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য বিহীন, মূর্খ ও সর্ব্ব-জীবের প্রতি নির্দ্দয়, সে চণ্ডাল।

ঘৃৎসমদ পুত্র শুনকের পুত্র শৌনক ঋষি বিভিন্ন কার্য্যানুসারে নিজের সন্তান দিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে যে বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ এবং হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুত্রো ঘৃৎসমদস্যচ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ
এতস্য বংশ সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভিদ্বিজাঃ
বায়ুপুরাণম্।

ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তাভূৎ
বিষ্ণুপুরাণম্।

পুত্রো ঘৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
হরিবংশম্।

এমন কি যখন শ্রেণী বিভাগ মাত্র হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত জাতি ভেদের সৃষ্টি হইল, তখন কোন উচ্চ জাতি হইতে নীচ জাতিতে অবনতি এবং কোন নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নতি হইবার নিয়ম ও প্রচলিত ছিল। মহাভারত ও শ্রীমৎভাগবৎ হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশ সকলে ইহারই প্রমাণ রহিয়াছে।

এখানে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষে আর্য্য জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতি ও ছিল। তাহাদিগকে অনার্য্য জাতি বলা হইত। কিন্তু অনার্য্য শব্দে তখন কেবল যাহারা আর্য্য নয়, তাহাদিগকেই বুঝাইত; তদ্ব্যতীত উহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কোনরূপ বংশের নীচত্বাদি বুঝাইত না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির গাত্র বর্ণের সহিত আর্য্যদিগের গাত্র বর্ণের তুলনা করিবার সময়েই কেবল বর্ণ অর্থাৎ রঙ্ এই কথাটীর প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ অনেক সময়ে কৃষ্ণকায় জাতি বিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন অনার্য্য জাতির বিবরণে দেখা যায় যে, তাহারা প্রবল পরাক্রান্তশালী লোক ছিল। তাহাদের সুন্দর নগর, সুপ্রশস্ত প্রমোদ কানন, মনোহর অট্টালিকা, লৌহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি লইয়া তাহাদিগের সহিত যে, আর্য্য জাতির বিবাদ হইয়াছিল, সভ্যতায় তাহারা সেই আর্য্য জাতির সমকক্ষ ছিল। আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে অনেক সময়ে বিবাহাদিও প্রচলিত ছিল—জরৎকারু ঋষি অনার্য্য বাসুকি রাজার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আস্তিকঋষি ইহাদের সন্তান। তিনিই আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে

বন্ধুতা স্থাপন করিয়া ছিলেন। আমরা সকলেই জানি যে, পরাশর ঋষি, শান্তনু রাজা, ভীম ও অর্জ্জুন ইহারা সকলেই অনার্য্য-কন্যাদিগের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত অনার্য্য জাতিই কৃষ্ণবর্ণ ছিলনা। য়িহুদী, আরবদেশবাসী, তিব্বত দেশ বাসী, চীন দেশবাসীরা, জাপান দেশ বাসী এবং ব্রহ্মদেশ বাসীরা সকলেই অনার্য্য জাতি, কিন্তু তাহাদের গাত্রবর্ণ কাল নহে। অনার্য্য-জাতির মধ্যে কতকগুলি অশিক্ষিত জাতি ছিল। আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বীয় সমাজে লইবার সময় তাহাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ইহা হইতেই জাতি বিভাগের প্রথম সৃষ্টি হইল।

(ক্রমশঃ)

আহার।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

দ্বিতীয়-অধ্যায়।

"হিন্দু জাতির রসায়ন।"

দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্রই প্রশস্ত। আয়ুর্বেদে এই বিষয়ের বিবর-আলোচনা আছে। দ্রব্যাদির গুণাবধারণ করিবার পূর্ব্বে দেখাকর্ত্তব্য যে, কোন কালে হিন্দুদিগের রসায়ন ছিল কি না। কিন্তু এই বিষয়ের প্রমাণাদি দিতে গেলে বর্ত্তমান-প্রবন্ধের কলেবর অযথা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে। তাই সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব।

রসায়ন না জানিলে চিকিৎসা হইতে পারে না। কোন কোন দ্রব্যের কি কি গুণ আছে, কোন দ্রব্যের সহিত তাহার কিরূপ সংযোগ হয়, অন্য দ্রব্য সংযোগে দ্রব্য বিশেষের নিজ গুণের কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে, এই সকল জানা নিতান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করা অসম্ভব। সুতরাং ভৈষজ্য-তত্ত্বের এবং রসায়নের আলোচনা যে বহু-দিন হইতেই ভারতবর্ষে আছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রসায়নের অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য চরক ও সুশ্রুত হইতে ও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। তবে বর্ত্তমান যুগে "রসায়ন" (chemistry) বলিলে আমরা যাহা বুঝি "হিন্দু জাতির রসায়ন" তদ্রূপ ছিল কি না বলিতে পারিনা। রসায়নের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তেমন কোন আগার (Loboratory) প্রাচীন ভারতে ছিলনা। কিন্তু হিন্দুদিগের অনেক পুরাতন-গ্রন্থে নানাবিধ যন্ত্রের ও পাকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সকল যন্ত্র কেবল রসায়নেই ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি পুস্তকের ও যন্ত্রের নাম দিতেছি—

(১) বরাহমিহির কৃত "বৃহৎসংহিতার" ষষ্ঠবিংশতি অধ্যায়ের ষষ্ঠ হইতে নবম-শ্লোক পাঠ করিলেই তুলা যন্ত্রের বিবরণ জানা যাইবে।

(২) সুশ্রুতের ৩১ অধ্যায়ে মান (weights) সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

(৩) সংস্কৃত "রাজসুন্দর" গ্রন্থে 'পুট' বা চুল্লির (Furnative) বর্ণনা পাওয়া যায়।

যন্ত্রের নাম।

(১) কবচী যন্ত্র।
(২) দোলাযন্ত্র।
(৩) নর্ভ যন্ত্র।
(৪) হংসপাক যন্ত্র।
(৫) বিদ্যাধর যন্ত্র।
(৬) উর্দ্ধপাতন যন্ত্র।
(৭) বালুকা যন্ত্র।
(৮) ভূধর যন্ত্র।
(৯) পাতাল যন্ত্র।
(১০) তেজোযন্ত্র।
(১১) কচ্ছপ যন্ত্র।
(১২) জল যন্ত্র।
(১৩) গৌরী যন্ত্র।
(১৪) কপি যন্ত্র।
(১৫) মূলা যন্ত্র (crucibles)
(১৬) বারুণী যন্ত্র।
(১৭) তীর্য্যক্ পাতন যন্ত্র।
(Retast stand with cramps and rings)
(১৮), স্বেদন যন্ত্র (Steambath)
(১৯) ডমরু যন্ত্র।

চোঁয়াইবার যন্ত্র বা (Distilling affaratus.
(১) উর্দ্ধনালিকা যন্ত্র।
(২) তেজো যন্ত্র।
(৩) বক্র যন্ত্র।
(৪) নাড়িকা যন্ত্র।
(৫) বারুণী যন্ত্র।

উল্লিখিত যন্ত্র গুলির বিস্তৃত বর্ণনা দিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রের নাম শুনিলেই বেশ অনুমান করিতে পারা যায় যে, হিন্দু জাতির রসায়ন ছিল।

এতদ্ভিন্ন চরকে নানাবিধ রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তৈল ঘৃত, ধাতু ঘটিত ঔষধ অরিষ্ট ও আসবাদি প্রস্তুত করিবার কথা লিখিত আছে। হারিত সংহিতা এবং বাগ্ভটে (অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা) দ্রব্য গুণ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত এবং সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাগভট বা অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংহিতা উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের (পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি) চিকিৎসকগণের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক, ইহাই তাঁহাদিগের অমূল্য কণ্ঠহার।

"রসেন্দ্রসার সংগ্রহে" নানাবিধ শোধন মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। সেই সকল বর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু জাতির রসায়ন ছিল, তবে সে রসায়নের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ের রসায়নের মত এত উন্নত নহে। অল্-বেরুণীর ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থে পুরাতন ভারতের তাৎকালিক রসায়নের প্রকৃত অবস্থা লিখিত রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ প্রতিপদাদি তিথিতে সে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সেই নিষেধ বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে সেই

রসগুণ ও দ্রব্য গুণ।

সকল দ্রব্যের গুণাবধারণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু আর্য্য-ঋষিগণ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে রসবিজ্ঞান করিয়া গিয়াছেন, কি ঔষধ, কি খাদ্য দ্রব্য, সকলই রসগুণসম্পন্ন। রসগুণে এবং দ্রব্য-গুণে অনেক পার্থক্য আছে। মিশ্ররসাত্মক দ্রব্যের সংখ্যাই অধিক। অথচ রস স্বভাবতঃ অমিশ্র, যে দ্রব্যে একটি রস, তাহা অমিশ্র রসাত্মক, আর যাহাতে দুই বা ততোধিক রস আছে, তাহা মিশ্ররসাত্মক। অমিশ্র-রসাত্মক দ্রব্যের সংখ্যা অতিশয় অল্প। অমিশ্র রসাত্মক-দ্রব্য ও আবার ব্যবহারে এবং অন্য সংযোগ মিশ্ররসাত্মক হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্বীকার্য্য যে, দ্রব্যসকল রসের উপাদান হইলে ও দ্রব্যগুণ ও রস গুণের কার্য্যকারিতা শক্তি এক নহে, তাহা ও ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, জল হইতেই অম্লজান বা যবক্ষার জানের উৎপত্তি। তাই বলিয়া জলের যে কার্য্যকারিতা শক্তি আছে, অম্লজান বা যবক্ষার জানের তাহা নাই।

রস ছয় প্রকার—(১) মধুর। (২) লবণ, (৩) তিক্ত, (৪) কষায়, (৫ অম্ল এবং (৬) কটু। পৃথিবীতে যে সমস্ত দ্রব্য আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে এই ষড়রসের এক কি দুই, কি ততোধিক রসের লক্ষণ দেখা যায়। রস যখন ভিন্ন ভিন্ন তখন তাহাদিগের গুণাগুণও অবশ্য স্বতন্ত্র। 'দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণ করিবার অগ্রে ভিন্ন ভিন্ন রসের কি কি গুণ আছে, তাহা স্থির করা আবশ্যক।

মধুররস,—তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলকারক, কণ্ঠরোগ, উদাবর্ত্তরোগ, বায়ু, পিত্ত, এবং ব্রণ-নাশক। ইহা রসচালক, গুরু, স্নিগ্ধ, নেত্রহিতকর, শীতল, আয়ুর্বর্দ্ধক এবং রুচি কারক। *

অম্লরস ;—তৃপ্তিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, রসনোত্তেজক, রক্তকারক, রুচিকর, প্রীতিকর, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মাংসদ, পাকেলঘু, স্বাদে কটু এবং ব্রণাদির ক্লেদ বৃদ্ধি কারক। *

লবণরস ;—পাচক, উগ্র, বহ্নি উদ্দীপক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, স্রাবক, শুক্রকারক, এবং দৃষ্টিশক্তি ও ব্রণাদির ক্লেদরোগ বর্দ্ধক *

কটুরস :—অঙ্গের রুচিরতা বর্দ্ধক, জিহ্বা, আস্য, নেত্র এবং নাসিকার মলরেচক ইহা নাতি উষ্ণ, নাতি উগ্র এবং কণ্ডু, ক্রিমি, শুক্রও কফ-নাশক। কটুরস লঘুশোষক পাচক ও শ্লেষ্মনিবারক। *

---

* "মধুরঃ প্রীণনোবল্যোব্রুংহণোহনিলপিত্তহা।
রসায়নো গুরুঃ স্নিগ্ধ শ্চক্ষুষ্যঃ শীতলশ্চসঃ।
আয়ুষ্কৃদ্ব্রণহারুচ্যঃ কণ্ঠোদাবর্ত্ত নাশকঃ॥
স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

*"অম্লোরুচিকরোহৃদ্যঃ প্রীণনোবহ্নিবর্দ্ধনঃ।
বাতহারসনোদ্বেগী স্নিগ্ধোষ্ণো রক্তমাংসদঃ।
ক্লেদনস্তর্পণঃ পক্কা লঘুব্যাপী কটু-স্বাদঃ॥"
স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* "লবণঃক্লেদনস্তীক্ষ্ণঃপাচনোদ্দীপনো রসঃ।
*স্নিগ্ধোরুচিকরঃস্যন্দী দৃষ্টি শুক্রকরোগুরুঃ॥"
স্মৃতি আহ্নিকতত্ত্ব।

তিক্তরস ;—পিত্ত কফ, বমি, উদগার, বিষ, কুষ্ঠ, জ্বর, ক্রিমি এবং কণ্ডুরোগ-নাশক। ইহা বহ্নি-উদ্দীপক-পাচক, রুক্ষ এবং লঘু। *

কষায়রস ;—বায়ুস্তম্ভনকারক, শোষক, ব্রণ-সম্বন্ধীয়-বেদনা, কফ, এবং রক্ত পিত্ত নাশক। ইহা লঘুশীতল ও রুক্ষ। আবার শীতোষ্ণভেদে এই রস দ্বিবিধ। উষ্ণ-কষায়রস বীর্য্যবর্দ্ধক ও পিত্তকারক। ইহা অল্প পরিমাণে বায়ু এবং শ্লেষ্মা নাশ-করে। শীতল কষায়-রস পিত্তনাশক বাতকফাদি বর্দ্ধক এবং বল কারক।* সুশ্রুত সংহিতার "সূত্রস্থানের" "রসবিশেষ বিজ্ঞানীয়" শীর্ষক দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় পাঠ করিলেই রস সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞতব্য-বিষয় জানিতে পারা যাইবে। "আকাশ বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে যথাক্রমে শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আশ্রিত। অতএব রস জলীয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের উপকারক অথচ উহাদের একাত্মভাব ও সান্নিধ্য আছে। তবে যে দ্রব্যে যে গুণের আধিক্য থাকে, তদনুসারে তাহার অভিধান হয়। রস আপ্য, সুতরাং অব্যক্ত রস হইলেও আকাশাদি অন্যান্য ভূতের সংসর্গ হেতু পরিপাকান্তর ষড়্বিধ হইয়া থাকে।

ভূমি ও অম্বু গুণের বাহুল্যে মধুররস, জল ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে অম্লরস, ভূমি ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে লবণ রস, বায়ু ও অগ্নিগুণের বাহুল্যে কটুরস, বায়ু ও আকাশ গুণের বাহুল্যে কষায় রস হইয়া থাকে মধুরাদি সমস্তরসই সমান যোনির (কারণের) বর্দ্ধক ও অসমান যোনির ধ্বংসক। [যথা:—বায়ু গুণ বাহুল্যে তিক্ত, কটু ও কষায় রসের উৎপত্তি হয়। অতএব তিক্ত, কটু ও কষায় রস সেবিত হইলে বায়ু বৃদ্ধি হয়।]" * স্নেহ, গৌরব, শৈত্য ও পিচ্ছিলতা এই সমস্তই শ্লেষ্মার লক্ষণ। মধুর রস শ্লেষ্মার সমান-যোনি। শ্লেষ্মা ও মধুর, মধুর রসও মধুর; সুতরাং মধুর-রসে শ্লেষ্মার মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়; শ্লেষ্মাও গুরু, মধুর-রসও গুরু; সুতরাং মধুর-রসে শ্লেষ্মার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কটু-রস শ্লেষ্মার বিরুদ্ধযোনি, সুতরাং কটু-রসের কটুত্ব হেতু শ্লেষ্মার মাধুর্য্য নষ্ট হয়, রুক্ষতা হেতু শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা নষ্ট হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে "রসাঃ স্বযোনি-বর্দ্ধনা অন্যযোনিপ্রশমনাশ্চ"।

ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি এবং তাহা-কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিগের বিশেষত্ব দ্রব্যাদির গুণ। লক্ষিত হইল, এক্ষণ দেখা যাউক, তিথ্যনুক্রমে যে সকল দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহাদিগের নিজ

* "তিক্তঃ পিত্ত কফচ্ছর্দ্দি বিষকুষ্ঠ জ্বরাপহঃ দীপনঃ পাচনো রুক্ষঃ কণ্ডুক্রিমিহরোলঘুঃ॥" স্মৃতি—আহ্নিকতত্ত্ব।

* "কষায়ঃ শোষকস্তম্ভী ব্রণপাকার্ত্তি নাশনঃ।
কফশোণিত পিত্তম্নোরুক্ষঃ শীতোলঘুস্তথা।
শীতলঃ পিত্তহা বল্যঃ কফবাতকরোগুরুঃ।
উষ্ণঃ পিত্তকরো বৃষ্যো বাতশ্লেষ্ম হরো লঘুঃ॥"
স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

* সুশ্রুত সংহিতা।

গুণ কি এবং তাহারাই বা কোন্ কোন্ রসের অন্তর্গত।

১। কুষ্মাণ্ড।

(ক) "কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং সক্ষারং রক্ত-
পিত্তনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফ
কারকম্॥
বৃদ্ধং নাতি হিমং স্বাদু দীপনং বাত-
সুন্নঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্ব-
দোষজিৎ॥*

কুষ্মাণ্ড—বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, অতিশয় ক্ষারগুণ সম্পন্ন এবং রক্তপিত্তনাশক। তরুণ-কুষ্মাণ্ড শীতল এবং পিত্তনাশক—মধ্যমবস্থার কুষ্মাণ্ড কফকারক। পক্ক কুষ্মাণ্ড স্বাদু, নাতি শীতল, বায়ুনাশক, বহ্নিউদ্দীপক ইত্যাদি।

কুষ্মাণ্ডের তিন অবস্থা। অবস্থা ভেদে ইহার গুণেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই কুষ্মাণ্ড লবণ রসাত্মক, এতাত্তিন্ন মধুর এবং অম্লরসও কুষ্মাণ্ডে আছে।

(খ) "কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্র
বাতনুৎ।
বল্যং লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তি
শোধনম্॥*

[গ] "পিত্তঘ্নং তেষু কুষ্মাণ্ডং......
পক্কং লঘূষ্ণং সক্ষারং......॥" †

সুতরাং কুষ্মাণ্ড যে লবণরসাত্মক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২। বৃহতী।

[ক] "বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা তীক্ষ্ণা
পিত্তোষ্ণকারিণী।
পাচনী দীপনী বৃষ্যা ক্রূরবাত প্রকোপিণী॥
কটু-তিক্তাস্য বৈরস্য মলারোচক নাশিনী।
উষ্ণা কুষ্ঠ জ্বরশ্বাস শূল কাসাগ্নিমান্দ্য-
জিৎ॥"

মলকাঠিন্যকারিণী, হৃদয়েরস্বাস্থ্যবিধায়িনী, তীক্ষ্ণা, পিত্তোষ্ণকারিণী, অগ্ন্যুদ্দীপনী, পরি-পাককারিণী, বৃহতী—বীর্য্য এবং ক্রূর বায়ু বর্দ্ধিনী। ইহা কটু এবং তিক্তরসাত্মিকা। মুখের বিরসতা, মুখমল এবং অরুচি বৃহতীতে দূর হয়, বৃহতী উষ্ণ গুণ সম্পন্না, কুষ্ঠ, জ্বর শ্বাস প্রভৃতি ও মন্দাগ্নি উপশম কারিণী।

[খ] "রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্হৃদ্যানি স্থূল-
ঘ্নানি চ।" †

[গ] "ফলানি বৃহতীনাস্তু কটুতিক্ত
লঘূনি চ" †

৩। পটোল।

[ক] "পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং
লঘ্বগ্নিদীপনম্।
বৃংহণং রুচিকৃত্রক্তস্যোষ্ণতাক্ষাতিবর্দ্ধনং।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তিকাসাস্র জ্বর দোষত্রয়,
ক্রিমীন্॥"

পটোল পরিপাক কারক, হৃদয়ের স্বাস্থ্য কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং লঘু। ইহা অগ্ন্যু-দ্দীপক, পুষ্টিকর এবং রুচিকর। পটোল অতিশয় শোণিতোষ্ণতাকারক এবং স্নিগ্ধোষ্ণ। এতত্তিন্ন পটোলের আরও গুণ আছে।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
‡ সুশ্রুত সংহিতা।
* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
‡ সুশ্রুত সংহিতা।

পটোল রক্ত, কাস, জ্বর ও ত্রিদোশ নাশক এবং মধুরাম্লরসাত্মক।

[খ] পটোলং ;.........

পাচনং তর্পণং বৃষ্যং শোণিতস্তোষ্ণ-কৃদ্ গুরু।

স্নিগ্ধোষ্ণং বৃংহণং.........

.........ত্রিদোষাণাং বিনাশনং ॥"*

বর্ত্তমান শ্লোক হইতেও দেখা যাইতেছে যে, পটোল ত্রিদোষ নাশনক্ষম হইলেও শোণিতোষ্ণকারী এবং স্নিগ্ধোষ্ণ।

৪। মূলক বা মূলা।

[ক] "মহৎ তদ্ গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং ত্রিদোষকৃৎ।

তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্তু পিত্তনুৎ কফ-বাতজিৎ॥"‡

মূলক—গুরু, বিষ্টম্ভি, তীক্ষ্ণ ও ত্রিদোষ-কারক। স্নিগ্ধ ও সিদ্ধ মূলক পিত্তনাশক কফনাশক হয়।

(খ) মূলকং গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং ত্রিদোষকৃৎ।

তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্তু পিত্তকৃৎ কফবাতনুৎ।।*

[মূলক গুরু, মলরোধক, তীক্ষ্ণ, আমোৎ-পাদক।]

বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রূরতা রুক্ষতাপ্রাবল্যাদি বিকার মূলা হইতেই উৎপাদিত হয়। তৈলাদি দ্বারা রন্ধন করিলে মূলা কেবল মাত্র পৈত্তিক বিকার বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং বায়ু শ্লেষ্মার উগ্রতা ও প্রাবল্য নাশ করিতে পারে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন ধাতুরই ক্রূরতা ও রুক্ষতা নাশে সমর্থ হয় না। মূলক আমকারক। কিন্তু যাহা আম-কারক তাহাই ত্রিবিধ-ধাতুরই ক্রূরতা ও রুক্ষতা বর্দ্ধক। স্নেহসিদ্ধ মূলকের আম-নাশিনী শক্তি নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে মূলকের গুণনির্দ্ধারক শ্লোকে তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইত, সুতরাং স্নেহ-সিদ্ধমূলক যখন আম নিবারক নহে, তখন তাহাতে বাতাদি কোন ধাতুরই রুক্ষতা ও ক্রূরতা বিনষ্ট না হইয়া যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সত্য। মূলক কটু ও শীতোষ্ণ-কষায় রসাত্মক।

৫। বিল্ব। [বেল]

(ক) "শ্রীফলস্তুবরস্তিক্তো গ্রাহী রুক্ষোঽগ্নিপিত্তকৃৎ।

বাল: শ্লেষ্মহরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ পাচনঃ॥"*

বিল্ব ধারক গুণ বিশিষ্ট, কষায় এবং তিক্তরসাত্মক। ইহা পিত্তকারক রুক্ষ ও অগ্নি-বর্দ্ধক। তরুণবেল শ্লেষ্মনাশক, লঘু, বলোদ্দীপক, উষ্ণ এবং পাচক।

(খ) "বিল্বং ;............।

.........বল্যং দীপনং পিত্তকৃদ্ গুরু ॥"‡

বর্ত্তমান শ্লোক হইতেও দেখা যাইতেছে যে, বিল্ব পিত্তবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

৬। নিম্বুক।

"নিম্বুকং ক্রিমি সংমূহ নাশনম্।

তীক্ষ্ণ মন্মুদরগ্রহাপহম্ ॥

* স্মৃতি।

† সুশ্রুত সংহিতা।

‡ স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।

† স্মৃতি-আহ্নিকতত্ত্ব।

বস্তি-বিশোধনস্তবেদ্ধমম্লাং।
কিলং শীতরসং বর্দ্ধনস্তৃশম্॥
বাতপিত্ত কফ শূলিনে হিতং।
কষ্ট নষ্টরুচি রোচনং পরম্।
ত্রিদোষ বহ্নি ক্ষয় বাত রোগ।
নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাং।
মন্দানলে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং॥
বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥"*

নিম্ব—ক্রিমিনাশক, অম্লরসাত্মক, উগ্র, বস্তি-শোধক, উদরাময়নাশক। কিন্তু ইহাতে শিরায় শৈত্যরস অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাতপিত্ত কফাদির বিকার জনিত রোগে, শূলরোগে ।-।-।-। প্রভৃতিতে নিম্ব ভক্ষণ উপকারী। অম্ল ভিন্ন নিম্বুকে মধুর রসও আছে—অম্লের ভাগই অধিক, মধুর রস অল্প।

৭। তাল।

"পক্কং তালং তু মধুরং কফপিত্তাস্রবর্দ্ধনম্।
দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যান্দ শুক্রদম্॥
তাল মজ্জাতু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরোলঘুঃ।
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহী মধুরঃ সরঃ। *

পাকাতাল কফ ও রক্তপিত্ত রোগ বৰ্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্র, তন্দ্রা ও শুক্র উৎপাদক ইত্যাদি। তরুণ তালও শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক, মধুর রসাত্মক ও সরগুণ বিশিষ্ট। লবণ, মধুর, অম্ল এই ত্রিবিধ রসই তালে সমপরিমাণে আছে।

৮। নারিকেল।

(ক) বিশেষতঃ কোমল নারিকেলং।
নিহন্তি পিত্ত জ্বর মূত্র দোষান্।
তদেব বৃদ্ধং গুরু পিত্তকারী।
বিদাহী বিষ্টম্ভীমতং ভিষগ্‌ভিঃ॥"*

(খ) "নারিকেলং ফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনং।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাত পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

(গ) "নারিকেলং গুরু স্নিগ্ধং "‡

[ক] শ্লোকে নারিকেল পিত্তকারক ও দাহপ্রদ এবং (খ) শ্লোকে দাহ ও পিত্তনাশক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহা দেখিয়াই নারিকেল দ্বিবিধ—তরুণ ও পক্ক, কিন্তু [ক] শ্লোকে পক্ক নারিকেল দাহপ্রদ ও পিত্তকারক বলিয়া বিবৃত হইয়াছে! সুতরাং [খ] শ্লোকের দাহ ও পিত্তনাশক নারিকেল যে তরুণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাহউক [ক] এবং [খ] এই উভয় শ্লোক হইতেই জানা যাইতেছে যে, তরুণ নারিকেল মলরোধক, শীতল, গুরু ও দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকর, বলকারক, বস্তি-সংশোধক ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, পক্ক নারিকেল পিত্তকারক, দুষ্পাচ্য, মলরোধক, গুরু, বলকারক ইত্যাদি।

নারিকেল মাত্রেই মধুর ও শীতোক্ত কষায় রসাত্মক।

৯। অলাবু।

(ক) "অলাবুঃ শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্তনাশিনী।

---

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।

* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† সুশ্রুত সংহিতা।

বাত শ্লেষ্মকরী রুক্ষা দুর্জ্জরা মল-
ভেদিনী।"*

অলাবু গুরুপাক, শৈত্য গুণ সম্পন্না পিত্তনাশিনী, বাতশ্লেষ্মরোগকারিণী ইত্যাদি।

(খ) "অলাবু র্ভিন্নবিট্কা তু রুক্ষা
গুর্ব্বতিশীতলা"†

অলাবু বিষ্টাভেদক, রুক্ষ, গুরু ও অতি শীতল। ইহাতে মধুর ও কষায় রস সমভাগে আছে।

১০। কলম্বী। কলমি।

"কলম্বীস্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্র-
কারিণী।
অম্লপিত্তকরী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা মলবর্দ্ধিনী॥"*

কলম্বী অম্লপিত্ত রোগকারিণী, শ্লেষ্মা এবং মল বৃদ্ধিকারিণী, স্নেহযুক্তা ইত্যাদি।

লবণ, উষ্ণকষায়, অম্ল এবং মধুর এই চারি প্রকার রস ইহাতে সমভাগে আছে।

১১। শিম্বী (শিম বা ছিম)।

"শিম্বী তু শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্ত-
নাশিনী।
কটুকারসরুক্ষা জ্বর শ্বাসকরী মতা॥"

শিম্বী বা শিম পিত্তনাশিনী, শৈত্যগুণ-সম্পন্না, রস, জ্বর ও শ্বাস রোগকারিণী ইত্যাদি।

১২। পুতিকা বা পুইশাক।

(ক) "তণ্ডুলীয়কোপোদিকা......
মদবাতকফানাহু রক্তপিত্তহরাশ্চি।"†

তণ্ডুলীয়ক এবং উপোদিকা (পুই) বায়ুকফকারী রক্তপিত্তহারী ইত্যাদি।

(খ) "উপোদিকা......শ্লেষ্মকর হিম।"*

পুইশাক শ্লেষ্মকর এবং হিম।

(গ) "পূতিকা শ্লেষ্মলা গুর্ব্বী স্নিগ্ধা
পিত্তপ্রকোপিণী।
দুর্জ্জরা মধুরা রুচ্যা কাসাস্র বাত
বর্দ্ধিনী॥"*

পূতিকা পিত্ত, বায়ু, রক্ত ও কাস বর্দ্ধিনী স্নিগ্ধা, অতি বিলম্বে এবং কষ্টে জীর্ণ হয় ইত্যাদি।

১৩। বার্ত্তাকী।

(ক) "বার্ত্তাকী কফ বাতঘ্নী রুচ্যাগ্নিব-
লবর্দ্ধিনী।
বৃংহণী পাচনী বৃষ্যা কণ্ডুকৃদ্রক্ত পিত্তনুৎ॥"†

ইহাতে কফ এবং বায়ুর প্রকোপ বিনষ্ট হয়। বার্ত্তাকী কণ্ডুরোগোৎপাদিনী, অগ্নি ও বলবর্দ্ধিনী ইত্যাদি।

(খ) "কফ বাত হরং তিক্তং রোচনং
কটুকং লঘু।
বার্ত্তাকং দীপনং প্রোক্তং জীর্ণং সক্ষার-
পিত্তলম্॥"*

বার্ত্তাকু কফ এবং বাত নাশক, তিক্ত, রোচন, কটু, লঘু, দীপন, পক্ব বার্ত্তাকু ক্ষারযুক্ত এবং পিত্তকারক।

ইহাতে মধুর ও লবণ রস সমভাগে আছে।

১৪। মাষকলায়।

"মাষো বহুমলোবৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণো মধুরো
গুরুঃ।
বাতনুৎ পিত্তলো বল্যো মেদোমাংস কফ
প্রদঃ॥"†

* স্মৃতি—আহ্নিক তত্ত্ব।
† সুশ্রুত সংহিতা।
* আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† সুশ্রুত সংহিতা।

* সুশ্রুত সংহিতা॥
† আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
† স্মৃতি—আহ্নিক তত্ত্ব।

মাষকলায় অতিরিক্ত মলবৃদ্ধিকারক, (কফ, পিত্ত, মেদ, মাংসবর্দ্ধক), উষ্ণ-গুণ-সম্পন্ন, শুক্রবর্দ্ধক ইত্যাদি। মাষকলায় গুরু, বিষ্টামূত্রের তরলতাকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, মধুর, বাতঘ্ন, সন্তর্পণ, স্তন্যকর, বলপ্রদ এবং শুক্রকফকারক। (খ) "মাষো গুরুর্ভিন্ন পুরীষ মূত্রঃ স্নিগ্ধো-ষ্ণবৃষ্যো মধুরোঽনিলঘ্নঃ।
সন্তর্পণঃ স্তন্যকরো বিশেষাদ্বলপ্রদঃ শুক্র কফাবহশ্চ।"†

১৫। মাংস।

"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং কফপিত্তকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রস পাক-য়োরঃ।।"*

বায়ুনাশক, কফকারক, পিত্তবর্দ্ধক, প্রীতিপ্রদ, পুষ্টিকর, গুরু ইত্যাদি।

ইহাতে মধুর এবং শীতল কষায় রস তুল্য পরিমাণে আছে।

কুষ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মাষকলায় পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলির গুণাগুণ ইংরাজি পুস্তক হইতেও কতকাংশে দেখান যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা ইংরাজি পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া "Dr Watt's Dictionary of the Economic Products of India" পাঠ করিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি এ

(ক্রমশঃ)

† আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র।
* সুশ্রুত সংহিতা।

ভ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মকর-রাশি :

অভিজিৎ নক্ষত্র।

ধনুঃ রাশির উত্তরে গরুড় মণ্ডল। গরুড় মণ্ডলের বায়ুকোণে বীণা মণ্ডল। বীণা মণ্ডল ছায়া পথের পশ্চিমে স্থিত। এই বীণা-মণ্ডলে প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল নীল বর্ণ একটী তারা আছে। এই তারার নাম নীলমণি। পুলস্ত্য ও অত্রি তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা উঃ পূঃ অভিমুখে বর্দ্ধিত করিলে, বর্দ্ধিত রেখা নীলমণি তারার নিকটস্থ হইবে। নীল মণি তারা উত্তর ভগোলার্দ্ধে অবস্থিত। এবং ধ্রুব তারা হইতে ব্রহ্মহৃদয় তারার সমদূরে ও বিপরীত ভাগে নীলমণি তারা অবস্থিত। নীল মণি তারার ১ হাত উঃ পূঃ কোণে অশনি তারা। এবং ১ হাত দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে জয়ন্তি তারা অবস্থিত। অশনি ও জয়ন্তি তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীস্থ, তারার ত্রয়ে একটী সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইয়াছে, এই তারা ময় ত্রিভুজের নাম অভিজিৎ নক্ষত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে অভিজিৎ নক্ষত্র শৃঙ্গাটক-আকৃতি। এই নক্ষত্রের যোগ তারা নীল মণি। অভিজিৎ বজ্রের নামান্তর [১] এই অভিজিৎ বা বজ্র নক্ষত্র অধুনা নক্ষত্র

(১) অভিজিদসীতি। বজ্র বৈবোড়বী ॥ ইতি গোপথ ব্রাহ্মণ ২। ২। ১৩

মালা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। [২]

নীল মণি তারার অগ্নিকোণে একটি সুন্দর তারাময় সমদ্বাদশ ক্ষেত্র আছে। এই সমদ্বিবাহু ক্ষেত্রের বায়ু কোণস্থ কোণে জয়ন্তি তারা।

নীলমণি তারা আরব দেশে অল্ নেসর অল ওয়াকী নামে খ্যাত। এবং এই বাকী [ওয়াকী] নাম হইতে ইয়ুরোপে এই তারার নাম বেগা হইয়াছে।

মকর-রাশির।

শ্রবণা নক্ষত্র।

ধনু: রাশির উত্তরে গরুড় মণ্ডল। গরুড় মণ্ডল ছায়া পথে স্থিত, এই মণ্ডলের প্রধান তারার নাম বাসুদেব। বাসুদেব তারা অতি উজ্জ্বল প্রথম শ্রেণীর তারা। ইহার অগ্নি ও বায়ু কোণে ১॥০ হাত ও ১ হাত দূরে সায়ক ও কর্ণ নামে দুইটী তারা আছে। সায়ক চতুর্থ শ্রেণীর ও কর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর তারা। এই তারা ত্রয় শরাকৃতি। এবং এই শরাকৃতি তারাত্রয়ে শ্রবণা নক্ষত্র গঠিত। শ্রবণা নক্ষত্রের দেবতা বিষ্ণু বা হরি। যে মাসে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এই নক্ষত্র সন্নিহিত থাকে। সেই মাসের নাম শ্রাবণ। যে দিনে শ্রবণা নক্ষত্রে চন্দ্র থাকে সেই দিনের নক্ষত্র শ্রবণা। [৩]

রাশি চক্রস্থ মকর রাশি হইতে শ্রবণা নক্ষত্র বহু দূরে ও গরুড় মণ্ডলে অবস্থিত। শ্রবণা নক্ষত্র মকরের অঙ্গ ভুক্ত নহে।

বীণা মণ্ডল ও গরুড় মণ্ডল।

পাশ্চাত্যে বীণা মণ্ডল গরুড় মণ্ডলের একাংশ বলিয়া গণ্য। গরুড় ও অভিজিৎ হিন্দু প্রবাদ বিদ্যায় নিত্য সম্বন্ধে আকৃষ্ট। মাতার দাসীত্ব মোচনার্থে গরুড় বিমান মার্গে উড্ডীন হইল। এবং দেব-সমরে জয়ী হইয়া অমৃত আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন কালে বিমান মার্গে গরুড়ের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ হইল। বিষ্ণু বরে গরুড় অমর হইলেন। এবং গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে গরুড় বিমান হইতে অবতরণ কালে ইন্দ্র দেব গরুড়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গরুড় অমর, গরুড় বজ্রের সম্মান রক্ষার্থে পক্ষ হইতে একটী পত্র উৎপাঠন করিয়া অর্পণ করিলেন। পত্রের সৌন্দর্য্য অবলোকনে দেবগণ প্রীত হইয়া গরুড়ের নাম সুপর্ণ রাখিলেন।

এবং দেবরাজদত্ত বরে ভুজঙ্গগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। গরুড় অমৃত আনিয়া সর্পগণকে দিয়া মাতার ও আপনার দাসত্ব মোচন করিলেন। কুশ তৃণোপরি অমৃত স্থাপিত রহিল। সর্পগণ স্নান ও মঙ্গলাচরণ জন্য গমন করিলে দেবরাজ অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। স্নাত সর্পগণ কুশোপরে অমৃত না দেখিয়া দর্ভ লেহন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের

---

(২) অভিজিদ্ স্পর্দ্ধমানাতু রোহিণ্যা কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপ স্তপ্তুং বনং গতা।

ইতি মহা ৩। ২২৯। ৮

(৩) শ্রবণা নক্ষত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে গৃহ দগ্ধ হয়। ইহাই ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত। গৃহ দাহ হউক বা না হউক, বিপদজনক বস্তু বা সহজক্রোধিব্যক্তি শ্রবণার খড়ের নিত্য উপমেয়।

জিহ্বা দর্ভে দ্বিধা হইল। এবং অমৃত স্পর্শে দর্ভ পবিত্র হইল। [৪]

মকর-রাশির।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

গরুড় মণ্ডলের পূর্ব্বে প্রবিষ্ঠা মণ্ডল। এবং শ্রবণা নক্ষত্র হইতে পূঃ পূঃ উঃ কোণে ৬ হাত দূরে যে একটী তারাগুচ্ছ দৃষ্ট হয়, ঐ তারা গুচ্ছের নাম প্রবিষ্ঠ মণ্ডল। তারা গুচ্ছের পঞ্চ তারা আকারে মর্দ্দল বা মৃদঙ্গ সদৃশ। এই তারা মৃদঙ্গের নাম ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। ধনিষ্ঠা অর্থে শব্দায়মান মৃদঙ্গাদি। এই নক্ষত্রের বৃহত্তম তারাটীর নাম রত্ন পুরী। তারাটী চতুর্থ শ্রেণীর, এবং ছায়া পথের পূর্ব্ব তীরে স্থিত ধনিষ্ঠার দ্বিতীয় তারার নাম বসুদেব। প্রবিষ্ঠা মণ্ডলের পাশ্চাত্য নাম Delphinos।

মকর রাশি।

ধনুরাশির ঈশান কোণে মকর রাশি অবস্থিত।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ৩ এর ৪ ভাগ শ্রবণা নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ১ এর ২ ভাগ ৩০ অংশ মকর রাশি।

মকর রাশির নক্ষত্র দ্বয় দ্বারা মকর রাশি গঠিত হয় নাই। কারণ মকরের নক্ষত্রদ্বয় রাশি চক্রের বহু দূরে অবস্থিত। মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ মৃগাকৃতি। উত্তরার্দ্ধ মৎস্যাকৃতি। মকর-দেহ পূর্ব্ব পশ্চিম দশ হস্ত বিস্তৃত। শ্রবণা নক্ষত্রের দশ হাত অগ্নি কোণে মকর অবস্থিত। মকর পশ্চি-

(৪) ততঃ সা বিনতা তস্মিন্ পণিতেন পরাজিতা
অভবৎ দুঃখ সন্তপ্তা দাসীভাবং সমাস্থিতা
মহাভারত ১। ২৩। ৪

ততঃ সুপর্ণ মাতা তাং অবহৎ সর্প মাতরং
পন্নগান্ গরুড়ঃ খাপি মাতুঃ বচন চোদিতঃ
মহাভারত ১। ২৫। ৫

বহ-অস্মান্ অপরং দ্বীপং সুরম্যং বিমলোদকং
দাসী ভূতাস্মি দুর্যোগাৎ সপত্ন্যাঃ পন্নগোত্তম
কিম্ আহৃত্য বিদিত্বা বা কিংবা কৃত্বাহই পৌরুষং
দাস্যাৎ বঃ বিপ্রমুচে হয়ং তথ্যং বদত লেলিহা।
মহাভারত ১। ২৭। ৩—৫

ততঃ পর্ব্বতকূটাগ্রাৎ উৎপপাত মহাজবঃ
প্রাবর্ত্তন্ত অথ দেবানাং উৎপাতাঃ ভয় শংসিনঃ
১। ৩০। ৬—৭

গরুড়ঃ পক্ষিরাট্ তূর্ণং সংপ্রাপ্তঃ বিবুধান্ প্রতি
তং দৃষ্ট্বা অতিবলং চৈব প্রাকম্পন্ত সুরা ততঃ
১। ৩২। ১

বিষ্ণুনা চ তদাকাশে বৈনতেয়ঃ সমেয়িবান্
তম্ উবাচ-অব্যয়ঃ দেবঃ বরদঃ অস্মিইতি খেচরং
স বব্রে তব তিষ্ঠেয়ং উপরি ইতি অন্তরীক্ষগঃ
অজরঃ চ অমরঃ চ স্যাম্ অমৃতেন বিনাপি অহং
প্রতি গৃহ্য বরৌ তৌতু গরুড়ঃ বিষ্ণুং অব্রবীৎ
ভবতে অপি বরং দদ্যাং বৃনীতু ভগবান্ অপি
তং বব্রে বাহনং বিষ্ণুঃ গরুত্মং তং মহাবলং
তং ব্রজস্থং খগশ্রেষ্ঠং বজ্রেণ ইন্দ্রঃ অতাড়য়ৎ
ঋষেঃ মানং করিষ্যামি বজ্রং যস্য অস্থি পন্থবং
এবং উক্ত্বা ততঃ পত্রং উৎসসর্জ্জ সপক্ষিরাট্
সুরূপং পত্র মালোক্য সুপর্ণঃ অয়ং ভবতু ইতি
মহা ১। ৩৩। ১২—২৪

ভবেতু ভুজগাঃ শত্রুঃ মম ভক্ষ্যাঃ মহাবলাঃ
অথ সর্পান্ উবাচ ইদং সর্ব্বান্ পরম হৃষ্ট বান
ইদং আনীতং অমৃতং নিক্ষেপ্স্যামি কুশেষু বঃ
অদাসী চৈব মাতা ইয়ং অদ্য প্রভৃতি অস্ত মে
যথা উক্তং ভবতাং এতৎ বচঃ মেপ্রতি পাদিতং
সোম স্থানং ইদং চোত দর্ভাং তে লিলিহুঃ তদা
ততো দ্বিধা কৃতা জিহ্বাসর্পানাং তেন কর্ম্মণা।
অভবন্ চ অমৃতস্পর্শাৎ দর্ভাঃ তে অথ পবিত্রিণঃ।
মহাভারত ১। ৩৪। ১৩—২৪।

মাভিমুখ, মকরের পুচ্ছস্থ পুচ্ছ তারা সর্ব্ব প্রধান, তারাটী তৃতীয় শ্রেণীর, মকরের শৃঙ্গাগ্রস্থ তারা দুইটী চতুর্থ শ্রেণীর, মকর মুখ তিনটী ক্ষুদ্র তারায় গঠিত।

তারা তিনটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতি। মকর পুচ্ছ অগণ্য ক্ষুদ্র তারায়ে নির্ম্মিত, ছায়া পথের [আকাশ গঙ্গার] নিম্ন ভাগে মকর রাশি অবস্থিত। [৫]

কুম্ভ রাশিস্থ।

শতভিষা নক্ষত্র।

শত ভিষা নক্ষত্র মণ্ডলাকৃতি শত তারক ময় বলিয়া জ্যোতিষ গ্রন্থে বর্ণিত। কিন্তু বেদ মতে শত ভিষা নক্ষত্র এক তারক ময় [১] তবে এই রাশিতে সে বহুতর তারা-গুচ্ছ আছে। তাহার একরূপ মণ্ডলাকার ভাবে স্থিত বলিলেও বলা যায়।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে যে চতুস্তারক ময় একটী সমচতু র্ভুজক্ষেত্র দেখা যায়। ঐ তারা ময় ক্ষেত্রের পশ্চিম বাহু দক্ষিণাভি মুখে প্রসারিত করিলে, একটী তারা ময় সমদ্বিবাহু ত্রভুর্জ ক্ষেত্র ভেদ করিয়া যাইবে, এই তারাময় সমদ্বিবাহু ত্রিভুর্জের পশ্চিমস্থ শীর্ষ কোণে চতুর্থ শ্রেণীর যে একটী তারা লক্ষিত হয় ঐ তারার নাম দুর্য্যোধন [১] এই দুর্য্যোধন তারা শত ভিষা নক্ষত্রের যোগ তারা, শত ভিষা নক্ষত্রে জ্বর হইলে শত ভিষক [বেদ] চিকিৎসা করিলেও জ্বর আরগ্য হয় না, এই বিশ্বাসে এই নক্ষত্রের নাম শত ভিষা বা শত ভিষক, এই নক্ষত্র শত তারক ময় বোধে ইহার অপর নাম শত তারকা এবং এই নক্ষত্র বরুণ দৈবত বলিয়া এই নক্ষত্র বরুণ দৈবত বলিয়া এই নক্ষত্র বৃষ্টিকারী।

অবেস্তা পাঠে দেখা যায় এই নক্ষত্রের নাম শত ভিষা। তিস্ত্রা [তিসা] তারা অশ্বরূপে বৌরকাষের [বরুণ কোষ] জলে প্রবেশ করিলে বৌরকাষের জল ঠগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। এবং জল স্ফীত হইয়া উথলিয়া পড়ে। শতভিষা নক্ষত্র ঐ জল বণ্টন করিয়া সপ্ত বর্ষে প্রক্ষিপ্ত করেন।

ইতি অবেস্তা তীর ষষ্ট অধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৫) এই জন্য গঙ্গার বাহন মকর।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চমোঽধ্যায়।

১

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥

অন্বয়—দ্বে (বিদ্যাবিদ্যে) তু অক্ষরে অনন্তে ব্রহ্মরূপে বর্ত্তেতে, যত্র অক্ষরে ব্রহ্মপরে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে গূঢ়ে (চ ভবতঃ) অবিদ্যা তু ক্ষরং, বিদ্যা তু অমৃতং হি (ভবতি)। যস্তু—বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে, সঃ অন্যঃ (ভবতি)।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—"অক্ষরে"—অবিনাশিনি—অবিনশ্বরে। "ব্রহ্মপরে পরব্রহ্মণি

পরব্রহ্মে 'অনন্তে"—দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃবা অপরিচ্ছিন্নে, দেশ-কাল বা বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। "বিদ্যাবিদে" বিদ্যা এবং অবিদ্যা "নিহিতে"—স্থাপিত। "গূঢ়ে"—অনভিব্যক্ত। "অবিদ্যা তু ক্ষরং" অবিদ্যাই ক্ষরণের একমাত্র হেতু। "বিদ্যা তু অমৃতং"—বিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র হেতু। "ঈশতে"—নিয়ময়ন্তি—।

বঙ্গার্থ—বিনাশি-কার্য্য-মূলা সংসার বৃত্তির কারণ অবিদ্যা এবং অমৃতময়ী আত্মজ্ঞান রূপিণী বিদ্যা, এতদুভয়ই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মে, লৌকিক জগতের অজ্ঞাতভাবে নিহিত রহিয়াছে, যে মহাত্মা সেই অজ্ঞানমূলা অবিদ্যা এবং সংসারবৃত্তি নিবারিকা বিদ্যাকে নিয়মিত করিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই সেই দুঃখবহুলা অবিদ্যা ও সুখৈকমূলা বিদ্যা হইতে পৃথগ্ভূত,তাঁহাকে সংসার হইতে ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়া জানিবে। সুখ বা দুঃখ কিছুতেই তাঁহাকে প্রসন্ন বা বিষণ্ণ করিতে পারে না, তিনি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির চিত্ত হইয়া দ্বন্দ্বাতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। "দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ" এই আখ্যা তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

২

যো যোনিং যোনি মধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈ র্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ
পশ্যেৎ।

অন্বয়ঃ—কোঽহং ইতি স্ফুটীকরোতি যঃ একঃ যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি, বিশ্বানি রূপাণি সর্ব্বাঃ যোনীঃ চ অধিতিষ্ঠতি, যঃ অগ্রে প্রসূতং ঋষিং কপিলং জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি (তম্ জায়মানং চ পশ্যেৎ। (এবম্ভূতঃ সঃ)।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় এই শ্লোকের পদ-সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই পুনরায় ব্যাখ্যাত হইল না।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব-শ্রুতি-বর্ণিত পুরুষকে, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন—যে সত্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভূতিময় পরমেশ্বর অনাদিসিদ্ধা মায়াখ্যা মূল প্রকৃতি, জগতের দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল কারণ, যাবতীয় রূপ এবং সমুদয় বীজাদিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অর্থাৎ কি দৃশ্য, কি অদৃশ্য, বিশ্বস্থ-তাবৎ পদার্থই যে অনাদি পরমাত্মার অধিষ্ঠান ভূমি, যিনি ঋষি অর্থাৎ অপ্রতিহত জ্ঞান, স্বশক্তি-সম্ভূত কনকাভ হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টির প্রথম কালে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যাদি দিব্য-জ্ঞানের দ্বারা যুক্ত করিয়াছেন, এবং সেই সহস্রাংশু সমপ্রভ জায়মান হিরণ্যগর্ভকে প্রকাশ কালে সাক্ষিরূপে অবলোকন করিয়াছিলেন, সে পরম পুরুষই পূর্ব্বশ্রুতি বর্ণিত অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয় বিমুক্ত মহাপুরুষ,—পরমাত্মা। একবার মনু স্মরণ করুন—

"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহঃ॥

৩

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সহংরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥

অন্বয়ঃ—এষ দেবঃ অস্মিন্ ক্ষেত্রে একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্ সংহরতি। যে লোকানাং পতয়ঃ ভূয়স্তান্ সৃষ্ট্বা মহাত্মা ঈশঃ তথা (পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে যথা কৃতবান্) সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—"অস্মিন্ ক্ষেত্রে"—এই মায়াময় সংসারে। "একৈকং জালং"—একটি একটি মায়াজাল। "বহুধা বিকুর্ব্বন্ নানাপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া "লোকানাং পতয়ঃ"—পুনঃ যে লোকানাং পতয়ঃ মরীচ্যাদয়ঃ মরীচি প্রভৃতি লোকপালগণ "তান্ তথা সৃষ্ট্বা" তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব-কল্পের ন্যায় সৃষ্টি করিয়া।

বঙ্গার্থ—এই অনাদিতন পরম-পুরুষ সৃষ্টিকালে সুরনর তির্য্যগাদি এক একটি জাল এই মায়াময় সংসার-ক্ষেত্রে নানাভাবে বিস্তার করিয়া আবার তাহা যথাকালে সংহৃত করেন। মহাত্মা ঈশ্বর প্রলয়াবসানে পুনঃ সৃষ্টির প্রাক্কালে মরীচি প্রভৃতি লোক-পালদিগকে পূর্ব্ববারের ন্যায় আবার সৃষ্টি করিয়া স্বীয় ঐশিক আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি অভিনয়ের তিনিই একমাত্র নেতা, তাঁহার নেতৃত্বই স্বর্গের দিব্য আধিপত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র কীটাদি পর্য্যন্ত মায়াময়-জাল বিস্তার করিয়া সকলকে মায়াবশে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার বিশ্ববিরচিকা কল্পনা অনন্তকাল একই প্রকার অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে, শ্রৌত-মন্ত্রে কথিত হইয়াছে "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। তিনি পূর্ব্বাপর সমভাবে সমগ্রবিশ্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। গীতা স্মরণ করুণ।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয়, জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—
মেট্রপলিটান কলেজ।

হিন্দু-সমাজের উন্নতি-সাধনের উপায়। (১)

জাতি-ভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের সামাজিক ব্যবস্থাপনের যন্ত্র স্বরূপ। উহা ভাল কি মন্দ, উহা জাতীয় উন্নতির সহায় বা অন্তরায়, সে আলোচনা এস্থলে করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, জাতি-ভেদ-প্রথা হিন্দু-সমাজের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাকে ভালই বিবেচনা করুন, বা মন্দই বিবেচনা করুন, ইহার মূলোৎপাটন সহজ নহে। এ প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, প্রথাটী যখন আছে, এবং সহসা বিপর্য্যস্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই, তখন ইহার দ্বারা সমাজের যত টুকু উপকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু-সমাজের এই জাতি ভেদ-প্রথার দ্বারা আপাততঃ আমরা কি উপকার প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা দেখা আবশ্যক। এই শত সহস্র সম্প্রদায় সমন্বিত সুপ্রকাণ্ড হিন্দু-জাতিকে একটি মাত্র সূত্রে সুসম্বদ্ধ করা

(১) শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত কোন বক্তৃতার সারাংশ।

আপাততঃ সম্ভবপর নহে। এতদন্তর্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি আপন ২ সাম্প্রদায়িক সমুন্নতি সাধনে যত্নপর হন, তবেই ক্রমে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমবেত-উন্নতির ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। বৃহৎকার্য্য মাত্রেরই প্রায় এই নিয়ম।

বিভিন্ন জাতির বিভিন্নাকার বিশৃঙ্খল-বস্তু সমূহের একত্রীকরণ ও একসূত্রে বন্ধন সুসাধ্য নহে; পরন্তু বিভিন্ন জাতীয় বস্তু স্বতন্ত্র ২ ভাবে বন্ধন করিয়া, পরে এক রজ্জুতে বা এক আধারে অবস্থাপিত করা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য, সন্দেহ নাই। জাতি-ভেদ-জনিত বিভিন্ন রীতি-নীতি, ক্রিয়া-কার্য্য সমন্বিত বহুবিভিন্ন সম্প্রদায়পূর্ণ হিন্দু-সমাজের উন্নতিবিধানের ইহাই ক্রম।

এই বিরাট-হিন্দু জাতির সমস্ত অন্তর্ভূত জাতিই যদি স্ব স্ব জাতীয়-উন্নতি বিধানে অগ্রসর হন, তবে তাহাই হিন্দুর জাতীয় উন্নতি নহে কি? মনে করুন, একটি গ্রামে অনেকগুলি বাড়ী; কিন্তু কোনটী পাকা, কোনটি কাঁচা, কোনটি প্রায় ভগ্ন, কোনটি অর্দ্ধ ভগ্ন, কোনটি প্রায় প্রস্তুত, কোনটি অর্দ্ধ প্রস্তুত, ইত্যাকার। এখন সকল বাড়ীর অধিবাসীরাই যদি বিশেষ প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া আপন আপন বাড়ীগুলি ভাল করেন, পাকা করেন, সুন্দর করেন, তবে অচিরাৎ সমগ্র গ্রাম খানিই একটি সৌধমালা-শালিনী নগরীর ন্যায় শোভমান হয়। বিভিন্ন খণ্ড সমাজ সমন্বিত সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্র সমুন্নয়ের ইহাই প্রণালী। অতএব জাতিভেদ প্রথাতেই এই প্রণালীর ফলোপধায়কতা প্রতিষ্ঠিত জানিয়া, বিভিন্ন-সমাজের প্রত্যেক হিন্দুরই স্ব স্ব সমাজোন্নতি সাধনে যথা সম্ভব যত্নবান হওয়া প্রার্থনীয়।

এক্ষণে কি প্রকারে আমাদের এই জাতীয় উন্নতি সুসাধিত হইতে পারে, বর্ত্তমানে তাহাই আলোচ্য ও বিবেচ্য। আমি বিবেচনা করি, উন্নতির প্রধানতঃ চারিটি উপায়—ধর্ম্ম, বিদ্যা, বল ও ধন। সূক্ষ্মভাবে সকল তত্ত্বই ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত, সকল সাধনই ধর্ম্মবলে সিদ্ধ; কিন্তু সে উচ্চাধিকারের কথা এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে, সাধারণতঃ স্থূলভাবে—মানব জাতির উন্নতির উক্ত চারিটি প্রধান অঙ্গ আমাদের প্রয়োজনীয়, সুতরাং আলোচনীয় ও সাধনীয়।

ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্ষ্যমাণ-প্রসঙ্গে আমি অধিক কিছু বলিব না। প্রতি শুভ কার্য্য-সাধনাই ধর্ম্মাভাবে অসিদ্ধ, ইহা হিন্দু-হৃদয়ে স্বতঃএব সুপ্রতীত। হিতোদ্দিষ্ট সর্ব্বকার্য্য কর্ম্মই হিন্দুর পরিচালক, পোষক ও রক্ষক। স্থূলত এই ধর্ম্মের দুইটি বিভাগ। ভগবদ্ভক্তি ও নৈতিকশক্তি। এই দুইটি আবার পরস্পর সাপেক্ষ। অতএব যদি ভগবৎ কৃপায় আমরা ভগবচ্চরণে ভক্তি রাখিয়া ও নৈতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত থাকিয়া ধর্ম্ম বলে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, তবে অচিরাৎ সিদ্ধির মুখ দেখিব; নচেৎ শত বৎসর ব্যাপী শত চেষ্টা—সহস্র সাধনাও তপ্ত বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুবৎ ব্যর্থতায় বিলীন হইবে।

বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে আমাদের দেশে কোন দিন সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী থাকিলেও অধুনা

বহুপশ্চাতে পড়িয়াছে। বিদ্যাকে স্থূল ভাবে লেখা পড়া মাত্র ধরিলেও দেখা যায়, অস্মদ্দেশ এক্ষণে কত পশ্চাদ্বর্ত্তী। এ দেশে অঙ্গুলি-পর্ব্বমেয় কয়েকখানি মাত্র সংবাদ ও সাময়িক পত্র অতি কষ্টে চলিতেছে; আর ইউরোপ-আমেরিকা তদ্বিষয়ে কি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুদ বৈপরীত্য! অথচ এ দেশের লোকসংখ্যা কত অধিক! বিলাতে বোট্‌ম্যান, কোচ্‌ম্যান, মুটে-মজুর সংবাদ-পত্র পড়িয়া থাকে। অস্মদ্দেশে হয় ত কোন কোন সুসভ্য রাজাধিরাজও সংবাদ-পত্র পাঠে পৃথিবীর সংবাদ রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন না! যাক্ সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রের দশা ত ততোধিক শোচনীয়। সে যাহা হউক, অস্মদ্দেশে সর্ব্বজনীন বিদ্যা-শিক্ষা (Mass Education) না থাকাতে জাতীয় বিদ্যোন্নতি দূরপরাহত হইয়াছে। এক্ষণে যদি এদেশের খণ্ড খণ্ড জাতি বা সমাজ সমূহে স্বসীমাধিগত স্বতন্ত্র ও সায়ত্তভাবে বিদ্যা-শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে কালে উহারই সমষ্টিগতভাবে জাতীয় বিদ্যোন্নতি সহজেই সংসাধিত হইতে পারে।

বিদ্যাবলের অপচয়ে অত্যুন্নত ভারত অবনত হইয়াছে। বিদ্যাবলের উপচয়ে ইউরোপ উন্নত, আমেরিকা উন্নত, এসিয়ার ক্ষুদ্র দ্বীপ গতকল্যের জাপানও আজ উন্নত হইয়া পৃথিবীর ঈর্ষা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাবলে—বিজ্ঞান-বলে স্বভাবের অদম্য অনতিক্রম্য বল আয়ত্ত করিয়া, আজ পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতিকে পরিচারিকা করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। বিদ্যাবলে—বিজ্ঞানবলে অসাধ্য সাধন, অঘটন সংঘটন করিয়া এই বিংশশতাব্দীর মানব যেন ঐশীশক্তিকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে!

ঐহিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া পারমার্থিক উন্নতিতে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, বিদ্যা তাহার এক প্রধান সাধন। ভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের এক নামই বিদ্যা। অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। ভারতে বিদ্যার উৎকৃষ্ট ফল ধর্ম্মসাধন—ভগবদ্ভজন আবহমানকাল সমাদৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য প্রদেশও এখন এই তত্ত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। অতএব এমন যে পরমধন বিদ্যাধন, সেধনে যে জাতি বা সমাজ নির্দ্ধন না হইলেও অন্ততঃ হীনধন, তাহার অপর বিশিষ্ট বৈষয়িক ধনবত্তাও বিড়ম্বনা মাত্র। এই পরমধনার্জ্জন সাধনে যে ধন বা অর্থ ব্যয়িত হয়, সেই অর্থই সার্থক, নতুবা নিতান্তই অনর্থক।

আমাদের তৃতীয় আবশ্যকতা বল বীর্য্যের। মানসিক-বল-বীর্য্যের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে; কারণ তাহা মুখ্যতঃ ধর্ম্ম ও বিদ্যা বৃদ্ধির ফল, গৌণতঃ কতকটা শারীর-বলেরও ফল বটে। ধর্ম্ম ও বিদ্যা-বলের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়াছি; এক্ষণে শারীর-বলের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

অনেকদিন হইতে ভারতে শারীর-বলের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে; এখন অভাব বলিলেও বোধহয় বড় অত্যুক্তি হয়না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে এ "অভাব"

শব্দ প্রযোজ্য না হইতে পারে, কিন্তু জাতিগত-ভাবে বোধহয় স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদিও পাশ্চাত্য জাতিগণের দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয় যে, ধন-বলই প্রধান জাতীয়-বল; তথাপি ইহাও নিশ্চিত যে শারীর-বল ভিন্ন সেই ধন-বল উপার্জ্জিত বা রক্ষিত হইতে পারেনা। প্রাচীন ভারত অপেক্ষা বিদ্যাবল ও ধন বল আধুনিক ভারতে অনেক কমিলেও শারীর-বলের মত কখনই কমে নাই।

প্রাচীন-শারীর-বলের যে সাক্ষ্য পুরাণেতিহাস ও কাব্য সাহিত্যাদিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে কবি-কল্পনা বা অতি-রঞ্জনার "ছুট্‌বাদ" দিলেও যে টুকু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহাও বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে অসাধারণ ও অলৌকিক। তাহার তুলনায় এখনও যে আমাদের অস্তিত্ব বজায় আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। দুই—চারি শতাব্দীর কথাও নহে, প্রায় সহস্রাধিক বৎসর হইতে আমাদের শারীর-বলের অবনতি। এই অবনতি আমাদের সর্ব্ববিধ অবনতির অন্যতম প্রধান হেতু, সন্দেহ নাই। অতএব শারীর-বল কদাচ উপেক্ষার বিষয় নহে। দুঃখের বিষয় এই শারীর-বলের উৎকর্ষ সাধনে আমাদের সামান্য চেষ্টাও দৃষ্ট হয় না। যোগেযাগে "পৈতৃক প্রাণটি" থাকিলে যেন যথেষ্ট; কিন্তু প্রাণেরই যে নামান্তর বল। বলশূন্য প্রাণ আর জলশূন্য নদী একই কথা। কেবল নাম মাত্র—বিড়ম্বনা। আত্ম ও পর লইয়াই সংসার। দুর্ব্বল-ব্যক্তি পরের কার্য্যে খাটিতে অসমর্থ, আত্মরক্ষায়ও অপটু। সুতরাং দুর্ব্বলের বিড়ম্বনাময় জীবন সমাজে ভার মাত্র।

এ দেশে পিতা-মাতা পুত্রের শারীর-বল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। অনেক স্থলে পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা যথেষ্ট আছে, কিন্তু পুত্র বাঁচে কি মরে, সে দিক লক্ষ্য নাই! যেন বল ও জীবনীশক্তির অভাবে পুত্র পরলোকে গেলে, সেখানেও বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, এবং তাহার ফলও তাঁহারা পাইবেন; সুতরাং নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত আছেন! ইহা হাসিবার কথা নহে; কাঁদিবার কথা। বড় দুঃখেই ইহা বলিলাম। দুর্ব্বলের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। সংসারে কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করে না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখুন, কোন্ দূরদেশ হইতে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া একটি কাবুলী এদেশে ভিন্ন রাজার অধিকারে আসিয়া কেবল নিজ শারীর বল মাত্র ভরসায় কেবল ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়া স্বদেশে গমন করিতেছে। একক গ্রামে ২ গিয়া ধারে জিনিস বিক্রয় করিয়া, বিনা খৎপত্রে কত লোকের সহিত কারবার চালাইতেছে। তাহার টাকা পড়িয়া থাকে না। প্রায় নালীশের প্রয়োজন ও হয় না। সকলেই তাহাকে ভয় করে, শারীরিক-বলই তাহার এক মাত্র সহায়, শারীরিক-বলেই তাহার আইন-আদালতের কার্য্য সাধিত হয়। অধিক কি, আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানগণকে যে লোকে ভয় করে, তাহার কারণও তাহাদের শারীরিক-বলের আধিক্য। "বলং বলং বাহুবলং" ইহা আমাদের দেশেরই প্রবচন, বেদেও আছে, একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরীক্ষং,

বলেন দৌর্ব্বলেন পর্ব্বতো, বলেন দেবা মনুষ্যাঃ বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণ বনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যা কীট পতঙ্গ পিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমাদের বাঙ্মাত্রে পর্য্যবসিত। যাহা-হউক, শারীর-বল সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলিব না, যাহা প্রায় সকলেরই সুখ-বোধ্য বিষয়, তৎসম্বন্ধে অধিক বাগ্‌ বিস্তর বাহুল্য মাত্র। ফলে আমাদের সমাজে শারীর-বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা যেরূপে হইতে পারে, বিশেষতঃ যুবক ও বালকদিগের তদনুশীলনার্থ গ্রামে ২ তাহার যে কোনরূপ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য, অবধার্য্য ও কার্য্য।

আমাদের চতুর্থ বা শেষ প্রয়োজনীয় ও আলোচনীয় বিষয় ধন। সমাজে, অর্থাৎ আর একটু পরিষ্কাররূপে বলিতে হইলে-গার্হস্থ্য জীবনে পদে পদেই ধনের আবশ্যকতা। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, চলিতে, বলিতে কেবল ধনেরই বিবিধ বিচিত্র লীলা-বিলাস! রাজা হইতে রাজপথ-ভিখারী পর্য্যন্ত সবাই ধনার্থী। রাজার রাজ্যলাভার্থে ধন চাই। ভিখারীর ভোজ্যলাভার্থে ধন চাই। ফলে ধনের প্রয়োজন হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। এই সাংসারিক সর্ব্বার্থ-সাধন ধন, যে জাতি বা সমাজে যত অধিক, সে জাতি বা সমাজের সাংসারিক উন্নতি তত অধিক, সন্দেহ নাই। এই বিংশ শতাব্দীর সমুন্নত পাশ্চাত্য সমাজ বা জাতি-সমূহের অসাধারণ ঐহিক অভ্যুদয় প্রধানতঃ তাহাদের জাতির কুবেরত্বরই পরিচায়ক। ধনই ঐহিক অভ্যুদয়ের জীবন।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি॥
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং।
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এটি অস্মদ্দেশের চির প্রচলিত প্রসিদ্ধ প্রবচন; কিন্তু এক্ষণে আমরা শুধু বচনেই মজবুদ্; কাজে কিছুই না। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহা আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিজ্ঞাত; অথচ আমাদের দেশে বাণিজ্য মোটেই নাই বলিলেই হয়। এদেশে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা প্রায়শঃ বিদেশীয় বণিকের, দেশীয় যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা প্রায়শঃ অন্তর্বাণিজ্য মাত্র। বহির্বাণিজ্য ব্যতীত প্রভূত ধনাগমের দ্বিতীয় উপায় নাই। আজ পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের যে অপ্রমিত অভ্যুদয়, বহির্বাণিজ্য-বিস্তারই তাহার বিশিষ্ট হেতু। আমাদের ইংরাজরাজ ভারতে বহির্বাণিজ্য করিতে আসিয়াই এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ভারত-ভুবনের একাধীশ্বর হইয়াছেন। বাণিজ্য হইতে এরূপ আশাতীত অসামান্য মহৎ ফললাভ আর কি হইতে পারে? আমাদের স্বদেশই এই দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত, অথচ সভ্য জাতি সমূহের মধ্যে আমাদের ন্যায় বাণিজ্য উদাসীন ও অসমর্থ জাতি বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বহির্বাণিজ্যে আমাদের জাতি যায়! কিন্তু বাণিজ্যের অভাবেই যথার্থ জাতি যায়, অর্থাৎ জাতি টেঁকেনা, জাতির জীবন দারিদ্র্যের দোষে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা ভাবি না। আমাদেরই কবি-বাক্য "দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশি-নাশী," ধনহীনত্ব সর্ব্বগুণনাশক। জাতির

দারিদ্র দোষে জাতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণ-জ্ঞান কিছুই সম্যক্ কার্য্যকর হয় না। বাণিজ্য ব্যতীত এই জাতীয় দারিদ্র্য মোচনের উপায়ান্তর নাই।

শিল্প ও কৃষি-বাণিজ্যের প্রধান সহায়। এই শিল্প ও কৃষি বিষয়ে ভারতবর্ষ কোন দিন জগতে আদর্শ ছিল এবং কোন দিন ভারতে বহির্বাণিজ্যেরও প্রদীপ্ত প্রভাব ছিল, তাহা পুরাণাদির সাক্ষ্যে জানা যায়, কিন্তু এখন বাণিজ্যের অবনতিতে জাতীয় ধনবত্তার অবনতি ঘটিয়া এবং বিদেশীয় কলকারখানা প্রভৃতির প্রতিযোগিতা রূপ অপর বিবিধ আনুষঙ্গিক কারণে শিল্পের অবস্থা দিন ২ অতি অবনতই হইতেছে; কৃষির অবস্থা সেই সুপ্রাচীন উপায়াদির অবলম্বনে যতটুকু অব্যাহত আছে, তাহাও আশাজনক নহে। তবে ভারতভূমি স্বতঃই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, এই জন্য প্রকৃতি মাতার স্বতঃপ্রদত্ত প্রসাদে ভারতের কৃষি-প্রধানত্ব অদ্যাপি কতকটা অব্যাহত আছে; তথাপি এই ভারতবর্ষের যে অধুনা দুর্ভিক্ষের নিত্য প্রচণ্ডতাণ্ডব, তাহার প্রধান কারণই আমাদের দারিদ্র্য। রাজকীয় অনুসন্ধানেও আজ এ সত্য স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ধনেরই অত্যাবশ্যকতা।

দারিদ্র্যের বিশ্বগ্রাসী করাল কবল ভারত গ্রাস করিতে উদ্যত, অথচ আমরা উদ্ধারের একমাত্র উপায় ধনাগমের প্রকৃষ্ট-পন্থা ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদাসীন হইয়া, কৃষিকার্য্যও প্রায়শঃ নিরক্ষর চাষার উপর ভার দিয়া, কেবল "হা চাকরী! হা চাকরী!!" করিয়া মরিতেছি! হা লজ্জা! হা বিড়ম্বনা! অধঃপাতের বাকী কি? এখন কেবল জাতির ভিক্ষাবৃত্তির কথঞ্চিৎ বাকী আছে। আমাদের যে গতিক, পশ্চাতে "নৈব নৈবচ" পর্য্যন্ত না নামিয়া ছাড়িবে বোধ হয় না। ফলে দারিদ্র্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ-ঘটিল। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র আছেন, তাঁহারা জাতীয় ধনাভাবের গুরুত্ব ও সর্ব্বনাশকত্ব লক্ষ্য করিতেছেন না; গরিবেরা আর কি করিবে? তবে কি না, আমাদের মত গরিবদেরই উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। আমাদের আন্দোলন—আলোচন ও উদ্যোগ আয়োজনের গোলযোগে হয়ত তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে।

আমি অদ্য বিদ্যা, বল ও ধন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম, এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, বিরাট-হিন্দু-জাতির যুগপৎ সমবেত-চেষ্টায় যুগপৎ উক্ত চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি আপাততঃ অসম্ভব, অতএব তদন্তর্ভূত খণ্ড খণ্ড চেষ্টা দ্বারা কালে সমগ্র জাতির সমষ্টিগত অভ্যুদয় অসম্ভব নহে।

৮ম বর্ষ। ৯ম, ১০।

১৮২৩, ১৩০৮।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—— [illegible]

"আমিত্বের প্রসার"—১মখণ্ড। ইহাতে ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিমাই ৮পেজি ১৩০পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধান। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ৷৹ আনা মাত্র। হিন্দুর দৈনিক কার্য্যাবলী কিরূপে আত্মপ্রসারের অনুকূল এই গ্রন্থে তাহা চক্ষুতে অঙ্গলি দিয়া দেখান হইয়াছে!

যশোহর হিন্দু পত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

The work (আমিত্বের প্রসার) states that amitva, egoism or self-love is the root of all evil in this world and hence its annihilation is taught in the Sastras as the means of attaining summum bonum. Now, this annihilation can be effected not only by foregoing all love of self, but also by extending it indefinitely to non-self, or in otherwords not by not loving self, but by loving others like self. And all pre-eminently Hindu institutions like the five sacrifices, the four asramas and the four castes have all been framed with a view to attaining this very object and lead, when the duties and injunctions relating thereto are obeyed in practice, to more or less liberalisation of a person's sympathies and the increase of love for others. Let all Hindus, therefore remember this cardinal teaching of the sastras and carry it out in life by consecrating themselves to the service of their fellow creatures. The book is exceedingly well-written and its altruistic teaching cannot fail to have a salutary and ennobling effect on the reader.

CALCUTTA GAZETTE, 4th April 1900 Bengal Library Catalogue for the 4th qr. 1899. pp. 18-19, No. 7271.

I was greatly impressed by the perusal of the book. It evinces considerable spiritual development on the part of the author. There can be no two opinions regarding its great moral and educational value I shuld like to see the book in the hands of our students as well as grown up men. The subject matter of the book is well thought out and the book is apparently the product of deep thinking and sober spiritual living.

Rajendra Ch. Sastri M. A.

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ।। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা

স্বরজ্ঞান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

-•:০:•-

নিশ্বাস প্রশ্বাসের (প্রাণের) দ্বারায় কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্ব কার্য্য সাধন হয়। প্রাণের ন্যায় মিত্র ও পরম বন্ধু মানবের আর কিছুই নাই। ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকগণের গোচরার্থে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

দেব্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব সর্ব্ব সংসার তারক।
কিং নরাণাং পরং মিত্রং সর্ব্ব কার্য্যার্থ-
সাধনং।

দেবী কহিলেন,—সর্ব্ব সংসার তারক দেব দেব মহাদেব! মনুষ্যগণের পরম মিত্র এরূপ কি আছে, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধন করা যায়?

এতদুত্তরে সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগী মহেশ্বর বলিলেন—

প্রাণ এব পরং মিত্রং প্রাণ এব পরঃ সখা।
প্রাণতুল্যঃ পরোবন্ধুর্নাস্তি নাস্তি বরাননে॥

প্রাণই শ্রেষ্ঠ সখা, প্রাণই পরম মিত্র। প্রাণের তুল্য পরম বন্ধু মনুষ্যগণের আর কিছু নাই। (১)

বাস্তবিক একমাত্র প্রাণের (নিশ্বাসের) দ্বারা কার্য্য করিতে পারিলে, ঐহিক ও পারলৌকিক সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়।

(১) পূর্ব্বে বলিয়াছি একবার শ্বাস প্রশ্বাসের নাম প্রাণ। প্রাণ শব্দে শ্বাস প্রশ্বাস বুঝিতে হইবে। হিন্দু-পত্রিকা ১৩০৭ সাল ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রাণ বায়ুর ক্রিয়াযোগে যোগপরায়ণ যোগিগণ লোকদুর্লভ বিবিধ ক্ষমতা এবং অসীম অনন্ত ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা সাংসারিক, বৈষয়িক সকল, কার্য্য সুফল ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা অসম্ভব হইতে পারে কি? কিন্তু প্রাণতত্ত্ব বিদ্যা গুরু-মুখে শিক্ষা করিতে হয়। মহাদেব বলিয়াছেন—

এবং প্রাণবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব কার্য্যে ফল-
প্রদঃ।
জায়তে গুরু-বাক্যেন ন বিদ্যা শাস্ত্র
কোটিভিঃ॥

প্রাণ বায়ুর বিধি যাহা কথিত হইয়াছে, এই প্রাণ বায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) সর্ব্ব কার্য্যেরই ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্বরতত্ত্ব বিদ্যা গুরুর মুখে অবগত হইবে; তদ্ভিন্ন কোটি কোটি শাস্ত্র পড়িলেও প্রাণতত্ত্ব বিদ্যা লাভ করা যায় না।

কথাটা অতি প্রকৃত। যিনি যত বড় চতুর, বুদ্ধিমান ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হউন না কেন, স্বরজ্ঞ গুরুর প্রমুখাৎ শিক্ষা উপদেশ বিনা কেহই স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। তজ্জন্য গুরু মুখের উপদেশ ব্যতীত, সকলে সহজে স্বরজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাংসারিক সকল কার্য্য করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার নিয়মএবং শ্বাসের দ্বারায় কিরূপে সাংসারিক সকল কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, কিরূপে ভাবী আপদ বিপদ, মঙ্গলামঙ্গল জানিতে পারা যায় ইত্যাদি এবং বন্ধ্যা নারীর পুত্র লাভ করিবার উপায়, বাতের পীড়াদি আরোগ্য হইবার অপূর্ব্ব কৌশল, দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার উপায় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এখন বলিব। বলিব, কিন্তু ভয় হয়,—সাহস আসিয়া হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। কবিকুল—কেশরী কালিদাস আপনাকে "প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" জ্ঞান করিয়া ভয়ে ভয়ে লেখনী ধরিয়াছিলেন। আমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহাযোগিগণের হৃদয়ের ধন অতি গুহ্যাদপি গুহ্য লুপ্ত প্রায় স্বরশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়া সুশিক্ষিত পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, কি "লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" সদৃশ অর্ব্বাচীন সুলভ প্রগল্‌ভতার [illegible] হইয়া অপরিমেয় উপহাসের আস্পদ হইব, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কালিদাসের পক্ষে "মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" ছিল; আমার গতি, ভরসা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ। আমার একটী অদ্বিতীয় সাহস ও আশ্বাসের হেতু গুরুকৃপা। গুরুদেবের অসীম কৃপায় তাঁহারই শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া অনন্তদুর্লভ এবং দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর যাঁহাদিগের জন্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গুরুতর বিষয় নাড়া চাড়া করিব, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত হিন্দু এবং হিন্দু শাস্ত্রের অনুরাগী; তাঁহারা ক্ষুদ্র লেখকের ত্রুটী, ন্যূনতা, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, অথবা করণাপাটব দেখিলে ক্ষমা করিবেন, এই সাহসে আশার আশ্বাসপ্রদ মধুর-কণ্ঠে বিশ্বাস করিয়া স্বরমতে সমস্ত

কার্য্য করিবার নিয়ম পর্করণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ
করিয়া উঠিবার নিয়ম।

যত্রাঙ্গে চরতে বায়ু স্তদঙ্গস্য করস্তথা।
সুপ্তোত্থিতো মুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং।
ন হানিঃ কলহৈশ্চৈব কণ্টকৈর্নাপি ভিদ্যতে ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শয্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখস্পর্শ করিয়া উঠিলে, বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। কোন হানি, বিপদ, এমন কি, কোন একটি কণ্টক পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপ করিয়া পরে শয্যা হইতে মৃত্তিকায় প্রথম পা দিবার সময়, যে নাসিকায় শ্বাস্ বহে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া শয্যা হইতে নামিবে। প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিতে কেহ ভুলিবেন না।

গুরু, বন্ধু, প্রভু ও আত্মীয়
প্রভৃতির নিকট যাইয়া কার্য্য সিদ্ধি
ও বশীভূত করিবার উপায়।

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্রাপ্যাক্রমতে স্বরঃ।
কৃত্বা তৎপদমাদৌ চ যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।
গুরু বন্ধু নৃপামাত্যা অন্যেঽপি শুভদায়িনঃ।
পূর্ণাঙ্গে * খলু কর্ত্তব্যা কার্য্য সিদ্ধির্মনীষিভিঃ।

গুরু বন্ধু, রাজা অমাত্য, প্রভু প্রভৃতির নিকট ও অন্যান্য কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবার মনন করিয়া যাত্রা করিবার সময়, যে নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং অভীষ্ট ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকে অভীষ্ট ব্যক্তিকে রাখিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে।

তাৎপর্য্য এই যে,—যখন কোন কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিম্বা কাহারও অনুগ্রহ লাভ প্রত্যাশায় বাটী হইতে বহির্গত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া এবং বাম নাসিকায় নিশ্বাস থাকিলে, বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে। ঐরূপ যাত্রা করিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ করিয়া পরে পদ ক্ষেপণ করিবে।

অভিলাষিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তখন যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তাহা হইলে এরূপ ভাবে দাঁড়াইবে কিম্বা বসিবে যে, ঐ অভীষ্ট ব্যক্তি বাম দিকে থাকেন। আর সে সময় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন থাকিলে, দক্ষিণ দিকে তাঁহাকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইবে। বা উপবেশন করিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে। এইরূপ করিলে সুফল ফলিবে। যদি স্বরের দিকশূল না হয়, তাহা হইলে এই সকল কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহনের সময়, বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করা উচিৎ। এই

---

* যে নাসিকায় যখন নিশ্বাস বহে, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ এবং তদ্বিপরীতাঙ্গকে রিক্তাঙ্গ কহে।

নিয়মে যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধ ও অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ॥

কোন লাভজনক বা যে কোন মঙ্গলকর কার্য্যে যখন যাইবে, তখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া এবং বাম নাসিকার শ্বাস বহন হইলে বামচরণ অগ্রে বাড়াইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। এরূপ করিয়া যে কোন শুভ কার্য্যে যাইবে সুফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বরোদয়ে উক্ত আছে—

'বহেন্নাড়ী পদেনৈব যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।'
যস্যাং নাসিকায়াং প্রাণবায়োর্গতির্বহতে

তদংশীয় পাদ প্রসারণ পূর্ব্বিকা যাত্রা সিদ্ধিদা ভবতীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ—যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের পদ অগে বাড়াইয়া যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। (১)

কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যাত্রা করা উচিৎ যথা—

চন্দ্রঃ সম্পদ কার্য্যাণি রবিস্তু বিষমঃ সদা।
পূর্ণপাদং (২) পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা॥

বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যে কোন সম্পৎ কার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিবে। লাভ বা যে কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন যাত্রা করা বিধি। বিষম ও ক্রূর কর্ম্মাদির নিমিত্ত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় যাত্রা করিবে। এইরূপ যাত্রায় নিঃসন্দেহ সকল কর্ম্ম সিদ্ধি হইবে।

কিন্তু দিক অনুসারে ইড়ার দিক্‌শূল হইলে, বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যাত্রা না করিয়া দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন কালে যাত্রা করিবে। দিকশূলের বিষয় পরে বলিব।

কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থানে যাত্রা করা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিবে।

সর্ব্বত্র শুভ কার্য্যেষু বামা ভবতি তুষ্টিদা।

---

(১) ভারতের নারীরত্ন বিদুষী খনার বচনে আছে যে—

"স্বরের আগায় দিয়ে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।"

ইহার অর্থ উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিতে হইবে। এই সকল খনার বচন আমরা বাল্যকালে পঞ্জিকাতে পড়িয়াছি। এখন পাশ্চাত্য বিদ্যার বিষম বোঝায় আমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, বুদ্ধিও মার্জ্জিত—অতিসূক্ষ্ম বলিয়া খনার অমূল্য বচনের মর্ম্ম আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্ত্তমান কালে নূতন পুরাতন ধরণে সংগঠিত হালফেশনের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও খনার উক্ত জ্যোতিষ, স্বর, কৃষি প্রভৃতি নানাবিষয়িণী অমূল্য বচনগুলির মর্ম্মাবধারণে অক্ষম। তজ্জন্য বর্ত্তমান সময় পঞ্জিকাকারগণ অমূল্য রত্নরাজী স্বরূপ খনার বচনগুলি পঞ্জিকা হইতে বাদ দিয়া আপনাপন পাণ্ডিত্য বজায় করিয়া পসার রাখিয়াছেন।

(২) পূর্ণপদ কাহাকে বলে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বার বিশেষে পদক্ষেপণের নিয়ম বা হঠাৎ যাত্রা করিবার সময় কোন পদ কতবার ক্ষেপণ করিতে হয় পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

সর্ব্বত্র সকল প্রকার শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিলে শুভ ফল প্রদান করে।

অপিচ—

ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্য কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিবে। *

শত্রু, দুষ্ট ও অধম ব্যক্তির নিকট জয় লাভ করিবার উপায়।

অরি চৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যো উৎপাত বিগ্রহাঃ।
কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয় লাভ সুখার্থিভিঃ॥

শত্রু, দুষ্ট, চোর ও অধম ব্যক্তিদিগের নিকট যখন যাইবে এবং অন্যান্য উপদ্রব সময়ে বিবাদে ও যুদ্ধ আদিতে জয় লাভ করিবার জন্য এবং শত্রু, দুষ্ট ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তির নিকট কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিবে, তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিবে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে, অর্থাৎ গৃহ হইতে যাত্রা করিবার সময় যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে বামপদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তবে দক্ষিণ চরণ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে।

কুপিত প্রভু, বিদ্বেষী ও খল
ব্যক্তিকে বশীভূত করিবার উপায়।

ব্যবহারে খলোচ্চাটে বেবি বিদ্যাদি বঞ্চকাঃ।
কুপিত স্বামী চৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ।

* ইহা ব্যতীত বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা পৃথক রূপে পশ্চাৎ বলিব।

প্রভু যদি রাগ করিয়া থাকেন কিম্বা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যদি কুপিত হন এবং বিদ্বেষী ও খল চোর, বিদ্যাদি বঞ্চক প্রভৃতি লোকের নিকট যাইবার সময় উপরোক্ত নিয়মে অর্থাৎ যাত্রা কালীন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা কার্য্য ও ব্যবহার করিবে। এরূপ করিলে কুপিত স্বামী ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত ও মুগ্ধ হইবে।

চাকুরে লোকের পক্ষে প্রভুর ও উপরিতন বড় বাবুর কোপানলে পড়া বিরল নহে। সুতরাং চাকুরী ব্যবসায়ী মহাশয়েরা নিত্য পূর্ণাঙ্গে ও প্রভুর রাগ জানিলে রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিয়া প্রভুর নিকট যাইয়া নিম্নোক্ত প্রকার ব্যবহার করিয়া দেখিবেন যে, প্রভু সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইয়াছেন, আর খল ও তোমার বিদ্বেষকারী বশীভূত হইবে। শত্রুদিগের নিকট ঐরূপ রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন।

ক্রোধিত প্রভু কিম্বা কুপিত যে কোন
ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য।

উপরে যেরূপ বলিয়াছি ঐ নিয়মে যাত্রা করিয়া কুপিত ব্যক্তির নিকট গমন করিবে এবং কুপিত ব্যক্তির সম্মুখে যখন উপস্থিত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকে, তবে বামদিকে ক্রোধিত ব্যক্তিকে রাখিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। আর যদি সে সময় বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, যাহাতে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে

ক্রোধিত ব্যক্তি থাকেন এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে ক্রোধিত ব্যক্তির ক্রোধ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

ঐ দুই নিয়মে কার্য্য করিলে ক্রোধিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইবেন। বহু তোষামোদে ও বহু চেষ্টায় যে ফল লাভ না হয়, ঐ ক্রিয়ায় সে ফল লাভ অনায়াসে হইবে সন্দেহ নাই। মঙ্গলময় মহাদেবের আজ্ঞা মিথ্যা নয়, প্রত্যক্ষ ফল দেখিবেন।

যে সকল কার্য্যে যেরূপ ভাবে যাত্রা করিতে হইবে তাহা উপরে বলিলাম। ঐ রূপ নিয়মে যাত্রাদি করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্বরের দিকশূল বিচার করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

স্বরের দিকশূল।

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রো ভানুঃ পশ্চিম দক্ষিণে।
দক্ষনাড্যাঃ প্রবাহেতু ন গচ্ছেদ্দক্ষ পশ্চিমে॥
বামাচার প্রবাহেতু ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব উত্তরে।
পরিপন্থি ভবেত্তস্য গতোহসৌ ন নিবর্ত্ততে॥
তস্মাদত্র ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতৈঃ শুভৈঃ।
তদা তত্র তু সঙ্ঘাতো মৃত্যুরেব ন সংশয়॥

স্থূল তাৎপর্য্য এই যে,—পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি। একজ্য ইড়ানাড়ীর অর্থাৎ বাম নাসিকার নিশ্বাস বহন কালে দক্ষিণ অথবা পশ্চিম দিকে যাইলে শুভ হয়। উহার বিপরীত দিক দিকশূল হয়। বাম নাসিকার নিশ্বাস বহন সময় উত্তর ও পূর্ব্ব দিক ইড়ার দিকশূল হওয়ায়, বাম নাসিকার নিশ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে দিবা ও রাত্রিকালে কখনই যাইবে না। পিঙ্গলানাড়ী পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি হওয়ায়, তাহার বিপরীত—পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক পিঙ্গলার দিকশূল হয়। এই কারণে পিঙ্গলা নাড়ীর অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য। দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন কালে পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ দিকে কখনই যাইবে না। যে ব্যক্তি ইহা বিচার না করিয়া শূল লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐ নিষিদ্ধ দিকে গমন করে, সে বিপরীত ফল ভোগ করিয়া থাকে। এমন কি, তাহার ফিরিয়া আসাও অসম্ভব। অথবা মৃত্যুতুল্য কষ্ট পাইবে।

অতএব পাঠকগণ বাম নাসিকার শ্বাস বহন সময় দিবা রাত্রের কোন সময়ই পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাইবেন না। দিবসে ও রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন সময় দক্ষিণ কি পশ্চিম দিকে যাইবেন না।

যাত্রা কালে কর্ত্তব্য।

সপ্তপাদাঃ শনি শুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ।
চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈবচ॥
সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্য বিচক্ষণৈঃ॥

উপরোক্ত নিয়মে বিধি নিষেধ মানিয়া যাত্রা করিবার সময় বিচক্ষণ ব্যক্তি যে কোন স্থানে যাত্রা কালে রবি, সোম, মঙ্গল, ও বুধবারে এগারো বার, বৃহস্পতি বারে অর্দ্ধবার ও শুক্র ও শনিবার সাতবার মাটিতে পদক্ষেপণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন।

হঠাৎ বা শীঘ্র
যাত্রা করিবার নিয়ম।

লোকানাং শীঘ্র গন্তব্য কুশলায়াভিযাতে।
পরদলে তথা গ্রামে হানিশ্চ কলহাগমে।
মদভে রহতে নাড়ী গ্রামং প্রতিক্রমং নৃণাম্।
চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চ পাদঞ্চ ভাস্করে॥

এবন্তু গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ ভুবন ত্রয়ং।
ন হানিঃ কলহোনৈব কণ্টকৈর্নাপি ভিদ্যতে।
নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বাপত্তির্বিবর্জ্জিতঃ॥

যদি কোন শত্রুর সহিত বিবাদ জন্য যাইতে হয় কিম্বা হঠাৎ কোন ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, অথবা যে কোন কার্য্যে কোন স্থানে যদি শীঘ্র গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস থাকিবে, সেই অঙ্গে সেই দিকের হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া যাত্রা করিবে এবং যাত্রা করিবার সময় যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে মৃত্তিকাতে চারিপদ ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে মৃত্তিকাতে পঞ্চপদ ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে ত্রিভুবনে কোন কার্য্যই অসিদ্ধ হইবে না। পরন্তু সর্ব্বপ্রকারে আপদ বিপদ বিহীন হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

যখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে যাত্রা করিতে হইবে, তখন সমীরণ অন্তঃকরণে প্রবেশ করিলে প্রথম পদক্ষেপণ করিবে। অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় প্রথম পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে। এ ব্যবস্থা জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে।

"অন্তঃ সমীরণে দেহে প্রবেশে সমুপস্থিতে।
স্বস্তীতি দক্ষিণং পাদমাসনাদব রোহয়েৎ॥"
(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থাৎ বায়ু অন্তঃকরণে প্রবেশ করিলে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ ভূমিতে নামাইবে।

জ্যোতিষ মতে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করতঃ যাত্রা করিবার বিধি আছে। স্বরমতে সেরূপ করিতে হইবে না।

অতএব পাঠকগণ পূর্ব্বের লিখিতানুরূপ স্বরানুকূলে দক্ষিণ বা বাম পদ অগ্রে দিয়া যাত্রা করিবার সময় নিশ্বাস গ্রহণ কালে (শ্বাস বায়ু যখন ভিতরে প্রবেশ করে) সেই সময় প্রথম পদক্ষেপণ করিবেন।

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিবার সময় পৃথিবী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে যাত্রা করিতে হইবে। (পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের উদয়, কোন্ তত্ত্বের পরিমাণ কত, তাহা গত বারে বলিয়াছি *।) লাভ ও মঙ্গলজনক এবং সম্পৎ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য পৃথিবী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিশ্বাসের অনুকূলে পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে।

ভূমৌ জলে চ কর্ত্তব্যং গমনং।

পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে যাত্রা করিলে সকল কার্য্যই শুভ হইবে; কিন্তু অগ্নি, বায়ু, আকাশ তত্ত্বের সময় যাত্রা করিলে কখনই সুফল হইবে না।

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। মন্দ তিথি বারাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। তাহা স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে—

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং বার গ্রহ দেবতা।
ন বিষ্টি র্ন ব্যতিপাতো বিরুদ্ধ্যাদ্যা স্তথৈবচ।
কুযোগা নৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন।
প্রাপ্তে স্বর বলে সিদ্ধিঃ সর্ব্বমেব ফলং শুভম্।

স্বর অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে মন্দ-তিথি, বার, গ্রহদেবতা এবং বিষ্টিদোষ ও ব্যতীপাত প্রভৃতি কুযোগের প্রভাব কখন

---

* পঞ্চতত্ত্বের চিনিবার উপায়, তত্ত্বের আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত রূপে পরে বলিব।

হয় না। পরন্তু স্বরবলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ ও শুভ হয়।

রাজদর্শন, প্রভুদর্শন এ চাকুরী করিবার জন্ম কিম্বা লাভজনক প্রভৃতি যে কোন শুভ কার্য্যে যাত্রাদি করিতে হইলে পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ দিন নির্ণয় করিবার রীতি আছে। তাহাতে মন্দতিথি, মন্দ-নক্ষত্র, বিষ্টিদোষ, বৈধৃতি, ব্যতীপাত, গণ্ড, ব্যাঘাতযোগ প্রভৃতি কুযোগে কোন কার্য্য করিতে নাই,—করিলেও বিঘ্ন হয়। কিন্তু একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে তত্ত্বানুকূলে যাত্রাদি যে কোন কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। মন্দতিথি, বার ও কুযোগাদি কোন মন্দ করিতে পারে না।

যদিচ উপরোক্ত কিছুই বিচার করিতে হয় না এবং বিচার করিবার আবশ্যকও নাই; কিন্তু বারবেলা, কালরাত্রি বিচার করিতে হইবে। বারবেলা বিচার করিবার বিধি স্বরশাস্ত্রে নাই; কিন্তু গুরূপদেশ আছে। একারণ গুরূপদেশ মতে বলিতেছি যে, পঞ্জিকায় লিখিত প্রত্যেক বারে নির্দ্দিষ্ট বার বেলা, এবং রাত্রিকালে কালরাত্রি বিচার করিয়া যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিতে হইবে। কারণ বারবেলা, কালবেলা ও কালরাত্রি শিবশক্তির তমোগুণ-সম্ভূত সর্ব্ব সংহারক কাল ভাব *। ইহাতে যে কোন কার্য্য করিলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

কালবেলা ও কালরাত্রি শিবশক্তির তমোগুণ-সম্ভূত বলিলাম; তাহার গূঢ় রহস্য এখানে প্রকাশ করা অসম্ভব। পাঠকগণের অবগতির জন্ম একটু আভাস দিতেছি। ভগবতী আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর এক নাম কাল রাত্রি। মুণ্ডমালা তন্ত্রোক্ত কালী শত নামে—

"কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী—

"কাল রাত্রির্মহারাত্রি র্মোহ রাত্রিশ্চ দারুণা।"

টীকা—ত্বং কালরাত্রিঃ কালো মরণং স এব রাত্রিঃ ব্রহ্মণো মরণ লক্ষণ রাত্রিঃ।

বাহুল্য ও গূহ্য বলিয়া ইহার বেশী প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

দিবাভাগে কোন্ সময়ে বারবেলা ও কালবেলা হয় এবং রাত্রিকালে কোন্ সময়ে কালরাত্রি হয়, তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকাতে প্রত্যেক বার পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত লেখা আছে। সে জন্ম এখানে তাহা আর বলিলাম না।

কাল বেলা, কাল রাত্রিতে যাত্রাদি কার্য্য করিলে তাহার ফল—

"যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু তং ত্যজেৎ॥"

(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থ—কালবেলাদিতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়, বিবাহে কন্যা বিধবা হয়, উপনয়নে ব্রহ্ম বধের পাপ হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিবে।

স্বরশাস্ত্রানুসারে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিবার সময় শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগাদিতে না করিলে কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না। স্বরানুসারে

---

* কাল বেলা ও কাল রাত্রির প্রকৃত অর্থ যাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি, তাহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত এবং আমাদের দেশীয় জ্যোতিষী ও পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত। বাহুল্যভয়ে প্রকৃত অর্থ এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কার্য্য স্বরের দিকশূল এবং উপরোক্ত বার-বেলাদি বিচার করিয়া তত্রানুকূল শুভক্ষণে করিতে হইবে।

ইত্যগ্রে বলিয়াছি নিশ্বাস গ্রহণ সময় কোন স্থানে যাত্রা করিবার জন্য প্রথম পদক্ষেপণ করিতে হইবে। উহা ভিন্ন নিশ্বাস গ্রহণ সময় গৃহস্থ লোকের আর একটি কার্য্য আছে। তাহা নিম্নে বলিতেছি।

শ্বাস গ্রহণ সময়ে কর্ত্তব্য।

মনুষ্যগণ নাসিকার দ্বারা অহরহ শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহাতো সকলেই জানেন। প্রত্যেকবার শ্বাস গ্রহণ সময়ে 'সঃ' এই বর্ণ ও শ্বাস পতন কালে 'হং' এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।* 'সঃ' শক্তিরূপিণী। শক্তিরূপিণী স-কার স্থিত শ্বাস গ্রহণ সময়ে কাহাকে কিছু দান করিলে, প্রদত্ত বস্তুর পরিমাণ অপেক্ষা দানের ফল অত্যধিক গুণ হইয়া থাকে। যথা—

শ্বাসে সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেঽস্মিন্ কোটিগুণং ভবে-
ন্নিতং॥

অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ সময় 'স' উচ্চারিত হয়। ঐ সকার স্থিত শক্তিরূপিণী শ্বাস—নিশ্বাস গ্রহণ সময় যাহা কিছু দান করা যায়, সেই দানের ফল এই জীবলোকে কোটি কোটি গুণ অধিক হইয়া থাকে।

গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য এই যে, মুষ্টি ভিক্ষা অথবা অর্থ, বস্ত্রাদি যাহা দান করিবেন, তাহা স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণ সময় দিবেন। এরূপ দান করিলে দান দ্রব্যের পরিমাণাধিক ফল লাভ হইবে।

আহার ও পরিশ্রমান্তে কর্ত্তব্য।

ভুক্ত মাত্রেচ মন্দাগ্নৌ শ্রৌণাং বথার্থ কর্ম্মণি
শয়নং সূর্য্যবাহেন কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বুধৈঃ॥

ভুক্ত মাত্রাদৌ বাম পার্শ্বেন, শ্রান্ত্যাদিষু দক্ষিণ পার্শ্বেন শয়নং কার্য্যমিতি তাৎপর্য্যং।

আহারান্তে অগ্রে বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে। পরিশ্রম অন্তে ও শ্রান্ত ক্লান্ত হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে।

পাঠকগণ নিত্য আহারান্তে বাম পার্শ্বে* ও কোন পরিশ্রম অন্তে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবেন। রাস্তা হাঁটিয়া কিম্বা কোন কার্য্যে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে (ডান্ কাত্ হইয়া) শয়ন করিলে ক্লান্তি দূর হইয়া শরীর কেমন সুস্থ বোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। পরিশ্রম নিবন্ধন শরীর ক্লিষ্ট ও ধাতু গরম (রুক্ষ) হয়, তাহারও প্রভূত উপকার হইবে।

অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় বারান্তরে বলিব।

ক্রমশঃ।

* হিন্দু-পত্রিকা ১৩০৮ সাল আষাঢ় সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

* নিত্য আহারান্তে বামপার্শ্বে শয়ন করাই উচিৎ। যাঁহাদের দিবাতে শয়ন করা অভ্যাস নাই, কিম্বা কার্য্যানুরোধে আহারান্তে বাহিরে যাইতে হয়, তাঁহাদেরও আহারান্তে কিছুক্ষণ উপবেশন পর কিছুক্ষণ বামপার্শ্বে শয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে, তাহা নাড়ী চালনার বর্ণনায় বলিব।

প্রার্থনা।

"ন জানামি তব তত্ত্বং কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥"

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়
যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

মহম্মদপুরের বর্ত্তমান অবস্থা।—

সীতারামের রাজত্ব কালে মহম্মদপুর একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। রাজধানী যেরূপ হওয়া আবশ্যক তদ্রূপই ছিল। কোন গৃহস্থের কিছুরই অভাব ছিল না। রাজবাটীর চতুঃপার্শ্বে রীতিমত প্রকাণ্ড গড়, কারাগার, বিচারালয় ইত্যাদি সমস্তই ছিল। অনেক ধনী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান ও পণ্ডিতের বাস ছিল। সামাজিক-শৃঙ্খলাও অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। অদ্যাপি মহম্মদপুর-সমাজ "রাজ সমাজ" বলিয়া অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে মহম্মদপুর এতদূর শোচনীয়-দশায় পরিণত হইয়াছে যে, সহসা কোন আগন্তুক জনপদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, ইহার পুর্ব্বোন্নতি কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। লোক সংখ্যা ও বসতি অতি অল্প, অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে আবৃত, ব্যাঘ্র, শূকর ইত্যাদি বন্য জন্তুর আবাস স্থান। উদারচেতা, পরোপকারী, স্বদেশ বৎসল, স্বধর্ম্মানুরাগী ও ধনবান্ লোকের অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণেও মধ্যবিত্ত অবস্থার অনেক ভদ্রলোক আছেন। কিন্তু সাধারণের উপকার, স্বদেশের উন্নতি কিংবা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কাহারও সহানুভূতি নাই। সে সমস্ত বিষয়ে সকলেই নিশ্চেষ্ট। সকলেই নিজের স্বার্থ সাধনে তৎপর। অন্য কোন বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। নিম্নে একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাতে স্থানীয়-লোকের অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

মহম্মদপুরের সুবৃহৎ দীর্ঘিকা রামসাগর পুণ্যাত্মা সীতারামের পরোপকারিতা, স্বদেশ বৎসলতা ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অধুনা রামসাগরই তৎপার্শ্বস্থ লোকের জীবন স্বরূপ; এই দীঘির জলই জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, অথচ ইহার জল যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে এবং জলাশয়টী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। জলও অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এক্ষণ কৃষ্ণসাগরের গভীরতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী, জল ও উৎকৃষ্ট। রামসাগরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তীরের উপরই বেশ্যা বুনা ইত্যাদি নিম্নতম শ্রেণীর লোকের বাস। পশ্চিম তীরের উপর বসতি নাই, ভয়ানক জঙ্গল পরিপূর্ণ। উল্লিখিত ইতর শ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদা রামসাগরে মল মূত্র ত্যাগ এবং অপবিত্র ও অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছে। স্থানীয়-লোকে গরু, ঘোড়া ইত্যাদি স্নান করায়। রজকেরা এই দীঘিতে রীতিমত কাপড় কাঁচিয়া ধৌত করে। জনপদেরপ্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই

৺কার্ত্তিক পূজা করেন, সেই সকল কার্ত্তিক-মূর্ত্তি রামসাগরে বিসর্জ্জন দিবার প্রথা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর অন্যূন চারি পাঁচ শত মণ মৃত্তিকা দীঘিতে পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রতিমাদি ইহাতে বিসর্জ্জনা দেওয়া হয় না। বৎসরান্তে ৺দশহরা স্নানের দিন বহুসংখ্যক লোকে গঙ্গা স্নান কামনায়, এই রামসাগরে স্নান করে। ইহার উত্তর তীরের উপর ৺গঙ্গা-দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়। যে সমস্ত লোকে রাম-সাগরে ৺দশহরা স্নান করিতে আইসে, তাহারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু লবণ চিনি ও নারিকেল ৺ গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে রাম-সাগরে ফেলিয়া দেয়, তাহাতেও প্রতি বৎসর অনেক লবণ ইহার মধ্যে পতিত হয় ও জল অধিকতর লবণাক্ত হয়। এই দীঘির উত্তর তীর ব্যতীত অন্য তিন ধারেই অল্পাধিক জঙ্গল, সেই জঙ্গলের পত্রাদি পঁচিয়া জল আরও অস্বাস্থ্যকর হয়। বস্তুতঃ পার্শ্ববর্ত্তী লোকে ইহাকে স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় বিবেচনা করিয়াই যেন এইরূপ অত্যাচারাদি করে, তাহারা মনে করে যে, এই রামসাগরের জল কস্মিন্‌কালেও শুষ্ক হইবে না, তাহারা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এই দীঘিতে এইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে স্নানাদি করিবে। নানাকারণে এই দীর্ঘিকার দীর্ঘস্থায়িত্ব ও পরিষ্কৃত-জলের আশা খুব কম। স্থানীয়-ভদ্রলোকে একত্র হইয়া একটু চেষ্টা করিলেই অনায়াসে উল্লিখিত অত্যাচারাদি নিবারণ পূর্ব্বক স্বদেশ, নিজ পরিবার বর্গ ও প্রতিবেশী মণ্ডলের মহোপকার সাধন ও মহাত্মা-সীতারামের একটী কীর্ত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত বিষয়ে কাহারও মন আকৃষ্ট হয় না। সেবাইত মহারাজা নাটোরাধি-পতিরও তত মনোযোগ নাই, রাজ সরকার হইতে একেকবার এইরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সে আদেশ প্রতিপালন করেন নাহি। এইরূপ অনেক ঘটনাই আছে, সাধারণের অবগতির জন্য একটী মাত্র লিখিত হইল। বাহুল্য ভয়ে বেশী লিখিতে সাহসী হইলাম না। মহম্মদ-পুর অধুনা ম্যালিরিয়া পরিপূর্ণ বড়ই অস্বাস্থ্য-কর, জনপদবাসী প্রত্যেকের আকৃতি দেখিলেই সহজে অনুমিত হয় যে, তাহারা কোন না কোন ব্যাধিগ্রস্ত। যাহাদের কোন ব্যাধি নাই, তাহাদের শরীরে ও উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সবল সুস্থকায় সুপুরুষ প্রায় নয়ন—পথে পতিত হয় না। রীতিমত চিকিৎসকাদিরও অভাব। মহম্মদপুরের জল বায়ু এতদূর খারাপ হইয়াছে যে, কেন বিদেশী সুস্থকায় ব্যক্তি কিছু দিন এখানে বাস করিলেই তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। একটু বিশেষ অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও উন্নতির চিহ্ন সহজেই দৃষ্ট হয়।

১২৪৪ সালে মহম্মদপুরে মহামারী আরম্ভ হওয়ায়, জনপদটী একেবারে লোক শূন্য হয়। পূর্ব্বে যে বহুসংখ্যক লোকের বাস ছিল, তাহা জনপদ দর্শনেই সহজে বোধ গম্য হয়।

সীতারামের রাজ্য নাটোরের হস্ত গত হইলেও মহম্মদপুরের অবনতি ঘটিয়া ছিল না। নাটোরের সদর কাছারী মহম্মদপুরে

ছিল। মহম্মদপুর রাজধানীর ন্যায় উন্নত অবস্থাই ছিল, পরে নাটোরের জমিদারী বিক্রীত হইলেও মহম্মদপুরে নড়াইল, দীঘাপতিয়া, নাটোর, সাতুইর পরগণা ও নলদী পরগণার স্বতন্ত্র রীতিমত কাছারী আদি থাকায় একেবারে অবনতি হইয়া ছিল না। অবশেষে নড়াইল, দীঘাপতিয়া ও নলদী পরগণার কাছারী গুলি স্থানান্তরিত হয়, নানাকারণে এক্ষণ পূর্ব্ব গৌরব-রবি একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে, আর উদিত হইবার আশা নহি।

সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরকে পঞ্চ রত্ন বলে। এই মন্দিরটী খিলান করা ; মন্দিরের উপরে চারি কোণে চারিটী ও মধ্য স্থলে একটী, মোট ৫ পাঁচটী চূড়া ছিল, এক্ষণে মধ্যের ও পশ্চিম দক্ষিণ ও পশ্চিম উত্তর কোণের ৩টী চূড়া আছে, অবশিষ্ট দুইটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। মন্দিরটী দেখিতে অতি মনোহর, শিল্প নৈপুণ্য ও যথেষ্ট আছে। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের নিষ্কর সম্পত্তি অন্যান্য বিগ্রহ অপেক্ষা বেশী। প্রকাণ্ড বাড়ী ও প্রাঙ্গণ ছিল। চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা যোড় বাঙ্গলা ও প্রাচীর ছিল, এক্ষণে সমস্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটীর ও ভগ্ন দশা ; মন্দিরটী দেখিলেই মনে এক অনির্ব্বচনীয় ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও বিষাদ একত্র এক সময়ে অনুভূত হয়। সীতারামের মন্দির ইত্যাদি দর্শনেই সহজে অনুমান করা যায় যে, তখন দেশীয় শিল্প কার্য্যের অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নতি ছিল।

কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর নিকট হইতেই মহম্মদপুরের বর্ত্তমান বাজার পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ গড় দৃষ্ট হয়। এই গড়টী অত্যন্ত গভীর, সর্ব্বদাই ইহাতে বেশী পরিমাণে জল থাকে। অনেক লোকের এই গড়ের জলে উপকার হইতেছে। অনেকে বলেন যে, এই গড় নাটোরের দয়াময়ী ৺রাণী ভবানীকৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাণী ভবানীর এতাদৃশ সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড গড় খননের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। তিনি লোকের উপকারার্থে বৃহৎ দীঘি পুষ্করিণী আদি খনন করাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ সুদীর্ঘ গড় খননের আবশ্যকতা দেখা যায় না। তাহারা বলেন যে, এই গড়টী ও সীতারামের কৃত। সীতারামের প্রাচীর চতুঃপার্শ্বে আর একটী গড় আছে, তাহাতে সর্ব্বদা জল থাকে না, এইটীই যে সীতারামকৃত তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। কানাইনগর সীতারামের রাজধানীর অন্তর্গত। শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হওয়ায় যে, সীতারামের সময় রথ যাত্রার দিন রথ মহম্মদপুর হইতে এই গড়ের উপর দিয়া কানাইনগর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া হইত, পরে নাটোর হইতেও সেইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, এক্ষণে ততদূর পর্য্যন্ত রথ টানিয়া লওয়া হয় না। গড়ের ধারও জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। ৺রাণী ভবানীকৃত দুইটী দেব-বিগ্রহ মহম্মদপুরে ও কানাইনগরে স্থাপিত আছে। তিনি দয়াময়ী দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া বিখ্যাতা, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক এই গড় খনিত হয়, ইহা সহজে বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে। সম্ভবতঃ সীতারাম এই গড় খনন করান।

এইরূপ বহুদূর ব্যাপী গড় ৺রাণী ভবানীর কাটিবার কোন কারণ দেখা যায় না, সীতারামের গড় কাটিবার অনেক কারণ ছিল। ১ম—গড় খনন করাইয়া জনপদ উচ্চ করা। ২য়—শত্রু পক্ষ হইতে সহসা আক্রমণ নিবারণ, ৩য়—লোকের উপকার, ৪র্থ—তিনি বিলাসী ছিলেন, কানাইনগর পর্যান্ত নৌকারোহণে জল বিহার করিতেন ইত্যাদি অনেক যুক্তি মূলক কারণ দেখা যায়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, এই গড় ৺রাণী ভবানী কৃত; স্থানীয় অল্প সংখ্যক ও কিছু দূরবর্ত্তী অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, সীতারাম কৃত। মদীয় প্রথম প্রস্তাবে যে রাণী ভবানীকৃত একটী গড় মহম্মদপুরে আছে লিখিত হইয়াছে, সে এই গড়। তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল।

সীতারামের রাজবাটীতে অদ্যাপি ৺দুর্গোৎসব পূজাদি রীতিমত হইয়া থাকে। রাজবাটীর দুর্গোৎসবের প্রতিমাতে দেবমাহাত্ম্য আছে শ্রুত হয়, কারণ ঐরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না এরূপ প্রকাশ। যাহারা রাজবাটীর প্রতিমা প্রস্তুত করে, তাহারাই বলে যে, অন্যত্র অনেক স্থানে তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী যত্ন ও মনোযোগ সহকারে প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি কোথায়ও হয় না। স্থানীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একবাক্যে এইরূপ বলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিমূর্ত্তি অতিশয় মনোমুগ্ধকারিণী হইয়া থাকে। প্রতিমাতে ডাকেরসাজ ইত্যাদি দেওয়া হয় না। মুকুট মালা ইত্যাদি সমস্ত আভারণই মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। শিল্প মহিমাও যথেষ্ট এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। সীতারামের সময় হইতেই এই নিয়ম প্রচলিত আছে। রাজবাটীর প্রতিমা দর্শন করিয়া সেই প্রতিমা প্রস্তুতকারীদিগের দ্বারা মহম্মদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় তাঁহার নিজের বাটীর দুর্গোৎসবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াথাকেন। কিন্তু উক্ত মূর্ত্তি রাজবাড়ীর ন্যায় মনোহারিণী ও ভক্তি প্রদায়িনী হয় না, এইটী চাক্ষুষ-প্রমাণ। আরও শুনা যায় যে, এই প্রতিমা প্রস্তুতকারীর বংশ থাকে না, তবে অর্থলোভে দূর দেশের লোকে আসিয়া প্রস্তুত করে। সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত-বিগ্রহগুলির পূজক ব্রাহ্মণ, চাকর খানসামা ইত্যাদির বংশ থাকে না। অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা অপবিত্র অবস্থায় পুষ্পচয়ন ও সেবার কার্য্যাদি করে বলিয়া তাহাদের বংশ লোপ পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অপবিত্র অবস্থায় থাকে, দেব সেবার কার্য্য ভক্তি সহকারে করে না। অনেক বিষয়ে অবহেলা করে।

সীতারামের চরিত্রে কেহ কেহ দোষারোপ করেন এবং বলেন যে, তিনি অত্যন্ত বিলাসী, কামুক ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ইহা তাঁহাদের মনের ভ্রম মাত্র। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও প্রাচীন ব্যক্তি কেহ এরূপ বলেন না। অতি অল্প লোকে এরূপ প্রকাশ করেন। যখন কোন ইতিহাস বা জীবন চরিত নাই, শ্রুতি পরম্পরায় জ্ঞাত হইয়া লিখিতে হইতেছে, তখন লেখা কর্ত্তব্য বলিয়া বাধ্য হইয়া লিখিতে হইতেছে, নচেৎ মহৎ চরিত্রে এরূপ দোষারোপ করা নিতান্ত অবৈধ। ফলতঃ

তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না থাকাও সম্ভব পর নহে। ধর্ম্মই যে একমাত্র সুহৃৎ, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। এক মাত্র ধর্ম্ম-বলেই তিনি এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিলাসী ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও কোন স্ত্রী লোকের সতীত্ব নাশ বা তদ্রূপ কোন ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ শ্রুতি গোচর হয় না। জনপদস্থ প্রায় সমস্ত লোকেই তাঁহাকে পুণ্যাত্মা, নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্রচেতা, কীর্ত্তিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। সুখসাগর ইত্যাদি বিলাসিতার চিহ্ন দেখিয়া কেহ কেহ মূল বৃত্তান্ত না জানিয়া এতাদৃশ মহাত্মার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন। বিশেষতঃ তাঁহার রাজত্ব সময়ে নবাব জামাতা আবুতারা সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়া প্রজার উপর নানা পাশব-অত্যাচার করেন। তিনি গর্ব্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া দেখিতেন, অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে জলে ফেলিয়া আমোদ প্রাপ্ত হইতেন। সীতারাম এইরূপ অত্যাচার শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিতে আদেশ দেন, তদনুসারে তাহার মস্তক কাটিয়া সীতারামের সমীপে আনয়ন করা হয়। নিতান্ত সরলমতি তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রান্তি বশতঃ সেই দোষ সীতারামে অর্পণ করিতে পারেন। অথবা বাঙ্গালী অনুকরণ প্রিয় এবং কোন ব্যক্তি বিশেষে যে সমস্ত দোষ গুণ ইত্যাদি দেখে বা শুনে, তাহার সত্যাসত্য না জানিয়া বা মূল কারণ না বুঝিয়া সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে সেইরূপ মনে করে। বর্ত্তমানে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী জমিদার ইত্যাদি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রায়শঃই অত্যন্ত বিলাসিতার প্রিয় ও কামুক হয়েন। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকেন। জিতেন্দ্রিয় জমিদার ইত্যাদির সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। এজন্য কেহ কেহ মূল তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মনে করেন যে, সীতারাম স্বাধীন রাজা ও অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রেয়ের দাস হইয়া সর্ব্বদা কলুষিত-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, তদনুসারে তাঁহারা সেইরূপ স্বকপোল কল্পিত গল্পাদি অতি রঞ্জিত করিয়া উপন্যাসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, এত অল্প কালের মধ্যে যে মহাত্মা নিজে স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এরূপ চিরকীর্ত্তি স্থাপনা ও অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। তিনি একমাত্র ধর্ম্ম-বলেই এক সময়ে নবাবের সিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তাঁহার বিবাহিতা তিনটী স্ত্রী ছিলেন। তিনি ন্যায় ও ধর্ম্ম পথে থাকিয়া বিলাসিতা উপভোগ করিতেন, কদাচ কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা বা ধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই।

সীতারামের রাজ্য দক্ষিণে যশোহরের বঙ্গীয় বীরচূড়ামণি মহারাজাধিরাজ ৺প্রতাপাদিত্যের বংশধরের রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অন্যদিকে কোন পর্য্যন্ত ছিল তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি চতুশ্চত্বারিংশৎ পরগণার রাজা ছিলেন এরূপ প্রকাশ।

সীতারামের আত্মহত্যা বা শেষ জীবনী।

সম্বন্ধে আরও একটী প্রবাদ আছে যে, তিনি শেষ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধির বাসনায় দুইটি শিক্ষিত পারাবত লইয়া মুরসিদাবাদে নবাব সমীপে গমন করেন। যাত্রা কালে বাটীতে প্রকাশ করিয়া যান যে, যদি সন্ধি হয় এবং রাজ্য রক্ষার উপায় করিতে পারেন, তবে পুনর্ব্বার রাজধানীতে আগমন করিবেন, নচেৎ পারাবত দুইটী মুক্ত করিয়া তিনি তথায় আত্মহত্যা করিবেন। যবনের অধীনতা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। তিনি নবাব গোচরে সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং মণিরাম রায় নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার উকীল নিযুক্ত করেন। সন্ধির প্রস্তাবে নবাব প্রথমতঃ অসম্মত হন এবং সীতারামকে কিছু কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন। সীতারাম তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া আর নবাব সম্মুখে না যাইয়া নিজের বাসা বাটীতে থাকেন। মণিরাম রায় অনেক তর্ক বিতর্কের দ্বারা নবাবের তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক সীতারামের রাজ্যের বন্দোবস্তের আদেশ বাহির করেন। এদিকে রঘুনন্দন সীতারামকে বলেন যে "নবাব সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত নহেন, আগামী কল্য তোমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন"। তচ্ছ্রবণে সীতারাম অনন্যোপায় হইয়া পায়রা দুইটী উড়াইয়া দিয়া নিজ হস্তের অঙ্গুলীতে যে বিষাক্ত-অঙ্গুরীয়ক ছিল, তাহাই চুষিয়া নিজের জীবন নিজেই নাশ করেন। আরও শুনা যায় যে, সীতারাম মুরসিদাবাদে গেলে রঘুনন্দন তাঁহাকে বলেন যে, দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিলে তিনি নবাবের সহিত সন্ধি করাইয়া দিতে পারেন। তদনুসারে সীতারাম তদীয়াগন্ত লক্ষ্মীনারায়ণকে উক্ত টাকা লইয়া মুরসিদাবাদে যাইতে লিখেন। যখন লক্ষ্মীনারায়ণ টাকা লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হয়েন, তখন সীতারাম আত্মহত্যা করিয়াছেন। রঘুনন্দন তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত টাকা লইয়া বলিলেন যে, নবাব সীতারামকে হত্যা করিয়াছেন, তোমাদের সপরিবারে নবাব বধ করিবেন"। লক্ষ্মীনারায়ণও তাহা শুনিয়া তথায় আত্মহত্যা করেন। এ দিকে সীতারামের পায়রা দুইটী রাজধানীতে উড়িয়া আসে এবং রঘুনন্দন লোক পাঠাইয়া মহম্মদপুরে ঘোষণা করিয়া দেন যে, নবাব সীতারমও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছেন, সীতারামের স্ত্রী পুত্র সকলকেই তিনি মুরসিদাবাদে লইয়া বধ করিবেন। পায়রা দুইটী উড়িয়া আসায় এবং রঘুনন্দনের ঘোষণায় নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া সীতারামের স্ত্রী পুত্র বীর রমণী ও বীর পুত্রের ন্যায় যবনের হস্তে জীবন নাশ ভয়ে নৌকারোহণে জল মগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হন। কেবল সীতারামের কনিষ্ঠ পুত্র শূর নারায়ণ জীবিত ছিলেন। তিনি শেষে শ্যামগঞ্জের বাড়ীতে বাস করিতেন। সীতারামের আত্মহত্যা সম্বন্ধে এই জনরব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, অমূলক বলিয়াই ধারণা হয়। জ্ঞানী ও প্রাচীন লোকের যাহা ধারণা, তাহা প্রথম প্রস্তাবেই লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রবাদও যে নিতান্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা বলেন তাহাও নহে, তবে প্রথম প্রস্তাবে লিখিত যে তিনি বন্দী হইয়া নবাব গোচরে নীত হন, তথায় বিচার কালে নবাবের কর্কশ বাক্য শুনিয়া নিজ অঙ্গুলীর বিষাক্ত-অঙ্গুরীয়ক চুষিয়া

আত্মহত্যা করেন তাহাই যুক্তি যুক্ত বিবেচিত হয়। যখন শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হইয়া লিখিত হইতেছে, তখন সমস্ত প্রবাদগুলি লেখাই কর্ত্তব্য। মোটের উপর তিনি মুরশিদাবাদেই আত্মহত্যা করেন তাহা নিশ্চিত।

সীতারামের উকীল মণিরাম রায় সীতারামের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন কিন্তু বৃথা হইল। মণিরাম রায় বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহার নিবাস মহম্মদপুরের নিকট সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে। তিনি প্রথমে সীতারামের সভাসদ থাকেন, পরে মুরসিদাবাদে গিয়া নবাব দরবারে ওকালতী করেন। তিনি অনেক ভূসম্পত্তি করিয়া যান এবং তাঁহার বাটীতে কয়েকটী দেববিগ্রহ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশে এক্ষণে জগদ্বন্ধু রায় নামক একটী নাবালক পুত্র আছেন।দেব সেবা অদ্যাপি চলিতেছে সম্পত্তি অনেক হস্তান্তরিত হইয়াছে এক্ষণেও ৭০০। ৮০০৲ শত টাকার আয়ের সম্পত্তি আছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সীতারাম সম্বন্ধে যেরূপ শ্রুত হওয়া যায়, সে সমস্তই লিখিত হইল। সত্যাসত্য কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সীতারামের বিবরণ উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। জ্ঞানী, প্রাচীন ও অধিকাংশের কথানুসারে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশ্বাস যোগ্য। যাহা অমূলক বলিয়া ধারণা হয়, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল। সীতারাম সম্বন্ধে আর কোন জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না। যতদূর অবগত হইতে পারা যায় তাহা বর্ণিত হইল। সম্ভবতঃ, আর কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য।

সীতারামের পূর্ব্ব নিবাস রাঢ়দেশে গিধনা গ্রামে ছিল। ১ম প্রস্তাবে গিধোন গ্রাম লিখিত হইয়াছে, গিধোন স্থানে গিধ্না হইবে গিধ্নার এক্ষণ অন্য নাম প্রচলিত। বর্ত্তমান্ জেলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধ্না গ্রাম ছিল। তাঁহার পিতা উদয় নারায়ণ নবাব-সরকার হইতে চাকলা ভূষণার কার্য্যকারক হইয়া আসিয়া ভূষণায় বাস করেন। সীতারামের উর্দ্ধতন ৪। ৫ চারি পাঁচ পুরুষ দিল্লীর সম্রাট ও মুরসিদাবাদের নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন, তাহাতে নবাব সরকারে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সীতারামের পূর্ব্ব পুরুষ নবাব সরকার হইতেই খাস বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন। সীতারামের মূল উপাধি দাস ছিল।

সীতারামের তিন বিবাহ। তিনি জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণার নিকট ইদিনপুর গ্রামে প্রথমে বিবাহ করেন, পরে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের নিকট পাটুলীতে বিবাহ করেন। তৃতীয় বারে অর্থাৎ সর্ব্ব শেষে তিনি জেলা বীরভূমের অন্তর্গত দাস পলশা গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহাদের নাম ইত্যাদি অবগত হওয়া যায় না। সীতারাম উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের মধ্যে বংশে তত সম্ভ্রান্ত ছিলেন না। শেষে নিজে উত্তর রাঢ়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য মুখ্য কুলীনের মেয়ে বিবাহ করেন, ক্রমশঃ নিজে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহের স্ত্রীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র শূরনারায়ণের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন সন্তানাদি জন্মে না। তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র

শ্যামসুন্দর জন্ম গ্রহণ করেন। সীতারামের প্রপৌত্র ৺রাধাকান্ত রায় হইতেই তাঁহার বংশ লোপ পায়।

সীতারামের পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, সীতারাম বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ করেন। সীতারামের রাজত্ব কালে বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া রাঢ়দেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া সীতারামের রাজ্যে বাস করিতেন। বর্ত্তমান মুরসিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন টেঁয়া গ্রামের ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয় বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া মহম্মদপুর নগরে আসেন। সীতারাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক আশ্রয় দান করেন। তিনি কায়স্থের দান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং সীতারামের দান তিনি গ্রহণ করিবেন না, এই বিবেচনায় মহাত্মা সীতারাম মহম্মদপুরের অনতিদূরে যশপুর গ্রামের কতক অংশ বার্ষিক সামান্য কর ধার্য্য করিয়া তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে তথায় বাস করান। অদ্যাপি সেই সম্পত্তি কৃষ্ণপ্রসাদের বংশধরগণের অধীনে আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষ ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সীতারাম অনেক সময়ে তাঁহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ এবং শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিতেন।

প্রবাদ আছে যে, একদা সীতারাম ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি পুণ্য-বলে রাজত্ব লাভ করিয়াছেন, তদুত্তরে কৃষ্ণপ্রসাদ কিছু বিলম্বে বলিতে পারি, এইরূপ বলেন এবং তান্ত্রিক মতানুসারে একটী অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ-কুমারীকে আনাইয়া রীতিমত পূজা ইত্যাদি করণানন্তর উক্ত ব্রাহ্মণকুমারী হস্তে খড়ি দিয়া লিখিতে বলেন। প্রশ্নের উত্তর হইল যে, সীতারাম পূর্ব্ব জন্মের জলদান-পুণ্যবলে এ জীবনে রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। পরে প্রশ্ন করিলেন যে, কতদিন রাজত্ব স্থায়ী হইবে, তাহার উত্তর লিখিত হইল যে, চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব স্থায়ী হইবে। সম্ভবতঃ এই জন্যই সীতারাম তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, সীতারাম ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের গুণগ্রাম সন্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পারলৌকিক-মঙ্গল বিধানের উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম তখন অদীক্ষিত ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহাকে দীক্ষিত হইতে উপদেশ দেন। সীতারাম কৃষ্ণপ্রসাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিকে মন্ত্রদান এবং তাঁহাদের দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়েন। সীতারাম তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করেন, কৃষ্ণপ্রসাদ কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায়, অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। তদনুসারে কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বদা প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হইতেন, তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে দেওয়া হইত না, কিন্তু কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। অবশেষে ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর বাধ্য হইয়া সীতারামকে বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সীতারামের মন্ত্রগ্রহণের পরে কৃষ্ণপ্রসাদ

তাঁহাকে বলেন যে "তুমি আমাকে যে কষ্ট দিয়াছ, এজন্য জীবনের শেষভাগে তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে; তচ্ছ্রবণে সীতারাম তাঁহাকে ভক্তি সহকারে বলেন যে "আমাকে আর অভিসম্পাত করিবেন না, এক্ষণ যাহাতে আমার পরকালে মঙ্গল হয়, সেইরূপ উপদেশ দেন"। কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে সীতারাম কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের (পানীরাধাকৃষ্ণের) মন্দির স্থাপনাপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দিরে যে সংস্কৃত কবিতাটী প্রস্তরে অঙ্কিত ছিল, তাহা প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে "কৃষ্ণতোষ ভিলাষ" শব্দটী দ্ব্যর্থবোধক। তদীয় গুরুদেব কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়ের সন্তোষ অভিলাষী হইয়াই তিনি এই মন্দির উৎসর্গ করেন। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ ইত্যাদি সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মনোহর। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের নিষ্কর সম্পত্তিও বেশী। সীতারামের রাজত্বের শেষ অংশে কৃষ্ণপ্রসাদ টেঁয়ায় গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণজীবনের বংশধর মহম্মদপুর থানার অধীন ঘুল্লিয়া গ্রামে সীতারামের আশ্রয়ে বাস করেন। সেই বংশধরগণই ঘুল্লিয়ার গোস্বামী বলিয়া খ্যাত।

শ্রীবরদাকান্ত দেব।

(ক্রমশঃ)

গৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[২য় শ্লোকের আলোচনা।]

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

(অনুবাদ।)

আপনার বহু নাম করি বিস্তারিত।
নিজ সর্ব্বশক্তি তায় করিলা অর্পিত॥
সেই নাম-সকলের স্মরণ কারণ।
না করিলা কোনরূপ কাল-নির্দ্ধারণ॥
ভগবন্! এত কৃপা তব, কিন্তু হায়!
আমারো দুর্দ্দৈব এত, রতি নাহি তায়॥

"নাম্নামকারি বহুধা"—ভগবান আপনার বহুনাম বহু প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বহুভাবে, বহু অর্থে, বহুদেশে, বহু ভাষায় তাঁহার বহু বহু নাম বিস্তারিত, বিকাশিত ও বিদিত। ভারতবর্ষে হরি, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোপাল, গোবিন্দ, বাসুদেব প্রভৃতি বৈষ্ণব-তন্ত্রের মহামন্ত্রাত্মক নাম। তদ্ভিন্ন শুধু বিশেষণাত্মক নাম বিস্তর। "শতনাম" "সহস্রনাম" প্রভৃতি নাম-স্তোত্রেই তাহা বিজ্ঞেয়। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, এই অপর চতুর্ব্বিধ উপাসনা তন্ত্রেও শিব, হর, রুদ্র; কালী, দুর্গা, তারা; সূর্য্য, রবি,

অদিত্য; গণেশ, বিনায়ক, হেরম্ব প্রভৃতি মহামন্ত্রাত্মক ইষ্টনাম। মন্ত্রাত্মক আরও বহু নাম আছে। দ্বাদশ, শত, অষ্টোত্তর শত, সহস্র, অষ্টোত্তর সহস্র, ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট গাণিতিক সংখ্যানিবদ্ধ নামাবলী মধ্যে মন্ত্রাত্মক নাম ব্যতীত বিশেষণাত্মক নামও বিস্তর। উক্ত "শতনাম" স্তোত্রাদি ব্যতীতও বিশেষণাত্মক নামের অভাব নাই। ভগবানের এক নামই "সর্ব্বনাম।" ভগবতীকে তন্ত্রে "বর্ণময়ী, বর্ণরূপা" বলা হইয়াছে। প্রতিবর্ণই তাঁহার নাম। মহাশক্তি-পূজায় স্বর-ব্যঞ্জনের প্রতিবর্ণাত্মিকারূপে প্রতিবর্ণ প্রয়োগে তাঁহার পূজা-বিধান রহিয়াছে।

সংস্কৃতের শব্দ-কল্পভাণ্ডার হইতে ঈশ্বর-বোধক অসংখ্য নাম সংগৃহীত ও সংগঠিত হইতে পারে। কিন্তু মাত্র মন্ত্রাত্মক স্বরূপে উপাস্য নামগুলিই মূল শ্লোকের লক্ষিত। বিরাট হিন্দু-উপাসক মণ্ডলীর সেই উপাস্য নামও বহুসংখ্যক। আমরা উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। উপাস্য বা মন্ত্রাত্মক নামই ইষ্টনাম। সাধারণ বিশেষণাত্মক নাম হইতে তাহার শক্তি অনেক অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন—"হরি" নামের যে গুণ—যে মহিমা, "জনার্দ্দন" নামের অবশ্য তাহা নহে। "শিব" নামের যে প্রভাব, "পঞ্চানন" নামে তাহা নাই। 'দুর্গা' নামে যে শক্তি, "পার্ব্বতী" নামে তাহা অসম্ভব; ইত্যাদি। অবশ্য এসব তত্ত্ব সাধন-জীবনেই সুপরিজ্ঞেয়; আমাদের একরূপ অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। তবে ভগবৎকৃপায় এইটুকু মনে হয় যে, এই সমস্ত মন্ত্রাত্মক ইষ্টনাম-গুলিতে কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত আধ্যাত্মিক অমিত বল সঞ্চিত হইয়াছে; কত মুনি-ঋষি মহাপুরুষের, কত সিদ্ধ-যোগী-সাধু-ধীরের, কত ভক্ত-সাধক-মহাবীরের মহীয়সী জ্ঞান-শক্তি, কর্ম্ম-শক্তি ও ভক্তি-শক্তি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ করি এই মহামহিমাময় নামের স্মরণে পাষাণ-প্রাণেও পুলক-সঞ্চার হয়।

অস্মদ্দেশীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার্থীগণ প্রথমতঃ পৌত্তলিকতার ভয়ে ঐ সমস্ত যুগ-যুগান্তের মন্ত্রাত্মক সিদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া, নব-কল্পিত নাম লইয়া উপসনা করিতেন। এমনকি, মন্ত্রাত্মক নাম দূরে থাক্, বিশেষণাত্মক নাম নিতেও আপত্তি হইত। সুতরাং তাঁহাদের সেই উপাস্য নামগুলি বিশেষণ শব্দ মাত্রে কল্পিত হইয়াছিল। যথা "দয়াল" "দয়াময়" "প্রেমময়" ইত্যাদি। তাঁহারা অবশ্য ব্রহ্ম, পরম পিতা, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর প্রভৃতি পদও প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু "দয়াল" নাম ভিন্ন তাঁহাদের যেন ভাবের জমাট হইত না। ক্রমে তাঁহাদের উপাসনায় "আনন্দময়ী মা" আসিলেন, "দয়াল" মুকুট পরিয়া "হরি" আসিলেন, "সত্যং শিবং সুন্দরং" আসিলেন। ইদানীং প্রায় সকলেই আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। এখন প্রায় সমস্ত হরিসংকীর্ত্তন, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি ব্রহ্ম-সংগীতের অবাধিত প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। বোধকরি ব্রাহ্মসমাজস্থ প্রকৃত উপাসনা-পিপাসুগণের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবান ক্রমশঃ তাঁহার নিত্য সিদ্ধ ও সকল-সাধ্য মন্ত্র-নামাবলী তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছেন। শুনিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন যথাসম্ভব বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রা-

ত্মক নামগ্রহণ বা মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণও করিতেছেন। ইহা অবশ্য সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রায় বঙ্গীয় আদি-ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় হিন্দুস্থান, সিন্ধু, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের "আর্য্যসমাজ।" তাহার উপাস্য নাম "ব্রহ্ম" "পরমাত্মা" প্রভৃতি বৈদান্তিক পদ। উপাসনার অতীত শুদ্ধ-তত্ত্ব-জ্ঞানাধিগম্য "অবাঙ্-মনসোগোচরম্" নির্গুণ 'ব্রহ্ম'ও এখন কালমাহাত্ম্যে সগুণভাবে উপাস্য নাম। খাঁটি হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য ঈশ্বর নাম ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য প্রাচীন অপ্রাচীন শাখা-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহেও বিস্তর উপাস্য নাম, যথা — বুদ্ধ, অর্হৎ, মহাজীন, মহাবীর, পরেশনাথ, অলখ্‌নিরঞ্জন, ত্রিনাথ, বিঠোবা, কর্ত্তা প্রভৃতি। এসব ব্যতীত, ভারতীয় বিরাট আর্য্য-উপাসনা-কল্পবৃক্ষের অপর বিস্তর শাখা, প্রশাখা, অনুশাখা,উপশাখা-ভেদে আরও বিস্তর উপাস্য ঈশ্বর-নাম বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে অনেক প্রকাশ্য উপাস্য নাম ব্যতীত গুপ্ত-সাধন-মন্ত্রাত্মক নামও অনেক; কিন্তু তৎসমস্ত সাধারণে অবিদিত ও অবেদ্য।

তারপর গড্, খোদা, জিহোবা, জোভ, করাতরা, ইত্যাদি নামমূলক উপাসনা-তন্ত্র মূলতঃ ভারত ভিন্ন অন্য দেশজ। এমন কি, দ্বীপনিবাসী আমমাংসাশী উলঙ্গ উল্কী-অঙ্কিতাঙ্গ অসভ্য-জাতীয়দেরও "সিম্‌সাক্" "পোজিন্" "পুতিয়াঙ্" "মম্বোজম্বো" প্রভৃতি উপাস্য ঈশ্বর-নাম রহিয়াছে: "মানব" সংজ্ঞায় পরিচিত জীব মাত্রেরই ঈশ্বর কৃপায় কোন না কোনরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-নাম আছে। এই জন্যই ত মানব-জন্ম দুর্ল্লভ জন্ম—সার্থক জন্ম—যেহেতু ভগবন্নামাধিকারের জন্ম।

এস্থলে আরও একটী কথা স্বভাবতঃ মনে আসে। এই পৃথিবীর তুলনায় ইহার একটি বালুকণা যত ক্ষুদ্র, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবী তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নগণ্য—অলক্ষ্য। ঈশ্বর সমস্তেরই কর্ত্তা; অতএব এই নগণ্য পৃথিবী-রেণুর রেণু নগণ্যতম কতিপয় মানবই কি কেবল সেই সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকে ভজে? আর এই সুপ্রকাণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি কেবল বিরাট বিচেতন জড়পিণ্ড মাত্র? ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? যোগ-সিদ্ধ সত্য-প্রসূত সর্ব্বতত্ত্বাত্মক আর্য্যশাস্ত্রও তাহা বলেন না। আর্য্যশাস্ত্রে অন্যান্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্রবাসী উচ্চতর চেতন জীবসত্তার আভাস-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাহউক, তৎপ্রসঙ্গের প্রসার এ প্রবন্ধে, প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। ফলকথা এই যে, পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-তারা নক্ষত্রের মধ্যে যে গুলিতে মানবের ন্যায় বা কিঞ্চিৎ তন্যূন বা তদতোধিক শক্তিশালী বাক্যকথনশীল বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যেও সমগ্র বিশ্বের কর্ত্তার উপাসনা ও উপাস্য নাম অবশ্য প্রচলিত আছে। ফলে অতদূর ভাবিতে বুদ্ধি অবসন্ন হয়। আর তাহা আমাদের অনেকটা অনধিকার চর্চ্চাও বটে। মোট কথা, দয়াময় ভগবান জীবের প্রতি দয়া করিয়াই আপনার বহুনাম বহুলোকে বহুপ্রকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্বময়ের নাম বিশ্বময়!

নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা।—নামে ভগবান নিজ সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন। সিদ্ধ মন্ত্রাত্মক ভগবন্নাম সমূহ ভগবদর্পিত

সর্ব্বশক্তি সঞ্চারে স্বয়ং ভগবৎপ্রতিম! আমাদের এই ক্ষুদ্র সান্ত পৃথিবীতেই সেই অনন্তস্বরূপের অনন্ত নাম অনন্ত-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর এই ভগবন্নামতত্ত্ব ভগবৎ কৃপায় আর্য্যধাম ভারতবর্ষে আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ বিচিত্র রস-রহস্য-বিলোড়নে ও বিশ্লেষণে অসাধারণ ও অনুপম-ভাবে বিবৃত, এমন বুঝি আর কোনও পার্থিব জাতির কোনও সাধন-শাস্ত্রেই নাই। নাম নামীর অভেদ-সত্তা, সুতরাং নামের সর্ব্বশক্তিমত্তা হিন্দু-তত্ত্ববিদ্যার অমূল্য আভরণ। ভগবন্নাম-তত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্র-রত্নভাণ্ডারের মহোজ্জ্বল মণি। "হরের্নামৈব কেবলম্"—হরির অর্থাৎ পরমেশ্বরের নামই কেবল সার—সর্ব্বস্ব; কারণ নামই তিনি। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই মহাবাক্য হিন্দু—অহিন্দু—উপাসক মানব মাত্রেরই স্বাধিকার-ভেদে সাধ্য ও আরাধ্য;—তবে কি না, নাম নামীর অভিন্নত্ব—নামের সঙ্গে রূপ-গুণ লীলার অপূর্ব্ব মিলনতত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্রের অদ্বিতীয় বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বই যে কলির সাধকের আশা-ভরসার অনন্য অবলম্বন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাশক্তিময়ী শিক্ষায় এ সত্য ভারত-বক্ষে প্রকৃষ্টরূপেই পরীক্ষিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাহাহউক, আর প্রায় সর্ব্বত্রই নাম কেবল নামীর স্মারক—পরিচায়ক চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র; সুতরাং নাম হিন্দুসাধকের সর্ব্বস্ব। হিন্দুশাস্ত্রে নামের শক্তিভেদে বর্ণ বা শব্দ-সংস্থান-ভেদ অতি গূঢ় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-বিহিত এবং কল্প-কল্পান্ত ব্যাপকতায় অনাদি-কাল-বোধিত।

প্রস্থান-ভেদে হিন্দুর প্রতি ইষ্টনামের কত প্রস্তিনাম। শতনাম-সহস্র-নাম স্তোত্রাদির কথা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। বহুবিধ স্তব-কবচ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই সর্ব্বশক্ত্যাধার নাম-চিন্তামণিহার আর্য্য-উপাসনা-দেবীর কমনীয় কণ্ঠে নিত্যোজ্জ্বল বিভায় বিরাজমান! ভক্তের উপাসনা-লভ্য হওয়ার জন্যই ভক্তিপ্রিয় ভগবান এক হইয়াও সহস্র নামে সহস্রীকৃত। আর সিদ্ধ মন্ত্রাত্মক সর্ব্বনামেই স্বীয়-সর্ব্বশক্তি সহ অবতারিত। অতএব প্রত্যেক নাম এক একটী অবতার! সাধুগুরু-মুখে ব্যক্ত, ইহার প্রায় সর্ব্ব-নামাবতারেই ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রকটিত। কয়েক-টীতে মাত্র ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয় শক্তিই সঞ্চারিত। আর দু-একটীর পূর্ণমাধুর্য্যে মহেশ্বরও মোহিত! ফলে এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নাই। তবে এইটুকু মাত্র নিবেদ্য যে, আধ্যাত্মিক ইষ্টসাধন ত দূরের কথা, সামান্য বৈষয়িক ইষ্টসাধনেও বিষয়-ভেদে নাম-ভেদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা। "ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দ্দনং" ইত্যাদি; অথবা বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষার্থে "শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী" ইত্যাদি কবচ-বিধিই ইহার প্রমাণ। গুহ্যাতিগুহ্য আগমোক্ত সাধন-তত্ত্বেও এই নামভেদ-রহস্যের অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-লীলা লুকায়িত!

মূলে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, এই উভয় শক্তি এবং তদন্তর্ভূত অনন্তশক্তি; অর্থাৎ ভগবানের সর্ব্বশক্তিই নামে নিহিত।

নামে সৃষ্টি-স্থিতি লয়, নামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,
নাম হয় মরণ-হরণ।
নামে আশা-পাশ খসে, পিয়ে নাম-সুধারসে,
পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥

আর চাই কি ? কৃষ্ণনাম-কল্পতরুতলে কাঙ্গাল হইয়া আঁচল পাতিতে পারিলে, সেই দেবের দুর্লভ্য শিবের সেব্য সুধা-কলটীর প্রসাদ জীবের ভাগ্যেও সুখলভ্য হয়। মানবের সৌভাগ্য-সঞ্জাত এহেন সুলভ সর্ব্বশক্তিমান্ নামের আশ্রয় যাহার পক্ষে দুর্লভ হয়, তাহারই যথার্থ দুর্ভাগ্য। নাম-নামীর অভিন্নত্ব, সুতরাং নামেই সাধন, নামই সাধ্য। এই সাধ্য-সাধনের একত্ব-জনিত অপূর্ব্ব সুবিধাটী স্বতঃস্বদীন কলির জীবের পক্ষে বড়ই উপযোগী; দুর্ভাগ্যবশে ও দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে তাহাতে বঞ্চিত হওয়া যে কি দুঃখের বিষয়, মূঢ় জীব আমরা তাহা বুঝিলাম না। জীবের এই দুঃখ ভাবিয়াই দয়াল গৌরাঙ্গ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন! আর তৎপ্রতিবিধানার্থ সাধ্য-সাধনের অভেদ রহস্য ভেদ করিয়া এই সুপ্রশস্ত ও সুগম নামসাধন-পন্থা দেখাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-হৃদয়রত্নস্বরূপ "হরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"যেইত সাধন সেই সাধ্য যবে হৈল।
উপায় উপেয় মধ্যে ভেদ না রহিল॥
সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব নামের কৃপায়॥"

নামে ভগবানের সর্ব্বশক্তি সমর্পিত, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর স্বমুখের সাক্ষ্য। কলির জীবের জন্য ভগবান যাহা করিয়াছেন, স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতার হইয়া সেই ভগবানই তাহা প্রচার করিতেছেন, এই পরমানন্দ-বার্ত্তায় যাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাসী, তাঁহাদের পক্ষে আর কথা কি ? তাঁহারা প্রেমানন্দে নামানন্দে মজে যাউন। আর উপাসনার্থী যাঁহারা মহাপ্রভুকে "ভগবদ্ভক্ত" মাত্র ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, এমন ভক্তও "নভূতো ন ভবিষ্যতি"—অতএব ভগবদ্ভজন বিষয়ে ভগবন্নাম-মহিমার অমন সত্যপূত সাক্ষ্যও আর সংসারে মিলিবেনা।

নামের মহীয়সী-শক্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"এক নামাভাসে তব পাপদোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥"

হেলায়-খেলায়, অপ্রেমে-উপেক্ষায় গৃহীত "সাপরাধ" নামেরও পাপবিনাশিনী—সুতরাং পারত্রিক সদ্গতিদায়িনী শক্তি আছে। সুবিখ্যাত অজামিলাখ্যানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফলে মহাপ্রভুর মহাবাক্যই উৎকৃষ্ট আপ্ত-প্রমাণ।

"নিরপরাধেতে নামে পায় প্রেমধন।"

"নামাপরাধ"শূন্য হইয়া নামসাধন করিতে পারিলে, সেই নামের শক্তিতে প্রেমধন লাভ হয়; সুতরাং কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমিকের কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার জন্মে।

শাস্ত্রে যে ভূরি ২ স্থানে নামের মোক্ষ-দায়িনী শক্তির উল্লেখ আছে, সে এই নিরপরাধ-সাধ্য নামের। সাপরাধ নাম-করার নামকে শাস্ত্রে "নামাভাস" বলিয়াছেন। ঠিক নাম হইল না, কিন্তু নামের আভাস মাত্রেই পাপক্ষয় ও সদ্গতিসঞ্চার হইল; কিন্তু নিরপরাধযুক্ত ও নামাসক্ত নামগ্রহণে মুক্তি এবং নামীর চরণ-সেবনের এক মাত্র উপকরণ ভক্তি লাভ হয়। মুক্তির ফল যে ভক্তি, তাহাই অহৈতুকী পরাভক্তি। যেহেতু বদ্ধ-জীবে শুদ্ধ অহৈতুকতা সম্ভবেনা।

সহজ উদাহরণের ভাবেও এই টুকু বুঝা যায় যে, কেহ বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া কাহারও সেবা

করিতে সমর্থ হয় কি? তুমি তোমার ভৃত্যকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া তোমার চরণ সেবা করিতে বলিয়া থাক কি? ফলে বদ্ধ দাসের প্রভু-সেবা অসম্ভব। দয়াল-হরি দয়া করিয়া যাহাকে স্বচরণ-সেবার চরম চরিতার্থতা প্রদান করেন, তাহার ভব-বন্ধন মোচনের ব্যবস্থা কাজেই তাঁহাকে করিতে হয়। অহো! তাই বুঝি চতুরশীতি লক্ষ গ্রন্থিতে বিজড়িত সেই বিষম বন্ধন-বিমোচনে এই নিরপরাধ-নিশিত নামাস্ত্র-প্রয়োগের ব্যবস্থা।

এ ব্যবস্থার শুভসমাচার সর্ব্বশাস্ত্রে সুতার-স্বরে কীর্ত্তিত ও সমস্বভাবে সংগীত! দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির আলোচনা করিতেছি।

নামের পাপসংহারিণী শক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

"নাম্নস্তু যাদৃশীশক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং নশক্নোতি পাতকং পাত-
কীজনঃ ॥"

পাপ-নাশে হরিনাম যত শক্তি ধরে।
পাপীর নাহিক শক্তি তত পাপ করে।

কি চমৎকার! কি অভয়-আশা আনন্দের স্বর্গীয় সুসংবাদ! কি পাপী-তাপীর প্রাণ-জুড়ানো দয়াময়ী দৈববাণী! কিন্তু হায়! গীতা-বর্ণিত অস্মদ্‌সদৃশ নরাকৃতি আসুর-প্রকৃতির ভাগ্যে ক্ষীরোদ সিন্ধুর সুরেন্দ্র-সেব্য সুধার পরিবর্ত্তে বাসুকীর বিষম বিষের ব্যবস্থা বিচিত্র নহে। আমরা হয়ত নামের অন্তরালে-পাপ-প্রলোভনে পড়িয়া নিদারুণ নামাপরাধ-গ্রস্ত হইতে পারি। নামকে "হজমীগুলি" ভাবিয়া, সারা দিন রাত পাপ-মল ভক্ষণ করি, আর শেষ রাত্রি ৫টা ১২ মিনিটের সময় একবার হ আর র-এ ইকারের সেই "হজমী-গুলী" প্রয়োগ করি! অমনি সব ভস্ম! এইরূপ দুরভিসন্ধিতে এইরূপ 'হরি' বলায় কাজেই নামাপরাধ ঘটে। এই নামাপরাধে হরি নামের পাপহারিণী শক্তি পাপ-বর্দ্ধিনীই হইয়া উঠে! ফলে এই জন্যই উহা নামাপরাধ। নামাভাসেই পাপক্ষয় হয় বটে; কিন্তু কাম বা কামনাকেই যখন পাপস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, নৈষ্কর্ম্ম্য বা মুক্তি-সাধ্য ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার জন্য নামাস্ত্র লইয়া, নামী-কৃপা বল-দৃপ্ত হইয়া, সাধক যখন বীর-বিক্রমে সংগ্রাম করেন, তখন তাঁহার সেই নামাস্ত্র নিরপরাধ-নিশিত হওয়াতেই নিঃসন্দেহ বিজয় লাভ হয়। ফলে সেইরূপ নাম-করার মত নাম করিতে পারিলেই পাপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত বিধ্বংসিত হয়। বাসনার বীজ পর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া যায়।

"যদি ডাকার মত ডাক্‌তে পারিস্, (দেখি) কেমন হরি থাক্‌তে পারে!" বাস্তবিক নামাপরাধমুক্ত নামাসক্ত নাম-সাধনই ডাকার মত ডাক। নামে খাঁটি ভালবাসা না হইলে নামাপরাধের ভয় ছাড়ায় না। নিষ্কাম নাম-সাধন চাই। নামের জন্যই নাম-ভজন চাই। নামকে ভাঙ্গাইয়া বিষয়-ক্রয় না হয়। কৃপণের ধনের ন্যায় নামধনই যেন সর্ব্বস্বধন জ্ঞান হয়।

"বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥"

আমাদের ভক্ত কবিবর তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ইহার কি সুন্দর অনুবাদ-ভাষ্য লিখিয়াছেন!

"সযতনে সঙ্গোপনে কৃপণ যেমন।
বার বার গণে গাঁথে আপনার ধন॥

তাই করে তোলাপাড়া—তাই নাড়াচাড়া।
আর কিছু নাহি জানে সেই ধন ছাড়া॥
তেমনি তোমার নাম হউক আমার।
ইষ্টমন্ত্র, জপমালা, ধ্যান-জ্ঞান আর॥"

ভগবন্নামের পাপসংহারিণী শক্তি-সংঘোষক বচন-হার-বিন্যাসে পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ সমলঙ্কৃত।

"অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥"

অবশেও নাম লইলে পুমান্,
সর্ব্বপাপ সদ্য যায়।
পশুরাজ-ভয়ে ভীত-চিত হয়ে
পশুরা যথা পালায়।

একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গীতেও এই ভাবের উক্তি শুনা যায়, যথা—

"শুনিলে 'গোবিন্দ'রব, আপনি পালাবে সব,
সিংহনাদে যথা করিগণ।" ইত্যাদি।

পাপেই যমের ভয়, কিন্তু নামের বলে পাপ পালাইলে, সে ভয়-জয় অবহেলেই হয়; তাই স্বয়ং যমরাজের উক্তি,—

"জিতংতেন জিতংতেন জিতংতেন যমান্তরং।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"
জিত তার জিত তার জিত তার যম-ভয়।
জিহ্বাগ্রে বিরাজে যার "হরি" এ অক্ষরদ্বয়॥

নারায়ণ-পরায়ণ মহামুনি গর্গ এই ভাবেই খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদদ্ভুতম্॥"
নারায়ণ মন্ত্র আছে, বাক্য আছে বশে।
কি আশ্চর্য্য! তবু নর নরকেতে পশে॥

মহাভাগবত গর্গমহর্ষির ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায় মোহান্ধ জীবের বরং তদ্বিপরীত ভাবই ভাবিতে হয়। "আহা! এমন সুখের সংসার! সখের প্রাণ! তাহাতে এমন মধুর বিষয়-বিলাস-মাদকতা! তন্মধ্যে কোথাকার ভুয়া নরক-কল্পনা ও নারায়ণ-জল্পনা লইয়া জীবিত ও তৃপ্ত থাকাই জগতে আশ্চর্য্য!" এই খানেই যোগী ও ভোগী বা ভক্ত ও ভাক্তের পার্থক্য! যোগী-ভাক্তের সেব্য নামামৃত বিষয়-বিষম্ন কীট ভোগী-ভাক্তের ভাগ্যে ঘটিবে কেন?

তাৎপর, যে মুক্তি কৃষ্ণভক্তি লাভের অনন্য-উপযোগিতা, যাহা জ্ঞান-মার্গে কঠোর-তপঃসাধ্য হইলেও, ভক্তি-মার্গে কেবল নাম-সাধন-সাধ্য, (পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে) তাহারই ভুরি ২ আর্ষ বাক্য-প্রমাণ হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু-একটি মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। স্বাধ্যায়-সেবী সাধকগণ পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্রের যত্র তত্র এবম্বিধ নাম-মাহাত্ম্যরত্ন বিকীর্ণ দেখিতে পাইবেন।

"মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকল নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

ভৃগুবর!
মধুর হতে মধুর—মঙ্গল-মঙ্গল।
সর্ব্ববেদ-লতিকার সৎচিৎ ফল॥
বারেক হেলা-শ্রদ্ধায় হেন কৃষ্ণনাম।
গীতমাত্র নরমাত্রে করে পরিত্রাণ॥

নিখিল ধর্ম্মতত্ত্ব-কল্পভাণ্ডার বেদের যে সার সর্ব্বস্বধন "হরিনাম," তাহাতে আর সন্দেহ কি?

'ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ,
সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।

অধীতাস্তেনযেনোক্তং
হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।"

ঋক্-যজু-সামাথর্ব্ব—ইতি বেদচতুষ্টয়—
অধীত, কথিত যার "হরি" এ অক্ষরদ্বয়।

ভগবন্নামের গুণ বর্ণিতে ভক্ত-রসনা শতধারে সুধাবর্ষণ করে। মহাবীর মহাযোগী ভারত-ভাগবত-ভূষণ ভীষ্মদেব বলিয়াছেন,—

"প্রাণকান্তার-পাথেয়ং সংসারচ্ছেদভেষজম্।
দুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

জীবন-বন-পাথের—ভবরোগহর।
দুঃখ-শোকহারী 'হরি'-নাম দ্বিঅক্ষর॥

বিবিধ-বিপদ-সঙ্কুল-মানব-জীবন ভীষণ অরণ্যই বটে। সে বিষম-বন-পথের পাথেয় বা সম্বল একমাত্র হরিনাম। বিকট বিকার-ভোগদুরারোগ্য ভবরোগে মহামহৌষধ এই হরিনাম। অপ্রাপ্ত প্রিয়ের অভাবজনিত দুঃখ ও প্রাপ্ত প্রিয়ের বিয়োগজনিত শোক, এই শোক-দুঃখের নিত্য ক্রীড়া-পুত্তলী সুদীন মানবের একমাত্র শান্তি-সান্ত্বনা এই হরিনাম! অতএব হরিনাম যদি সর্ব্বদুঃখ-শোকহারী হন, তবে কৃষ্ণ-দাসত্ব অভাবে জীবের যে দুঃখ, কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিরহে ভক্তের যে শোক, তাহা অবশ্য হরিনামই হরণ করিবেন। ভীষ্মদেব আরো বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম
কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কাম-কর্ম্মভিঃ॥"

ভক্তিভরে হিয়ে হরিতে মজিয়ে,
'হরিনাম' গেয়ে যেই—
ভক্ত যোগিবর ত্যজে কলেবর,
কাম-কর্ম্ম-মুক্ত সেই।

শুধু মুখের হরিনাম "নামাভাস" মাত্র হওয়াতে পুণ্যের সহিত দ্বন্দ্ব-সাপেক্ষ যে পাপ, তাহারই ক্ষয় হইতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ করিতে হইলে, কাম-কর্ম্মের সর্ব্ববন্ধন ছেদনপূর্ব্বক সংসার-দাসত্বে "এস্তফা" দিতে হয়। স্বতঃ সকামকর্ম্মী জীব কাহার অভয় আশ্রয় পাইয়া, তাহার জন্ম জন্মান্তর-সেবিত সংসার-দাসত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, নৈষ্কর্ম্ম্য-নির্ম্মল-হৃদয়ে অন্তরাত্মার চিরবাঞ্ছিত সেই কৃষ্ণদাসত্ব লাভে সমর্থ হয়? একমাত্র ভগবন্নামেরই আশ্রয়ে, সন্দেহ নাই।

মানবের ব্যবস্থাশাস্ত্র স্মৃতিও সর্ব্ব-ব্যবস্থা-সার-স্বরূপে বলিয়াছেন,—

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥"

'হরি' এ অক্ষরদুটি বারেক যে বলে।
কোমর বাঁধিয়া সে-ই মুক্তি-পথে চলে॥

মুক্তি-পথই ভক্তি-মন্দিরের পথ। অমুক্ত—বাসনা-বদ্ধ-যুক্ত জীবের সে ভক্ত হওয়ার অধিকার কোথায়? সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ একমাত্র নামই সে অধিকার দানে সমর্থ। সাধকের চির সম্বল নাম। প্রথমতঃ নামে পাপনাশ; পরে পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মের বীজ বাসনার বিনাশ—অর্থাৎ মুক্তি। পরে প্রকৃত ভক্তি লাভ এবং সর্ব্বশক্তিময়ী সেই কৃষ্ণ-ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণ-দাসত্ব লাভ। তাহাই জীবের পরমপদ, চরম সম্পদ, নিত্য সত্ত্ব, শাশ্বত স্বরূপ! আহা ভক্তচূড়ামণি ভৃগুমুনি এই ভাবটি ভাবিয়া ভগবদুদ্দেশে ভগবন্নাম-গৌরব এইরূপ গাহিয়াছিলেন,—

"সাধৈব তব গোবিন্দ কলৌ স্বতঃ শতাধিকম্।
যদাত্মাচ্চারণামুক্তিং বিনৈবাষ্টাঙ্গযোগতঃ॥"

হে গোবিন্দ ! তব নামের গৌরব
তোমাহতে শতগুণে ।
উক্তি মাত্র ফলে, মুক্তি কলিকালে,
অষ্টাঙ্গযোগাদি বিনে ॥

গোবিন্দ নিরুত্তর ! উচিত কথার কে জবাব করিতে পারে ? অথবা "মৌন-সম্মতিলক্ষণ"ও বলা যায়। কথাটা বড় ঠিক কি না। কথাটা জগৎ-জুড়ানো অভয়-বাণী—পাপী-তাপীর ভরসার খনি ! এই ভাবের একটি সুন্দর হিন্দী দোঁহা আছে।
"রাম সে রামনাম বড়া, সাগর উতারা রাম।
পেড়্-পাথরসে,'রামনাম'সেকুঁদকেহনুমান ॥"

অর্থাৎ—

রাম হতে রামনাম, বহুগুণ গুণধাম,
শিলা-বৃক্ষে বান্ধি সিন্ধু উত্তরিলা রাম ;
রামনাম মাত্র স্মরি, অপার-অর্ণব-বারি
এক লম্ফে হৈল পার বীর হনুমান !

সুবিখ্যাত সত্যভামা-ব্রতাখ্যান বর্ণনস্থলে কোন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

হরি হতে হরিনাম গৌরবে প্রধান।
নিজে হরি তুলাছলে করিলা প্রমাণ ॥
নিজে লঘু হয়ে নিজ নামে করিগুরু ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূরালেন বাঞ্ছাকল্পতরু ।

ভক্তের আর বাঞ্ছা কি ? নামই তাঁহার সর্ব্বস্ব। নামের গৌরবেই নামীর গৌরব ; তাঁহার নামই সেই নামী; ইহাপেক্ষা সাধকের সুখ-সুবিধার বিষয়ই আর কি আছে ? আবার সেই নামীই নামাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া, আত্মাধিক সুলভতা লক্ষ্যে নামের পক্ষে অধিকতর গৌরব বিধানকর্ত্তা, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয়ইবা কি আছে ?

সাধকের নামে অনন্যগতিত্ব—অনন্তআশ্রয়িত্ব স্বয়ং কৃষ্ণের একাত্মসাধিকা কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহে বিগতচেতনা শ্রীরাধার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিলেই তিনি আগতচেতনা হইতেন। আবার নিজে শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহ-কালে হরিনাম জপিয়াছেন !. নামেতেই কৃষ্ণ, সুতরাং নামের জপনে কৃষ্ণ-প্রাপণ সিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার বিরহ-বিদ্ধহৃদয় সুস্থ হইয়াছে। তারপর কৃষ্ণের আগমনে লীলারূপের যুগল-মিলনে নামীতে নাম অভেদ মিশিয়া গিয়াছেন !
"কুঞ্জদ্বারে লতামূলে হরিনাম জপা সা।"

রাধার কৃষ্ণনাম জপ সম্বন্ধে এই বিখ্যাত পৌরাণিক সাক্ষ্য বৈষ্ণব-সমাজে অবিদিত নহে। রাধা, নামীর আসার আশায় থেকে পলকে প্রলয় দেখে, শেষে "কুঞ্জদ্বারে—লতা-মূলে" নাম নিয়ে বসে গেলেন। নামেই নামীকে পেলেন ! তারপর লীলারূপে নামী এলে, নাম তাঁতে মিশে গেলেন ! প্রথমতঃ নামেইত রাধা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ পদ-গীতি—সেই বঙ্গ-বৈষ্ণবকবির বিমোহিনী বীণাধ্বনি স্মরণ করুন।—

"সৈ ! কেবা শুনাইল 'শ্যাম' নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো !
আকুল করিল মোর প্রাণ।
নাজানি কতই মধু 'শ্যাম' নামে আছে গো !
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ তনুয়া গো !
কেমনে পাইব সৈ তারে ?"

মরি মরি ! কি মোহ-মন্ত্র ! ভক্ত-জগৎ এই মন্ত্রে মুগ্ধ-বিবশ-বিহ্বল ! নামে মন্ত্রে,

নাম ভজে, নামীকে পাওয়া, আর নাম-নামীতে মিশে যাওয়া, এই মহাভাব-চিত্র মহাভাবরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর চারুচরিত্রে বিচিত্রবর্ণে সুচিত্রিত! ইহা গোলকের গুপ্ত-রস-তত্ত্ব, জীবের ভাগ্যে ব্রজ-লীলায় সুব্যক্ত; এবং ততোধিক কলির জীবের ভাগ্যে গৌর-লীলায় উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে জগৎ ব্যাপ্ত। আহা! এই মহাভাব-রসের কণিকাঘ্রাণেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। কিন্তু কর্ম্মদোষে এমন কপাল! এই গৌর-প্রেম-প্লাবিত প্রদেশে প্রসূত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াও আমরা মগ্ন শৈলের ন্যায় অচল পাষাণ হইয়া আছি। এ নিরেট পঞ্জর ভেদিয়া কিছুই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না; সুতরাং কি বলিব? কেবল বলিবার—গৌর-কৃপাহি কেবলম্।

গৌরাঙ্গচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ হইতে আমাদের ভক্তিভাজন ভক্ত কবিবর তারা কুমার কবিরত্নের সংগৃহীত এবং তাঁহার অমৃতভাণ্ড "পঞ্চামৃত" পুস্তকে তৎকৃত অনুবাদসহ প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গোক্ত ভগবন্নামমাহাত্ম্য সূচক কতিপয় শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাং।
মুক্তিঃ সঞ্জায়তে সদ্যো নামসংকীর্ত্তনাদ্ধরেঃ॥
সকৃদুচ্চারিতং যেন হরেকৃষ্ণেতি নিশ্চয়ং।
যমাধিকারং নো যাতি কাপট্যেন বিনা যদি॥
ত্রৈলোক্যে যানি পুণ্যানি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফলানি চ।
তুল্যতা তানি নো যান্তি হরিনামানুকীর্ত্তনৈঃ॥"

ভক্তের প্রাণের কথাটী এখনও বাহির হয় নাই। তাই অন্তর্যামী দয়াল গৌরাঙ্গ আরো বলিলেন—

"যো ভাবগদ্গদো ভূত্বা রোদিত্যচ্যুতকীর্ত্তনন্।
তস্য কৃষ্ণঃ পরিক্রীতস্তস্মাদ্ বিভাতি দেবতাঃ॥

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীতিপরাঙ্মুখ পাষণ্ডের উপায় কি? অতএব তাহার প্রতি কৃপা করিয়াই তাহার গতিও বর্ণন করিয়াছেন,—

"কদাচিদ্ যো ন গৃহ্লাতি কৃষ্ণনাম ভবামৃতম্।
মৃতঃ শ্বখরকোলানাং সতু যোনিষু জায়তে॥"

তারপর, আর এক শ্রেণীর ধর্ম্মকর্ম্মী লোক আছেন, তাঁহারা যাগ-যজ্ঞ দান-ব্রতাদির অনুষ্ঠানে আসক্ত থাকিয়াও, অনেকে আসল বিষয়ে উদাসীন। ইঁহারা কলির সাধকের সর্ব্বস্বধন ভগবন্নামধন সঞ্চয়ে তত সমুৎসাহী নহেন। আর সব আয়োজন আছে, কেবল "নামে রুচি" নাই। তবেই ফলিতার্থে কিছুই নাই; অথবা যা আছে, তা "লেবু টেবু সব আছে" গোছ! একটি কৌতুক-প্রবাদ-বাক্য অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে।—

"বিয়ের সব প্রস্তুত ব্যাই!
কেবল কন্যাটি আমার নাই!!"

এও ঠিক তদ্বৎ। যাহাহউক, ঐ সব বাহ্য-ধর্ম্ম-কর্ম্মীদের প্রতিও কৃপাবশে শিক্ষাদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

"দানং ব্রতং তপো যজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণং।
সকলং নিষ্ফলং লোকে হরিসংকীর্ত্তনং বিনা॥"

ভগবন্নামের শক্তি-সংঘোষিণী এই উক্তি-গুলি অতি সরল সংস্কৃতে রচিত; তথাপি এ গুলির পদ্যানুবাদ একত্রে নিম্নে প্রদত্ত হইল। পণ্ডিত তারাকুমারের পদ্যানুবাদ অতি মিষ্ট হইলেও তাহা একটু ভাববৎ বিস্তৃত বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই যথাসাধ্য অবিকল ও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ লিখিত হইল।—

পাপেতে নরকে পচে পাপী তাপী লোক যারা।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে সদা মুক্তি পায় তারা ॥
অকাপট্যে বারেক যে "হরেকৃষ্ণ" নাম লয়।
সে জন যমাধিকারে নাহি যায় সুনিশ্চয় ॥
ত্রৈলোক্যে যতই পুণ্য-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফলোদয়।
হরিনাম কীর্ত্তনের তুলনায় কিছু নয় ॥
যে ভাব-গদগদ হয়ে কেঁদে হরিনাম করে।
কৃষ্ণ তার ক্রীত হন—দেবেরাও তারে ডরে ॥
শুবামৃত কৃষ্ণনাম কভু না আস্বাদে যেই।
মরিয়া কুক্কুর-খর-শূকরত্ব পায় সেই ॥
দান-ব্রত-তপ-যজ্ঞ-শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণ।
সকলি নিষ্ফল লোকে বিনা হরিসংকীর্ত্তন ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র, শিক্ষা, সাধনা, নাম-প্রেম-প্রচার ইত্যাদি বিষয়ক বহুসংখ্য ও বহুবিধ আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, গুপ্ত, লুপ্ত গ্রন্থ বা সন্দর্ভ আছে ও ছিল; তৎসমুদায়ই নাম-শক্তিবর্ণিনী প্রভু-উক্তির পীযূষ-প্লাবনে প্লাবিত! সে প্লাবনে যে পশিয়াছে, সেই রসিয়াছে;—প্রেমানন্দে ডুবিয়া আবার নামানন্দে ভাসিয়াছে!

এদিকে কলির সাধনশাস্ত্র ("কলাবাগম-সম্মতা") আগম বা তন্ত্রের কর্ত্তা স্বয়ং সদাশিব বৈষ্ণব-তন্ত্র নিচয়ের যত্র যত্র হরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তত্র তত্র ভোলানাথ একেবারে ভাবে ভুলিয়া, প্রেমে গলিয়া, হৃদয়-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন! যেখানেই হরি-নাম-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গিত, সেইখানেই দেবাদিদেব মহাদেবের মহাহৃদয়ের অজস্র অমৃত-উৎস উৎসারিত! আমাদের স্থান অল্প; তাহারই এক গণ্ডূষমাত্র এস্থলে উপহার দিলাম। নামসাধনের বহুবিচিত্র ফলের যাহা পরম এবং চরম ফল, ভক্তের যাহা সার সম্বল ও প্রকৃত প্রাণের পিপাসার জল, অর্থাৎ কৃষ্ণ-নামে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তি-ফল; তৎসম্বন্ধে স্বয়ং শিবের স্বাভিমত ইহাতেই সুবিদিত।—

"যঃ পতত্যবনৌ গীত্বা হরের্নামানি গদ্গদঃ।
ভাবেন তস্য গোবিন্দঃ ক্রীতো ভবতি নান্যথা ॥"

হরি-গানে রত, ভাবে গদগদ,
ভূতলে লুণ্ঠিত যেই;
শ্রীগোবিন্দ হন তারি কেনা-ধন,
ইহাতে সংশয় নেই।

হরি-হর অভিন্ন। ভিন্ন ভাবাও "নামাপরাধ"। অতএব হরি-হর-বাক্যে আমরা কি পাইলাম? যে অকৈতব ভক্ত হরিনাম গানে ভাব গদ্গদ হইয়া দশাপ্রাপ্ত ও ভূপতিত হন, তাঁহারই জন্ম সার্থক; কারণ জগচ্চিন্তামণি-ধন তাঁহার "কেনা" হন! এই এক "কেনা" শব্দে যে ভাব ব্যক্ত হয়, আর কোনও শব্দের তাহা সাধ্য নয়। কেনা-বস্তুতে ক্রেতার পূর্ণাধিকার; অতএব নিরপরাধ-'নাম' মাত্র মূল্যে ভগবানে ভক্তের পূর্ণাধিকার হয়! লোকে কোন বস্তু বা বিষয়ের সামান্যত্ব বা অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইতে "নাম-মাত্র" শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু এস্থলে "নাম মাত্র" শব্দের অসামান্যত্ব ও মহা-মহিমত্ব কিরূপ! ফলিতার্থে যিনি মূল্য, তিনিই বস্তু! 'হরিমূল্য" দিয়াই হরিকে কেনা হরির বিধান! শ্রীমন্মহাপ্রভুও বহুবার বহুভাবে তাঁহার অকৈতব ভক্ত-মণ্ডলীকে এই গোলক-গুহ্যতত্ত্বের উপদেশ-প্রসাদ প্রদান করিয়াছেন। তাই তাঁহার শিক্ষাষ্টকের এই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য ঘোষণার্থ জগৎ লোমাঞ্চিত করিয়া তারস্বরে গাহিয়াছেন,—"নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"।

"নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।"—
দয়ার সীমা নাই। ভগবান তাঁহার এহেন নামের স্মরণাদি সাধনে কোন কালাদির নিয়মাপেক্ষা রাখেন নাই। প্রাত্যহিক আহ্নিক-কৃত্যে যে ত্রিসন্ধ্যা নাম-জপাদির বিধি, সূক্ষ্ম বিচারে তাহা গৌণ; পরন্তু কালাকাল-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বকাল নাম-স্মৃতি বা নামে স্থিতিই মুখ্য বিধি।

"হরিসে লাগি রহোরে ভাই !
তেরা কাল অকাল মিটি যাই ।।"

নামে লাগাই হরিতে লাগা। নামে লাগিয়াই থাকিতে পারিলে আর কালাকাল-বিচার-সাপেক্ষ নাম-জপাদির বিধি-বিশেষত্ব কোথায়? কোন যবন-যোগীর মুখে এই ভাবের একটি গান শুনা ছিল।—

"হর দমে আল্লাজীর নাম লিও।
দমে দমে লিও নাম, কামাইনা দিও।।"

ইত্যাদি। বড় প্রাণে লাগিয়াছিল; তাই যাবনিক হইলেও এবং বহুদিনের শ্রুত হইলেও আমি ভুলিতে পারি নাই। কথা কটি একেবারেই খাঁটি। তাহা যেন গীতা-ভাগবতের তরজমা! "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং" "যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ" "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং" "নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ" ইত্যাদি ঐ ভাবের ভূরি ভূরি বাক্য জগন্মান্য পরম প্রামাণ্য গীতা গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে অধীত হইয়া থাকে। উদ্ধৃতির স্থানাভাব। ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্র ত ঐ ভাবের উক্তি-মুক্তাহারে বিশিষ্টরূপেই বিভূষিত!

অপর, যে সময়ে শুচি থাকা যাইবে, সেই সময়েই নাম লওয়া চলিবে, কিন্তু অশুচি থাকার সময়ে নহে, এসব নিয়মাধিকারী "প্রবৃত্ত" সাধকের জন্য গৌণবিধি; মুখ্যতঃ এবম্বিধ শৌচাশৌচ-সময়-সাপেক্ষতা নাম-গ্রহণ বিষয়ে বর্জ্জিত। তবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-কর্ম্মের অন্যবিধ অঙ্গসম্পাদনে কর্ত্তার শুচি-কালের অপেক্ষা আছে। আহা! সে শুচিত্বও সংক্ষেপতঃ নামগ্রহণেই নিষ্পাদ্য। "বিষ্ণু"-স্মৃতি-আচমনেই সর্ব্বশৌচ সম্পাদন।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাংগতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃশুচিঃ॥"

শুচি বা অশুচি—ইতি সর্ব্বাবস্থাগত—
যে স্মরে বিষ্ণুরে—সেই বাহ্যান্তর-পূত।

তবে যে সেই নামজপেরও উপক্রমে পূর্ব্বক্ষণে আচমনে বিষ্ণু-স্মরণ, সে কেবল গঙ্গা-পূজার উপকরণ গঙ্গা-জলে ধৌতকরণ! অগ্নি স্বতঃপূত বলিয়াই পাবক। অগ্নির এক নামই "সদাশুচি"। অশেষ-কর্ম্ম-দাহক মহাঅগ্নি নামও ভুবন-পাবন ও সদাশুচি।

মনে করুন, যে সময়ে কেহ মলত্যাগ করিতেছে, আচারতঃ সে সময়টা তাহার অতি অশৌচের সময় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তখন কি অন্ততঃ মনে মনেও নাম স্মরিতে পারে না? ভাবুন, তখন যদি তাহার অন্তকাল উপস্থিত হয়; অন্ততঃ কোন বিপদ হয়, তখন কি সেই সাময়িক ও বাহ্যিক অশৌচের বাধায় তাঁহাকে কেহ না ডাকিয়া পারে? তখন কি আর শৌচ-সময়ের সাপেক্ষতা সম্ভবে? প্রকৃতি তখন আপনি ভগবন্নাম-স্মৃতি আনিয়া দেন। ফলে সেরূপ ঘটনা না ঘটিলেও, সে সময়ে এবং কোন সময়েই নাম স্মরণের বাধা নাই, বরং বিশেষ আবশ্যকতাই আছে। এমন একটা কালই কল্পিত হইতে

পারে না, যে কালে সেই কালান্তকারী সদাকাল-সাধু-স্মৃতি-বিহারী শ্রীহরির শ্রীনাম স্মরণ অযুক্ত। জগতে অযুক্ত যাহা, তাহা ভগবন্নামে অযুক্ত থাকারই ফল।

নিত্য-নাম সাধকের অভ্যাসই স্বতন্ত্র। তাঁহাদের নামের নেশা অষ্ট প্রহর লাগিয়াই আছে। তাঁহাদের নামের আমেজের বিরাম নাই। নামের ভাবের একটানা স্রোতে তাঁহাদের জীবন-স্রোতে অভেদে মিশিয়াছে। তাঁহাদের প্রতি হৃদ্‌স্পন্দ-সংস্ফুরণে—প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস বহনে নামেরই স্ফুরণ ও বহন হইতেছে! যোগশাস্ত্রোক্ত প্রাণন-ক্রিয়ার "হংস মন্ত্র" তাঁহাদের ইষ্টনামমন্ত্র সহ একীভূত হইয়া গিয়াছে। নামের কৃপায় তাঁহাদের অন্তর্বাহ্য অহর্নিশ নাম-রসে নিষিক্ত। আহা! তাঁহারা গৃহী হইলে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্রে নাম-মাধুর্য্য মুক্ষিত; তাঁহাদের সাধের সংসার নাম-সৌন্দর্য্যে শোভিত! আর তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাদের আত্মসর্ব্বস্ব নামেই সংন্যাসিত। "স্মর্ত্তব্যং সততং নাম নাত্র কালবিচারণা।"

সর্ব্বদাই নাম-স্মৃতি-সার।
নাহি তায় কালের বিচার॥

কি ভোজনকালে, কি শয়নকালে; কি ভ্রমণকালে, কি রমণকালে; কি যোগকালে, কি ভোগকালে; কি বাল্যকালে, কি বৃদ্ধকালে; কি ইহকালে, কি পরকালে; নাম-স্মরণ সর্ব্বকালে। ভগবৎ কৃপায় কোনরূপ কাল-নিয়মের অধীনতা না থাকাতেই এই সর্ব্বসিদ্ধিদ নাম-স্মরণ জীবের ভাগ্যে এত সুলভ হইয়াছে। ভগবন্নামসাধনই অনন্ত-সাধন-সাপেক্ষ কলির জীবের জীবনসর্ব্বস্ব হওয়াতেই এই সুলভতা। যাহা যত প্রয়োজনীয়, তাহা তত সুলভ হওয়াই প্রার্থনীয়। দয়াময়ের রাজ্যে ব্যবস্থাও তদ্রূপ। জগজ্জীবন বায়ুতে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রয়োজন ও সর্ব্বদা প্রয়োজন, এই জন্য সদাগতি বায়ু সদাই সর্ব্বত্র স্বতঃসুলভ। স্থান-সাপেক্ষতা না থাকায় এই ভৌতিক জগজ্জীবন বায়ু যেরূপ সুলভ, কালসাপেক্ষতা না থাকাতে আধ্যাত্মিক জগজ্জীবন নামও তদ্রূপ সুলভ। ফলকথা, ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া, সেই প্রাণাধিক নামে নিয়ত মজিয়া থাকা নিতান্তই সাধুগুরু-কৃপাসাপেক্ষ। হায়! সাধুসেবা-দীন গুরুভক্তি-হীন আমাদের উপায় কি?

"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্।—"

হে ভগবন্! তোমার এমনি দয়াই বটে। তাই ভক্ত কবিগণ চিরকাল "দয়ার সিন্ধু" বলিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তবে পৃথিবীতে আর উপমা দেওয়ায় কিছুই নাই, অগত্যা 'সিন্ধু' শব্দের প্রয়োগ। ফলে সে সিন্ধুতুলনায় এ সিন্ধু বিন্দু মাত্র!

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের কৃপাই বিশ্বের সর্ব্বস্ব। 'ব্রহ্ম' পদে এস্থলে সেই পূর্ণব্রহ্মই লক্ষিত। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ব্বৃত্ত; তাঁহাতে দয়াবৃত্তির কল্পনা অদার্শনিক। পরস্পরসাপেক্ষ দুই বিরুদ্ধ সত্তার নিরপেক্ষ অবিরুদ্ধ সমাবেশেই পূর্ণত্ব। অতএব যুগপৎ নির্গুণ ও সর্ব্বগুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম ভগবানই কৃপাময়। সেই কৃপাই জগজ্জীবন—সংসার-সার ধন।

বিরাট বিশ্বের বিপুল কুক্ষিতে লুক্কায়িত এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের

প্রকাণ্ড খ-কোষে এই ক্ষুদ্র সৌরজগৎ; তাহাতে এই অতিক্ষুদ্র পৃথিবী; তাহাতে আবার এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মানব! অতএব এই অখিল অনন্ত সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম ভগবানেরই বিশ্বসর্ব্বস্ব কৃপার কথা মানুষের ভাষায় প্রকাশ-প্রয়াস প্রকৃতই প্রহসন মাত্র;—বাল-বাতুলের ব্যর্থ-চেষ্টার বিড়ম্বনা মাত্র। বলিতে কি, স্বয়ংভগবানও "ঈশ্বর" স্বরূপে সে বিষয়ে হারি-মানিয়াছেন!

"কে ক'বে সে কৃপা-কথা কথার চেষ্টায় ?
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ পরাঙ্মুখ যায়!
অনন্ত অনন্তমুখে অন্ত নাহি পেয়ে,
রাখিলা সে কৃপাময়ে হিয়ায় শোয়ায়ে!
বাগ্দেবী অবাক্ নিজে বর্ণনে যাহার,
নীরবতা—নীরবতা স্তুতি মাত্র তার!
যদি কিছু স্তুতি করা আবশ্যক অতি,
"নীরবতা স্তুতি তাঁর" এই মাত্র স্তুতি।"

ভগবদবতারবিশেষ ব্যাসদেব স্তুতি দ্বারা ভগবানের অনির্ব্বচনীয়তা-খর্ব্বীকরণরূপ অপরাধ চিন্তা করিয়া "স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা-খিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া" বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। অতএব অনির্ব্বচনীয় ভগবৎকৃপা-তত্ত্বের বর্ণনার্থ বচন রচনে বিরত থাকাই বিহিত। কিন্তু প্রগল্‌ভ ভক্ত তাহা ঠিক পারে কি? এই জন্যই কবি-লেখনী প্রেমিক, পাগল ও বালককে অনেকটা এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। ফলে শ্রীভগবানের নিভৃত-নির্ম্মিত সাধের ভক্ত-হৃদয় যখন ভগবৎকৃপার ভার আর বহন করিতে পারে না, তখন তাহা আপনি উচ্ছলিত হয়। ভক্ত তখন ভাবাবেগে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইলেও, নয়ন কোন বাধাই মানে না! সেই ভুবন-পাবন নীরব নয়নধার কবি-কোটি-কল্পিত স্তুতিগীতিকেও পরাস্ত করে!

সিদ্ধর্ষিগণের "নিঃশ্বসিত ন্যায়" শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ-গঠিত গোস্বামীম-গুলীর সন্দর্ভসমূহেরইবা কথা কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বর্ত্তমান,স্বনাম-খ্যাত পণ্ডিতবর ও সাধকপ্রবর অধুনা নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ মহাশয়ের লিখিত "হরিনাম-চিন্তা-মণি" গ্রন্থখানি ভগবন্নাম-কৃপা-মাহাত্ম্য ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভজনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রিয় পাঠকগণকে পড়িতে অনুরোধ করি। আশা করি, তৎপাঠে তাঁহারা বুঝিবেন যে, এই বিপুল বিষয়-বিপ্লাবিত বিংশশতাব্দীর ভগবদ্ভক্তের লৌহলেখনী-মুখেও ভগবদিচ্ছায় ভগবন্নাম-কৃপা-তত্ত্বরসের কি অমল উৎস উৎসারিত হইয়াছে!

সে যাহাহউক, শ্রীভগবান স্বকর্ম্মানুসারী বহুবিধ অধিকারী জীবের সংসার-নিস্তারণার্থ নিজের বহুবিধ নাম-বিস্তারণ ও তাহাতে নিজ সর্ব্বশক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক যে অসাধারণ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন; অপিচ, তাহার স্মরণ-মননাদি সাধনে কোনরূপ সময়-সাপেক্ষতাদির অধীনতা না রাখিয়া যে কৃপার উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিতে ভক্ত-জীবন গৌরহরি গাহিয়াছেন —"এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্!" আহা! আমরা কিম্বকথনও এই মহাগীতির প্রতিধ্বনি করিয়া গাইতে পারিব যে, হে জীব-সর্ব্বশুভদ! নামানন্দ-নীরদ! প্রেমপারাবার—অপার করুণাধার শ্রীগৌরহরি! তোমার এই

শিক্ষা-শ্লোকে আমাদিগকে সেই কৃপার আশ্রয় লইতে তুমি (আপনি দেখাইয়া) শিখাইয়াছ। আহা! "এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্!"

"মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"

আমারও এমন দুর্দ্দৈব যে, ইহাতে (এমন নামে) আমার অনুরাগ জন্মিল না! জীবের দুর্দ্দৈব ত পদে পদে। বিশেষতঃ কলির জীবের। কিন্তু ভগবৎ-বিমুখতার ন্যায় এমন দুর্দ্দৈব আর নাই।

"সর্ব্বৈব দুর্দ্দৈব যায় যে নামেতে ঘুচি,
এ কি এ দুর্দ্দৈব হায়! সে নামে অরুচি!"

যাহাতে সর্ব্বদুর্দ্দৈব কাটে, তাহারই অভাব-জনিত যে দুর্দ্দৈব, তাহা আর কিসে কাটিবে? "হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিনাশিনী"— তবে সে স্মৃতির বিস্মৃতি-জনিত বিপদুদ্ধারের উপায় কি? দয়াময় নিজগুণে দয়া করিয়া পায় না রাখিলে আর উপায় নাই।

"হরির কি দয়া! হরিনামে হরি পাই।
মোর কি দুর্ভাগ্য, হেন নামে মতি নাই॥"

তবে ভরসা এই যে, এস্থলে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা দয়ার বল বেশি, এবং দুর্ভাগাদের জন্যই দয়া। দয়ার দুর্ভাগাদেরই দাবী।

"ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।" রোগীর হিতার্থেই ঔষধের আবশ্যকতা, অরোগীর জন্য অবশ্য নয়। যাঁহারা নিত্য নামানুরক্ত ভাগ্যবান ভক্ত, তাঁহারা ত ভগবানের প্রেমাস্পদ; কিন্তু আমাদিগকে কৃপাস্পদ হওয়ার জন্যই কাঁদিতে হইবে।

"নামেরুচি, জীবে দয়া, সাধুর সেবন" শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ত্রি অঙ্গ ধর্ম্মসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে নামে রুচিই প্রধানতম বলিতে হইবে। নামেরুচি—কৃষ্ণে রুচি—একই কথা। নামে রুচির সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি স্বভাবতই আসে। নামে রুচি-বৃদ্ধির সহিত রজস্তমোময় অসার-বিষয়-ভোগেচ্ছায় অরুচি জন্মিতে থাকে। আর সাত্ত্বিকতা শীতপক্ষের কৌমুদীবৎ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। সাত্ত্বিকী প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ফল "জীবে দয়া"—এই জন্য শক্তিদেবীর সাত্ত্বিকী পূজাতেও পশু-বলিদান ও আমিষ-সংস্রব নিষিদ্ধ। যথা—"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" ইত্যাদি। বিষ্ণু-সেবায় আমিষ পূর্ণ-নিষিদ্ধ; কারণ বিষ্ণুসেবা পূর্ণসাত্ত্বিকী। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধেও আমিষ-সংস্রবে 'জীবেদয়া' ব্যাহত হয়। এক পশুঘাতনের সংস্রব-সম্পর্কে নয় জনের ঘাতকত্ব-পাপ মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত। একটি অবৈধ জীবহিংসার সংস্রবে যেখানেই সাত্ত্বিকতার হানি, সেখানেই ঘাতকত্ব। এই জন্যই মাতৃক্রোড়ে কন্যার ন্যায় সাত্ত্বিকতার ক্রোড়ে জীবেদয়াকে দেখিতে পাই; অতএব সাত্ত্বিকতাই জীবেদয়ার জননী। সাধু-সেবাও সাত্ত্বিকতারই মুনি-মনোমোহিনী দ্বিতীয়া দুহিতা। এই দয়াবৃত্তি ও সেবা-বৃত্তি— উভয়ই সাত্ত্বিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

——•:o:•——

ভগবন্নামে রুচি দ্বারাই সাত্ত্বিকতাশক্তি যেরূপ রক্ষিতা, পোষিতা ও বর্দ্ধিতা হয়, অন্য কোন সদ্গুণ বা সদ্বৃত্তি-বলেই সেরূপ হইবার নহে। আক্ষেপের বিষয়—ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ হেন নামে রুচি কেবল দুর্দ্দৈব-দোষে—স্বকর্ম্মবশে। ভাগ্যে ঘটিল না। এদিকে "গণা দিন"ও ফুরাইয়া আসিল; সুতরাং কবে আর ঘটিবে বা কখনও ঘটিবে কি না—কোটি কল্পেও ঘটিবে কিনা, তাহা সেই একজনই জানেন। কিন্তু কখন না কখন—কোন না কোন জন্মে যে ঘটিবেই, শাস্ত্রে এইরূপ আশ্বাস-আশ্বাস পাওয়া যায়। ফলে মানবাত্মার তাহাতে নির্ভর সম্ভবেনা। দুর্লভ মানব-জন্মেই ভগবদনুরাগ জাগে, ভগবৎ-বিরহ লাগে; তাই সাধন-ভজনের ব্যবস্থা। তাই বেদ-পুরাণ-তন্ত্র—স্তুতি-গীতি-মন্ত্র। তাই যাগ যজ্ঞ তীর্থ-ধর্ম্ম, জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম্ম। তাই যুগে যুগে অবতার। কলিযুগে মহাপ্রভুর নাম-প্রেম প্রচার। নাম-নামীর সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের বিকাশ। তাই এই শিক্ষাষ্টকেরও প্রকাশ।

নামানুরাগশূন্য যে নাম-করা, তাহা "নামাভাস" মাত্র হইলেও, তাহারও যে অসাধারণশক্তি, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞান-প্রিয় অনেকের তাহাতে হয়ত আস্থা নাই। এই জন্য তাঁহারা হয়ত সানুরাগ—নিরনুরাগ-

উভয়বিধ নাম-সাধন ছাড়িয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। ইহা কেবল কলি-কুহকের ক্রিয়া-ফল মাত্র। শব্দ বা বর্ণবিশেষের সংযোজনে, তদুচ্চারণে বা তন্মননে, "মূলাধারাদি আজ্ঞা-চক্রান্ত পর্য্যন্ত" কোন চিত্তড়িন্ময়ী নাড়ী-বিশেষের বিকম্পনে, কিরূপে কোন্ বিজ্ঞানে এই নামে এবং এমন কি—নামাভাসেও যে ঐশী শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বুঝিবার সাধ্য অস্মদ্দৃশ অসিদ্ধ মানবে সম্ভবেনা। তবে, শাস্ত্রের আপ্তবাক্যে যাঁহাদের দৃঢ়নিষ্ঠা বা প্রতীতি-প্রতিষ্ঠা, তাঁহারা অতএব এ তত্ত্বে বিশ্বাসবান; সুতরাং তাঁহারা পরম ভাগ্যবান, সন্দেহ নাই। আমরা যাহা বুঝিনা, তাহাই হইতে পারে না, এরূপ প্রগল্‌ভ প্রলাপ বা ধৃষ্টধারণা ফলিতার্থে মূর্খতা মাত্র। ভগবানের কার্য্য যে কোন্ শক্তির কি গুপ্তরহস্য-বলে—কোন্ বিজ্ঞানাতীত বিজ্ঞান-কৌশলে সম্পাদিত হয়, তাহা তিনিই জানেন। তবে শাস্ত্রে ও মহাজন-বাক্যে যাঁহার বিসংশয় বিশ্বাস, তিনিই সত্য সুবুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান, শাস্ত্রই এ কথা বলিয়াছেন। কারণ তিনি ভোজ্যের প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ায় অজ্ঞ হইলেও ভোজনে বিজ্ঞ।

নিরনুরাগ নামে বা নামাভাসে পাপ যায়, সানুরাগ নাম-সাধনে পুণ্যও যায়! অর্থাৎ পাপ-পুণ্য-দ্বন্দ্বাত্মিকা বাসনাই যায়। "ন পাপং ন পুণ্যং ন সৌখ্যং ন দুঃখং" অবস্থা অর্থাৎ মুক্তাবস্থা লাভ হয়; কিন্তু সাধককে নৈষ্কর্ম্য বা মুক্তি দিয়াই নামের কার্য্য শেষ হয় না। কাম-পাশ হইতে মুক্তি দিয়া, নাম স্বীয় সাধককে আবার প্রেম-পাশে বন্ধনের আয়োজন করেন। কিন্তু সে বন্ধন প্রকৃত বন্ধন নহে; তাহা মুক্তিরও মুক্তি! তাহা প্রেমানন্দময়ী পরাভক্তি! সে পাশ নহে; সে পরমার্থ-পরিমলময় হরি-প্রেম-পুষ্পহার! সে হার পরিতে ব্রহ্মলোক ব্যগ্র! শিবলোক পাগল! নরলোকের আর কথা কি?

মুক্তির পর যে বাঁধন, সে যে কেমন বাঁধন—কেমন স্পৃহনীয় বাঁধন, তাহার একটা কথঞ্চিৎ পার্থিব দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা আমরা কিছু আভাস পাইলে পাইতে পারি। মনে করুন, সমস্ত দিনের সর্ব্ববিধ গৃহ-কার্য্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, নিভৃত নিশীথে সতীকুলবতীর পতি-প্রেমালিঙ্গন-পাশ কেমন? সেও ত বন্ধন বটে, কিন্তু কি স্পৃহনীয়, প্রাণারাম ও পরমানন্দময়! সেইরূপ সিদ্ধ ভক্ত সাধুগণ সংসার-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া, সেই গোপীকান্তের করুণ কটাক্ষে গোপী-রূপাশ্রয় ও প্রকৃতি-ভাবাশ্রয় লাভ করিয়া, সেই পরমপুরুষ প্রাণ-পতি কৃষ্ণধনের পাদপদ্মের প্রেমালিঙ্গনে পরম-কৃতার্থ ও চরম চরিতার্থ হইতে পারেন। এ যদি বাঁধন হয়, তবে এই বাঁধনের জন্যই সকল সাধন। এই বাঁধনের জন্যই সাধকের মুক্তি বা বিষয়-বাঁধন বিমোচন। এ বন্ধনে বেদন নাই; এ পীযূষ-প্রলেপ! এ যে কৃষ্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকার রজত-রশ্মি-রজ্জুর বন্ধন!

"যে বাঁধনে রাধা বাঁধা রাস-কেলিকুঞ্জে।
রাধা-পদরেণু হয়ে ভক্ত তাহা ভুঞ্জে॥"

কিন্তু জীব মুক্তি লাভে শিব না হলে, সে ভক্ত হতে শক্ত হয় না।

"সংসার-সন্ন্যাসী শিব নিত্যমুক্তভব।
হরি-প্রেমে বাঁধা পড়ে হরিনামে মত্ত॥"

নামে রুচি না হইলে কিছুই হইবে না। ভজন-পথে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। টিকী-বাঁধা, নামাবলী-ছাঁদা, কণ্ঠী-আঁটা, তিলককাটা, ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা; গেরুয়া, করোয়া, কিছুতেই কিছু কুলাইবেনা। একমাত্র নামে রুচির অভাবে অপর কোটি উপকরণে কোটিকল্পেও কৃষ্ণ-পূজা হইবে না।

অতএব নামানুরাগের অভাবের ন্যায় দুর্দ্দৈব জীবের আর কি হইতে পারে? "নামমাত্র" নাম ত আমরাও করিয়া থাকি। আমরাও কখনবা থিয়েটারের ষ্টেজে নিমাই, প্রহ্লাদ, বিল্বমঙ্গল বা হরিদাস সাজিয়া হরি-নামের বন্যা বহাইয়া দিই; এবং তাহাতেও অন্ততঃ নামাভাসের ফল পাই; কিন্তু যখন হয়ত কেবল মৎলবী হুজুকে মাতিয়া হরি-সংকীর্ত্তনে হদ্দ চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গি, লোক-দেখানো নাচ নাচিয়া পা ভাঙ্গি এবং কখন কখন সজ্ঞান "দশা" বা দুর্দ্দশায় পড়িয়া মাথা ভাঙ্গি, তখন কেবল "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং" হয়। কারণ একে ত নামে অরুচি, তাতে আবার নামাপরাধ; সুতরাং সে স্থলে নামাভাসের গৌণ-ফলও আমাদের ভাগ্যে দুর্লভ হয়। 'নারায়ণ' নামাভাসে অজামিলের এবং 'রাম' নামাভাসে ম্লেচ্ছের পাপক্ষয় ও সদ্গতিলাভ হইয়াছিল, তাহার হেতু-রহস্য এই যে, তাহারা "নামাভাস" করার পর আর "নামাপরাধ" না করায় ঐ ফলের অধিকারী হইয়াছিল। আমাদের নামাভাসে পাপের বোঝা কমে না কেন? যদিও নামাভাসের সময়ে একটু ভার লঘু লাগিতে পারে, পরে বিষয়ে ঢুকিলেই আবার যেন যে সেই! হাপরের রক্তোজ্জ্বল লোহা তুলিতে তুলিতেই আবার যে কালো সেই কালো! আমাদেরও ঐ দশা। নামাভাসের ম্লান জ্যোৎস্নায় হয় ত সাময়িক ভাবে একটু আলো পাই; আবার পরক্ষণেই আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন ব্যঙ্গস্বরে বলিতে থাকে—"তুমি সে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!" এরূপ বিড়ম্বনার কারণ কেবল আমাদের নামাপরাধ। নামাভাসে একটুকু উঠি, নামাপরাধে আবার ততোধিক নামিয়া পড়ি। এইরূপে আমাদের একপদে উন্নয়ন, পরপদে অধঃপতন ঘটিতেছে।

"নামাভাসে অপরাধ এড়ি পাপ যায়।
রুচিযোগে-অনুরাগে নামে প্রেম পায়॥"

এই শিক্ষা ভুলিয়া আমরা নামাভাস-শক্তির সাহায্য লাভে অনেক সময়েই বঞ্চিত হইতেছি। একদিকে যেমন সে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, অপরদিকে অমনি অপরাধে তাহা অপব্যয়িত হইতেছে। তবে আর আশা কোথায়?

আশা আছে। আমাদেরই রুচির অভাব, অমৃতের ত অভাব হয় নাই। হরিনামের ত ভার লোপ হয় নাই। যখন নাম আছে, তখন সব আছে; সুতরাং আশাও আছে। আমরা সদাই সাপরাধ হইলেও এবং নাম না পাইলেও, নামাভাসেই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। মগ্ন তরীর ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ডও মজ্জমানের উপেক্ষা হইতে পারে না। এই অধমাধিকারে নামাভাসও আমাদের আরাধ্য ধন। "গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্" সার করিয়া, এই নামাভাস নিয়াই আমাদের

পড়িয়া থাকিতে হইবে। নামাপরাধীকে নামই নিস্তার করিবেন।

"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং পরম্॥"
ভূমে যে আছাড়ি পড়ে ভূমিই আলম্ব তার।
তোমাতে অপরাধীর তুমিই আশ্রয় সার॥

নামাপরাধীর নামাশ্রয়-প্রপন্নতাও এই প্রকার।

পিত্তদোষ-দুষ্ট-রসনায় মিশ্রী তিক্ত লাগে; কিন্তু তবু যেন জোর করিয়া সেই ত্রিদোষঘ্নী মিশ্রী মুখে রাখিতে রাখিতে সময়ে সেই রসনায় আবার সেই মিশ্রীই মিষ্ট লাগে!

"হরি সে লাগি রহো রে ভাই!
তেরা বনত বনত বনি যাই।"

লাগিয়া থাকিতে পারিলে একদিন বনিয়া যায়। নাম লইয়া পড়িয়া থাকিলে, নামের অন্তমাধুর্য্য-রসে ক্রমে আপনি মন বসে। নামে মন বসিলে, অর্থাৎ রুচি আসিলে, আর নামাপরাধের ভয় থাকে না। হয়ত প্রথম প্রথম রুচির আস্বাদ ভাল বুঝা যায় না। কখনও নাম হয়, কখনও নামাভাস হয়। সে নামাভাসেরও ফল তখন ফলে; কারণ রুচির শুভ সমাগম হইতে থাকিলেই নামাপরাধ দূরে পালাইতে থাকে। এতাবতা নামেরুচি বা নামানুরাগই সাধনের মূলধন,—ভজনের অনন্য উপকরণ। এই স্বলম্পন্ন সাধনযন্ত্র দুর্ল্লভ মানব-দেহ পাইয়া, যাহার কর্ম্মদোষে একমাত্র ভগবন্নামানুরাগ-বিরহে ইহা কেবল কামারের জাঁতার ন্যায় শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের জড়-যন্ত্ররূপে গণিত, তাহার মত দুঃখী কে? হায়! ভগবন্নামানুরাগ-বিরহে যে মানবের স্বভাব-স্বর্গ নরকে অবনত, হৃদয়-নন্দন শ্মশানে পরিণত, তাহার মত অভাগা কে? ভগবন্নামানুরাগে বঞ্চিত হইয়া, যাহার সঞ্চিতধন নষ্ট, মুখের গ্রাস নষ্ট, হাসির স্থানে অশ্রুরাশি, আশা-উল্লাসের স্থানে হা-হুতাশ, তাহার মত দুর্দ্দৈব-তাড়িত—দুর্দ্দশা-পীড়িত দীনাতিদীন দয়ার পাত্র কে আছে? বিশেষতঃ কর্ম্ম-ভূমি ধর্ম্ম-ক্ষেত্র—প্রেমময় ভগবানের বিবিধ বিচিত্র প্রেম-লীলা-বিলাস-ক্ষেত্র—গোলক-গৌরবস্পর্দ্ধী ভারত-ভূলোকের লোকের পক্ষে এ দারুণ দুর্দ্দৈব জন্য উপযুক্ত আক্ষেপবাক্য ভাষা-ভাণ্ডারে দুর্ল্লভ। হায়! আমরা—

"গঙ্গাতীরবাসী হয়ে তাপিত তৃষায়!
কল্পতরুতলে রয়ে ক্ষোভিত ক্ষুধায়!!"

জীবের এ হেন শোচনীয় দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়াই আর্ত্ত জীবের অন্তরাত্মার নীরব করুণ ক্রন্দন সরব করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি———"মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"

এই ভাবের একটি রামপ্রসাদী সুরের বৈষ্ণব-সংগীত এই স্থানে নিবেদন করিলাম -

"(হরি) নাম-রসে মন মজ্‌লনারে॥
(এ যে) কি অমৃতে কি অরুচি, মন বুঝি
তা বুঝ্‌লনারে॥
(হরি) নাম-বন্যা বহালে নিতাই, মন-দ্বার
মোর ভিজ্‌লনারে॥
কৃষ্ণ কতই নাম নিলেন, নিজ তত্ত্ব নামে
দিলেন,
যুগলরূপে নামে এলেন, এমন নাম মন
ভজ্‌লনারে।
দয়াল হরির দয়া যেমন, এ দীনের দুর্দ্দৈব
তেমন,
নামামৃত পেয়ে এমন, বিষয়-বিষ ত্যজ্‌লনারে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ভ-গোল পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুম্ভ রাশির

পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্র।

শ্রবিষ্ঠা মণ্ডলের পূর্ব্ব ভাগে যে তারাময় সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র লক্ষিত হয়, ঐ সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্র পক্ষিরাজ মণ্ডলে অবস্থিত; এই সম চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণ চতুষ্টয়ে যে চারিটী তারা আছে, এই তারা চতুষ্টয় গো-ক্ষুর সদৃশ, ভদ্রা বা সুরভির পদ চতুষ্টয় ভাদ্র পদ বলিয়া খ্যাত। তারা চতুষ্টয়ের পশ্চিমস্থ তারা দ্বয়ে পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্র গঠিত। এই তারা দ্বয়ের উত্তরস্থটীর নাম সুরভি। এই সুরভী তারা পূর্ব্ব ভাদ্র পদ নক্ষত্রের যোগ তারা। দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম মুরা।

কুম্ভ-রাশি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে কুম্ভ রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলসধারী শীর্ষোদয় চরণ রহিত পুরুষ বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু আকাশে এরূপ কোন মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না, তবে শতভিষা নক্ষত্রকে ঘট বা কলস বলিয়া কষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে।

মীন রাশির।

উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র।

পক্ষিরাজ মণ্ডলস্থ তারাময় সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের অগ্নি কোণস্থ ও ঈশান কোণস্থ তারাদ্বয়ে উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র গঠিত। তারাদ্বয়ের উত্তরস্থ তারাটীর নাম প্রতিষ্ঠা-তারা। এবং এই তারা উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্রের যোগ তারা, এবং দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম গোপদ, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র দ্বয়ের তারা চতুষ্টয় পর্য্যঙ্কাকৃতি বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত।

মীন রাশিস্থ

রেবতী নক্ষত্র।

সুরভি তারা ও গোপদ তারা সংযোজিত করিয়া ঐ সংযোগ রেখা অগ্নি কোণে প্রসারিত করিলে, গোপদ তারা হইতে ছয় হাত দূরে একটী ক্ষুদ্র তারা স্পর্শ করিবে, এই ক্ষুদ্র তারার নাম মৎস্যপালক, মৎস্য পালক তারা ও তাহার পূর্ব্বস্থ অপর দুইটী ক্ষুদ্র তারা এই তারাত্রয় মৎস্যপুচ্ছাকৃতি। মৎস্য-পুচ্ছের পূর্ব্বস্থ-তারার নাম মূল কীলক, মৎস্য পুচ্ছের উত্তরে নব তারায় মৎস্য দেহ গঠিত। এই দ্বাদশ তারায় রেবতী গঠিত। রেবতীর সম্মুখে একটী তারা-স্তবক অবস্থিত। এই তারা স্তবকের পাশ্চাত্য নাম স্তবক রাজ্ঞী, পুরাণে এই স্তবক রাজ্ঞী মাতৃকা রেবতী নামে বর্ণিত।

মূল কীলক তারা রেবতী নক্ষত্রের যোগ তারা, এবং এই তারার ১০ পল পূর্ব্বস্থ বিন্দু মেষ রাশির আদিস্থান, এই জন্য এই তারার নাম মূল কীলক, তারাময় মৎস্য উল্লম্ফন ভাবে অবস্থিত, এই জন্য মৎস্যটী রেবতী নামে অভিহিত, বেদ মতে রেবতী নক্ষত্র এক তারাময়, ক্রমে রেবতীর কলেবর বৃদ্ধি হইয়া রেবতী ত্রিতারক বা দ্বাদশ তারকময় বা দ্বাত্রিংশৎ তারকময় হইয়াছে।

মীন রাশি।

কুম্ভ রাশির ঈশান কোণে মীন রাশি অবস্থিত। মৎস্যাকৃতি রেবতী হইতে এই রাশি মীন রাশি বলিয়া খ্যাত।

মতান্তরে মীন রাশি তারাময় মৎস্য যুগল রূপে বর্ণিত, মীনের সম্মুখে মৎস্যাকৃতি মাতৃকা রেবতী অবস্থিত। [ক]

মাতৃকা রেবতী পাশ্চাত্যে স্তবক রাজ্ঞী নামে অভিহিত, এবং দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড সদৃশ, ইহার আয়তন ২×৪ ইঞ্চি [খ]

মেষ রাশিস্থ

অশ্বিনী নক্ষত্র।

রেবতী নক্ষত্রের পূর্ব্ব ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র অবস্থিত। মূল কীলক তারা হইতে ঈশান কোণ অভিমুখে একটী রেখা টানিলে ১৬ হাত দূরে দুইটী তৃতীয় শ্রেণীর শুভ্র বর্ণ উজ্জ্বল তারা দৃষ্টি-গোচর হইবে। তারা দ্বয় পরস্পর দুই হাত ব্যবধানে অবস্থিত, এই তারা দ্বয়ের উত্তরস্থ তারাটীর নাম অমল, এবং দক্ষিণস্থ তারাটীর নাম শির-স্ত্রাণ তারা, শিরস্ত্রাণ তারার এক ফুট অগ্নি কোণে পঞ্চম শ্রেণীর একটী ক্ষুদ্র তারা আছে। এই তারাত্রয়ে অশ্বিনী নক্ষত্র গঠিত। তারা-ত্রয় অশ্বমুখাকৃতি এবং এই জন্য এই নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, অমল তারা অশ্বি-নীর যোগ তারা, এই তারা-ত্রয়ের আকৃতি গড্ডলিকার লাঙ্গুল সদৃশ। এবং অশ্বিনী নক্ষত্র মেষ রাশির লাঙ্গুল গঠন করিতেছে।

মেষ রাশিস্থ

ভরণী নক্ষত্র।

অশ্বিনী নক্ষত্রের পূঃ পূঃ উঃ কোণে এবং অমল তারা ও দেবসেনা তারার যোগ রেখার মধ্য ভাগের উত্তরে, একটী ক্ষুদ্র তারাময় ক্ষুদ্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজক্ষেত্র রক্ষিত হয়, ত্রিভুজের কোণ ত্রয়ে তিনটি ক্ষুদ্র তারা অবস্থিত, এই তারা ত্রয়ে ভরণী নক্ষত্র নির্ম্মিত, ভরণীর পূর্ণ নাম অপভরণী। ভরণীর দেবতা যম, এজন্য ভরণীর অপর নাম যাম্য। ভরণী নক্ষত্রে মেষ-মুণ্ড গঠিত। ত্রিভুজের পূর্ব্ব কোণস্থ তারা ভরণীর যোগ তারা।

মেষ রাশি।

মীন রাশির ঈশান কোণে মেষ রাশি অবস্থিত, এই রাশিতে অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র অবস্থিত, ভরণী মেষমুণ্ড রূপে, এবং অশ্বিনী মেষ-লাঙ্গুল রূপে অবস্থিত, ইহা পরিষ্কার নয়ন গোচর হয়।

তারা—নক্ষত্র।

রাত্রিকালে ভগোলে ক্ষুদ্র হীরক-খণ্ড সদৃশ যে সকল জ্যোতিষ্ক দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নাম তারা সমুদ্র (অন্তরীক্ষ) সলিলে সন্তরণ-কারী ঐ সকল জ্যোতিষ্ক তারা নামে খ্যাত, চলিত ভাষায় নক্ষত্র শব্দ ভগোলস্থ ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক বা তারা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং

(ক) পুরাণে তারা গুচ্ছ, তারা স্তবক, এবং বাষ্প স্তবকগণ মাতৃকা নামে বর্ণিত এবং মানব জাতির পরম শত্রু বলিয়া কথিত।

(খ) রেবতী মৎস্যের মস্তক সংলগ্ন স্তবক রাজ্ঞী, পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, যেন আদিম তরুর নৌকা শৃঙ্গে ধারণ করিয়া সমুদ্রে (অন্তরীক্ষে) অদ্যাপি সন্তরণ করিতেছে।

বেদাদিতে নক্ষত্র শব্দ তারা-শব্দের প্রতিপদ-রূপে-ব্যবহৃত-থাকা লক্ষিত হয়। "যাঁহারা ইহলোকে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তারালোকে গমন (লক্ষণ) করেন, এজন্য তারার নাম নক্ষত্র"। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৫।৩।৫; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।১১) যথা "অত্রি আদি সপ্ত ঋষিগণ তপশ্চরণে সৃষ্টি বিধান করিয়া অধুনা নক্ষত্র রূপে দ্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন"। (তৈঃ আঃ ১।১১)। স্বর্গালোকে বীর্য্যশূন্য বা প্রতিভা শূন্য হয় বলিয়া ন ক্ষত্র নাম। (শত-পথ ব্রাহ্মণ ২।১।২)। অথবা "তপস্যা হইতে ক্ষান্ত নহে" এই অর্থে ন-ক্ষত্র নাম। (কাশী খণ্ড ১৫)। মৎস্য পুরাণ মতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বলিয়া ন-ক্ষত্র নাম। (ন ক্ষীয়তে,) আবার জর্ম্মন্ মতে নক্ত (অন্ধকার) হইতে ত্রাণ করে বলিয়া নক্ষত্র নাম, এবং সমুদ্র (অন্তরীক্ষ) সন্তরণকারী বলিয়া নক্ষত্রের তারা নাম। (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩ ৫)। অথর্ব্ব বেদে নক্ষত্রগণ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। (অঃ বেঃ ১১।১।৪০)। তৈত্তি-রীয় ব্রাহ্মণ-মতে নক্ষত্রগণ দেবগণের-গৃহ (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।৫।) এবং আদি সৃষ্ট জীব-গণের আবাস ভূমি (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।৫) শতপথ ব্রাহ্মণ মতে স্বর্গগত সাধুজনের প্রতিভা নক্ষত্ররূপে লক্ষিত হয়। (শঃ ব্রাঃ ৬।৫।৪।৮) পদ্মপুরাণ মতে নক্ষত্র-পূজক নক্ষত্র সদৃশ প্রভা সম্পন্ন হইয়া নক্ষত্র লোকে বাস করেন। (কাশী খণ্ড ১৫) এবং দেশীয় জন-প্রবাদ মতে তারাগণ মৃত মানব বৃন্দের চক্ষু।

নক্ষত্রবিদ্যামতে তারাগণ এক এক সূর্য্য। রাশি চক্রের আয়তন-৩৬০ × ১৬। সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে এই রাশি চক্র বা ভ-চক্রের—এক সপ্ত বিংশ অংশের এক এক অংশের নাম এক নক্ষত্র। রাশি চক্রের ২৭টী অংশ ২৭ নক্ষত্র বলিয়া গণ্য। (১) (সূঃ সিঃ ১২। ২৫)। সুতরাং এক নক্ষত্র রাশি চক্রের এক অংশ যাহার দৈর্ঘ্য ১৩⅓ অংশ এবং বিস্তৃতি ১৬° গতিকে এক নক্ষত্র বহু তারকময় স্থান এবং ঐ স্থানস্থ প্রধান তারা বা তারা-চয়ের নামে ঐ স্থান খ্যাত।

যথা অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি শব্দ স্থান বাচক। অশ্বিনী নক্ষত্র বলিলে ভ-চক্রের এমন একনির্দ্দিষ্ট ভাগ বুঝিতে হইবে, সে নির্দ্দিষ্ট ভাগে অশ্ব মুণ্ডাকৃতি তারাত্রয় আছে। অপভরণী (ভরণী) নক্ষত্র বলিলে রাশি চক্রের এমন এক নির্দ্দিষ্ট-ভাগ বুঝিতে হইবে, সে নির্দ্দিষ্ট ভাগে ত্রিকোণাকৃতি তারাত্রয় আছে। কৃত্তিকা নক্ষত্র বলিলে রাশি চক্রের এমন এক নির্দ্দিষ্ট ভাগ বুঝিতে হইবে, সে ভাগে ৬য়টী তারায় একখানি ক্ষুর গঠিত করিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র শব্দ সংজ্ঞা মাত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বর্ত্ত-মানে নক্ষত্র শব্দের মুখ্য অর্থ তারাময় রাশি চক্রের এক বিভাগ বা খণ্ড এবং গৌণ অর্থ তারাপুঞ্জ। বর্ত্তমানে জ্যোতিষিক প্রয়োগে নক্ষত্র শব্দ তারা শব্দের প্রতি শব্দ রূপে ব্যবহৃত না হইয়া তারাপুঞ্জ অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে।

---

(১) পুনঃ দ্বাদশধা আত্মানং বিভজৎ রাশি সংজ্ঞকং
নক্ষত্র রূপিণং ভূয়ঃ সপ্তবিংশ আত্মকাংশী।

যথাঃ (১) গ্রহ নক্ষত্র তারাগণাং
ভূমে বিশন্য বা বিভুঃ। ইতি (সূঃসিঃ ১২।২৮)
(২) সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ তারা
নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ। ইতি বিষ্ণু পুরাণ ২।৯।৩
(৩) এবং সূর্য্য-প্রভাবেন
সর্ব্বাঃ নক্ষত্র তারকাঃ। ইতি কৌর্ম্মে ১৮
(৪) গ্রহ নক্ষত্র তারাগণাং
অধিপঃ বিশ্ব ভাবন। ইতি বাল্মীকি ৬।১০৬।১৫
(৫) নক্ষত্র তারা গ্রহ সঙ্কুলাপি
জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ। রঘুবংশ ৬:২২
ইত্যাদি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই সমস্ত ভাষাবিৎ ভাষাপাঠক ভাষা বিশোধক শাস্ত্রকার ও মহাকবিগণের শাস্ত্রে শিষ্টপ্রয়োগ উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া বঙ্গীয় সুলেখক ও গ্রন্থকারগণ তারা অর্থে নক্ষত্র শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য।

শাস্ত্রে বলে: ধ্রুব তারা অগস্ত্য তারা, (সূঃ। সিঃ ১২। ৪৩; ৮। ১০) ধ্রুব নক্ষত্র বলিলে সহসা শ্রোতার ভ্রম জন্মে। শাস্ত্রেবলে স্বাতি নক্ষত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। স্বাতি তারা ধনিষ্ঠা তারা বলিলে পাঠকের মন রাশি-চক্র হইতে ৩০° উত্তরে সঞ্চালিত হয়। এরূপ প্রয়োগ বিশদ বা শিষ্ট নহে।

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের স্থূলত্ব পর্য্যায় তালিকা।

বীথিকা।	মণ্ডল বা রাশির নাম।	তারা নাম।	বর্ণ।
৩	মৃগব্যাধ	লুব্ধক	
৭	ভূতেশ	নিষ্ট্যা	কুঙ্কুম
"	মহিষাসুর	জয়	শুক্ল
২	ব্রহ্ম	ব্রহ্মহৃৎ	পীত
৯	বীণা	নীলমণি	অরুণ
৩	কাল পুরুষ	বাণরাজ	নীলাভশুক্ল
১	যামী	নদীমুখ	শুক্ল
৩	অর্ণবযান	অগস্ত্য	"
৪	শুনী	সরমা বা প্রভাস	নীলাভশুক্ল
৭	মহিষাসুর	বিজয়	শুক্ল
৩	কালপুরুষ	বিশাখ	রক্ত
২	বৃষরাশি	হলদীবর্ণ	পীতবর্ণ
৬	ত্রিশঙ্কু	বিশ্বামিত্র	শুক্ল
৮	বৃশ্চিক রাশি	পারিজাত	রক্তবর্ণ
১০	গরুড়	বাসুদেব	নীলাভশুক্ল

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের স্থূলত্ব পর্য্যায় তালিকা।

বীথী।	মণ্ডল বা রাশির নাম।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৪	কর্কটরাশি	সোম	শুক্ল
৬	কন্যারাশি	চিত্রা	নীলাভশুক্ল
১১	দক্ষিণমীন	মৎস্যমুখ	,,
৫	সিংহরাশি	খ্যাতি	পাণ্ডু
৩	মৃগব্যাধ	পিনাক	শুক্ল
১০	বক	পুচ্ছ	,,

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের বীথী পর্য্যায় তালিকা। (১)

বীথী	মণ্ডল বা রাশি।	তারা-নাম।	বর্ণ।
১	যামী	নদীমুখ	শুক্ল
২	ব্রহ্মা	ব্রহ্মহৃৎ	পীত
,,	বৃষরাশি	হলন্দীবর্দ্ধ	,,
৩	মৃগব্যাধ	লুব্ধক	নীলাভশুক্ল
,,	কালপুরুষ	বাণরাজ	নীলাভশুক্ল
,,	অর্ণবযান	অগস্ত্য	শুক্ল
,,	কালপুরুষ	বিশাখ	রক্তবর্ণ
,,	মৃগব্যাধ	পিনাক	শুক্ল
৪	শুনী	সরমা	নীলাভশুক্ল
,,	কর্কটরাশি	সোম	শুক্ল
৫	সিংহরাশি	খ্যাতি	পাণ্ডু
৬	ত্রিশঙ্কু	বিশ্বামিত্র	শুক্ল
,,	কন্যারাশি	চিত্রা	নীলাভশুক্ল
৭	ভূতেশ	নিষ্ঠ্যা	কুঙ্কুম
,,	মহিষাসুর	জয়	শুক্ল
,,	,,	বিজয়	শুক্ল

(১) সৌম্য হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত ছেদ করিয়া ভ—গোলকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক বিভাগকে বীথী বলা যায়, এক এক বিভাগ আকারে কমলা লেবুর এক এক কোষ পৃষ্ঠ সদৃশ হইবে।

ভ—গোলস্থ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের বীথী পর্য্যায় তালিকা।

বীথী।	মণ্ডল বা রাশি।	তারা-নাম।	বর্ণ।
৮	বৃশ্চিকরাশি	পারিজাত	রক্তবর্ণ
৯	বীণা	নীলমণি	জলদ
১০	গরুড়	বাসুদেব	নীলাভশুক্ল
"	বক	পুচ্ছ	শুক্ল
১১	দক্ষিণমীন	মৎস্যমুখ	নীলাভশুক্ল

নক্ষত্রগণ।

নক্ষত্র সংখ্যা।	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ মতে নক্ষত্র নাম।	অথর্ব্ববেদ মতে নক্ষত্র নাম।	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।
১	কৃত্তিকা	কৃত্তিকা	কৃত্তিকা	বহু
২	রোহিণী	রোহিণী	রোহিণী	১
৩	মৃগশীর্ষ	মৃগশিরা	ইন্বকা	বহু
৪	আর্দ্রা	আর্দ্রা	বাহু	১
৫	পুনর্ব্বসু	পুনর্ব্বসু	পুনর্ব্বসু	২
৬	তিষ্য	পুষ্যা	তিষ্য	১
৭	অশ্লেষা	অশ্লেষা	অশ্লেষা	বহু
৮	মঘা	মঘা	মঘা	বহু
৯	পূঃ ফল্গুনী	পূঃ ফল্গুনী	পূঃ ফঃ	২
১০	উঃ ফল্গুনী	উঃ ফল্গুনী	উঃ ফঃ	২
১১	হস্তা	হস্তা	হস্তা	১
১২	চিত্রা	চিত্রা	চিত্রা	১
১৩	স্বাতি	স্বাতি	নিষ্ঠ্যা	১
১৪	বিশাখা	বিশাখা	বিশাখা	২
১৫	অনুরাধা	অনুরাধা	অনুরাধা	১
১৬	রোহিণী	জ্যেষ্টঘ্নী	রোহিণী	১
১৭	বিচৃত	মূল বর্হণী	মূল বর্হণী	বহু

নক্ষত্রগণ।

নক্ষত্র সংখ্যা	কৃষ্ণ যজুর্বেদ মতে নক্ষত্র নাম।	অথর্ববেদ মতে নক্ষত্র নাম।	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।
১৮	পূঃ আষাঢ়া	পূঃ আষাঢ়া	পূঃ আষাঢ়া	বহু
১৯	উঃ আষাঢ়া	উঃ আষাঢ়া	উঃ আষাঢ়া	বহু
২০	...	অভিজিৎ	...	১
২১	শ্রোণা	শ্রবণা	শ্রোণা	বহু
২২	শ্রবিষ্টা	শ্রবিষ্টা	শ্রবিষ্টা	বহু
২৩	শতভিষক্	শতভিষক্	শতভিষক্	১
২৪	পূঃ প্রোষ্ঠপদ	পূঃ পোষ্টপদ	পূঃ প্রোঃ	বহু
২৫	উঃ প্রোষ্ঠপদ	উঃ পোষ্টপদ	উঃ প্রোঃ	২
২৬	রেবতী	রেবতী	রেবতী	১
২৭	অশ্বযুজা	অশ্বযুজা	অশ্বযুক্	২
২৮	অপ্‌সরণী	ভরণী	অপভরণী	১

শ্রীপতি মতে নক্ষত্র নাম।	শ্রীপতি মতে তারা সংখ্যা।	যোগ তারা নাম। হিন্দু নাম।	যোগ তারা নাম। পাশ্চাত্য নাম।
কৃত্তিকা	৬	প্রীতি	Merope.
রোহিণী	৫	হলদ্দীবর্ণ	Aldebaran.
মৃগশিরা	৩	এণক	Heka.
আর্দ্রা	১	বিশাখ	Betelgeux.
পুনর্ব্বসু	৪	সোমতারা	Pollux.
পুষ্যা	৩	গর্দ্দভ	S. Asellus.
অশ্লেষা	৫	বাসুকী	Delta Hydrae
মঘা	৫	খ্যাতি	Regulus.
পূঃ ফঃ	২	শিবা	Zosma.
উঃ ফঃ	২	সিংহলাঙ্গুল	Denebola.
হস্তা	৫	ভর্জনী	Algoreb.
চিত্রা	১	চিত্রা	Spica.
স্বাতি	১	নিষ্ট্যা	Arcturus.

শ্রীপতি মতে		যোগতারা নাম।	
নক্ষত্র নাম।	তারা সংখ্যা।	হিন্দু নাম।	পাশ্চাত্য।
বিশাখা	৪	ধান্যকীলক	Zuben el Genubi.
অনুরাধা	৪	দির্বাচক্ষলা	Dschubba.
জ্যেষ্ঠা	৩	পারিজাত	Antares.
মূলা	১১	শ্যাম বা শুক	Shaulah.
পূঃ আঃ	২	তুলসী	Delta Sagittarii.
উঃ আঃ	২	লঙ্কা	Sigma Sagittarii.
অভিজিৎ	৩	নীলমণি	Vega.
শ্রবণা	৩	বাসুদেব	Altair.
ধনিষ্ঠা	৪	রত্নপুরী	Rotaner.
শত তারক	১০০	দুর্যোধন	Lambda Aquarii.
পূঃ ভাঃ	২	সুরভি	Scheat.
উঃ ভাঃ	২	প্রতিষ্ঠা	Alpheratz.
রেবতী	১২	মূল কীলক	Zeta Piscium.
অশ্বিনী	৩	অমল	Hamal.
ভরণী	৩	অপ্সরণী	No. 41.

১ম বীথী।

পরশু মণ্ডল।

ব্রহ্ম মণ্ডলের পশ্চিম-ভাগে এবং মেষ ও বৃষরাশির উত্তর-ভাগে পরশু মণ্ডল অবস্থিত. পরশুমণ্ডল ছায়াপথের-মধ্যগত। পরশু-মণ্ডল দেখিতে একখানি কুঠার সদৃশ-লম্বে ছয় হাত, কুঠার পঞ্চ তারায় নির্ম্মিত, কুঠারস্কন্ধে এই মণ্ডলের সর্ব্ব প্রধান তারা অবস্থিত। তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ইহার নাম কুঠারপৃষ্ঠ তারা। এবং কুঠার দণ্ড মূলে একটী পীতবর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা অবস্থিত। এই তারাটীর নাম মায়াবতী। মায়াবতী কুঠার-পৃষ্ঠ তারা হইতে ছয় হাত দক্ষিণে স্থিত। মায়াবতী ও কুঠারপৃষ্ঠ তারার যোগরেখা উত্তরে প্রসারিত করিলে ঐ রেখা ধ্রুব-তারার সন্নিহিত হয়। মায়াবতী বহুরূপ বা কামরূপ তারাগণের শিরোমণি, ৬৯ ঘণ্টা কাল মধ্যে মায়াবতী ৬০ ঘণ্টা ৪১ মিনিট পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। পরে ক্রমে মলিনতা প্রাপ্ত হয়, ৪২ ঘণ্টা মধ্যে মায়াবতী চতুর্থ শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এবং ১৯ মিনিট কাল অবনতি ভোগ করিয়া ১২ ঘণ্টা কাল

মধ্যে পূর্ণ প্রভা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে মায়াবতী সতত স্থূলত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ভোগ করিতেছে। মায়াবতীর স্থূলত্বের পরিবর্ত্তন হেতু পাশ্চাত্যে মায়াবতী ভীষণা (Algol) নামে খ্যাত। মায়াবতীর দুই ফুট দক্ষিণে আর একটী বহুরূপ তারা আছে, এই তারাটী পীতবর্ণ ও চতুর্থ শ্রেণীর। এই তারাটীর নাম রেণুকা। পাশ্চাত্যে রেণুকা তারা মেডুসা (Caput Meduci) নামে খ্যাত (১) এই মণ্ডলে M ৩৪ চিহ্নিত একটী তারাস্তবক আছে। ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণে এই তারা স্তবক অতি সুন্দর দেখায়।

১ম বীথী।

ত্রিকোণ-মণ্ডল।

অশ্বিনী নক্ষত্রের উত্তর ভাগে উত্তর ত্রিকোণ মণ্ডল অবস্থিত। তারাত্রয়ে একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইয়াছে। তারাত্রয়ের একটী তারা অতি ক্ষুদ্র। একটী তৃতীয় শ্রেণীর এবং একটী চতুর্থ শ্রেণীর। ত্রিভুজের সম দুইটী বাহু লম্বে ৪ হাত এবং ভূমি রেখা লম্বে ১ হাত।

১ম বীথী।

মেষরাশি।

মেষ রাশির বর্ণনা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রেবতী নক্ষত্রের মূল কীলক-নামক তারা হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশি অবস্থিত (২)। প্রত্যেক রাশি লম্বে ৩০ অংশ এবং বিস্তারে ১৬ অংশ। এবং দ্বাদশ রাশিতে ভ-চক্র সমাবৃত।

১ম বীথী।

তিমি মণ্ডল।

মেষ রাশির দক্ষিণে তিমি মণ্ডল। এই মণ্ডলে পঞ্চ তারায় একটী মৎস্যাকৃতি গঠিত হইয়াছে। মৎস্য লম্বে ১৫ হাত বিস্তারে ৪ হাত, মৎস্যামুণ্ড নরমুণ্ড সদৃশ। মৎস্য দেহ মৎস্যাকৃতি, তিমি মুণ্ডে একটী রক্তবর্ণ বহুরূপ তারা অবস্থিত। কামরূপত্ব হেতু এই তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এবং মানবের অদৃশ্য হয়। এই তারাটীর নাম মার। মার তারা ১৫ দিবস পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। তৎপরে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তিন মাস মধ্যে মার তারা অদৃশ্য হয়। পঞ্চ মাস মার তারা অদৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া পরে ক্ষীণ ভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়। এবং মাসত্রয় ক্রমে প্রভা বৃদ্ধি হইয়া মার তারা পুনঃ পূর্ণ প্রভা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সার্দ্ধ একাদশ মাস মধ্যে ১৫ দিবস

---

(১) গ্রীসীয় প্রবাদ মতে গর্গন—গণ নামে তিনটী কুমারী ছিলেন, ইহাদিগের নাম ষ্টিন, যুর্গলা এবং মেডুসা। কুমারীত্রয় মধ্যে মেডুসা মর্ত্ত্য ছিলেন। কিন্তু অতি সুন্দরী ছিলেন। মেডুসার গর্ভে নেপচুনদেবের দুইটী পুত্র জন্মে। এজন্য এথিনা দেবীর অভিশম্পাতে মেডুসার কেশপাশ সর্পময় হয়। এবং মেডুসার মুখ দর্শনে মানব পাষাণ হয়। পর্স্তুদেব মেডুসা-দেবীর মুণ্ড কাটিয়া এথিনা-দেবীকে উপহার দেন। এবং এথিনাদেবী স্বীয় বর্ম্মবক্ষে মেডুসা-মুণ্ড-ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মেডুসা মুণ্ডতলে-রেণুকা-তারা। এবং কপাল দেশে মায়াবতী তারা অবস্থিত।

(২) বিষুবৎ ক্রান্তি বৃত্তৌ কাৎপূর্ব্ব-
ভাগ স্থিতাঃ স্থিরাঃ
মেষাদ্যাঃ রাশয়ঃ ক্রান্তিবৃত্তয়ঃ পূর্ব্বদিক
ক্রমাৎ। মুনীশ্বর।

মাত্র যার তারা পূর্ণ প্রভা ধারণ করে। মার তারার পাশ্চাত্য নাম মার [বিস্ময়কর] এবং ববিলনে এই তারা অণ (খদ্যোত) নামে খ্যাত ছিল। মৎস্যের পুচ্ছ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী তারা স্থিত। এই তারার নাম মৎস্যপুচ্ছ। তারাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং অতি উজ্জ্বল। মৎস্য দেহ চতুর্ভুজাকৃতি চারিটী তারায় গঠিত।

১ম বীথী।

যামী মণ্ডল।

তিমি মণ্ডলের দক্ষিণে যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডল ও ভাস্কর মণ্ডল। যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডলের দক্ষিণে যামী-মণ্ডলের দাক্ষিণাংশে অবস্থিত, যামী নদী কাল-পুরুষের দক্ষিণপদ হইতে প্রবাহিত হইয়া যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডলের দূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডলের তারাগণের মধ্যে নদীর মুখ প্রদেশে যে একটী প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ—তারা আছে, সেই—তারাটী সর্ব্ব প্রধান এই তারাটীর নাম নদীমুখ, এই তারাটীর বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নাম এচার্‌নার (আখির—অল—নহ্‌র= নদীর শেষ প্রাপ্ত)। এবং আমির উলুগ্‌-বেগের তালিকায় এই তারা অল—দালিম নামে খ্যাত? এই মণ্ডলের অপর—তারাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তন্মধ্যে ষোলটী তারায় একটী নৃমুণ্ডাকৃতি গঠিত হইয়াছে।

২য় বীথী।

১ম মণ্ডল—চিত্র ক্রমেল মণ্ডল।

(Camelopardalis)।

২য় বীথীর শীর্ষদেশে এই মণ্ডল অবস্থিত, চাক্ষুষ দৃষ্টিতে এই মণ্ডলের রূপ কষ্ট কল্পনা মূলক বলিয়া বোধ হয়। এই মণ্ডল আধুনিক। ১৬৯০ খৃঃ জ্যোতির্ব্বিদ (Helvelius) এই মণ্ডলের নাম করণ করেন। এই মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাময়। স্থলতঃ ইহার সর্ব্বপ্রধান তারা ৫ম শ্রেণীর।

২য় মণ্ডল—ব্রহ্ম মণ্ডল।

ব্রহ্ম মণ্ডল ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতে এই মণ্ডলের নামরথ (Auriga) (১)।

২য় বীথী।

বৃষ রাশি।

ব্রহ্ম মণ্ডলের দক্ষিণে বৃষ রাশি অবস্থিত, বৃষ রাশি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

২য় বীথী।

সুবর্ণাশ্রম মণ্ডল।

বৃষরাশি দক্ষিণে যামী মণ্ডল, যামী মণ্ডলের দক্ষিণে ঘটিকা মণ্ডল। ঘটিকা মণ্ডলের দক্ষিণে-সুবর্ণাশ্রম মণ্ডল। এই মণ্ডল অগস্ত্য তারার অতি সন্নিহিতি। এই মণ্ডলের-পাশ্চাত্য নাম স্বুবর্ণ মণ্ডল (Dorado) কারণ এই মণ্ডলে একটী স্বর্ণ বর্ণের ক্ষুদ্র তারা আছে, তারাটী ৫ম শ্রেণীর। এই তারাটী বহুরূপতারা। হ্রাসকালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অবরোহণ করে। এই বহুরূপ

(১) কিন্তু অশ্বিদ্বয় (castor এবং pollux) হইতে এই মণ্ডল বহুব্যবধানে অবস্থিত। রথ একদেশে, রথী একদেশে থাকা অসম্ভব। এবং অশ্বিদ্বয়ের রথের বৈদিক বর্ণনা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বিদ্বয়ের পুষ্যরথ মধুচক্র নামক তারা স্তবক এবং খর ও গর্দ্দভ নামক তারাদ্বয়ে ঐ রথ সজ্জিত।

তারার নাম লোপামুদ্রা (২) কারণ হ্রস্বতমকালে এই তারা দৃষ্টি গোচর হয় না। এজন্য এই তারার নাম লোপামুদ্রা। লোপা মুদ্রা তারা অগস্ত্য তারার ১০ হাত দূরে নৈঋত কোণে অবস্থিত।

৩য় বীথী।

মিথুন রাশি।

এই রাশি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এই রাশির নাম করণ পরবর্ত্তী কর্কট রাশিস্থ অশ্বিদ্বয় (সৌম্যতারা ও হরিদ্বর্ণ বিষ্ণু তারা) হইতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই রাশিতে হরিদ্বর্ণ কোন তারা নাই। কিন্তু রাশিগণের বর্ণ ভেদ কথনে দৈবজ্ঞ মনোহর বলিয়াছেন যে, মিথুন রাশি হরিত বর্ণ (৩) সুতরাং অশ্বিযুগল হইতে এই রাশির নাম করণ হইয়াছে বলিতে হইবে।

৩য় বীথী।

কালপুরুষ মণ্ডল।

কাল পরুষ মণ্ডল মিথুন রাশির দক্ষিণে অবস্থিত। এই তারা মণ্ডল পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩য় বীথী

শশ মণ্ডল।

কাল পুরুষ মণ্ডলের দক্ষিণে শশ মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলে ৬টী তারায় পশ্চিমাভিমুখ একটী শশবিমানে অঙ্কিত আছে।

৩য় বীথী।

কপোত মণ্ডল।

শশ মণ্ডলের দক্ষিণে কপোত মণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলে অষ্ট তারায় একটী কপোত মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

৩য় বীথী।

কাল পুরুষ মণ্ডল।

মিথুন রাশির দক্ষিণে কাল পুরুষ মণ্ডল এই তারা মণ্ডলের বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩য় বীথী।

অর্ণবযান মণ্ডল।

কপোত মণ্ডলের দক্ষিণে অর্ণবযান মণ্ডল বিরাজিত। অর্ণবযান মণ্ডলে পঞ্চ তারায় একখানি নৌকার কাণ্ড। এবং তারাদ্বয় নৌকার মাস্তুল। এবং তারাত্রয় নৌকার

(২) বামন-পুরাণের ১৮ অধ্যায় পাঠে দেখা যায় যে, সূর্য্যদেবের প্রার্থনায় বিন্ধ্যগিরিকে নিম্ন করণার্থে মহর্ষি-অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলের সমীপে উপস্থিত হইয়া গিরিকে বলিলেন। আমি তীর্থে যাইতেছি, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বিন্ধ্য পার হইয়া যাইতে অসক্ত। অতএব তুমিনীচতর হও, বিন্ধ্যগিরি তৎশ্রবণে নীচশৃঙ্গ হইলেন। মহর্ষি অবলীলাক্রমে বিন্ধ্যপার হইয়া বলিলেন, যাবৎ তীর্থ হইতে নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তুমি উন্নত হইবে না। আমার অনুজ্ঞা অবজ্ঞা করিলে অভিশম্পাত করিব। এই বলিয়া মহর্ষি সহসা দক্ষিণ অন্তরীক্ষ আরোহণ করিলেন। এবং তথায় বিশুদ্ধ সুবর্ণময়, তোরণ পরিশোভিত রম্যতর আশ্রম নির্ম্মাণকরিয়া এবং ঐ আশ্রমে মুনি পত্নী লোপামুদ্রাকে রক্ষা করিয়া স্বীয় সৌম্য আশ্রমে মহর্ষি প্রত্যাগমন করিলেন। যথা—

তত্রাশ্রমং রম্যতরং হি কৃত্বা।
সংশুদ্ধ জাম্বুনদ তোরণাস্তং॥
তত্রাপি নিক্ষিপ্য বিদর্ভপুত্রীং।
স্বমাশ্রমং সৌম্য মুপাজগাম॥ ইতি বামনপুরাণ।

(৩) অরুণসিত-হরিত-পাটল পাণ্ডু বিচিত্রাঃ সিতেতর পিবঙ্গৌ। পিঙ্গল কর্ব্বুর বভ্রু মলিন রুচয়ঃ যথা সংখ্যং॥ মনোহর।

পতাকা সজ্জিত রহিয়াছে। এবং নৌকা হইতে ৬ হাত দূরে অগস্ত্য তারা নৌকার মান (ভার) রূপে তারাময় নৌনিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছে (৪) গ্রীসীয় প্রবাদ মতে এই অর্ণবযানের নাম আর্গো (৫)।

৪র্থ বীথী।

কর্কট রাশি।

কর্কট রাশিতে সোমতারা ও বিষ্ণু তারা অবস্থিত। সোমতারা ১ম শ্রেণীস্থ এবং নীলাভ শুক্লবর্ণ। এবং বিষ্ণুতারা ২য় শ্রেণীস্থ এবং হরিতবর্ণ। এই তারাদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিকৃতি। এজন্য এই তারাদ্বয় অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিযুগল নামে খ্যাত। অশ্বিযুগল রাসভযোজিত রথারোহণে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন। এবং তাঁহারা সুনিপুণ রথী বলিয়া বর্ণিত, কর্কশ রাশিস্থ মধুচক্র নামক তারা স্তবক অশ্বিদ্বয়ের রথ বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যে এই তারাযুগল কষ্টর (castor) এবং পলক্ষ (pollux) নামে খ্যাত। (১)।

৪র্থ বীথিকা।

শুনী মণ্ডল।

কর্কট রাশির দক্ষিণে শুনীমণ্ডল অবস্থিত। কিন্তু শুনী মণ্ডল কর্কট রাশির মধ্যগত। শুনীমণ্ডলের প্রধান তারার বর্ত্তমান নাম প্রভায প্রভাযতারার বৈদিক নাম সরমা (১)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকাশীনাথ দেব শর্ম্মা।

---

(৪) অথর্ব্ব-বেদপাঠে দেখা যায় যে, হিরণ্ময় খেপনি কেনিপাত আদিতে সুসজ্জিত যে হিরণ্ময় নৌকাযোগে স্বর্গ হইতে কুষ্ঠ নামক ঔষধ পৃথিবীতে-আনীত হইয়াছিল। ঐ নৌকা আকাশ মার্গে চলিয়াছিল। যথা—হিরণ্ময়ী নৌ অচরৎ হিরণ্য বন্ধনা দিবি।

(৫) থেছলী দেশের রাজ ভ্রাতা—পেলিয়স ভ্রাতৃ রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়া ভ্রাতৃ পুত্র জেসনকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিবার মনন করেন। ইয়া বা কল্‌চিশ প্রদেশে মঙ্গল গ্রহরাজের যে কুঞ্জবন ছিল ঐ বনের একটী উচ্চবৃক্ষের মস্তকে স্বর্ণ নির্ম্মিত উর্ণ ছিল। এবং তক্ষকনাগ ঐ উর্ণের প্রহরী ছিল। পেলিয়স জেসনকে ঐ উর্ণ আনয়নে আজ্ঞা দেন। বীরবর জেসন আর্গো নামক নৌযান প্রস্তুত করিয়া উর্ণ-আনয়নের যাত্রা করেন। গ্রীসীয় যাবতীয় বীরবর্গ জেসনের সহচর হইয়াছিলেন। হরকুলেশ কষ্টর পলক্ষ এবং থিছিউস্ প্রভৃতি বীর পঞ্চাশৎ এই নৌযানে যাত্রী ছিলেন। এবং জেসন তক্ষক বধ করিয়া উর্ণ আনায়ন করেন। বীরবর জেসনের নৌযান খ-গোলে তারাময়রূপে বিরাজমান রহিয়াছে।

(১) পাশ্চাত্য মতে অশ্বিযুগল সুরথী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহাদিগের রথের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন যে, ব্রহ্মমণ্ডল পাশ্চাত্যে রথী auriga নামে খ্যাত। এবং ঐ রথ অশ্বিদ্বয়ের, কিন্তু ব্রহ্ম মণ্ডল হইতে অশ্বিদ্বয় বহুদূর অবস্থিত। সুতরাং একদেশে রথ একদেশে রথী থাকা অসম্ভব।

(১) কাল্‌ডিয়াবাসীগণ এই তারাকে ছায়া পথের অপর পারস্থিত কুক্কুর তারা বলিয়া বর্ণনা করেন। এবং বেদে সরমা ছায়াপথের অপর পারস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে। বেদ মতে সরমা দেব কুক্কুর বা দেবশুনী।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রথম প্রবন্ধ।

উৎপত্তি।

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, এদেশে হিন্দুধর্ম্মের আস্থা যেমন হওয়া উচিত, তাহা নহে; পশ্চিমদেশের আচার জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক দিন দিন যেমন এদেশের সামাজিক গণের হৃদয়ে নূতন নূতন ভূমি অধিকার করিয়া নব নব দুঃখের ছবি প্রকাশ করিতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু-আচার, জ্ঞান ও সভ্যতা, এক একটী চিরাধিকৃত ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে অতর্কিতভাবে চির বিস্মৃতির গভীর অন্ধকারময় রাজ্যে মিশাইয়া যাইতেছে!

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে এই অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, অবশেষে কোন্ পক্ষে বিজয়-লক্ষ্মীর করুণাময়-কটাক্ষের নীল কমল-মালা পরাইয়া দিবে, তাহার নির্ণয় সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকিলেও বর্ত্তমানে যতটুকু দেখিবার শক্তি আমাদিগের আছে, তাহা দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের প্রাচ্যসভ্যতার বল ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের আচার, আমাদের সমাজ এবং আমাদের জ্ঞান, এই চতুরঙ্গিণী সেনার উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্যসভ্যতা এই মহা-সংগ্রামে এইরূপ ভাবে আর অধিক কাল যে ক্ষয়োন্মুখ আত্ম-গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই প্রকার আশা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সভ্যতার প্রতি আস্থাবান্ কোন্ চিন্তাশীল ভারতবাসী আজ এই অপ্রত্যাখ্যেয় বিষাদময় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অশ্রু-বিন্দু বর্ষণ না করেন?

এরূপ সঙ্কটপূর্ণ-সময়ে হিন্দুর পক্ষে কি কর্ত্তব্য?—কর্ত্তব্য হইতেছে, সর্ব্বাগ্রে হিন্দু-ধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়। আমার বিশ্বাস, সত্যের গতি অপ্রতিবার্য্য, যতদিন সত্য প্রকাশ না পায়, ততদিনই ভ্রান্তি-কুহকে পতিত মানুষ অসৎ মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করিয়া থাকে; কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পরস্পর বিবাদ বাঁধাইয়া বসে, এবং উপকার বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ফলতঃ অপকারের ডালি মাথায় করিয়া বিজয়োল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, এই প্রকার বহুতর অনর্থই অজ্ঞানের কার্য্য। তাই আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদের সর্ব্বাগ্রে বোধ্য, হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে বস্তুটা কি? ইহার আবির্ভাব, ইহার বিকাশ, ইহার উন্নতি, ইহার প্রতিঘাত ও ইহার অবনতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়, এবং কি কারণে কোন্ অবস্থায় কিরূপ সমাজে কোন্ ভাবে ইহার বিকাশ, উন্নতি, প্রতিঘাত ও অবনতি হইল বা হইতেছে, তাহাও স্পষ্ট নির্ণেয়। এই সকল বস্তুর নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন ইতিহাসের ঐকান্তিক আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা সত্য, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতে হইবে। কল্পনার সাহায্যে আত্মধারণার অনুকূল-পদার্থ সাজাইয়া সাধারণের যেন্নে বুদ্ধি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক আত্ম-প্রতিষ্ঠার তীব্র

আকাঙ্ক্ষাকে একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যার যন্ত্রে ফেলিয়া হিন্দুধর্ম্মকে তাড়িতময় করিবার বাতিকটাকে অন্ততঃ মধ্যমনারায়ণের সাহায্যে ও শান্ত করিতে হইবে। শান্তভাবে অবিসংবাদিত-প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের পবিত্র পত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান-অবস্থার সহিত যুক্তি ও নৈপুণ্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় অনাদি, অপরিমেয়, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, মনুষ্য-কল্পনার অবিষয় এই মহাধর্ম্মের গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি, তোমার বা আমার ন্যায় অল্পবিৎ মনুষ্যের আছে, এই প্রকার বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত নহে।

আমরা চাহি ইহার স্বরূপ দেখিতে। ইহার গতি নির্দ্দেশ করিবার ভার চিরকালই সেই এক পুরুষের উপর নিহিত আছে ও থাকিবে। সেই পুরুষ কে, ইহার উত্তর তিনিই দিয়াছেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

সুতরাং আমাদের পক্ষে ধর্ম্মজগতে নূতন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের কর্ত্তব্য একমাত্র এই যে, হিন্দুসমাজের জীবনভূত সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় বিরাট পুরুষ-কল্প সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থার পরিচয়। কারণ, অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাইলে আর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বিলম্ব হয়না। আমার বিবেচনায় সেই অবস্থা পরিচয়ের জন্য আমাদের প্রধানতঃ দুইটী পথ অবলম্বনীয়।

প্রথম।—বেদ, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ কল্পসূত্র প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ গ্রন্থনিচয়ের বিস্তৃতভাবে অনুশীলনদ্বারা তাহার সাহায্যে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রযত্ন।

দ্বিতীয়।—যে যে অপেক্ষাকৃত নূতন ধর্ম্মের সহিত দীর্ঘকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বশেষে জয়ী হইয়া হিন্দুধর্ম্ম এই ভারতে হৃতপ্রায় নিজ অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্ব্বার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই সেই ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলয়াবস্থার বিস্তৃত অনুশীলন ও তাহার সহিত তত্তৎ সময়ের নিষ্প্রভপ্রায় হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধে কোন্ অংশে সাম্য এবং কোন্ অংশে বৈষম্য এবং কি কারণে হিন্দুধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্মের শক্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রবল হইতে পারিল, এই সকল তথ্যগুলি ইতিহাসের মধ্য হইতে যত্নের সহিত বাহির করিয়া সাধারণের সম্মুখে ও অকপটভাবে প্রচার করা।

হিন্দুধর্ম্মের সারভূত নিয়ম প্রভৃতির তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করিবার ভার অনেক দিন হইতেই যোগ্য ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই কৃতকার্য্যতার ফলে আজ আমরা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যনারায়ণের কথা পর্য্যন্ত বহুতর হিন্দুগ্রন্থের প্রচার ও অনুশীলন দেখিতে পাইতেছি এবং উত্তরোত্তর যে আরও পাইব, তাহার আশাও হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়টীর দিকে আমরা প্রকৃত পক্ষে অল্পই অগ্রসর হইতে পারিয়াছি।

হিন্দুধর্ম্ম-মহাসাম্রাজ্যে এ পর্য্যন্ত যত বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ বিপ্লবই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে বৈদিক-হিন্দু-

ধর্ম্ম অবিরাম স্রোতে এবং অপ্রতিহত শক্তিতে ভারতীয়-সমাজে সকল প্রকার মনুষ্যের ভাগ্যযন্ত্রের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সেই বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের মেরুদণ্ডে এমনই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে যে, এখন পর্য্যন্তও উহা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই; কত দিনে দাঁড়াইবে অথবা আর তেমনি ভাবে এযুগে দাঁড়াইতে পারিবে কি না, তাহা ভবিষ্য-ইতিহাসের অন্ধকারাবৃত পৃষ্ঠেই লিখিত আছে। বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের কথা ত অতি দূরে, বৈদিক-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ও এক্ষণে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে আমরা সহস্রাধিক যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু সেই সহস্রাধিক বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে এক্ষণে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি চারি পাঁচটী যজ্ঞ ছাড়া অন্য যজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয় করিবার কোন উপায় পাই না। কেমন করিয়া, কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া কিরূপ স্থান বা সভা নির্ম্মাণপূর্ব্বক কোন্ সময়ে কোন্ মন্ত্রের সাহায্যে অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞগুলি সাধন করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে পারেন, এমন যাজ্ঞিক ভারতে অনেক দিন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মীমাংসাদর্শন পড়িলে আমরা জানিতে পারি যে "যজ্ঞকালে দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করাইবার জন্য বেদের মন্ত্রভাগকে আবৃত্তি করিতে হইত; প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা কোন না কোন যজ্ঞীয় দ্রব্য বা দেবতার স্মরণ করিয়া ঋত্বিক্ যজ্ঞকালে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পাদন করিতেন," এই নিয়ম অনুসারে ঋগ্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব সংহিতার প্রত্যেক মন্ত্রই কোন না কোন যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত, ইহা মানিতে হইবে; দুঃখের বিষয়, ভারতে এক্ষণে এমন কোন বৈদিক পণ্ডিত বা বৈদিক গ্রন্থ নাই, যাহার সাহায্যে আমরা অদ্য বিস্পষ্টভাবে দুর্গোৎসব বা কালীপূজার ন্যায় ঐ সকল মন্ত্রলিপিযোজিত যজ্ঞ সকলের প্রকৃত চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারি। বৈদিক ধর্ম্মের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল যজ্ঞক্রিয়ানিরত-যজমান-বহুল-বৈদিক গৃহস্থের চিত্রও আমাদের মানসপটে আর কিছুতেই অঙ্কিত হইতে পারেনা।

আমরা সকলেই বলিয়া থাকি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ই ক্রমে এই বৈদিকধর্ম্মের অবনতি সাধন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বজনীন অধিকার, বৌদ্ধভিক্ষুগণের অনিয়ন্ত্রিত ঔদার্য্য ও লোকচরিত্রজ্ঞতা, বৌদ্ধধর্ম্মনেতৃগণের অসীম কার্য্যকুশলতা ও নিয়ম পালনশক্তি কিরূপভাবে ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল জাতীয় মনুষ্যকে নূতন জীবন্ত সমাজে পরিণত করিয়া ছিল, কেমন করিয়া ভারতসম্রাটের দুষ্প্রবেশ অন্তঃপুরের মধ্য হইতে অনাবৃতদ্বার দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ও বুদ্ধের জয়-ঘোষণার একতান স্বরলহরীতে সমাজের হৃদয়তন্ত্র বাজিতে থাকিত, তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের মধ্যে কয়জন উদ্যত হইয়া থাকেন?

ইহা কি আমাদের পক্ষে কম লজ্জার

কথা? প্রাচীন ভারতের ধর্ম সভ্যতা ও সমাজের মহাবিপ্লব করিয়া যে বৌদ্ধধর্ম অন্যূন সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে কত অভিনব শিক্ষার বিস্তার করিয়া গেল, ভারতের সমাজ, ধর্ম ও নীতিকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গেল, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে গেলে আমরা আজ আমাদের ভাষায় এক খানিও ইতিহাস গ্রন্থ খুঁজিয়া পাই না! সামুয়েল্ বীল, বার্থ প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণের কৃপায় পালি সংস্কৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রাচীন ইতিহাস জানিবার অন্য কোন উপায় আমরা এক্ষণও করিয়া উঠিতে পারি নাই। ফাহিয়ান্, হুয়েন্থসাঙ্গ প্রভৃতি চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ সহস্র সহস্র ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, মরুভূমি ও জঙ্গল অতিক্রমণ পূর্ব্বক এই দেশে আসিয়া স্বচক্ষে বৌদ্ধভারতের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কই, আমাদের ভাষায় সেই সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদেরও অনুবাদ করিয়া আমরা আমাদের ভাষায় এখনও কি প্রচার করিতে পারিয়াছি? যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল সত্যঘটনাময় ঐতিহাসিক চিত্র অতুলনীয় বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাঁহারা মাতৃভাষার অলঙ্কার পরাইতে গিয়া এখনও ঐ সকল রত্নরাজির প্রতি এরূপ উপেক্ষা করিতেছেন কেন? যে জাতির আত্মপিতৃপুরুষগণের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি আদর নাই, তাহারা কখনও যে আপনাদের অধঃপতিত সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া আবার সমুন্নত জাতিবৃন্দের মধ্যে আপনাদের গৌরব-ধ্বজা রোপণ করিতে পারিবে, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

প্রাচীন ইতিহাসের প্রগাঢ় অনুশীলন ব্যতিরেকে শিক্ষার অভাবে অধঃপতিত সভ্য জাতির পুনরুদ্ধারের আশা যে নিতান্ত অল্প, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। সংক্ষেপতঃ—বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া সাধারণ ভাবে ইহার অভ্যুদয় ও বিস্তার এবং তাৎকালিক হিন্দুসমাজের সহিত ইহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য আমি এস্থলে কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের প্রণীত বা সঙ্কলিত গ্রন্থের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হড্‌সন সাহেব (B. H. Hodgson) তাঁহার প্রণীত ("Essays on the Languages, Literature, and Religion of Nepal and Tebet") উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অনেক প্রামাণিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বান্বেষী, আমি তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

এইরূপ জি টর্‌নুর (G. Turnour) সাহেবের "Pali Literature and the Singhalese chronicles" নামক গ্রন্থ

এবং তাঁহার কৃত অনুবাদসহকৃত "মহাবংশ" নামক পালিগ্রন্থও এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আবেল রেমিউসাট্ (Abel Remusat) এবং Schmiat সাহেবের "Religions and literatures of High and Eastern Asia" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সাহায্যও এবিষয়ে অধ্যবসায়শীল পাঠকের পক্ষে অবশ্য গ্রাহ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।
অধ্যাপক, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত কলেজ

কর্ম্ম।

আসি এ ধরণী পরে
স্বীয় দুরদৃষ্ট স্মরে,
আপন কর্ত্তব্য হ'তে বিচলিত হয়ো না।
উৎসাহ উদ্যম ত্যজি
অলস সন্ন্যাসী সাজি
ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু পরমুখ পানে কভু চেয়ো না॥
দুর্লভ জনম পেয়ে
কেবল অদৃষ্ট চেয়ে
স্বীয় দুরদৃষ্ট-পথ আবিষ্কৃত করো না।
"বিফল পুরুষকার—
একমাত্র দৈব সার"
অলসের এই মন্ত্র কখনও বলো না॥
"তনয়-তনয়া জায়া—
এ সব মায়ার মায়া";
ইহা বলি মনে কভু বিষণ্ণতা তুল' না।
এসেছ করিতে কর্ম্ম,
কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম,
সর্ব্বশাস্ত্রে এই মর্ম্ম কভু ইহা ভুল না॥

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে"
তা' বলিয়া অবসাদ মনে স্থান দিও না।
শান্তি আশে কর্ম্ম ছাড়ি
পরো না অশান্তি-বেড়ি,
কমল-মালিকা ভ্রমে অহি করে নিও না॥
চির কুলব্রত যাহা,
পালন করহ তাহা,
আত্ম ব্রত ভঙ্গ করি পর পানে চেয়ো না।
সাহসে করিয়া ভর,
কঠোর কর্ত্তব্য কর,
শেষের নৈরাশ্য স্মরি' মনে ভয় পেয়ো না॥
কর্ম্মভূমি মহীতল,
কর্ম্মই জীবের বল,
হেন কর্ম্ম পরিহরি নরধর্ম্ম ভুল না।
ত্যজিয়া তাড়িত প্রায়
উৎসাহ উদ্যম, হায়!
আপনার শিরে খড়্গ আত্মকরে তুল' না॥
কর্ম্মে শান্তি—কর্ম্মে সুখ,
কর্ম্মহীন মনে দুখ,
ধর্ম্মভাবে কর্ম্ম কর, আর কিছু চেয়ো না;
সুখ লোভে হয়ে ভোর
ছিঁড়িও না কর্ম্ম-ডোর,
স্বকরে গরল তুলি', ভ্রান্তমতি! খেয়ো না॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
(অধ্যাপক, মেট্রপলিটান কলেজ।)

বেদান্ত-সূত্র।

"শব্দব্রহ্ম" ও "স্ফোট"-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(১০ম)

প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ।

২৪। শব্দাদেব প্রমিতঃ।

("ঈশান") শব্দের দ্বারা "অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ" পদে পরম পুরুষ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

কঠোপনিষদ্ (২-৪। ১২) বলেন,—
"অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
আত্মমধ্য নিত্যনিবাসী তিনি॥

অপিচ,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ জ্যোতি-রিবাধূমকঃ ঈশানো ভূত-ভব্যস্য সএবাদ্য সউশ্ব এতদ্বৈতত।"

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত পুরুষ যিনি।
অধূমত জ্যোতিস্বরূপ তিনি॥
ভূত-ভবিষ্যের ঈশ্বর যিনি।
অদ্য-কল্য-সম, তাহাই তিনি॥

"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" পদে সোপাধিকত্ব ভাব থাকাতেও জীবাত্মা বুঝায় না, পরন্ত উক্ত পদে পরমাত্মা ব্রহ্মই বিস্পষ্ট বোদ্ধব্য, ইহাই সূত্রে আলোচিত ও সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের মূল মীমাংসিতব্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব। নচিকেতা যমের নিকটে সেই বেদাতীত, কার্য্যকারণাতীত ও ভূত-ভবিষ্যাতীত তত্ত্বই জানিতে চাহিয়াছিলেন।

যথা—"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাশ্চ যৎ তৎ পশ্যাসি, তদ্বদ।" (কঃ উঃ ১—২।১৪।)

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔপনিষদী শ্রুত্যুক্ত "এতদ্বৈ-তত" বাক্যে অনুসন্ধেয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই নিরূপণ "অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত" পদে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কারণ পরে বিশদরূপেই বর্ণিত হইয়াছে যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পুরুষ ভূত-ভবিষ্যের প্রভু। পরাৎপর পরমাত্মা পরব্রহ্ম ব্যতীত ভূত-ভবিষ্যের ভর্ত্তা কর্ত্তা আর কে হইতে পারে?

২৫। ইত্যপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধি-কারত্বাৎ।

বেদবাক্যার্থ-ধারণে মনুষ্যাধিকার থাকা-তেই ব্রহ্মের মনুষ্য-হৃদয়গম্যতা হেতু "অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র" বিশেষণে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই এস্থলে বিশেষিত বা বেদিত হইয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পদে ব্রহ্মতত্ত্বই কেন বিজ্ঞেয়, এই সূত্রে সেই প্রশ্ন ও তাহার সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। বেদ-বিদ্যায় মানবের অধিকার প্রসারিত, তাহাতেই পরমাত্মা ব্রহ্মের জ্ঞান মানবের লভ্য হই-য়াছে; সুতরাং হৃদয় দ্বারা লভ্য সেই হৃদয়-বাসী হৃদয়েশ্বরের জ্ঞান তাঁহাকে, এস্থলে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়-স্বরূপে প্রকাশ করিতেছে। হৃদয় পরমাত্মার অধিষ্ঠানরূপেই শ্রুত্যুক্ত হইয়াছে; সেই হৃদয়ের পরিমাণ শাস্ত্রানুসারে অঙ্গুষ্ঠ-পরি-মিত "দীপকলিকাবৎ।" অতএব এস্থলে হৃদয়স্বরূপে উপলক্ষিত ব্রহ্ম "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পদেই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

বেদবিদ্যাধিকার দ্বারা মানবের এই ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞানাধিকার বিষয়ের আলোচনায় শ্রীমচ্ছ-

ঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণেরই বেদাধিকার বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। আচার্য্যপ্রবর, মহর্ষি জৈমিনি-কৃত "পূর্ব্বমীমাংসা" দর্শনের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শূদ্র বেদ-বিদ্যার অধিকারী নয়। সূত্রের "মনুষ্য" শব্দে প্রকৃতার্থে মনুষ্যাকৃতিধারী মাত্রই প্রতিপাদ্য নহে; পরন্তু "অধিকারী" মানবই প্রতিপাদ্য। সে অধিকার বা যোগ্যতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই "দ্বিজ" ত্রিবর্ণ ব্যতীত শূদ্র সম্ভবেনা। আমরা এই বিষয়টী ৩৪-৩৮ সূত্রের ব্যাখ্যার সময় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যেহেতু উক্ত সূত্রদ্বয়ে এ তত্ত্ব পুনরালোচিত হইয়াছে।

• এই সূত্র প্রকারান্তরে এই শিক্ষা দিতেছে যে, জীবাত্মা পরমার্থতঃ পরমাত্মা সহ অভিন্ন; পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের সিদ্ধান্ত-রহস্য। পশ্চাদুক্ত বাক্যে এই সিদ্ধান্ত সুবিশদ হইতেছে যে, হৃদয়স্বরূপ অন্তরাত্মার হৃদয়-পরিমিত আয়তন অঙ্গুষ্ঠমাত্র; এই হৃদয়ায়ত্ত অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা জীব হৃদয়াধারে নিত্যাধিষ্ঠিত। যথা—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জা-
দিবেষীকাং তং ধৈর্য্যেন বিদ্যাৎ।
শুক্রমমৃতমিতি।"
(কঃ উঃ ২-৬।১৭)

অন্তরাত্মা পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত।
সদা জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত॥
তৃণ হতে গর্ভ-তৃণ গ্রহণ যেমন,
তথাবৎ দেহ হতে হৃদি-উন্মোচন।
দেহ-সার হৃদি, তাই আত্মা হৃদিরূপ।
জানিবে সে ব্রহ্মজ্যোতি অমৃতস্বরূপ॥

২৬। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

সম্ভাবনানুসারে মানবাধিক উন্নত প্রাণী-গণেরও বেদবিদ্যায় অধিকার, ইহাই বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মানবগণ বেদ-বিদ্যায় অধিকারী; কিন্তু তদ্দ্বারা এমন কোন বাধকবিধি ব্যবস্থিত হয় নাই যে, দেবগণ বেদ-বিদ্যাধিকারে বর্জ্জিত। এতাবতা মহর্ষি বাদরায়ণের বিচারিত সিদ্ধান্ত এই যে, মানবাধিক শ্রেষ্ঠতর চিৎসত্ত্ব (যথা ইন্দ্র প্রভৃতি) দেবগণ অবশ্য বেদবিদ্যাধিকারী; যেহেতু এ বিষয়ে সম্ভাবনার সুবিদ্যমানতা আছে। পক্ষান্তরে, বেদাধিকারের উপযোগিতা এইরূপে বিবেচিত হইবে, যথা—প্রথমতঃ, দেবগণেরও মানবগণের ন্যায় মুমুক্ষুত্ব থাকার সম্ভাবনা, যেহেতু একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহারাও মায়া-সৃষ্ট, উপাধিবিশিষ্ট ও অনিত্যপ্রতিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহারাও মানবের ন্যায় কোন না কোনরূপ অনতীন্দ্রিয় স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করেন। তৃতীয়তঃ ইহাতে কোন বাধাই কল্পিত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ বেদাধিকারপ্রদ উপনয়ন সংস্কার তাঁহাদের পক্ষে না থাকিলেও, উহাই যে স্বাধ্যায়াধিকারের অবশ্যনির্দ্দিষ্ট অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়োজনানুষ্ঠান, এমন কোন কথা নহে। মানবের উপনয়ন-বাধ্য সংস্কারে দেবগণ স্বতঃপ্রবৃত্ততা বশতঃ স্বতঃসিদ্ধই হইতে পারেন।

২৭। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্না-নেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।

দেবগণের মূর্ত্তত্ব বা সাকারত্বের সত্তাসত্তা বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে, তাহা অগ্রাহ্য; যেহেতু দেবগণের বিবিধ সাকারসত্ত্ব ধ্যান-লব্ধ ও সিদ্ধ সাধকের দ্রষ্টব্য।

অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, বর্ত্তমান ও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রনিচয়ের সিদ্ধান্ত-বিচার দেবগণ পক্ষেই প্রয়োজনীয়; কিন্তু মানবগণ পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইন্দ্র বা তাঁহার সজাতীয় দেবগণ বেদ-বিদ্যায় অধি-কারী কি না, এবং তাঁহাদের সাকার-দেহ-সত্তা সত্য কি না, এসব বিষয় এতৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী মধ্যযুগের বিদ্যার্থীগণের বিচার্য্য ও আলোচ্য ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গের বোধ হয় সে সম্ভাবনা বড় কিছু নাই। ফলে যাঁহাদের এরূপ ধারণা, তাঁহাদের ভ্রান্তি-নিরসন অবিলম্বেই হইবে; কারণ পরবর্ত্তী সূত্রে এই আপাতসামান্য বিষয়টির সমস্যাতেই শব্দ-বিজ্ঞানের গুরুতম তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এক পক্ষে প্রতি-পক্ষীয় বিতর্ক এই যে, যদি দেবগণের মূর্ত্ত সত্তা স্বীকার করা যায়, তবে বেদোক্তি মতে দেবগণের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হয়? কারণ একই দেব বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে একই মূর্ত্তসত্তায় কিরূপে আবি-র্ভূত হইতে পারেন? উত্তর এই যে, শাস্ত্রে জানা যায়, এক দেবই বহুমূর্ত্তি ধারণে সমর্থ। অধিক কি, শাস্ত্র বলেন, মনুষ্যও যোগসিদ্ধ-শক্তিতে বহুমূর্ত্তি ধারণে সমর্থ। অতএব অতএব মনুষ্যাধিক শ্রেষ্ঠতর শক্তিসম্পন্ন দেবগণ যে একই সময়ে বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

২৮। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

যদি এরূপ বলা যায় যে, "শব্দ" পক্ষে অনুপপত্তির আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তবে সে আপত্তি সর্ব্বথা অপ্রতিপন্ন; যেহেতু শব্দই জগতের মূলতত্ত্ব। শব্দ হইতেই জগৎ সমুৎপন্ন। প্রত্যক্ষ (বেদ-শ্রুতি) ও অনুমিতি, এতদুভয় দ্বারাই এই সত্য সিদ্ধান্তীকৃত। 'প্রত্যক্ষ' অর্থ এস্থলে শ্রুতি এবং 'অনুমান' স্মৃতি।

দেবগণের মূর্ত্তসত্তা স্বীকারে যজ্ঞকার্য্য সম্বন্ধে কোন অসঙ্গতি সম্ভাবিত নহে, কিন্তু শব্দ সম্বন্ধেই যে কিছু অসঙ্গতির আপত্তি বা প্রতিবাদ। দেবগণ মূর্ত্তসত্ত্ব হইলে, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুরও বিষয়ীভূত বটে; যেহেতু সোপাধিকতা বা মূর্ত্তসত্তা অবশ্য অনিত্য; অতএব বহুদেবনামময় শব্দাত্মক বেদও অনাদি অনন্ত হইতে পারে না। নিত্য শব্দের সহিত অনিত্য বিষয়ের নিত্যসংযোগও অনিত্য অর্থাৎ নাশশীল হয়; সুতরাং বেদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ উত্থা-পিত হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের অনিত্য সত্ত্ব স্বীকার করেন, এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, দেবগণ, অপর প্রাণীগণ—এক কথায়—সমগ্র জগৎই শব্দ বা বেদ হইতে সমুৎপন্ন। এই শব্দ বা বেদই ব্রহ্ম। 'শব্দ ব্রহ্ম" এই বিখ্যাত বাক্য সাধক হিন্দু মাত্রেরই বিদিত। শব্দশাস্ত্রের গ্রন্থকার পাণিনিও "শব্দশাস্ত্রাধ্যায়ীই প্রত্যক্ষের অতীত মোক্ষ-

বিকারী" এই যে মত প্রকাশ করেন, তাহারও একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শঙ্কর বলেন, প্রত্যেক পদার্থের মূলতত্ত্ব শব্দে নিহিত। ফলে উহা পদার্থের স্বাতন্ত্র্যগত ভাবে নহে, কিন্তু জাতিগত ভাবে। কারণ পদার্থ সংখ্যায় অনন্ত। স্বাতন্ত্র্যগত বা সোপাধিক বস্তু বা দেবগণের অবশ্য মূল আছে, এবং অবশ্য উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, কিন্তু জাতিগত মূলতত্ত্ব তদতীত। চিৎস্বরূপে এবং বাক্য রূপে তাহা প্রথমে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্যক্ত।

যাহাহউক, ব্রহ্মকর্ত্তৃকই এই সোপাধিক জড়জগৎ সৃষ্ট, কিন্তু শব্দ কর্ত্তৃক নহে। শব্দ বা বেদ কেবল প্রতি বস্তুগত নিত্যতত্ত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ। স্বাতন্ত্র্যগত সোপাধিক জীবিত পদার্থসমূহ এতদনুসারেই সমুৎপন্ন।

শঙ্করাচার্য্য শ্রুত্যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। "মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ।" (বৃঃ আঃ উঃ, ১২৪) অর্থাৎ তিনি মনদ্বারা বাক্যে যুক্ত হইলেন। অপিচ,—

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥"
(মঃ ভাঃ, ১১-৮৫০৪)

অনাদিনিধনা নিত্যা স্বয়ম্ভূতা যিনি—
বেদবাণী, বিশ্ববাণী-বিকাশিকা তিনি॥

বেদ বা বাণীর বিশ্বমূলত্ব প্রতিপাদনে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিচার-প্রণালী এইরূপ।— আমরা যখনই যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি, তখনই সেই বিষয়ের স্মরণসূচক নাম, সংজ্ঞা বা বাণী সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে উদয় হয়। সেই ইচ্ছার উদয়, সেই বাণীর উদয়। নির্গুণের প্রথম সগুণত্বই ইচ্ছা। আর সগুণত্বের প্রথম বিকাশই বাণী। রজোগুণে, আদি সগুণসত্ত্ব প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াই জগদুপাদানভূত পদার্থের সংজ্ঞা স্বরূপ শব্দের স্মরণ করিয়াছিলেন। "স ভূরিতি ব্যাহরণ্ স ভূমিমসৃজত।" (তৈঃ উঃ ১১-২৪২) ভূমিসৃষ্টির বিষয় স্মরণ করিতেই সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ে "ভূ" শব্দের উদয় হইল। অমনি তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি "ভূ" বলিয়া ভূসৃষ্টি করিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও এই জন্য এইরূপ বাক্য হইয়াছে— "God said let there be light, and there was light. ঈশ্বর বলিলেন "জ্যোতি হউক" অমনি জ্যোতি হইল। ফলে শব্দাত্মক বেদের অনাদিনিধনত্ব ও জগন্মূলত্বের রহস্য "শব্দব্রহ্ম" তত্ত্বেই নিহিত।

বেদ, বাক্ বা শব্দ বস্তুতঃ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মূলতত্ত্বাতীত তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বাক্যের বীজ-সঙ্কেতবৎ জাগতিক সৃষ্ট পদার্থের সৃষ্টিমূলক প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা চিন্তা ধারণ করে। সৃষ্টিশক্তির মূল হেতুস্বরূপ এরূপ সূক্ষ্ম শব্দ বিজ্ঞান-রহস্য পাশ্চাত্য প্লেটোনিষ্টগণের বহু পূর্ব্বে হিন্দুর জ্ঞানাধিগত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ ১০ম (১২৫) ও অথর্ব্ববেদ ৪র্থ (৩০) বাণীর স্বগতোক্তি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

১। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

আমি বরুণের সহিত ভ্রমণ করি, রুদ্রের সহিত ভ্রমণ করি, আদিত্যের সহিত ভ্রমণ

করি, বিশ্বদেবের সহিত ভ্রমণ করি। আমি মিত্র-বরুণ উভয়ের ভরণ করি; আমি অগ্নির ভরণ করি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ভরণ করি।

২। অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণাং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যা যজমানায় সুন্বতে॥

আমি সোমকে পোষণ করি; ত্বষ্টা, পূষণ এবং ভগকে পোষণ করি। যাঁহারা সোমকে পোষণ করিয়া সোৎসাহে যজ্ঞ করেন, হোম করেন, দান করেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন বিতরণ করি।

৩। অহং রাষ্ট্রী-সগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তঃ॥

আমি রাজ্ঞী, আমি ধনসংগ্রহিত্রী, আমি জ্ঞাতবতী, আমি যজ্ঞোপাস্যগণের প্রথমা। দেবগণ আমাকে বহুস্থানে বহুবিষয়ে বহুভাবে অন্তর্নিবিষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন।

৪। ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধিশ্রুত শ্রদ্ধেয়ং তে বদামি॥

যিনি দর্শন, প্রাণন, শ্রবণ ও ভোজন করেন, তিনি অজ্ঞাতভাবে ফলিতার্থে আমাদ্বারাই তৎসমস্ত করেন তোমরা সকলে শ্রবণ কর, যাহা শ্রদ্ধেয়— সত্য, তাহাই আমি তোমাদিগকে বলি।

৫। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানামুত মানুষাণাম্।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

যাহা মনুষ্য ও দেবগণের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাই আমি স্বয়ং বলিতেছি। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে জগন্নির্ম্মাণক্ষম ঈশ্বর করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকে ঋষি করি, সুমেধা করি

প্রাচীন টীকাকারগণের মতে "প্রত্যক্ষ" অর্থে শ্রুতি বা ঐশবাণী এবং "অনুমান" অর্থে স্মৃতি বা পুরাণ। এই পরোক্ত শাস্ত্র স্মৃতি-পুরাণ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বেদের অবিরোধী হইলেই প্রামাণ্য।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"
বেদ-স্মৃতি পুরাণে যে আপাত-বিরোধ ঘটে।
বেদই প্রামাণ্য তায়; অন্য দুয়ে স্মৃতি বটে॥

বৈদান্তিকগণ তাঁহাদের দর্শনের মুখ্যতম প্রামাণ্যরূপে বেদকেই মান্য করেন; তাঁহারা কেবল যুক্তি-তর্কমাত্রে নির্ভর করেন না। শঙ্করাচার্য্য বলেন, এক মাত্র শ্রুতি-প্রমাণে নির্ভর করা যায়, কিন্তু একমাত্র যুক্তি-প্রমাণে নির্ভর করা যায় না। অতি চতুরের যুক্তি-তর্কও তদধিক চতুরের দ্বারা খণ্ডিত হয়; অতএব প্রমাণ বিষয়ে যুক্তি-তর্ককেই নির্ভর-ভিত্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে। যুক্তি-তর্কের পরিবর্ত্তনশীল অদৃঢ় ভিত্তি উপেক্ষা করিয়া, শঙ্করাচার্য্য তৎপ্রমাণিত নিত্য অপরিবর্ত্ত্য বেদ-ভিত্তিতে স্বীয় সেব্য বেদান্তদর্শনের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্ত-দার্শনিকেরা কোনরূপ অলৌকিক সংস্কারের

বাধ্য নহেন, কিন্তু শ্রুতির স্বয়ং-প্রামাণিকতায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহাদের মত এই যে, আলোকের প্রামাণ্য যেমন আলোকান্তর-সাপেক্ষ নয়, অর্থাৎ আলোক যদ্রূপ স্বয়ম্প্রকাশ, বেদও তদ্রূপ স্বয়ম্প্রমাণ। আলোক যেরূপ আকৃতি ও বর্ণের প্রমাণ, বেদও তদ্রূপ সর্ব্ব-তত্ত্ব—সর্ব্বসত্যের প্রমাণ।

ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ—যাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতুল্য প্রতিভায় আমরা চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই, তাঁহারাও বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করেন। তবে কি না, "সংহিতা" ও "ব্রাহ্মণ" নামধেয় কতিপয় পুস্তকবিশেষের স্থূল ভৌতিক সত্তাকেই যে তাঁহারা নিত্য ও অভ্রান্ত বলেন, ইহা বলিলে, তাঁহাদের সেই বিশ্ব-বিকাশিনী বোধ-শক্তিকে বিদ্রূপ করা হয় মাত্র। কতিপয় জড় সন্দর্ভ বা বাক্য সমষ্টিই তাঁহাদের সেই নিত্য সত্য সনাতন "বেদ" নয়; প্রকৃত বেদ-তত্ত্ব অতি গভীর। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদ, শব্দ বা বাক্ এবং ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক তত্ত্ব; এক তত্ত্বেরই ভিন্ন ২ প্রতিশব্দ-সংজ্ঞা মাত্র। "বিদ্" ধাতুর অর্থ জানা। যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই বেদ। অতএব বেদই জ্ঞানস্বরূপ। শব্দই জ্ঞানের প্রবর্ত্তক, অতএব অব্যবহিত কার্য্য-কারণত্ব জন্য শব্দ ও জ্ঞান মূলতঃ এক তত্ত্বান্তর্গত। শব্দই সগুণাত্মিকা ঐশী ইচ্ছার আদি অভিব্যক্তি। এই সিদ্ধান্তেই প্রতিপন্ন হয় যে, শব্দ, বাক্ বা ব্রহ্ম নিত্য, সত্য, শাশ্বত, স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বয়ংপ্রমাণ। অতএব শব্দ বা ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; সেই জ্ঞানই বেদ; এবং নিত্য সত্যজ্ঞানস্বরূপ সেই বেদেই আর্য্যবিদের সিদ্ধপ্রামাণ্য স্বীকৃত। বেদান্ত-দার্শনিকগণ কতিপয় স্থূল গ্রন্থমাত্রেতেই যদি স্বয়ংপ্রমাণ-বেদত্ব বোধ করিতেন, তবে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞান-প্রতিভার প্রসূত বিষয় মাত্রই বালকত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হইত। ফলে যাঁহারা প্রকৃত বেদবিৎ, তাঁহারাই প্রকৃত বৈদান্তিক।

তৎপর, জগদুৎপত্তির মূলতত্ত্ব শব্দের যথার্থ স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক "স্ফোট" পদের তাৎপর্য্য এই স্থলে বিচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য বলেন, যদ্রূপ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার উপক্রমে সেই বিষয়ের সংজ্ঞাত্মক শব্দ আমাদের চিন্তায় উদিত হয়, তদ্রূপ জগৎসৃষ্টির উপক্রমে প্রজাপতির চিত্তে শব্দের উদয় হইয়াছিল।

হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র সমূহে শব্দতত্ত্ব-সমস্যা বিশেষ বিচক্ষণতা ও ধীরতা সহযোগে বিচারিত হইয়াছে। "শব্দ" অর্থে পদ এবং ধ্বনি বুঝায়। অতএব প্রথমতঃ "ধ্বনি" কি, তাহাই আলোচিত হইয়াছে;

বৈশেষিক দর্শনে এবিষয় বিশিষ্ট ধীরতার সহিত এইরূপ বিচারিত হইয়াছে যে, ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বটে; ফলিতার্থে উহা কোন বস্তু বা ক্রিয়া নহে; কিন্তু আকাশ বা ব্যোমের ভৌতিক গুণ-বিশেষ। বায়ু ইহার স্বরূপ বাহক নহে; ইহার উচ্চতা বা শ্রুতি-যোগ্যতা বায়ুসাপেক্ষ হইলেও ইহার গুণ বা স্বরূপ বায়ুসাপেক্ষ নহে। এতাবতা ধ্বনি এবং পদ নিত্য-শব্দতত্ত্বের সাময়িক স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। বাদন-দণ্ডের আঘাতে একটি ঢক্কা বাদিত হইলে, ঢক্কা ও দণ্ডের সম্মিলনে ধ্বনি সমুৎপাদিত ও বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। জৈমিনি-শিষ্য মীমাংসা-

দার্শনিকগণের মত এই যে, শব্দ নিত্য। তাঁহারা প্রথমতঃ শব্দের নিত্যত্ব নিরাসক যুক্তি এইরূপে (পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপে) গ্রহণ করেন, যথা,—

১। শব্দ নিত্য হইতে পারেনা, যেহেতু ইহা উৎপন্ন।

২। ইহা বাহিত হইয়া বিলীন হয়।

৩। ইহা গঠিত বা কৃত হয়, তজ্জন্য বর্ণসমূহকে অকার-ককারাদি বলা যায়।

৪। ইহা বিভিন্ন ব্যক্তিকর্তৃক যুগপৎ অনুভূত হয়।

৫। ইহা পরিবর্ত্তনশীল, যথা ইহা "দধি অত্র" হইতে আবার "দধ্যত্র" রূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

৬। ইহা শব্দকারীর সংখ্যাধিক্যে আধিক্য-প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর মীমাংসকগণ এই সমস্ত পূর্ব্ব-পক্ষের খণ্ডনার্থ নিম্নোক্ত-প্রকার উত্তর পক্ষে উপনীত হন।—

"শব্দ নিত্যই বটে। যদিও ইহার অনুভূতি উভয় দিকেই তুল্য, তথাপি আমাদের এ সিদ্ধান্ত সত্য যে, শব্দ নিত্য অর্থাৎ সদাস্থিত বা শাশ্বত। কেবল উচ্চারক বা উত্তেজকের সাপেক্ষতায় ইহা সতত ভৌতিক সত্তায় অনাভব্যক্ত। "ক" এই শব্দটি যে শ্রুত হইল, ইহা সেই শব্দই, যাহা নিত্য শব্দিত হইয়াছে ও হইতেছে! যদি বলা যায় যে "একটি শব্দ করা হইল" তবে তাহার যাথার্থ্য এই যে, একটি শব্দকে ভৌতিক ব্যবহারে আনা হইল এবং যুগপৎ বহুব্যক্তি-দৃশ্যমান সূর্য্যবৎ ইহার অনুভূতি বা অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইল। শব্দের বিকার বা পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই এক শব্দই বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না; পরন্তু ইহা অপর শব্দ; শ্রোতার বোধাধিকারগত ভাবে সেই একের স্থান-পূরক মাত্র। আর শব্দের যে বৃদ্ধি বা আধিক্য, তাহা বায়ুর সংযোগ-বিয়োগের পরিমাণগত বৃদ্ধি বা আধিক্য-সাপেক্ষ। অপর, শব্দ বা বাক্য যদিও বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার পদাঙ্ক শ্রবণকারী বা শিক্ষাকারীর হৃদয়ে রাখিয়া যায়। শব্দ একই সময়ে সর্ব্বত্রস্থিত, তবে ইহার পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, ফলিতার্থে ইহা সেই শব্দই থাকে, কোন নূতনত্ব বা পরিবর্ত্ত প্রাপ্ত হয় না। শব্দ যে কেবল বায়ুরই বিবর্ত্ত-বিধায়ক, তাহা নহে; কারণ শ্রবণেন্দ্রিয় আপনা স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পবনকে শ্রবণ করে না; কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত আকাশের শব্দ-গুণকেই গ্রহণ করে বা শ্রবণ করে। এতদ্ব্যতীত অধিকতঃ ও প্রধানতঃ স্বয়ং শ্রুত্যুক্তি-প্রমাণেই শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত।"

উপরোক্ত বাক্য-সমষ্টি জৈমিনি-মীমাংসা-পক্ষীয় বিচার-সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সার। জৈমিনি-পক্ষ স্বমতানুস্যূত যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা করিয়া, পরে বেদোক্ত শব্দের সমর্থনার্থ বহুবিধভাবে বিচার করিয়াছেন। অতঃপর আমরা একটি পরবর্ত্তী সূত্রের বিচার-বিষয়ীভূত সেই "স্ফোট" পদের আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইব। "স্ফোট" অর্থ ফুটিয়া পড়া। পাণিনি "স্ফোট" সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ "স্ফোটায়ন" নামে এক বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির মতে শব্দই ব্রহ্ম। এই হেতু মাধবাচার্য্য পাণিনিকে দার্শনিকগণের মধ্যে

খ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে "বৈয়াকরণবাদ" বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পাণিনি যদিও স্পষ্টতঃ "স্ফোট" বিষয়ে বলেন নাই ; কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বীগণ সকলেই সমবেতমতে স্ফোটের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শব্দ বা বাক্যের অক্ষরসমূহ দ্বারা কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না ; উহা উচ্চারিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ উহারা প্রত্যেক বক্তা বা শব্দকর্তার উচ্চারণ বা শব্দকরণ দ্বারাই আত্ম-সত্তা অভিব্যক্ত করে ; যেহেতু উহাদের নিজের কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টি-শক্তির মৌলিকত্ব নাই। উহাদের শেষ অক্ষরেও পূর্ব পূর্ব অক্ষর-প্রবাহিত অর্থকরী শক্তি বা তাৎপর্যবতী অভিব্যক্তি আমাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত বা বুদ্ধিতে প্রতীত হয় না। অতএব স্থূল শব্দ বা বাক্য হইতে স্বতন্ত্র বা শব্দাতীত কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ববিশেষের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। শব্দের সেই সূক্ষ্মতত্ত্বই "স্ফোট"। সমগ্র শব্দটি হইতে একেবারে যে তাৎপর্যা-স্বরূপটি বোধ বিষয়ীভূত হইয়া বিকাশিত হয়, তাহাই স্ফোট। এই স্ফোটতত্ত্ব নিত্য ; ইহাই পরিবর্তনশীল ও বিকাশশীল বাক্যাক্ষরের অতীত স্বতন্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মীমাংসকগণের ন্যায় স্ফোটের ওরূপ গুরুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি তৎসমর্থনার্থ "উপবর্ষ" হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষের যুক্তি এইরূপ যে, অক্ষর সমূহই নিজ সত্তা দ্বারা শব্দ সংগঠন করে ; যেহেতু যদিও উহারা উচ্চারণ বা শ্রবণ মাত্রেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা পুনরাগত ও হইতে পারে। দুইবার "গো" বলিলে, ঐ দুই শব্দে ভিন্ন ২ শব্দ উচ্চারিত হইল, এরূপ কেহই মনে করে না। উচ্চারণের পার্থক্য বস্তুতঃ বাগ্‌যন্ত্রগত, আর অক্ষরের প্রত্যভিজ্ঞান তাহার অন্তঃপ্রকৃতিগত।

শব্দের বর্ণসমূহ একাধিক হইলেও অর্থতঃ একমাত্র মানসিক ক্রিয়ারই বিষয়ীভূত হয় ; যথা আমরা 'সারি' বা 'সৈন্য' সংজ্ঞার বস্তুগত বহুত্ব একত্বভাবেই অনুভব করি। যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, "পিক" ও "কপি" শব্দের ন্যায় একই অক্ষর সমূহে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ কেমন করে ? উত্তর এই যে, যখন এক দল পিপীলিকা সারিবাঁধিয়া সুশৃঙ্খলায় চলে, তখন তদ্দ্বারা একটি শ্রেণী মাত্রের একত্বভাব উপলব্ধ হয় ; তবে যখন তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বিভিন্নত্ব ও বহুত্ববোধ ঘটে। শঙ্করের মত এই যে, স্ফোটতত্ত্বের কল্পনা বা অবতারণা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে শব্দের বর্ণ সমূহ এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থবোধের সহিত নিত্য নিবদ্ধ থাকে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্নবর্ণ-সমবায়-সঞ্জাত একটি নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য বা অর্থবিশেষ আমাদের বোধ-বিষয়ীভূত করে। অতএব অতিরিক্ত এক স্ফোট-তত্ত্বের অনুভূতি অসিদ্ধ। এতাবতা শঙ্কর স্ফোটতত্ত্ববাদ অঙ্গীকার করেন না ; কিন্তু শব্দ ও ব্রহ্মের সমত্ব প্রতিপাদন পক্ষে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন এবং নিত্য ও জগন্মূল "শব্দব্রহ্ম" হইতেই যে জাগতিক অনিত্য পদার্থ—যথা দেব, নর, গো ইত্যাদি উৎপন্ন, তাহাও সিদ্ধান্ত করেন।

যোগদর্শন স্ফোটবাদ স্বীকার করেন, কিন্তু তৎসহযোগীদর্শন সাংখ্য তাহা অস্বীকার

করেন। কপিল বলেন,—যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, এরূপ এক নবোদ্ভাবিত তত্ত্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? "বৃক্ষ" হইতে "বন" যেমন অবিভিন্ন, তদ্রূপ শব্দ হইতে অবিভিন্ন এই স্ফোটের সার্থকতা ও প্রামাণিকতা সম্পূর্ণ অনুপপন্ন।" কপিল দেব বেদের নিত্যত্বও অস্বীকার করেন; যেহেতু বেদসমূহ স্বয়ং স্ববাক্যে তাহাদিগের উৎপন্নতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এ স্থলে ইহা অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, এই অনিত্যত্ব প্রতিপাদন "বেদ" নামধেয় স্থূল গ্রন্থসত্তার প্রতিই প্রযোজ্য; ফলে বেদার্থরূপ নিত্য-জ্ঞানতত্ত্বের প্রতি নহে; কারণ "বিদ্" ধাতু উৎপন্ন বেদ জন্যতা প্রযুক্ত অনিত্য হইলেও, তদ্দ্বারা বেদ্য জ্ঞানতত্ত্ব স্বতএব নিত্য।

ন্যায়দর্শনকার গৌতমও শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বেদ-সমূহের যথার্থ নিত্যত্ব তাহাদের স্মৃতি, স্বাধ্যায় ও নিয়োগের অক্ষুণ্ণ নিরবচ্ছিন্নতার উপর নির্ভর করে, এবং তাহাদের প্রামাণিকতা সম্যক্ স্বাধ্যায়-সিদ্ধ আপ্ত পুরুষের প্রমাণ-প্রয়োগতার নির্ভর করে; অতএব বেদ-সর্ব্বস্ব শব্দের বা শব্দসর্ব্বস্ব বেদের নিত্যত্ব অনুপপন্ন। বৈশেষিকগণও শব্দাত্মক বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে ন্যায়কার গৌতম ঋষির মতের বিশেষ বিভিন্নবাদী নহেন।

২৯। অতএব চ নিত্যত্বম্।

অতএব বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন যে, বাক্ বা শব্দাত্মক বেদ বিজ্ঞান বা বিদ্যার ন্যায় নিত্য। শব্দ ভিন্ন জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভবে না। প্রাচীন গ্রীকগণের "Logos" যেমন, ভারতের জ্ঞান বা বেদ তদ্রূপ। কালক্রমে অনেক স্থলে বেদের বেদত্ব কেবল কতিপয় গ্রন্থবিশেষে এবং ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা এবং তাহাদের "ব্রাহ্মণ" ও "উপনিষৎ" রূপ স্থূল বিভাগ-বিশেষেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহেরও সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, মানব-জ্ঞানের সমগ্র শাখা-প্রশাখাই বেদ-বিনির্গত। বস্তুতঃ মানব-জ্ঞানের এরূপ কোন শাখাই কল্পিত হইতে পারে না, হিন্দুগণ যাহার মূল সর্ব্বজ্ঞান-কল্পতরু বেদে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়াছেন।

৩০। সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তা-বপ্য বিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।

নাম-রূপ-উপাধির সমত্ব বশতঃ জগতের নব সৃষ্টির সময়ে বেদ বাণীর এই নিত্যতা অনুপপন্ন নহে।

ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, শব্দ ও জাতির সম্বন্ধ নিত্য। কিন্তু যদি জগৎ প্রতি কল্পের অবসানেই অবসান প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ কল্পারম্ভে পুনঃসৃষ্ট হয়, তবে শব্দ ও জাতির সম্বন্ধগত ব্যবহারিক নিত্যত্বের গতি ব্যাহত হইল, এবং তদ্ধেতু বিষয়টীও প্রতিবাদবিষয়ীভূত হইল, বলিতে হইবে। বক্ষ্যমাণ সূত্রে উক্ত প্রতিবাদের বিষয়ই এইরূপ আলোচিত হইতেছে যে—যদিও প্রতি মহাপ্রলয়েই এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের ভৌতিক প্রলীনতা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জগতের সূক্ষ্ম বীজ-শক্তি ব্রহ্মতত্ত্বগতভাবে অব্যাহত থাকে এবং জগতের পুনঃসৃষ্টিতে সেই মূল কারণ হইতে ইহাও সগুণা ও সক্রিয়া হইয়া পুনঃ প্রকাশ পায়। অন্যথা

আমাদিগকে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জগতের বিভিন্ন সাময়িক বিভিন্ন প্রকারের শক্তি-সত্তা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। নাম ও রূপের মূলতত্ত্বগত একত্ব শ্রুতি স্মৃতি, উভয় শাস্ত্রেই স্বীকৃত। ঋক্‌সংহিতা (১০—১৯০। ৩) বলেন—

"সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"
পূর্ব্বকল্প-অনুসারে সৃজিলেন ধাতা—
চন্দ্র-সূর্য্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ তথা।

স্মৃতিও এবম্বিধ উক্তি করিতেছেন, যথা,—
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥"
"দিলা অজ নাম-রূপ-বেদবিদ্যা-অধিকার।
নিশান্তে প্রসূত পুনঃ ঋষিগণে পুনর্ব্বার॥

ঋতু যেমন ঠিক সর্ব্বস্বাভাবিক সত্ত্ব সহ পুনরাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন যুগ-প্রলয়ের পর পুনরাবৃত্ত নবযুগে ভৌতিক সত্ত্ব এবং দেবগণের ঠিক পূর্ব্বযুগবৎ নাম-রূপ উপাধিসহ পুনরাবৃত্তি ঘটে।

৩১। মধ্যাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।

জৈমিনির মত এই যে, দেবগণ বেদ-স্বাধ্যায়শীল হইতে পারেন না, যেহেতু "মধুবিদ্যা" প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অসম্ভাবনাই প্রমাণিত।

"মধুবিদ্যা" পদের সহজ শাব্দিক অর্থ মধু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। বস্তুতঃ ইহা শ্রুতির ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক এক বিশিষ্ট অংশ। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩—১১) দেখিতে পাই যে, সূর্য্যই দেবগণের মধু স্বরূপ এবং আমরাও মধু স্বরূপ সূর্য্যকে ধ্যান করি। অতএব দেবগণ যদি স্বয়ংই উপাসক রূপে স্বীকৃত হন, তবে কিরূপে এই আদিত্যও স্বয়ং দেব হইয়া আপনাকে আপনি ধ্যান করিবেন ? এতাবতা জৈমিনির সিদ্ধান্ত এই যে, দেবগণ বেদবিদ্যাধিকারী নহেন।

৩২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।

দেব সংজ্ঞা-সূচক শব্দ সকল জ্যোতিঃ স্বরূপেই দেবতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়াও দেবগণের (পূর্ব্বোক্ত) অনধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

জ্যোতিষ্ক মণ্ডল আদিত্যবৎ আকাশ-মণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া জগৎ আলোকিত করেন। এই আদিত্য একটি প্রধান দেব বলিয়া পরিচিত। ফলে হৃৎ-কুক্ষ্যাদি-সম্বস্থিত কোন জৈবিক শারীর সত্তা বা বুদ্ধিমত্তা জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সম্ভবেনা; অতএব তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানাধিকার অনুপপন্ন। তারপর, যদিও মন্ত্র ও পুরাণ সকল দেবগণের ব্যক্তিত্ব ও মূর্ত্তসত্ত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ধর্ম্মোপদেশাদিবৎ মন্ত্র ও পুরাণাদি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদের প্রতি নিশ্চয় নির্ভর করা যাইতে পারে না।

৩৩। ভাবন্তুবাদরায়ণোঽস্তি হি।

পক্ষান্তরে, বাদরায়ণ, শ্রুত্যুক্তি আছে বলিয়াই, সেই আপ্তপ্রমাণ-বলে দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকারের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন।

বাদরায়ণ বলেন, দেবগণ জ্ঞানের অন্যান্য অবান্তর বিষয়াধিকারী না হইলেও, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন। এমন কি, মনুষ্য মধ্যেও সকল মনুষ্য সকল বিষয়ে সমাধিকারী হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ

কদাপি রাজসূয়যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন না। ফলে দেবগণের উক্ত অধিকার প্রতিপাদক স্পষ্ট শ্রুত্যুক্তি রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এতাবতা পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদিও দেবগণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের এরূপ বিশেষ দৈব আত্মসত্ত্বা, বুদ্ধিমত্তা ও অব্যাহত শক্তিসম্পন্নতা আছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে কোন অধিকারবিষয়ে যে কোন তত্ত্বমূলক মূর্ত্তিধারণে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

এই যে আমি।

(গীতিকা)

আমারে কি খোঁজ রে জীব!
আমি যে তোর পাশে॥
(আছি) পাশে এসে, ঘেঁসে বসে,
মিশে যাবার আশে॥

১। (আমায়) খুঁজিস্ কিরে লক্ষ্মীছাড়া!
আমি কি তোর অক্ষিছাড়া?
(আবার) শুনিস্ না যে দিচ্ছি সাড়া
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে॥

২। (আহা) সুধার সাধে উধাও হয়ে,
বাইরে ফের চন্দ্র চেয়ে,
(আছি) মন-চকোরের চন্দ্র হয়ে
অন্তর-আকাশে॥

৩। (এ যে) পেঁচিয়ে ধরেও চেঁচিয়ে ডাকা,
মশাল জ্বেলে খুঁজে দেখা,
আয়নায় হেরা হাতের শাঁখা,
হাওয়ায় বসে পাখা হাঁকা!
বোকা যে, সে এম্‌নি ঠকা
ঠিক অনায়াসে।—

৪। (আহা) পাতক্রতার তীর্থে যাওয়া,
ভরা-বাসার বারি চাওয়া,
মকর-মীনের গঙ্গা-নাওয়া,
পাঁক-পাওয়া নায় লগী-বাওয়া!
(ওরে) তেম্‌নি কি তোর সাধন-লওয়া
আমায় পাওয়ার আশে?

৫। (আমি) গোলকে নই, কৈলাসে নই,
বৃন্দাবনে—কাশীতে নই,
মন্দিরে নই—মস্‌জেদে নই,
নই মনের বিশ্বাসে॥

৬। (আমি) পুরাণে নই, কোরাণে নই,
গেরুয়া করোয়াতে নই,
যুক্তিতে নই উক্তিতে নই,
ভুক্তিতে নই মুক্তিতে নই,
(আমি) কেবল শুধু ভক্তিতে রই
ভক্ত-হৃদাবাসে॥

৭। (আমি) কুঙ্কুমে নই চন্দনে নই,
নমাজে নই বন্দনে নই,
মালাতে নই ঝোলাতে নই,
গাঁজায় সিদ্ধি-গোলাতে নই,
কপ্নী-কাছা-খোলাতে নই,
দোলাতে বিলাসে।
দুলি প্রেমের দোলাতে বিলাসে।
আমি নিত্য দুলি চিত্ত-দোলাতে বিলাসে॥

। (ও রে) গোলেমালে 'মাল' মিশেছে,
গোল থেকে মাল লওরে বেছে।
বুকের ধন রয়েছি বুকে,
বুক খুলে মুখ দেখ সুখে;
প্রেম-নয়নে দেখ সত্য,
এই যে আমি আছি নিত্য,
যুগলরূপে করি নৃত্য
ভক্ত-চিত্ত-রাসে॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

৮ম বর্ষ। ফাল্গুন, চৈত্র। ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

১৮২৩, ১৩০৮।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য —— সর্বেক ডাকমাশুল ১।৫ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৮৫

শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতেরেজষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা।

আহার।

তৃতীয়-অধ্যায়।

খাদ্যাখাদ্যের সাধারণ বিভাগ।

ভারতবর্ষের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে যত প্রকার সামগ্রী উৎপন্ন হয়, সমস্তই যে আর্য্য হিন্দুগণ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আহারের সহিত শরীর ও মনের বিশেষ সংযোগ আছে এবং মনের সংযোগ আছে বলিয়াই আহারের সহিত আত্মারও সম্বন্ধ, তাই সেই দিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া আর্য্যঋষিগণ হিন্দুর—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য সামগ্রী নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রেণী বিভাগের মূলে যে কতখানি সত্য নিহিত রহিয়াছে, তন্নির্দ্ধারণ বক্ষ্যমাণ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যে কারণেই হউক, তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মের আদেশ মনে করিয়া সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু এতদিন তাহা প্রতিপালন করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

"মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমে এইরূপ ভূমিকা আছে—ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণেরা সকলেইত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা বেদবিহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাহাদের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে? এই কথা শুনিয়া ভৃগু বলিলেন,—ব্রাহ্মণেরা আর ভাল করিয়া বেদ পড়েন না, তাঁহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, দিন দিন অতিশয় অলস হইতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের খাদ্য-দোষ ঘটিয়াছে, এই

গুলিই অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। তারপর মনুপুত্র ভৃগু অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির নাম করিতে লাগিলেন।"

মনুসংহিতার পঞ্চম-অধ্যায়ে আহার-সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত রহিয়াছে। নিম্নে কোন কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"লশুন (রসোন), গৃঞ্জন, (রক্ত মূলক শাক বিশেষ গাজোর ইতি ভাষা) ও বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে।"

মন্বাদি বিংশতি সংহিতায় এইরূপ সহস্র সহস্র বিধি নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অনেক দ্রব্যই নয়নগোচর হয়, যাহা হিন্দু মাত্রেরই অভক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন আরও এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা মাস বিশেষে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, যথা, —

(১) কার্ত্তিক মাসে মৎস্য, মাংস ভোজন করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।"*

(২) "আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত খেত শিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমীশাক, বার্ত্তাকু ও কদবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।"

(৩) "যদি মাঘ মাসে ব্রাহ্মণ মূলা ভক্ষণ করে, তবে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অন্যথা নরকে গমন করিবে; ক্ষত্রিয় ভক্ষণ করিলে শূদ্রবৎ হইবে; বরং অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে অথবা গর্হিত বস্তু আহার করিবে, তথাচ বহু পুষ্পক মদিরা তুল্য মূলা বর্জ্জন করিবে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর্য্য ঋষিগণ এই স্থানেই—ক্ষান্ত হন নাই। ঋতু বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণ করিবার বা বর্জ্জন করিবারও আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তিথি বিশেষে যেমন ধাতু বিকার ঘটিয়া থাকে, ঋতু বিশেষেও আবার ঠিক তেমনি হয়। কোন ঋতুতে বায়ু, কোন ঋতুতে শ্লেষ্মা, কোন ঋতুতে পিত্ত প্রভৃতি কুপিত হইয়া শরীরকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের ফলে মানব শরীরের যন্ত্রবিশেষও ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকার প্রাপ্ত হয়। তাই আর্য্য ঋষিগণ ঋতুবিশেষেও আবার খাদ্য দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুত সংহিতায় "সূত্র স্থানের" এক বিংশ অধ্যায়ে ২৪ হইতে ৩১ শ্লোক এবং "উত্তর তন্ত্রের" চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে ৪ হইতে ১২ শ্লোক পাঠ করিলে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্য জানা যাইবে। স্থানাভাব বশতঃ কথিত শ্লোকগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। "স্মৃতি আহ্নিক তত্ত্বেও এই বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা আছে।

নরবিভাগ ও তৎসংক্রান্ত খাদ্য বিভাগ।

এইরূপ খাদ্য সামগ্রীর বিজ্ঞান করিয়া ঋষিগণ নর-বিভাগ করিলেন। মনুষ্যের স্বাভাবিক নিজস্ব গুণ লইয়াই এই বিভাগ করা হইয়াছিল। মানবমণ্ডলীর ভিতর কেহবা সাত্ত্বিক-গুণ সম্পন্ন, কেহবা রাজস-গুণ সম্পন্ন, এবং অন্য সকলে তামস গুণ-সম্পন্ন, মিশ্রগুণ সম্পন্ন মানবের সংখ্যা অল্প। এইরূপে তখনকার হিসাবে মনুষ্য সম্প্রদায় শ্রেণীবদ্ধ করা

* মনু।

হইয়াছিল। আপন আপন চরিত্র এবং রুচি বিশেষে মানুষ আপন আপন খাদ্যসামগ্রী বাছিয়া লইত। তদ্দৃষ্টেই নরবিভাগ অনুসারে খাদ্যবিভাগও হইয়া ছিল।

যে সকল দ্রব্য কটু অম্লযুক্ত, লবণযুক্ত, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য এবং উগ্র, যে সকল দ্রব্য অতিশয় রুক্ষতাকারক ও উত্তাপ-বর্দ্ধক তাহাই রাজস লোকের প্রিয় খাদ্য।*

আর যে সকল দ্রব্য অদ্ধপক্ক, বিগতরস, পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এবং অপবিত্র, তাহাই তামস লোকের প্রিয়।†

কিন্তু সাত্ত্বিক-খাদ্যই শ্রেষ্ঠ এবং সাধুজনোচিত। খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্মের নিত্যসম্বন্ধ। তাই ধার্ম্মিক সাধু ও সংযমী পুরুষদিগের যাহা প্রিয়, তাহাই সাত্ত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত। যে সকল দ্রব্য সত্ত্বগুণ, অনাময়, বল, সুখ, প্রীতি প্রভৃতি বর্দ্ধক, যে সকল দ্রব্য রসাল, স্নিগ্ধ, হৃদয়ানন্দোদ্দীপক এবং চিত্তের স্থৈর্য্য-বর্দ্ধক, তাহাই সাত্ত্বিক-খাদ্য।*

সাত্ত্বিক-খাদ্য আবার দুই প্রকার—আশ্রমিক এবং হবিষ্যান্ন। সংসার ত্যাগী ধর্ম্মাশ্রমবাসী ঈশ্বরচিন্তানিমগ্ন ঋষিগণ যাহা আহার করিতেন, তাহারই নাম আশ্রমিক-খাদ্য। অগ্নিস্পৃষ্ট-দুগ্ধ এবং ফলমূলাদি আশ্রমিক খাদ্যের অন্তর্গত। যাহাহউক, তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবল এইটুকু বলিলেই বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে যে, সাত্ত্বিক খাদ্য ভোজনে চিত্ত যেরূপ পবিত্র ও নির্ম্মল থাকে, ধর্ম্মে যেরূপ মতি থাকে, শরীর ও মন উভয়ই যেমন সুস্থ থাকে অন্য (অর্থাৎ রাজস ও তামস) খাদ্য ভোজনে তাহা হয় না। কিন্তু আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশ রাজস খাদ্যের অন্তর্গত।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, স্থূলতঃ ত্রিবিধ উপায়েই সাধারণ খাদ্য হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য বিভক্ত হইয়াছিল ;—

১। সাধারণ বর্জ্জন, অর্থাৎ কতকগুলি দ্রব্য একেবারে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ।

---

* "কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥"
ভগবদ্গীতা।

† "যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনম্ তামসপ্রিয়ম্॥"
ভগবদ্গীতা।

"আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ॥"
ভগবদ্গীতা।

† স্মৃতিতে হবিষ্যান্নোক্ত দ্রব্যের একটী তালিকা আছে তাহা এই:—

"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায় কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকাঃ॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং।
লবণে সৈন্ধব সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পিষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃত সারঞ্চ পনসাম্র হরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী॥
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥"

২। ঋতুভেদে আহারভেদ এবং মাস-ভেদে আহারভেদ।

৩। তিথিভেদে আহারভেদ।

চতুর্থ-অধ্যায়।

তালিকা ও তুলনা।

শাস্ত্রকারগণ যে ত্রিবিধ উপায়ে হিন্দুদিগের আহার্য্য সামগ্রী বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাই সমীচীন এবং যথেষ্ট। দ্রব্যগুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কতকগুলি সামগ্রী একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অপর কতকগুলি ঋতুভেদে ও মাসভেদে ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যাহা অবশিষ্ট ছিল, সেই সকল খাদ্যসামগ্রীর ভিতর যে গুলি একটু অধিক অপকারী, তাহাই তিথিভেদে ভক্ষণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান অধ্যায় পাঠ করিবার সময় পাঠকদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল দ্রব্য অতিশয় সাধারণ এবং সহজেই প্রাপ্য, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই যত বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। সমাজের সকল লোকেরই অবস্থা কোন দিনই এক রকম নহে। কেহবা দরিদ্র, কেহবা ধনী, কেহবা মধ্যবিত্ত। পৃথিবীর জন্ম হইতে মানব-মণ্ডলীর ভিতর এইরূপ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে; এ নিয়মের প্রবর্ত্তক কেহ নাই। যে সমাজে যেরূপ অবস্থার লোক অধিক, সেই সমাজের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। দরিদ্রের সংখ্যা অধিক হইলে, সমাজ দরিদ্র—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিক্য হইলে সমাজের অবস্থাও মধ্যবিত্ত। শাস্ত্রকারদিগের আদেশের উপর অন্ধবিশ্বাস পরিপূর্ণ হৃদয়, ধর্ম্মভীরু, সরল, নিরহঙ্কারী সেই সকল হিন্দু আর্য্য কি কি সামগ্রী আহার করিতেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যক। আহারের "নবাবী" বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি, তখন তাহার যে প্রচলন ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের দিকে একবার চাহিলে দেখা যাইবে যে, এখনকার অধিকাংশ হিন্দু যাহা ভক্ষণ করে, তখনকার সেই প্রাচীন আর্য্যভূমে প্রায় সেই সমস্ত দ্রব্যই ভক্ষিত হইত।

কোন একটী দেশের কেবল মাত্র ধনী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন, সেই দেশের পক্ষে সেই সকল দ্রব্য সাধারণ খাদ্য সামগ্রী নহে। দেশের মধ্যবিত্ত অবস্থার বা দরিদ্র অবস্থার লোক যে সকল দ্রব্য ভোজন করেন—যে সকল দ্রব্য সহজেই এবং অল্পব্যয়েই বা বিনাব্যয়েই পাওয়া যায়—সেই সকল খাদ্য সামগ্রীই সাধারণ খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে ফল মূল, শাক শবজীর অভাব নাই—ভারতবাসীদের খাদ্য সামগ্রীর অধিকাংশ দ্রব্য তাহাই।

তখনকার পুরাতন ভারতবর্ষের সাধারণ আর্য্য হিন্দু যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিত এবং তাহাদিগের ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্যই এখন আমাদিগের আলোচ্য-বিষয়।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট (ক) তালিকার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে

পাওয়া যাইবে যে, সাধারণ ভক্ষ্য প্রায় সকল সামগ্রীরই (তরকারী, ফল, মূল ও শাকাদি) আমি নামোল্লেখ করিয়াছি। তবে ইচ্ছা করিলে তালিকার আকার আরও বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ করিয়া আমি তাহাদিগের নিজস্ব গুণাগুণও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

উক্ত দ্রব্যগুলির ভিতর যে গুলি সাত্ত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত, তাহাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলাই নিষ্প্রয়োজন। কারণ সাত্ত্বিক-খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেক কথা বলিয়াছি। তাহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক-খাদ্য দোষাবহ নহে—উহা সাধু, সন্ন্যাসী এবং সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের আহার্য্য। (ক) তালিকার অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সে গুলি তত অনিষ্টকর নহে, বরং অধিকাংশ স্থলেই উপকারী। তাই শাস্ত্রকারগণ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তবে তাহাদিগের ভিতর যে সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অপকারী, তাঁহারা কেবল তাহাদিগের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। (খ) এবং (গ) তালিকা (ক) তালিকার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই সকল বিষয় সহজ ও সরল হইয়া আসিবে।

(খ) এবং (গ) এই দুইটী তালিকা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ প্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর ভিতর যে গুলি একটু দোষাবহ, তাহাদিগের দোষের তুলনায় কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির দোষ বহুল পরিমাণে অধিক। (গ) তালিকার দোষের সহিত (খ) তালিকার দোষের তুলনা করিলে, (গ) তালিকার দোষ, দোষ বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে না। দোষ অপেক্ষা এই সকল সামগ্রীর গুণের ভাগই অধিক।]

(ক) গুণাবলী সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্য সামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
১	কুষ্মাণ্ড...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে	ইহারা রাজস খাদ্যের অন্তর্গত এবং তিথিভেদে ইহাদিগকে ভোজন করিতে হয়।
২	বৃহতী...	ঐ	
৩	অলাবু...	ঐ	
৪	বার্ত্তাকী...	ঐ	
৫	যজ্ঞডুমুর...	অপক্ব ফল মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ-গুরুপাক, এবং কফ পিত্ত, রক্তস্রাব, বমি, ও ব্রণরোগের উপকারক। ইহার পক্বফল ও উপকারী।	

(ক) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৬	মোচক (মোচা)...	মধুর-কষায় রসং শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়-রোগের হিতকর।	... ...
৭	থোড়...	মধুর-কষায়-রস, শীতল রুচি-কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং প্রদর ও যোনিদোষের উপ-কারক।	... ...
৮	রম্ভা...	... ...	সকল অবস্থাতেই সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৯	কাঁকরোল...	বলকারক ও রুক্ষ	... ...
১০	শজিনার ফল...	মধুর কষায় রস, অগ্নিবৰ্দ্ধক কফপিত্ত নাশক এবং শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম রোগের হিতকর।	... ...
১১	রাঙ্গাআলু বা রক্তালু...	মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, স্নিগ্ধ, বলকারক, এবং হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা নাশক। পুষ্টি-জনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিত-কর। ভ্রম, পিত্ত ও দাহ-রোগের উপকারক।	... ...
১২	কেমুক ফল বা গাছ আলু...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত
১৩	বেগুন...	মধুর তিক্ত রস, রুচিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, কফ বায়ুনাশক এবং দাহ, রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বীসর্প প্রভৃ-তির উপকারক।	... ...

(ক (গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
১৪	মূলক বা মূলা...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	... ...
১৫	পটোল...	ঐ	... ...
১৬	নিম্বুক...	ঐ	... ...
১৬	মান...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
১৮	কচু...	... ...	ঐ
১৯	ওল...	... ...	ঐ
২০	তিল...	... ...	ঐ
২১	যব...	... ...	ঐ
২২	কাউন...	... ...	ঐ
২৩	কলম্বী শাক...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	তামস খাদ্যের অন্তর্গত।
২৪	হেলঞ্চা বা কালশাক...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
২৫	কুষ্মী...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	ঐ
২৬	শিম্বী বা শিম...	ঐ ...	... ...
২৭	বাথুয়া শাক...	... ...	সাত্ত্বিক-খাদ্যের অন্তর্গত।
২৮	পূতিকা...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	
২৯	হৈমন্তিক অসিদ্ধ ধান্যের আতপতণ্ডুল...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৩০	নীবার ধান্য...	কষায়, মধুর ও শীতপিত্ত-নাশক।	... ...
৩১	শ্যামাধান্য...	ঐ	... ...
৩২	শাতভু ধান্য	ঐ	... ...
৩৩	গোধূম...	মধুর, গুরু, বলকারক, দৃঢ়তা-কারক এবং শুক্র ও রুচিকারক	... ...
৩৪	মুগ...	... ...	সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৩৫	মটর	... ...	ঐ
৩৬	মসুর...	ভাজা মসুরের দাইল-মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, মল-রোধক, বর্ণকারক এবং কফ পিত্ত, রক্ত ও বিষমজ্বরের উপকারক।	

০-৭

(ক) গুণাগুণ সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৩৭	খেসারী বা খণ্ডিকা...	মধুর কষায় রস, শীতল, লঘু-পাক, রুক্ষ, এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার হিতকর, বাহ্য প্রয়োগেও ইহারদ্বারা পিত্ত শ্লেষ্মার উপকার হইয়া থাকে।	... ...
৩৮	মাসকলায়...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	... ...
৩৯	সাকালু বা কন্দালু...	মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, স্রোতঃ সমূহের উপকারক এবং বায়ু শ্লেষ্মা, অরুচি, কণ্ডূ ও বিষ-দোষের হিতকর।	... ...
৪০	ঝিঙ্গা...	মধুররস, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, এবং জ্বর নাশক।	
৪০	পনস বা কাঁটাল...	... ...	সাত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৪১	নোনা ফল...	... ...	ঐ
৪২	আম্র...	... ...	ঐ
৪৩	জাম...	পাকা জাম মধুর-অম্ল-কষায় রস, গুরুপাক, শীতল, রুক্ষ, রুচিকর ও বাত-কফ-নাশক।	রাজসিক খাদ্যের অন্তর্গত।
৪৪	তাল...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।	... ...
৪৫	নারিকেল...	ঐ	... ...
৪৬	বেল...	ঐ	... ...
৪৭	নারঙ্গ বা কমলা লেবু...	... ...	সাত্বিক খাদ্যের অন্তর্গত
৪৮	পানিফল বা শৃঙ্গাটক...	স্বাদু, রুচিকর, গুরুপাক, মলরোধক, শুক্র বর্দ্ধক, বীর্য্য-জনক, পুষ্টিকর এবং বাত-পিত্ত-কফ নাশক।	... ...

*(ক) গুণ বর্ণনা সহ সচরাচর প্রচলিত তালিকার সাধারণ খাদ্যসামগ্রী তালিকা।

ক্রমিক নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৪৯	কলিঙ্গ বা তরমুজ...	মধুর সর, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক বলকারক ও পিত্ত দাহ প্রভৃতি নাশক। ...	...
৫০	খর্জ্জুর...	পক্কফল মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভজনক এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, অতিসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত পিত্ত-কফ জনিত অন্যান্য বিকারের হিতকর। ...	...
৫১	পারীশ ফল বা পেঁপে...	কাঁচা পাকা উভয় প্রকার পেঁপেই শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি রোগের উপকারক। ...	...
৫২	ফুটী...	মধুররস, শীতল, রুচিকারক, মূত্রদোষ নাশক, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা রোগের উপকারক। ...	...

* ইচ্ছা করিলে (ক) তালিকার আকার আরও বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে কিন্তু উদাহরণ দিবার জন্য তাহার প্রয়োজন দেখি না। ফল মূলই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, সেই জন্যই বর্ত্তমান তালিকায় ফলমূল ভিন্ন অন্য দ্রব্যের নাম সন্নিবিষ্ট করা হইল না।

(ক) গুণাবলী সহ সচরাচর প্রচলিত অতিশয় সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর তালিকা।

ক্রমিক নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	দ্রব্যের গুণাগুণ।	মন্তব্য।
৫৩	আমলকী ফল...	অম্ল, সুমধুর, তিক্ত, কষায়, কটু, সারক, চক্ষুষ্য, সর্ব্বদোষঘ্ন ও বৃষ্য। ...	...
৫৪	নিম্বুক...	পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ...	...

(খ) তালিকা।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম।	তাহাদের প্রধান প্রধান দোষ।
কুষ্মাণ্ড...	১। অতিশয় ক্ষার গুণ সম্পন্ন। ২। কফ কারক।
বৃহতী...	১। পিত্তোৎক্লেশকারিণী। ২। ক্রূর বায়ুবর্দ্ধিনী।
পটোল...	১। শোণিতোৎক্লেশ কারক। ২। স্নিগ্ধোষ্ণ।
মূলক...	(ক) কাঁচা—বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রূর রুক্ষ প্রাবল্যাদি বিকার বর্দ্ধিনী। (খ) স্নেহসিদ্ধ—পৈত্তিক বিকার বৃদ্ধিকারিণী, (গ) সাধারণ দোষ—আমকারক।
বিম্ব...	পিত্তকারক।
নিম্বুক...	শিরানিহিত শৈত্যরস বর্দ্ধক।
তাল...	১। রক্তপিত্ত রোগ বর্দ্ধক। ২। বহুমূত্র ও তন্দ্রা-উৎপাদক।
নারিকেল...	১। গুরু। ২। দুষ্পাচ্য। ৩। মলরোধক।
অলাবু...	১। শৈত্যগুণ সম্পন্না। ২। বাত শ্লেষ্ম রোগকারিণী। ৩। অধিক বিলম্বে ও অতিশয় কষ্টে জীর্ণ হয়।
কলম্বী...	১। অম্লপিত্ত রোগকারিণী। ২। শ্লেষ্মা এবং ম[illegible] বৃদ্ধিকারিণী।
শিম্বী...	১। শৈত্যগুণ সম্পন্না। ২। রস, জ্বর ও শ্বাস রোগ কারিণী।
পূতিকা...	পিত্ত বায়ু ও রক্তকাস (যক্ষাকাস) বর্দ্ধিনী।
বার্ত্তাকী...	কণ্ডুরোগোৎপাদিনী।
মাষকলায়...	১। অতিরিক্ত মল বৃদ্ধিকারক। ২। অতীসার রোগকারক।

(গ)

দ্রব্যের নাম।	(ক) তালিকার লিখিত সাধারণ ভক্ষ্য দ্রব্যের ভিতর দোষাশ্রিত দ্রব্যগুলির গুণ।	তাঁহাদিগের দোষ।
২	১	৩
রাঙ্গা আলু...	১। স্নিগ্ধ। ২। বলকারক। ৩। হৃদয়স্থ-শ্লেষ্মনাশক। ৪। পুষ্টিকারক। ৫। শুক্র-বর্দ্ধক। ৬। চক্ষুর হিতকর। ৭। ভ্রম, পিত্ত ও দাহ রোগের হিতকর।	১। গুরুপাক। ২। কিঞ্চিৎ বিষ্টম্ভী।
মসূর...	১। লঘুপাক। ২। বর্ণকারক। ৩। কফ, পিত্ত, রক্ত ও বিষম-জ্বরের উপকারক।	১। মলরোধক।
খর্জ্জুর...	১। স্নিগ্ধ; ২। রুচিকর; ৩। পুষ্টিকর; ৪। বলকারক ৫। শুক্রবর্দ্ধক; ৬। রক্তপিত্ত; ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, অতীসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত-পিত্ত কফজনিত অন্যান্য বিকারের হিতকর।	১। গুরুপাক। ২। কিঞ্চিৎ বিষ্টম্ভী।
পানিফল...	১। রুচিকর; ২। বলকারক ৩। শুক্রবর্দ্ধক; ৪। বীর্য্যজনক ৫। পুষ্টিকর; ৬। বাতপিত্ত; কফনাশক।	১। গুরুপাক।

ইহকাল ও পরকাল।

জীবজগতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, আবহমান কাল হইতেই মানবমনে দ্বিবিধচিন্তাস্রোত প্রবাহিত আছে। আদিম আমলেও মনুষ্য আপন কর্ত্তব্যকে বিভিন্নমুখীন দুইটী পথের মধ্যস্থলে রাখিয়া চিন্তাক্লান্ত-নয়নে বিরস বদনে বলিত, "কোন্ পথে যাই?" "কোন্ পথে গেলে আমার কর্ত্তব্যের গায়ে কাঁটার আচড়টী লাগিবে না?" প্রাচীনকালেও মানবাত্মা দ্বৈধতরঙ্গে হাবুডুবু খাইত, মানবীয় মন দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় এদিক ওদিক করিত। বস্তুতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতেই বিভিন্ন ভাবের দুইশক্তির লীলারঙ্গ মানবমনকে এই অচিন্ত্যতরঙ্গের সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে বাধ্য করে।

মানবের সম্মুখে সন্নিকৃষ্ট চরাচরাত্মক সসীম বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার—দূরে অলৌ-

কিক চিন্তার বিষয় অসীম-অপার-অনন্ত। সম্মুখের সামগ্রী শতধা সহস্রধা বিভাগ করিলেও সেই পুরাতন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, বধ, বস্ত্র, সাগর, নগর, ভূধর ইত্যাদি কত কি পাওয়া যাইবে; আর মানস-নয়নে চাহিয়া থাকিলে নয়নের অগোচর অনন্ত অলৌকিক রাজ্য ক্রমশঃ আবির্ভূত হইবে, লৌকিক শক্তি ক্লান্ত, তবুও অবিরাম সেই বিরাটচিত্র অসীম-অপার-অনন্ত অপরিবর্ত্তিতরূপে বিরাজমান। দর্শনশক্তির পরাজয়। একদিকে মানবের লৌকিক-সামর্থ্য পরাজিত তিরস্কৃত-অভিভূত, আর অলৌকিক মানসবল প্রবল, অন্যদিকে লৌকিক ইন্দ্রিয়শক্তি চরিতার্থ এবং অলৌকিক মন-শক্তির প্রবেশের অধিকার নাই। এই লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির সম্মিলনবিন্দুই মানবের অবস্থিতি-স্থান।

মানবের উপর অনাদিকাল হইতেই উভয় শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বারম্বার আকর্ষণ, বিকর্ষণ, জয়, পরাজয়, সম্মিলন, বিয়োজনে এই উভয় শক্তিই অল্পাধিক পরিমাণে মানবাত্মার আত্মীয় হইতে পারিয়াছে। অলৌকিক ও ত্যাজ্য নহে, লৌকিক ও অগ্রাহ্য নহে, কিন্তু কখনও অধিক অনুকূল বলে চলিতে হইলে স্বভাবের সনাতন নিয়মে এক দিক আশ্রয় করিতে হয়। এই জন্যই মানব উভয় শক্তির রঙ্গালয় হইলেও সুময় বিশেষে সকলের জন্য সমান অবকাশ দিতে অক্ষম। কখনও কাহার ও আধিপত্য প্রভুত্ব, কভু বা অপরের খ্যাতি প্রতিপত্তির বহুত্ব; এই চিরপরিবর্ত্তনশীল প্রথা সুতরাং বাঁধিয়া গিয়াছে।

এক সময়ে সন্নিকৃষ্ট সংসার রাজ্যের উন্নতি, অবনতি, রীতি পদ্ধতি, শুভাশুভ চিন্তা; অপর সময়ে অলৌকিক রাজ্যের সুখ দুঃখ লাভালাভের ভাবনা। মানবের বাহ্য লক্ষ্য সসীম সংসার, আর অন্তর্লক্ষ্য অলৌকিক অসীম অপার অবিনশ্বর। এই উভয় দিক্ ভাবিতেই ইহকাল পরকালের চিন্তায় মানুষের অধিকার হইয়াছে। শুধু বহির্জ্জগতের শয়ন ভোজন ভ্রমণ ইত্যাদি লইয়া মানুষকে ব্যস্ত থাকিলে চলে না, প্রকৃতির পরিণতি, জীবের গতি, সুখশান্তি প্রভৃতির ভাবনা ও ভাবিতে হয়। যদি জগতে বাধা বিপত্তি, ঘাত প্রতিঘাত না থাকিত, তবে একদিক দিয়া চলিলেই হইত, কিন্তু সংসার সুশ্যামল সমতল নয়, বন্ধুর। আলোকময় নয়, আলোক আঁধারের আবাসস্থান, সুখসলিলে সুধৌত নয়, দুঃখকর্দ্দমাক্ত ও বটে, কেবলই মধুর নয়, নব রসের আকর। দয়াদাক্ষিণ্যও আছে, আবার কর্ত্তব্য পীড়ন তাড়নেরও অসদ্ভাব নাই। অনুগ্রহ নিগ্রহ পাশাপাশি রাজত্ব করে। চক্ষে দুঃখবারি, মুখে সুখহাস্য, কিছুরই এ অতুল ভাণ্ডারে অপ্রতুল নাই। জগতের বয়োবৃদ্ধির সহিত মানববুদ্ধিরও নব নব অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইতেছে। অনেকে আ'জ কা'ল এই অলৌকিক অপার্থিব বিষয়গুলি একেবারে বিদায় দিতে চাহেন। সর্ব্বদাই চ'খ মেলিয়া দেখিতে চাহেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানস নয়নে আপনার অলৌকিকত্ব অবলোকন করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক।

পাশ্চাত্যদেশে সম্প্রতি এই মতবাদের সমর্থনকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল নহেন, অস্মদ্দেশেও অর্ব্বাকবুদ্ধি চার্ব্বাক বহুবর্ষ পূর্ব্বে

বৃহস্পতির পদাঙ্কানুসরণে এই "একচ'খো" ভাবের সমর্থন করিয়া গিয়াছিলেন। তখনকার চর্ব্বাক আর এখনকার চার্ব্বকের উদ্দেশ্য বা আবশ্যক লইয়া ভাবাভাবের অনেক পার্থক্য। তখনকার চার্ব্বাক মহোদয়েরা স্বসম্প্রদায় গুরু বৃহস্পতি মহাশয়ের উপর ও কলম চালাইয়াছিলেন। বৃহস্পতির মতে অলৌকিক অপার্থিব পদার্থের আদর ছিল না বটে কিন্তু লৌকিক সুনীতিসমূহের বিন্দুমাত্রও অভাব বা অসম্পূর্ণত্ব ছিলনা। চাণক্যপণ্ডিত যে নীতিশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক নীতি বার্হস্পত্য নীতির অনুমোদিত। চার্ব্বাক্ সুবিধামত যুক্তিশাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক অযৌক্তিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেও চেষ্টা করিয়া ছিলেন। বৃহস্পতি যুক্তিবলে ঐহিক নীতির সংরক্ষণ ও অলৌকিক পদার্থের নিরাকরণ করিতে চাহেন, চার্ব্বাক্ কিন্তু অনেক স্থানে যৌক্তিক লৌকিক নীতির ও উচ্ছেদ সাধন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

বৃহস্পতি ঐহিক সুখই একমাত্র প্রার্থনীয় বলিয়াছেন। বৃহস্পতির একটী সূত্র "কাম এবৈকঃপুরুষার্থঃ"। কাম অর্থ ঐহিক সুখ। যাহা মন চায়, তাহা যে উপায়ে পাই, সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। ইহজীবনের সুখসাধনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, অনিশ্চিত অলৌকিক পদার্থের [illegible] বা অপার্থিব সুখের আশায় ইহজীবনে ক্লেশভোগ মহামূর্খতার পরিচয়। এই ইহকালের সুখের জন্য যেসকল নৈতিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, নানা উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপাত হইতে আত্মঘাত নিবারণ করিবার জন্য যে সকল সুনীতির অনুসরণ আবশ্যক, বৃহস্পতির বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পরকালবাদী স্বর্গার্থে যাগানুষ্ঠানকারী সম্প্রদায়কে তিনি তীব্র তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, পরলোকে ফল ভোগ করা সম্ভব হইলে তাহার জন্য ইহকালে চেষ্টা করা যাইতে পারে। পরিশেষে বিপুল লাভের আশায় আপাততঃ ক্লেশ বা ক্ষতি স্বীকার করা নীতির বহির্ভূত নহে, কিন্তু পরকালে ফল ভোগ করিবে কে? "চৈতন্য বিশিষ্টো দেহঃ পুরুষ ইতি।" এই সূত্রে বৃহস্পতি সচেতন দেহকেই আত্মা বলিয়াছেন, সুতরাং মৃত্যুর পর ফল ভোগ করিবার জন্য "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? মৃত্যুর সঙ্গে সংসার রঙ্গ ফুরাইল, জলতরঙ্গ জলেই বিলীন হইল, আবার কে কিসের ফলাফল ভোগ করিবে? বৈদিক-ক্রিয়া কাণ্ড কেবল অকর্ম্মণ্য লোকের জীবিকার্জ্জনের উপায়। ইত্যাদি নানা কথা বৃহস্পতি বলিয়াছেন। বৃহস্পতির আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইয়াছে, এটী কিঞ্চিৎ রহস্য জনক। "পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্নহিংস্যতে?" যজ্ঞাদিতে পশুবধ বেদের আদেশ, অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি নানা যাগে পশুহিংসা বিহিত আছে। পশু বিনাশের সময় "স্বর্গংগচ্ছ পশুত্বম!" বলাও হইয়া থাকে। এখানে বৃহস্পতি বলেন,—যদি হত পশু স্বর্গেই যায়, তবে যজ্ঞে পশুস্থানে যজমানের পিতাকে বলিপ্রদান করাইত অধিক সঙ্গত। যজ্ঞে হত

হইলে তাহার স্বর্গ অবার্থ, আবার কোন্ পুত্রইবা পিতার স্বর্গ গমন ইচ্ছা করে না? সুতরাং পশুকে স্বর্গে না পাঠাইয়া পিতাকে পাঠানই উপযুক্ত যাজ্ঞিক পুত্রের উপযুক্ত-কর্ম্ম। এতাদৃশ অনেক কথা এবং অনেক অশুচিত তিরস্কার বৃহস্পতির গ্রন্থে পাওয়া যায়। ফলতঃ ঐহিক সুখই তাঁহার অভিপ্রেত, অপর সমস্তই অত্যন্ত অগ্রাহ্য। সুতরাং আমরা তাঁহাকে ইহসর্ব্বস্ববাদের নেতা বলিয়া বলিতে চাই।

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য দেশস্থ 'Secularist "সম্প্রদায় ও ইহসর্ব্বস্ববাদী। ইহারাও কেবল ঐহিক সুখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তবে ঘরের পরের সকলের চিন্তার জন্য ইহাদের একটু অবকাশ আছে। যাহাতে জগতের উন্নতি সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির আন্দোলন ও অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করেন। বিজ্ঞানাদির উন্নতির দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধন ভূরি-অভাব মোচন করা যাইতে পারে, কিন্তু সমস্তজীবন পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা সংসারের বিশেষ কোনও জাতীয় হিতসাধন করা যায় না। কোনও দরিদ্রের অন্ন সংস্থানে তাহার ঈশ্বরারাধনা সহায়তা করে না, কিন্তু অর্থনীতি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে, সুতরাং জগতের হিতার্থে ইহকালের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করাই অধিকতর মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, যোগ, যাগ মানুষের প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্বথা অনুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য নির্দ্ধারিত অমূল্য সময় নষ্ট করে মাত্র। আধ্যাত্মিক চিন্তায় অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করাতেই ভারতের লৌকিক-বল দিন দিন হীন হইয়া অবশেষে দুর্দ্দশার শেষাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক আলোচনা যে মানুষের সুখের শান্তির পথ কন্টকিত করে, ইহাই তাহার অতুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রত্যুত অনিশ্চিত এবং অনাবশ্যকীয় কার্য্যে সময় নষ্ট করাই অন্যায়। ইউরোপের ইহসর্ব্বস্ববাদের ব্রাডল, হোলিওক্ প্রভৃতি অনেক সমর্থনকারী আছেন।

ইহসর্ব্বস্ববাদের উপর একটা তর্ক আছে যে, ইহলোকের উন্নতির জন্য আমরা অনেক কার্য্য করিতে পারি, অনেক সময়ে জগতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতে গিয়া আমরা কৃতকার্য্যও হই, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনেক কার্য্যেই অনুপযুক্ত। আমাদের চক্ষু সামান্য দূর দেখিতে পায়, আমাদের সামর্থ্যে অতি অল্প অনিষ্টেরই প্রতীকার হইতে পারে। আমাদের সকল চেষ্টা যেখানে পরাভূত, সেখানে আমাদের আধ্যাত্মিক বল বা ধর্ম্মবল আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। বিশ্বাসীর কাছে, ভক্তের নিকট, ধার্ম্মিকের হৃদয় ফলকে ইহার উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত শত শত দৃষ্টান্ত স্থান পাইতেছে। বিজ্ঞানের সকল জ্ঞান যেখানে পরাস্ত হইয়াছে, এরূপ মুমূর্ষু রোগী, ভক্তের প্রার্থনায়, ভগবানের দয়ায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনাদর করিয়াও অনায়াসে সুস্থতা লাভ করিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই, তবে বিশ্বাসের অল্পতায় ভক্তের বিরলতায় ধর্ম্ম জীবনের শোচনীয় অধঃপতনে এরূপ দৃষ্টান্ত ক্রমে বিরলতর হইতে চলিয়াছে মাত্র।

আধ্যাত্মিক আলোচনায় বা ধর্ম্ম-বলে

মানবের মনোবল—শারীর-সামর্থ্য শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই। মানবের ক্ষুদ্র শক্তি, বিপুলশক্তি লাভ করিতে গেলে মানবকে সেই শক্তিসমুদ্র হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। বিষয়-সুখ সাধারণ মনুষ্য যে পরিমাণে ভোগ করেন, তদপেক্ষা প্রেমিক ভক্ত, বিশ্বাসী ধার্ম্মিক লক্ষগুণ অধিক ভোগ করেন। কোনও মনোরম দৃশ্য দর্শন করিলে সাধারণ ব্যক্তি প্রীতি লাভ করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক সুদৃশ্যে কুদৃশ্যে সর্ব্বত্রই মহিমান্বিত পরমেশ্বরের মহামহিমার পরিচয় পাইয়া বিপুল-আনন্দ উপভোগ করেন। অবিশ্বাসীর অভক্তের অধার্ম্মিকের অন্তঃকরণ কেবল লৌকিক নীতিবলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে অক্ষম। সন্নীতি দ্বারা অনেক সময়ে সংসারের উপকার হইতেছে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত নীতির পবিত্রতা রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। কেবল লৌকিক বহু দর্শনের সমষ্টি মাত্রকে নীতি নাম দিলে প্রকৃত নীতির অবমাননা হয়। রাজ দণ্ডের ভয়ে, সমাজ 'কলঙ্ক' শঙ্কায় ও নিজের অনিষ্ট অপচয়ের ভয়ে লোকে যে সকল কুকার্য্য করিতে বিরত থাকে, সেই গুলি পরিহারের জন্যই নীতির আবশ্যকতা ও সম্মান রক্ষিত হইলে বাস্তবিকই নীতির মূল্য অল্প। ধর্ম্মজ্ঞান রহিত নীতিজ্ঞান পশ্বাদি[illegible] পিতৃ মাতৃ ভক্তির সহিত পৃথক এবং তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পিতৃ মাতৃ [illegible] বা কৃতজ্ঞতা মানুষকে দিতে পারে কি না তাহাও বিচার্য্য। ভক্তি ধর্ম্ম জ্ঞান ধর্ম্ম বিশ্বাস ব্যতীত কোনও নীতিই প্রকৃত নীতির আসনে উপবিষ্ট হইতে পারেনা।

নীতিজ্ঞানে বা নৈতিক সাধনায় মানুষ দুষ্কার্য্যকে ঘৃণা করে, কেন না নীতিশাস্ত্র তাহাকে দুষ্কার্য্যের জন্য শত শত আপদ বিপদের দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র অনিষ্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেয়। নৈতিক জ্ঞানের বহুদর্শিতা তাহাকে দুষ্কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র সাবধানে থাকিতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতা কেবল মানুষের চক্ষুতে ধূলি দিতে পারিলেই শেষ হইল। নীতিজ্ঞ দশের ভয়ে দেশের ভয়ে মোটের উপর মানুষের ভয়ে কুকার্য্যে নিরস্ত, নীতি তাহাকে ইহার অধিক অর্থাৎ অমানুষ ভয় হইতে সাবধান থাকিতে শিক্ষা দেয় না। আর ধার্ম্মিক ধর্ম্ম নীতি বলে, একটী লোক চক্ষু নয় সর্ব্বব্যাপির সেই অসংখ্য চক্ষু হইতে সাবধানে থাকিতে বলে, এক কথায় বলিতে গেলে বিশ্বাসীর কুকার্য্য করিবার স্থান নাই। সে জানে "বিশ্বতশ্চক্ষু-রুতবিশ্বতো মুখং" ভগবান্ সর্ব্বত্র অসংখ্য নয়ন নিঃক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞাতে কোথায় কুকার্য্য করিবে? সমাজের চ'খের বাহিরে রাজার চ'খের অন্তরালে, তীব্র অন্ধকারে, অন্যায় কার্য্য করিলে নীতি শাস্ত্র আর কাহার ভয় দেখাইবেন? ধার্ম্মিক দেখাইবেন "সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ" বিশ্বব্যাপী পুরুষকে। নীতিজ্ঞের পাপ করিবার স্থান আছে, ধার্ম্মিক ঈশ্বর-বিশ্বাসী জানেন, তাহার অদৃশ্য অগম্য স্থান নাই। বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতির দ্বারা সাধারণে যে উপকার প্রাপ্ত হন, ভক্ত ধার্ম্মিক তাহার পর অতিরিক্ত ভগবানের অসাধারণ মহিমা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত

নৈতিক জীবন রক্ষার জন্য ধর্ম্মজ্ঞানের আবশ্যকতা দেখিতে পান নাই কিন্তু এক সময়ের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অপর সময়ের তুলনায় অকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইলে স্বকীয় ভ্রমের জন্য অনুতাপ ব্যতীত অন্য আশ্রয় সে সম্প্রদায়ের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নৈতিক জীবন রক্ষার জন্য সাধারণ মতই যথেষ্ট সাধন এই বিশ্বাসে, ভ্রম সঙ্কুল ও পরিবর্ত্তন শীল সাধারণ মত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, সে ব্যক্তি নিজেকে যতই নীতিমান মনে করুক না কেন, বস্তুত তাহার নৈতিক সাধনের অনিবার্য্য অধঃপতন উপস্থিত হইবে এবং পরবর্ত্তী জগৎ তাহা দ্বারা দুর্নীতিপরায়ণ হইতে শিক্ষা করিবে ইহা সুনিশ্চিত।

ইহ সর্ব্বস্ববাদী পাশ্চাত্য দেশীয়দের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে হাঁ, না, একটা কিছুই বলেন না। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই, নীতিমার্গই জগতের আশ্রয়। আমাদের দেশীয় বৃহস্পতি মহাশয় নীতি রাখিয়া পরমেশ্বরের উপর ও কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর সাধনের জন্য আদৃত অনুমান প্রমাণের মস্তকেই বজ্রাঘাত করিয়াছেন।

চার্ব্বাকের ঐহিক-সুখের উপর অস্মদ্দেশীয় পরলোকবাদী আচার্য্যগণ আপত্তি করেন যে, ঐহিক সুখ প্রায়ই দুঃখ সঙ্কুল, সংসারের সুখ চপলাচমক, দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, মানুষের ভাগ্যে কেবল দুঃখের গড়াই পড়ে। যৎকিঞ্চিৎ সুখ যাহা আসে, তাহারও মধ্যে দুঃখের বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইতে হয়। স্ত্রী পুত্রাদি জনিত সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু স্ত্রী সম্মিলনে বা পুত্র লাভে সুখ অপেক্ষা দুঃখের আশঙ্কাই অধিক, বিবেকী শিঙ্গনমিশ্র বলিয়াছেন, পুত্রবাজ্জমুপাগতো রিপুরয়ংমাসাচিজ্ঝিতাং" পুত্রের মত শত্রু বস্তুতঃ বিবেকীর চক্ষে কমই আছে। যাহার জন্য যত অধিক আশঙ্কা করিতে হয়, তাহার জন্য তত অধিক অশান্তি। পুত্র জন্মের উৎসবে এখনও অনেক দেশে ক্রন্দনের নিয়ম আছে। বাস্তবিকই একটী অসমর্থ জীবের প্রতি অশেষ কর্ত্তব্য ভার মস্তকে লইবার প্রথম দিনই পুত্রোৎপত্তির দিবস আমাকে যদি অপর কাহারও মঙ্গলামঙ্গলের জন্য সতত বিব্রত থাকিতে হয়, সর্ব্বদাই অপরের চিন্তায় ক্লান্ত থাকিতে হয়, তাহার সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখ অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে করিতে হয়, তবে তাহাতে শান্তি পাইব কিরূপে বুঝিতে পারি না। জগতের যাবতীয় মানবের সুখ দুঃখের অংশী হইতে গেলে তীব্র সহানুভূতির ক্রীত দাস হইতে গেলে, দয়াপরবশ পরোপকারী নীতিমান ব্যক্তি কেবল ক্রন্দনেই দিনযামিনী যাপ করিতে বাধ্য হইবেন। ক্ষমতা ক্ষুদ্র, অভাব অসীম, না কাঁদিয়া আর উপায় কি? সমাজ সংস্কারে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ক্ষীণশক্তি হইয়া সহানুভূতির তীব্র তাড়নায় বিরলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ২ জীবলীলা শেষ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে নীতিকে অশ্রু মোচনের সহবর্ত্তী সুখও কেবল ভগবানে নির্ভর হইতে উৎপন্ন। অশ্রুসিক্ত লোচনে ও শান্তির স্থান ঈশ্বর বিশ্বাস। "ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছারই জয় হউক" ইত্যা-

ক্যার বাক্যই বিশ্বাসীর আত্মপ্রসাদে অবলম্বন। অবিশ্বাসীর শুধু জল মাত্র সার, আরহা হতাশ! সুতরাং বলিতে হয়, ধার্ম্মিক নাস্তিক কেবল নাস্তিক নির্দ্দয়ানু ও পরোপকারীর দুঃখ ভোগ অসম্ভব, সুখের ও আধিক্য নাই দুঃখ। যখন ধর্ম্ম বিশ্বাস ভিন্ন সুখেও সুখ নাই, বরঞ্চ অধিক দুঃখ তখন এ সুখের জন্য উৎকণ্ঠায় লাভ কি? প্রকৃত-সুখের জন্য ঐহিক ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-সঙ্কুল-সুখ ত্যাগ করা কি একান্তই মূঢ়তার কার্য্য, না সহস্রবার দুঃখের তাড়না সহ্য করিতে করিতে স্বপ্ন দেখার মত একটু সুখ ভোগকেই পুরুষার্থ মনে করা মূঢ়তার কার্য্য? এ সকল কথায় অস্মদ্দেশীয় চার্ব্বাকের উত্তর এই, ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং, দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা', ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তম তণ্ডুলাঢ্যান্ কোনাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী। "সমস্ত বৈষয়িক-সুখই দুঃখ সংসৃষ্ট, যখন বিশুদ্ধ-বিষয়-সুখ সম্ভোগ সম্ভব নহে, তখন আর দুঃখাকুল সুখ ভোগে শান্তি কি? এতাদৃশ বিবেচনা মূর্খেরই সম্ভব পায়। উৎকৃষ্ট তণ্ডুলাঢ্য ধান্যে তুষকণা দেখিয়া কি কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়? ইহাদের মত সংসারে অশেষ দুঃখ সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখের ভয়ে কি সুখ সামগ্রী ও ত্যাগ করিতে হইবে! পারলৌকিক-সুখ ইহাদের সিদ্ধান্তে অসম্ভব সুতরাং উপস্থিত সুখ দুঃখ মিশ্রিত হইলেও ইহাই মানবজীবনের যথেষ্ট বিশ্রাম স্থান।

এখন এই সকল নৈসর্গিকবাদির মতে আলোচনা করিতে হইলে পরকালবাদাকে অদৃষ্ট, জন্মান্তর ও সংসার-সুখাপেক্ষা আধিক শান্তি সুখের কথা বলিতে হইবে। অদৃষ্টের জন্মান্তর মানাইতে হইলে দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হইবে। অদৃষ্ট মানিলে ঈশ্বর মানা অনেকটা সহজ হইতে পারিবে। সেই সকল স্বর্গীয় দার্শনিক-যুক্তি জালের অবতারণা করা এ প্রবন্ধে একান্ত অসম্ভব। অদৃষ্ট, জন্মান্তর প্রভৃতির আন্দোলন আমরা প্রবন্ধান্তরে করিতে চেষ্টা পাইব, এ প্রবন্ধে পরলোকের সুখ দুঃখও অবস্থানাবস্থার বিষয়ে আমরা দুই চারি কথা বলিব।

আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন নাটকের শেষ আর কিছু থাকা আবশ্যক, যদি মানবের জন্য মৃত্যুর বিকট বদনে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য মানবাত্মার জগতে অবতারণা হয়, তবে কে সংসারে অশেষ কার্য্যজালে জড়িত হইতে চায়? আমার আরব্ধ অশেষ কার্য্য যদি এইখানে অসম্পূর্ণ ভাবেই পরিত্যক্ত হইল, তাহা বিষম বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইবার কথা। যাহা অন্যায় করিলাম তাহারও পরিণাম ফল প্রাপ্ত হইবার অবকাশ জুটিল না, যাহা শুভকার্য্য করা গেল তাহারও সুফল লাভ ঘটিল না। মোটের উপর প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইল না। এই ব্রহ্মাণ্ডের এক বিন্দু বালুকার উপর একটী আঘাত প্রদান করিলে অনন্তকালের জন্য প্রকৃতির বক্ষে প্রতিঘাতকে আহ্বান করিবার জন্য অঙ্কিত থাকে, এখানে এ ব্যভিচার অসম্ভব, সুতরাং আমাদিগের জড়বিশ্ব দেহ বিকৃত হইল, জলে মিশিল, তবুও কার্য্য প্রবাহের বিরাম হইতে

পারে না। মোটামুটি কথায় এজগতে কিছুরই বিনাশ নাই অবস্থান্তর আছে। সত্যময়ের প্রতিচ্ছাপূর্ণ সংসারে এসত্য স্বরূপ অনারূপ হইবে বলিয়া কখনও স্বরূপ শূন্য হইতে পারিবেনা। এ ক্রিয়াকাণ্ড এ যন্ত্র জাত যাইবার জায়গা নাই। উড়িয়া আসে নাই আকস্মিক হইতে পারে না। কাজেই ইহার আদায় থাকা আবশ্যক, যুক্তি বলে প্রমাণিত হয়, অগ্র পশ্চাৎ না থাকিলে মধ্যও থাকিতে পারে না, অতএব যদি বর্ত্তমানে বিশ্বাসস্থাপন করিতে হয়, তবে অতীত ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান্ হইতে হইবে। আদিতেও কিছু ছিল, পরেও কিছু থাকিবে।

এই পারলৌকিক বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন ২ সম্প্রদায়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সম্প্রদায় বিশেষের মতে পরলোকে দুই অনন্ত জিনিষ। অনন্ত স্বর্গ, অনন্ত নরক, সংসারের কুকার্য্য সুকার্য্য যাহা হউক না কেন, বিচারের ফল দ্বিবিধ। পুণ্যের ভাগ অধিক হইলে অনন্ত স্বর্গ, পাপের ভাগ বেশী হইলে অনন্ত নরক। মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা কিছু করিলে আর একটু ভাল হইত। এখন যাহা ইচ্ছা কর, বিচার কিন্তু গড়ে একদিনে হইবে। সে দিন যদি তুমি ভাল উকীল দিতে পার, আর উকীল মহোদয় যদি বিচারক প্রভুকে বলেন,—Father for give them for they know not what they do, তবে তোমার পক্ষে মন্দ নয়। তোমার পাপে দয়াল উকীল বাবু জেলে যাইতে প্রস্তুত। দোষ তোমার ফল ভুগিল রামকান্ত, আহার করিল হরিহর, তৃপ্ত হইল রামপ্রসাদেরা। 'একজনের রোগ, অন্যে' ঔষধ খাইল, অমনি রোগীর ব্যারাম বমালুম সারিয়া গেল। এ সকল ব্যবস্থায় আমাদের আলোচ্য কিছু দেখি না। তবে হাঁ এই সকল সম্প্রদায়েরও স্বর্গ নরক আছে আর সে স্বর্গ নরক ইহলোকে নহে, তাহা পরলোক ব্যাপী এই টুকুই এ প্রসঙ্গে বক্তব্য। ইহাদের স্বর্গ বেশ সুন্দর সুখদ স্থান। সে বর্ণনা পাঠ করিলে স্বর্গে যাইবার জন্য সকলেরই বোধ হয় কিঞ্চিৎ আগ্রহ হয়।

মহম্মদের স্বর্গ ও প্রলোভন পূর্ণ বিরাট বিলাস নিকেতন। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরোধী নহে। বিধর্ম্মী বা অবিশ্বাসীকে বিনাশ করিলেও সে স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এখানে অকর্ত্তব্য জীব হত্যা, পরিণামে স্বর্গের বিপুল সুখ। এত তীব্র প্রলোভন না থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে এত ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় পাওয়া কঠিন হইত। সে স্বর্গের দুই চারিটী নিদর্শন বলিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। মহম্মদীয় স্বর্গ সাতটী, পর পর সাততলা ঘরের মত একটী [illegible] একটী স্থাপিত। প্রত্যেক স্বর্গীয় ব্যক্তি এক একটী সুবৃহৎ মুক্তানির্ম্মিত তাম্বুতে বাস করেন। স্বর্গে দাস দাসীর অভাব নাই, তথাকার ক্ষুদ্রবস্থ ব্যক্তির ৮০০০০ দাস থাকিবে। নারী সংখ্যা ৭২ জন, প্রত্যেকেরই রূপ লাবণ্য, যৌবন, অলঙ্কার [illegible]শেষ রূপ। প্রত্যেক রমণীর মস্তকে মুকুট সেই মুকুটের অপকৃষ্ট মুক্তার আলোকে দশদিক আলোকিত হয়। ইচ্ছা মাত্রেই মণিময় দেহ ধারণ করা যায়। গমনার্থে— উপযুক্ত বাহন সর্ব্বদা প্রস্তুত। বাহন [illegible]

কিছুই নয় "দিদিমার গল্পের সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া।" মাংসাদি প্রচুর ভোজন ইচ্ছা মাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে আর একটু রহস্য আছে। ধার্ম্মিক লোক পক্ষ মাংস আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পক্ষী জীবিত হইয়া অশরীরে উড়িয়া বাসায় চলিয়া যায়। এমন সুভোগ্য স্বর্গ লোভনীয় নয় কি? এ অলৌকিক রাজ্যের এসব সুযোগ সমধিক মুখরোচন। নরকের বর্ণনাও সমধিক ভয়ঙ্কর। বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

আমাদের দেশীয় পুরাণাদি গ্রন্থে স্বর্গ নরকের অনেক সুরঞ্জিত চিত্র পাওয়া যায়। স্বর্গ সুখস্থান এবং নরক ভীষণ বিভীষিকাময় যাতনা তাড়না বেদনার আবাস। যন্ত্রণা ভোগের জন্য নরকে যাওয়া শাস্ত্রের আদেশ কিন্তু হিন্দুর নরকের শেষ আছে। অনন্ত নরক অশেষ যন্ত্রণা, অনন্ত স্বর্গ—অপরিসীম সুখ হিন্দুর ভাগ্যে সুকঠিন। স্বর্গী জীব সুকর্ম্মের অবসানে পুনঃপতিত হন। "তেতং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি। শাস্ত্রের ঘোষণা এইরূপ, স্বর্গ ক্ষয়শীল, কাজেই স্বর্গবাস ও সীমাবদ্ধ। স্বর্গের বিলাস রাশির অপচয় আছে সুতরাং স্বর্গীয় অনন্তসুখ অসম্ভব। বেদে ও স্বর্গের উল্লেখ আছে। স্বর্গের অধিস্বামী ইন্দ্রদেবের বিষয়ে বহুবিধ প্রসঙ্গ । মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব ও স্বর্গে [illegible]ইতে ছিলেন। যুধিষ্ঠির সশরীরেই স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহাদের গমন পথ হস্তিনাপুর (দিল্লী) হইতে উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের পারে ও স্থান পাইয়াছিলেন। অনেক স্থানে স্বর্গ (দেবনিবাস) উত্তর দিকে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক অনুমানে সুমেরু সন্নিকটে প্রাচীন পুণ্যপুণ্য শ্বেতকায় আর্য্য জাতি বাস করিতেন। স্বর্গ ও সুমেরু শিরে। এখন আর্য্যের অতি পূর্ব্ব বাস স্বর্গ স্থান এবং খাগ্বেদীয় কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য বিজেতা ও শ্বেতকায় আর্য্য নেতা ইন্দ্রদেবই সেই স্বর্গের অধীশ্বর কি না, এবিষয়ে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। সে স্বর্গ অনাবৃতকায় ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব। পথি মধ্যে ভীমার্জ্জুনের মত মহাবীর ও হিমানীর মহিমায় আত্মলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক, যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেও শাস্ত্রীয় স্বর্গ পরলোকের প্রাপ্য দেহাবসানে গন্তব্য এইরূপ ঘোষণা শাস্ত্রে অনেক স্থলেই সুপরিস্ফুটভাবে বিদ্যমান। স্বর্গের সুখ ক্ষয়ী হইলেও প্রভূত। এই দুর্ল্লভ-বহুসুখ স্বর্গের জন্য বহুকাণ্ড সঙ্কুল যাগাদি কার্য্যে কষ্ট ভোগ করিতে প্রবৃত্তি হওয়া অনুচিত নয়। এখনকার সুখ সমৃদ্ধি অপেক্ষা স্বর্গ রাজ্যের সুখ শান্তি অবশ্য অনেকাংশে অভিলষিত একথা আধুনিক নীতির অনুমোদিত। ভারতবর্ষের অনেক প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় নরপতি ইন্দ্র রাজ্যের সখা ছিলেন। পরস্পরের উপকার প্রত্যুপকার চলিত। কখনও বা মর্ত্ত্যের কোনও নরপতি ক্রোধপরবশ হইয়া ইন্দ্রদেবের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিতেন, আবার সুযোগমত স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তারও করিতেন। সময়ানুসারে স্বর্গেশ্বরের সহিত সন্ধিও সংস্থাপিত হইত। এই

সম্প্রদায়ের নহুষ দশরথাদি জীবিতাবস্থায় স্বর্গে গিয়াছিলেন এবং স্বর্গাধিকার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বস্তুতঃ স্বর্গের ধারণা পরলোক-ব্যাপনী হইতে পারে না। স্বর্গে দেবগণ বসতি করেন, স্বর্গ—তাঁহাদের কৌশল বলে সুরক্ষিত। দৈত্য দানবগণ বলবান্ হইয়া অনেক সময়ে স্বর্গনিবাসীদিগকে বিপন্ন করিয়াছে, এরূপ উপাখ্যান পুরাণে পাওয়া যায়। দৈত্য দানবাদি প্রায়শ স্বর্গচ্যুত হইয়াছে। এই সকল রূপক অনার্য্য শক্তি দেবসমাজের নিকট প্রায়শই কৌশলেই পরাজিত হইত। পার্ব্বতীয় দুর্গমতা অতিক্রম করিয়া সুতরাং স্বর্গ রাজ্যে যাইবার যাতায়াত দৈত্যেরই ছিল, কাজেই তাহারা সহসা দেবগণের নিকট মস্তক অবনত করিত না। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে অনেকেই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইবেন এই সকল ব্যাপার কেবল মাত্র প্রাচীন-ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের নিদর্শন।

প্রবল বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যিনি এই ভারতকে পুনর্ব্বার যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মবিপাকে ফেলিয়াছিলেন এবং লুপ্তপ্রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যুগপরিবর্ত্তক কুমারিল ভট্ট ভট্টবার্ত্তিকে স্বর্গ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃ পদাস্পদং॥

সুখই স্বর্গ। তবে আমরা সর্ব্বদা যে বিজলী-বিকাশের ন্যায় ক্ষণিক সুখের আলোকে ঝলসিত নয়ন হইতেছি, তাহাই ভট্টের স্বর্গ নহে। লৌকিক-সুখে সততই দুঃখ সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই সংসারে অশেষ সুখ সামগ্রী আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য উপস্থিত, কিন্তু তাহাতে আমরা সুখী হই না। বাসনার বিষাক্ত শিরাস্রোতের প্রবাহে আমাদের অস্থি-মজ্জা অনবরত দগ্ধ হইতেছে। সংসারিহৃৎ কামহুতাশন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিলাস সামগ্রীতেও তৃপ্ত নহে। আকাঙ্ক্ষার অবসান নাই, আশঙ্কা প্রতিপদে। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যা-সমাগম পর্য্যন্ত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও মুহূর্ত্তকালের সুখ সাধন সংগ্রহ করা কষ্টকর, আবার অভাবের কশাঘাতে ক্লান্ত হইয়া ক্রন্দনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায় সুখ দুর্লভ, দুঃখই সর্ব্বদা উপস্থিত। শুক্লপক্ষে এক দিন পূর্ণিমা, কৃষ্ণপক্ষেও এক দিন অমাবস্যা। কিন্তু অনেক পূর্ণিমাই জলদের কল্যাণে অমাবস্যা সহোদরা হইয়া দাঁড়ায়, আর একটী অমাবস্যাকেও লোক-সমাজ আলোকিত দেখিতে পান না। আয়াস-সাধ্য যাগের ফল এরূপ স্বল্প সুখ হওয়া অনুচিত, তাই ভট্ট অক্ষয় স্বর্গ সুখের বাসনা করিয়াছেন। "যে সুখ দুঃখ সংমিশ্রিত নহে, তাহাই স্বর্গ (১) যে সুখকে গ্রাস করিবার জন্য পরবর্ত্তী দুঃখ বিকট বদন ব্যাদন করিয়া বিদ্যমান নহে সেই সুখই স্বর্গ; (২) যে সুখ অভিলাষ মাত্রেই আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ যাহার জন্য পৃথক্ আয়াস প্রয়াসের আবশ্যক হইবে না, সেই সুখই স্বর্গ (৩" ভট্টের টীকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অনেক পণ্ডিতের মতে এই তিনটী পৃথক লক্ষণ, তাঁহারা মনে করেন, তিনটীর দ্বারা একই অর্থ প্রকারান্তরে সমর্থিত

রয়েছে, অতএব তিনটী পৃথক্ তিন লক্ষণ। এক লক্ষণ হইলে পুনরুক্ত হয়। এরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখ কি ইহসংসারে সম্ভব?

মীমাংসা ভাষ্যকার শবর স্বামী বলেন, "স্বর্গ শব্দঃ লোকে প্রকৃষ্টে সুখে রূঢ়ঃ" উৎকৃষ্ট সুখই স্বর্গ শব্দের অর্থ। বাস্তবিক উৎকৃষ্ট-সুখ স্থান বিশেষের অবস্থা বিশেষের কাল বিশেষের সহিত সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে। লৌকিক শিক্ষায় কেবল সুখের ধারণাই অসম্ভব। অনেক দার্শনিকের অভিপ্রায় সুখ দুঃখের সম্বন্ধ বড় সন্নিকৃষ্ট। জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ কপিলাচার্য্য সুখ দুঃখকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন। সুখ সত্ত্বগুণের কার্য্য, দুঃখ রজোগুণের কার্য্য। এই সংসার ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) পরিণাম। তিনটী গুণের কেহও আবার কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ইহারা নিত্য সহচর, "অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।" এই ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকায় দেখা যাইতেছে ত্রিগুণ নিত্য সহচর। কপিলদেবের সাংখ্য প্রবচনেও এই কথা। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যেও ত্রিগুণ পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না, এই সিদ্ধান্ত। কেবল আধিক্যবশতঃ "এটী সাত্ত্বিক-কার্য্য," "এব্যক্তি সাত্ত্বিক পুরুষ" ইত্যাকার ব্যবহার হয়। স্মৃতিকার মহর্ষি বলেন,—"যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যে [illegible]তে। স তদাতদ্গুণ প্রায়ং তং করোতি শরীরিণং।" যে দেহে যে গুণ অধিক হয়, সেই গুণ শরীরীকে সেই গুণাক্রান্ত করিয়া তুলে. বস্তুতঃ সকল বস্তু ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডই ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং এদেহে এসংসারে শুধু সুখ সম্ভব নহে। যদি ত্রিগুণ সমষ্টি ব্যতীত অন্যবিধ শরীর সম্ভব হয় এবং কেবল সাত্ত্বিক-কার্য্য, কেবল সাত্ত্বিক-ইন্দ্রিয় বা কেবল সাত্ত্বিক মন থাকা মনোবিজ্ঞানাদির অনুমোদিত হয়, তবেই কেবল সুখের উপভোগ হইতে পারে, দুঃখের বিষয় তাহা সম্যুক্তির বহির্ভূত, কল্পনার আত্মীয়। অতএব নিরবচ্ছিন্ন সুখ রূপ স্বর্গ ভোগ কেবল কল্পনার কোমল কুসুমস্তবক শয়নে বিশ্রাম মাত্র। এখন ভাবিয়া দেখা যাইক, তদ্ভিন্ন সুখরূপ স্বর্গ কোথায়?

সাধারণতঃ আমাদের যে সুখানুভব সম্ভব, এসুখ নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অতএব সুখ শব্দের অর্থ বিবেচনীয়। অনেক দার্শনিক অনুমান-বলে পরমেশ্বরের মস্তকে অনন্ত সুখের ভার চাপাইয়াছেন, কিন্তু জীবজগতকে নিরবচ্ছিন্ন সুখে সুখী করিতে কেহই পারেন নাই। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু সংসারসারে বলিয়াছেন,— "সুখং দুঃখ সুখাত্যয়ঃ" সুখ দুঃখের অত্যন্তাভাবের নামই সুখ। সুখের আগ্রহ দুঃখের আশঙ্কা এই উভয় চলিয়া গেলে তৎপরাবস্থার নাম সুখ। যিনি সুখে আকৃষ্ট নন, দুঃখে ম্রিয়মাণ হন না, তিনিই বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে সুখী। অনেকে সুখের অর্থ "দুঃখ না হওয়া" বলেন। দুঃখ ও সুখকে মনের মধ্যে সংযত করা ব্যতীত অন্য উপায়ে দুঃখদূর করা সম্ভব কি না তাহাও আলোচ্য। জ্ঞানের দ্বারা বা যোগাভ্যাসের শক্তিতে সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হওয়ার নামই বোধ হয় স্বর্গ। যাজ্ঞিক মীমাংসকগণই সর্ব্ব প্রথম দেশে স্বর্গের ধারণা প্রচার করেন। ভারত

প্রথমে শুনিয়াছিল সেই বেদবাণী "স্বর্গ-কামো যজেত।" তারও স্বর্গ সুখের লোভে সর্ব্বস্বব্যয় করিতে কঠোর উপবাস ব্রত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে শিখিয়াছিল। সে স্বর্গ সুখ কেবল কোথায়? কি কাজে? তাহা কেহই স্পষ্ট বলেন নাই। মীমাংসক স্বর্গ ধারণার আদিগুরু, তিনি স্বর্গকে দেশবিশেষ মনে করেন না, নির্দ্দোষ নিরবধি নিরবচ্ছিন্ন সুখই তাঁহার স্বর্গ। ঐ সুখই আত্মজ্ঞানীর মুক্তি, কারণ তাহাতে দুঃখশঙ্কা নাই। মীমাংসকের স্বর্গকে জ্ঞানীরা বিনাশী বলেন কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ মীমাংসক বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ লাভ বলিয়াছেন, ইহাই কারণ। কর্ম্ম জন্য ফল সমস্তই অনিত্য, মীমাংসকের স্বর্গ যাগাদি কর্ম্মের ফল সুতরাং তাহা নিত্য নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ হইতে পারে না। মীমাংসকের স্বর্গকে ক্ষয়ী না বলিয়া মীমাংসকের নিত্য সুখ স্বরূপ স্বর্গ বৈদিক-কর্ম্মের ফল হইতে পারে না ইহা বলিলেই ভাল হইত। তাহাতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য থাকে না সুতরাং বেদ অংশত অপ্রমাণ হয়, এই ভয়েই জ্ঞানীরা মীমাংসকের স্বর্গ জিনিষ কি তাহা ভাবিতে চাহেন নাই; কেবল ভাবিয়াছিলেন মীমাংসকের স্বর্গসাধক বৈদিককর্ম্ম, কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। মীমাংসক মহর্ষি বলেন "সস্বর্গঃ স্যাৎসর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ। সুখই স্বর্গ, যেহেতু সকলের প্রতি অবিশিষ্ট হইতে পারে। স্বর্গ স্থান-বিশেষ হইলে সকলের পক্ষে অবিশেষ হইতে পারে না। জ্যোতিষ্টোমকারী বহুব্যক্তি এক রূপ সুখভোগ করিতে পারেন, কিন্তু এক রাজ্য বা দেশ সমভাবে ভোগ করিতে পারেন না।

সুখ ভাবিতে সুখের স্থান, প্রথা, উপকরণ সকলও ভাবিতে হইয়াছে। সেই ধারণার ফলের স্বর্গ লোকের কল্পনা হইয়াছে। বৈদিক-স্বর্গ পৌরাণিক-স্বর্গের সম্পূর্ণ আদর্শ এরূপ মনে হয় না। পুরাণের বিভিন্ন স্থানের স্বর্গ বিভিন্ন। পুরাণে ঐহিক পারত্রিক উভয় স্বর্গ দেখা যায়। ফলতঃ পৌরাণিক স্বর্গ লোক বিশেষ। তথায় কেহবা মরিয়া কেবা বাঁচিয়া ও যাইতে পারে। বেদের স্বর্গ ঐতিহাসিক অংশের প্রামাণ্য মানিলে স্থান বিশেষ এবং ইহকালের জিনিষ। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা গুলি ছাড়িয়া দিলে বেদের নিকট স্বর্গের কোনও স্পষ্টস্বরূপ পাওয়া যাইবে না। পৌরাণিক স্বর্গের ইন্দ্রত্ব হইতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ লাগিত। এক ব্যক্তি শত অশ্বমেধ করিলে ইন্দ্র হইতে পারিত। পুরাতন ইন্দ্র নূতন ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য শতাশ্বমেধকারীর অশ্বমেধ পূর্ণ হইতে দিতেন না। অগত্যা অশ্বটাকে চুরি করিয়া নিতেন। ইহলোক পরলোকের মানব ও দেবের মধ্যে এরূপ স্বার্থসংঘর্ষ বিস্ময়জনক। ইহাতেই স্বর্গ দেশবিশেষ মনে হয়। ব্রহ্মা শতাশ্বমেধকারীর ইন্দ্রত্ব (স্বর্গের রাজা হওয়া) অনুমোদন করিতেন। প্রাচীন ইন্দ্র কৌশল, তপস্যা, দেব বল, দেবশক্তি এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মন্ত্রণা, কদাচিৎ যুদ্ধ সাহায্য লইয়া পুনঃ স্বর্গ অধিকার করিতেন। এ সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বর্গ।

স্বর্গ ইহার সম্বন্ধ রাখেনা। চার্ব্বাকের ও সুখ, তবে তাহা এই অজনালিঙ্গনাদি লৌকিক সুখই। ইহসংসারে পবিত্রজীবনোপভোগ অনেকের মতে স্বর্গ। ফলতঃ অনেক

স্বর্গই ইহকালব্যাপী। পরকাল বা পরলোক বলিতে মৃত্যুরপর সময়ের অবস্থা ও মরণানন্তর প্রাপ্য স্বর্গ নরকাদিই বুঝা হয়। পরলোক অর্থাৎ পরে (মৃত্যুর পরে) যে লোকে স্থান যাওয়া যায়। ভট্টের স্বর্গ সুতরাং এ অর্থে পরলোক নহে। পুরাণের স্বর্গই এরূপ অর্থ বোধক পরলোক। ভট্টের স্বর্গ মুক্তিরনামান্তর। বলিতে হইলে নিরুপদ্রব সুখের নামই ব্রহ্মানন্দ। দার্শনিকেরা পৌরাণিক স্বর্গ স্থানকে সুকর্ম্মানুসারে পরজন্মের প্রাপ্য বলেন। কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা এই দুঃখবহুল মর্ত্তভূমি ত্যাগ করিয়া সুখ বহুল স্বর্গ স্থানে যাওয়া যায়। এখানে তাঁহারা শাস্ত্র ব্যতীত যুক্তি দেন না। অবশ্য দার্শনিক প্রথার স্বর্গ দুঃখশূন্য নহে, তবে সুখই বেশী। এই স্বর্গের সহিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধ পুরাণ কোথায় পাইলেন ভাবা উচিত। স্বর্গ ধারণার গুরু মীমাংসকের কাছে পান নাই। বেদের নিকট হইতেও সুস্পষ্ট পান নাই। কঠোপনিষদে আছে "স্বর্গ লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্রত্বং ন জরয়া বিভেতি, উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গ লোকে। পুরাণের স্বর্গে শোক দুঃখ নিতান্ত অপ্রাপ্য নয়। ফলতঃ এই সকল স্বর্গ জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। [illegible] স্বর্গ জীবজীবনের বিরাম [illegible]নাই। চরমশান্তিই এক মাত্র লক্ষ্য। [illegible]ন পৌরাণিক স্বর্গ অপেক্ষাকৃত শান্তি[illegible]য়ক, সুতরাং এই অমারজনীর গাঢ় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিকের মত সংসারিজীবের কাছে স্বর্গ (সুখস্থান) মন্দ লাগে নাই। জীব যদি চরমগতির দিকে লক্ষ্য নিঃক্ষেপ করেন, তবেই তিনি প্রকৃত স্বর্গ লাভ করিবেন, আসল পরকালের (জীবনের চরম সময়ের অর্থাৎ মুক্তির সম্মিকৃষ্ট কালের) চিন্তা করিলেন। নচেৎ নন্দনক ন.ন কিম্বা আগরার তাজমহলে কোথায় ও তাঁহার পরকালের পিপাসা মিটিবে না; কোথাও তিনি ইহসর্ব্বস্ববাদীর সুলভ সুখের মায়া ছাঁড়াইতে পারিলেন না। আশা থাকিতে সুখ নাই। শাস্ত্র বলেন "আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।" আশার আগুণ নিবাইতে হইলে জ্ঞানের মন্দাকিনী স্রোত বহাইতে হইবে, ইহ সর্ব্বস্ববাদীর সাধনের জিনিষ প্রবৃত্তির সুখ। স্বর্গেও তাহাই। স্বর্গকে পরকালের জিনিষ ভাবিবেন প্রবৃত্তিরই দাসত্ব স্বীকার করা হইল। নিবৃত্তিমার্গের স্বর্গই পরকালের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভট্ট তাহা বুঝিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ সমাজে বৈদিক কর্ম্মের প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক হিন্দুর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক বিধায় জ্যোতিষ্টোমের ফল স্বর্গকেও অবিচ্ছিন্ন সুখ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, জীবনের দুই লক্ষ্য এক যোগ সাধ্যানুসারে সামগ্রী সংগ্রহ। অপর মোক্ষ সুখ দুঃখের উপরে গিয়া পেঁাছান। ইহার পূর্ব্বটী ইহকালের, পরটী পরকালের। এইরূপ বুঝিতে বোধ হয় বিপদ্ থাকে না। পৌরাণিক স্বর্গ—এবং ইহ সংসারের পুত্রকলত্রাদি জনিত সুখ এই উভয় দ্বারা জীবনের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ হওয়া সঙ্গত নয়। ভট্টের স্বর্গ বা জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য অবকাশ থাকা আবশ্যক।

আমি সুখ চাহি কেন? আমার যাহা অনুকূল সংবেদন তাহাই আমার সুখ এই

জনাই ত! অনুকূল চাহ কেন? প্রতিকূলের ভয়ে। যদি প্রতিকূল আমার প্রতিকূলাচরণ পরিত্যাগ করে, তবে অনুকূলও ত্যাগ করিতে পারি। শত্রু যদি হিংসাহীন হয়, তবে আত্মসেনা দলকেও বিদায় দিতে আপত্তি কি? মন মায়ামুগ্ধ, আপনার অতুলনীয়তা অনুভব করিতে পারে না। আপনাকে আপনি না জানিয়া সাতসাগরসার্ব্বভৌম ব্যক্তিও দরিদ্র। সংসারের সুখ কি প্রার্থনীয়? নিশ্চয়ই নহে। দুঃখের তাড়নায় সুখের অঞ্চল ধরিতে চাই। যদি আমাকে আমি ভাল করিয়া জানিতাম, তখন আর দুঃখদারিদ্র্য রহিল না। তখন উপাধিসাধ্য লৌকিক সুখ থাকিল না বটে কিন্তু যাহা রহিত তাহা আমার আত্মতত্ত্ব, তাহাতে অভাব নাই আশঙ্কা উপদ্রব নাই সুতরাং শান্তি আছে। তাহাই আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ, তাহাই আমার সুখ দুঃখাতীত ভাব, তাহাই স্বরূপ, তাহাই কৈবল্য, তাহার পার নাই পরিমাণ নাই। তাহা আত্মস্বরূপ হইলেও পূর্ব্বে (আত্মজ্ঞানোদয়ের অগ্রে) শত যোজন দূরবস্থিত সমগীর ন্যায় দুর্লভ। শাস্ত্র বলেন "তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।" আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে অতি নিকটে অজ্ঞানে অশেষ দূর। এই নিরতিশয় সুখই পরকালের লক্ষ্য। এই অশেষ সুখের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেই মানবাত্মার শান্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। ইহসর্ব্বস্ববাদীর জীবনে এ আশ্বাস নাই। অনবরত দুঃখের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া ইহসর্ব্বস্ববাদী চমকিতে থাকুন, পরকালবাদী পরম পবিত্র আত্মস্বরূপ অক্ষয় আনন্দ অনুভব করিয়া সেই ব্রহ্মানন্দের রসে নিমজ্জিত হউন। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের লাভালাভে সমালোচনা করিয়া আদর্শ অনুসারে জাতের জন্য পথে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতে থাকি। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রী——ভারতী।
যশোহর।

বিষয় ও বিষয়ী

বিষয়ীর কাছে বিষয়ের কথা বড় মধুর। সমধিক সুখদায় বিপুল প্রীতিপ্রদ। বিষয় বিরাগীর নিকট বিষয়ের মূল্য কোটী কোটী মুদ্রা হইলেও অত্যল্প, অকিঞ্চিৎকর; আর বিষয় কথা ত্যাজ্য, কদর্য্য পরিত্যাজ্য।

রাগ বিরাগ সাধারণত মানুষের প্রকৃতির গতির উপরই সংস্থাপিত। শিক্ষা দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, অভ্যাস বিশ্বাস ইত্যাদিকে উহার লৌকিক ভূমি বা বিকাশ ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। প্রকৃততত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে, ত্রিগুণ তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক; কারণ প্রকৃতির কার্য্যকারি শক্তি ত্রিগুণ তত্ত্বময় যন্ত্রেই অবস্থিত। ইচ্ছার অনুরাগ বিরাগে পরিণত হওয়া কষ্টকর।

বিরাগী রাগী বিষয়কে কপট আলিঙ্গন করিতে পারেন না। রাগী বিষয়ের কোলাঞ্চল ধরিয়া অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন, বুকে টানিয়া লইতেছেন, কত যত্ন কত কষ্ট, কত বাধা, কত বিপদ, কত আঘাত কত বেদনা অকাতরে সহ্য করিতেছেন; কিন্তু বিষয় কিছুতেই ধরা দেয় না। দেখ, জো

ধরা দেয় না। কাছে আসে, পাশে পাশে আসে, কিন্তু ধরা দেয় না। যে চায়,—আগ্রহ করে, আদর করে, তাহার নিকট ছলনা; যে চায় না, নিগ্রহ করে, উপেক্ষা করে, তারই কাছে প্রার্থনা। বিষয় এই লীলারঙ্গ দেখাইয়া জীবজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই ফিরিতেছে ঘুরিতেছে। কেহই ইহার প্রকৃত-মূর্ত্তি দেখিতে সক্ষম হয় নাই। বিরাগীর বিশ্বাস, মনোরঞ্জনবসনভূষণের অন্তরালে গলিত কুষ্ঠ, সুরঞ্জিতপানপাত্রীর আবরণে বিষলতা, সুধামুখ-কুম্ভের অভ্যন্তর ভাগে করালকালকূট, সুচিত্রিত পেটিকার মধ্যে ঘৃণ্য জঘণ্য পূতিগন্ধময় সামগ্রীসম্ভার। রাগীর ধারণা,—বহির্ভাগ অপেক্ষা অভ্যন্তর অধিক রমণীয়, মণিমন্দিরের মধ্যে কুসুম-শয়ন, ঈঙ্গিতের মধ্যে আগ্রহ, চম্বনের মধ্যে সুরসধারা, সুবর্ণকৌটার মুক্তার মালা। আপন বিশ্বাসেই উভয়ে বিভোর, উভয়ে অসুখী। কেহই যথার্থ সংবাদ নেন না বা পান্ না। কাজেই এদেশে 'বিষয়' বিপন্ন।

বিষয় বলিলে আপাততঃ পরগণা, তালুক, গাঁতি, নিষ্কর ইত্যাদিই বুঝা হইয়া থাকে, কিন্তু পাঠকমহোদয়গণ! আমাদের এ প্রবন্ধের 'বিষয়' তদপেক্ষা অনেক অধিকবিস্তৃত—অনেক অধিক গভীর—অনেক অধিক মূল্যবান্।

বিষয় বলিলে দার্শনিকগণ বুঝেন, যাহা জ্ঞানের নিরূপক। আমরা সর্ব্বদা অশেষ-বিধ জ্ঞান লাভ করিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের আয়ত্ত্ব হইতেছে; এই অসংখ্য জ্ঞানের তৎকালীন স্বরূপ নিরূপণ করিতেছে কে? 'বিষয়' নয় কি? জ্ঞানের যথার্থ আকার আমাদের নিকট অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দর্শন-জ্ঞানের এবং অন্যবিধজ্ঞানের বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে আমরা কি প্রাপ্ত হই? কতগুলি বিজাতীয় ধারাবাহিক নিয়ম, আর কতগুলি উত্তেজক কারণ, ইহাই ত? এই ধারাবাহিক-নিয়মটিকে আবার উত্তেজককারণের পার্থক্যে পৃথগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হই। উত্তেজকের অবস্থা অনুসারে ধারাবাহিক নিয়মের শৃঙ্খলা অন্য আকার ধারণ করে। ঐ ধারাবাহিক নিয়মের অন্তরালে জ্ঞানের যে প্রকৃত-লুক্কায়িত 'রূপ' আছে, তাহাকে আমরা কিছুতেই পাই না। বস্তুতঃ, জ্ঞানের যতটুকু আমাদের আলোচনায় আসিতে পারে, তাহারই যে সময়ে ২ বৈলক্ষণ্য অনুভব করি, তাহার পরিচায়ক উত্তেজক কারণ অবশ্য 'বিষয়'। দর্শন শাস্ত্রের প্রাচীন পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—বিষিন্বন্তি বিষয়িণং অনুবধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তি ইতি বিষয়াঃ।" বিষয়িকে (জ্ঞানকে) নিজরূপের দ্বারা নিরূপণীয় করে যে সে বিষয়। আমাদের দর্শন ও স্পর্শন জ্ঞানের ধারাবাহিক নিয়ম ভিন্নজাতীয়, সুতরাং ইহাদিগকে পৃথক বুঝিতে আপাততঃ 'বিষয়' চাই না। বিভিন্নসময়ের বিভিন্নবস্তুর দর্শন-জ্ঞান অবশ্য এক জাতীয় ধারাবাহিক-নিয়মের অধীন, সুতরাং এখানেই শৃঙ্খলার পার্থক্য বুঝিতে হইলে 'বিষয়' আবশ্যক। এখানে প্রত্যেকদর্শনজ্ঞানের স্বরূপতঃ বা ধারাবাহিক নিয়মের ও ভেদ নাই, তবে ভেদ আছে নিয়মশৃঙ্খলায়, তাহার কারণ যখন 'বিষয় অর্থাৎ দৃষ্টবস্তু, তখন ঐ জ্ঞানের যে অংশ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাকে

ঐ উদ্রেজককারণরূপ'বিষয়'ই নিরূপিত করিয়াছে বলিতে হইবে, অতএব ঘটজ্ঞানও পুস্তকজ্ঞানের উভয়ত্র আকারনিরূপক 'ঘট' ও 'পুস্তক' ইহা বলা যাইতে পারে। এইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞানের পরিচায়ক বা নিরূপক 'বিষয়'। এখন বুঝিয়া দেখিলে, "জগতের কোন্ টুকু 'বিষয়' কোন্ টুকু নহে" তাহা জানা যাইবে। 'বিষয়ে'র সহিত রাগী বিরাগী উভয়েরই একটা সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—অপরিহরণীয়। যে বিরাগী তাহা বুঝেন না, তিনিই বিষয়কে দূরে নিঃক্ষেপ করিতে চান, এবং দূরে ফেলিতেছেন মনে করেন; বস্তুতঃ তাঁহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, থাকিবেও চিরদিন, কিন্তু তিনি ঐ বিষয়সম্বন্ধ দ্বারা নিজের ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেছেন না। সেটা কেবল বিষয়মর্ম্ম না জানিয়া, বিষয়ের স্বরূপ না দেখিয়া, না বুঝিয়া। রাগীও তাহা বুঝেন না, বুঝিলে—জানিলে, তিনি 'রাগী' হইতেন না। আপনার অভাবকে আপনি নিমন্ত্রণ করিতেন না, আপনার পন্থা আপনি আত্মহারা হইয়া পরিত্যাগ করিতেন না। যাহা চান, তাহা তিনি পাইয়া ও পাইতেছেন না; চিনিতে পারেন নাই, ব্যবহার জানেন না, সুতরাংই দুঃখ দৈন্য, অভাব প্রভাব, দিনদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাই হতাশপ্রাণে উদাস মনে কেহ বলিয়াছেন, 'বিষয়াবিষ্ট-চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু গচ্ছন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ?" বিষয়নিবিষ্টচিত্তব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণানুরক্তি ক্রমশঃ দূরতর হইতে থাকে। পূর্ব্বাভিমুখ গমন করিলে, পশ্চিম দিক্‌স্থিত বস্তু পাওয়া যায় না, প্রত্যুত উহা ক্রমেই অধিকদূর পশ্চাতে পড়িয়া যায়।

পাঠকমহোদয়! একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন। বিষয়প্রবণচিত্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় না, বরংচ ভগবান্‌কে অধিক পশ্চাতে রাখিয়া দেয়। বিষয়টী কি বাস্তবিকই বিড়ম্বনা পূর্ণ নহে? বিশালব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় 'বিষয়' এমন কি প্রতি পরমাণুও সেই ভবেশের অভাবনীয়-মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অভ্রান্তবাক্য বেদ, জলদগম্ভীর রবে জগতের কর্ণ ধ্বনিত করিয়া প্রচার করিতেছে "এতাবানস্য মহিমা।" এই বিরাট বিশ্ব বিশ্বস্রষ্টার অতুলমাহাত্ম্যের একমাত্র পরিচায়ক প্রমাণ। জগৎগ্রন্থের প্রত্যেক'বিষয়'অক্ষরে পরমেশ্বরের অমর মহিমা লিখিত আছে, তাহাতে মনোনিবেশ করিলে কি ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইতে হইবে? ভগবানের মূর্ত্তি যদি মানব কল্পনার অতীত সামগ্রী না হয়, মানুষের জ্ঞান-মনবুদ্ধি যদি ভগবচ্চিন্তায় বা তদ্ধারণায় সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত না হয়, তবে "ভগবান্ বিশ্বরূপ" এই সিদ্ধান্তই মানবীয় চিন্তার—মানবমনীষার—মানুষীয় গবেষণার—সুরম্যবিরামস্থান, সুখদ-প্রতিষ্ঠা, সংশয় নাই।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে উচ্ছৃঙ্খলমানব যদি সন্দিহান হন, তবে তাহার সংশয়নাশক অমোঘ-নিশ্চয় এই জগদ্‌'বিষয়ের' অধীন। যুক্তি তর্ক সমূহের দ্বারা বারবার বিড়ম্বিত বিভ্রান্ত মানবমন, ঈশ্বরের অস্তিত্বসহ এই বিচিত্রবিশ্ব নিপুণনয়নে অবলোকন করিলেই সান্ত্বনা পাইবে। হতাশ হতাশ সবই পলাইবে। দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে

যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলিবেন "বিশ্বই বিশ্বপাতার অস্তিত্বে প্রমাণ" মহামান্য ন্যায় দর্শন প্রধানতঃ এই রীতিরই অনুশরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে কেমন করিয়া বলিব, 'বিষয়ে' চিত্তনিবেশ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র দূরবর্ত্তী হন? এই বিশ্ব-'বিষয়' ব্যতীত আর যে কেহই ভগবানের পরিচয় দিতে সক্ষম নহে। আচ্ছা, ভাবিয়া দেখা যাউক, শাস্ত্র—'বিষয়' দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করে কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'বিষয়' বিষয়ীর (জ্ঞানের) একমাত্র পরিচায়ক। এই সংসার 'বিষয়', ইহার বিষয়ী সেই চিদ্বিগ্রহ। আমরা সর্ব্বদা যে ঘট-পটাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতেছি, সেই জ্ঞানের বিষয় ঐ ঘটপটাদি, এবং ঘটপটাদি বিষয়ের বিষয়ী ঐ জ্ঞান। ঐ জ্ঞান ক্ষুদ্র, আংশিক, উহা ভগবানের চিদ্বপুর স্বরূপ নহে, আভাস ছায়া মাত্র, ইহা দর্শন শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। অন্তঃকরণে পুরুষের (আত্মার) যে ছায়াসংক্রান্তি অর্থাৎ শব্দাব-ভাস তাহাই প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান। "চিচ্ছায়াপত্তি" শব্দ দ্বারা দর্শনে এই কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। ঘটাদি বিষয়ের বিষয়ী জ্ঞান, ভগবদবভাস বা [illegible]প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এখন দেখা গেল, এই বিশাল বিশ্বের [illegible] সমষ্টির বিষয়ী এক অগাধ অপ[illegible] জ্ঞান রাশি। সমগ্র সংসার বিষয়ের [illegible] লাভ করা, আর এক সার্ব্বভৌম জ্ঞান-[illegible]র কাছে উপনীত হওয়া, একই কথা হইল। এখন বক্তব্য, এ প্রবন্ধে 'অনন্তচিদ্বপু'ই ভগবানের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইল। এ পর্য্যন্ত দ্বারা আমরা অবগত হইতে পারিব যে, ন্যায়শাস্ত্র কি জন্য জগতের যাবতীয় বিষয়কে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ সমস্ত-পদার্থ যথা-যথরূপে জানিলেই মুক্তি হয়, এ কথা বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরসম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়াও কেন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববিবেক লাভ করিলে মুক্তি হয় বলিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে অনেকটা সুগম হইয়াছে।

মুক্তি জীবনের সমস্ত উপদ্রব নিবৃত্তি পূর্ব্বক শাশ্বত শান্তিলাভ ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। শান্তিলাভ করিতে হইলে অশান্তির কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক। রোগ নির্ণয় না হইলে চিকিৎসা অসম্ভব। আমাদের সমস্ত দুঃখের নিদান "আমরা অজ্ঞ।" সর্প-বিষচিকিৎসা জানি না, কাজেই সর্পদষ্ট হইয়া দুঃখানুভব করি, উপার্জ্জনের পন্থা অবগত নহি, সুতরাংই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জীবিকার্জ্জনে অক্ষম হই। বস্তুতঃ দর্শনশাস্ত্র সমস্বরে বলিয়াছেন "দুঃখমজ্ঞান-মূলং"। এই অজ্ঞান নাশ করিতে জ্ঞান চাই। জ্ঞান পাইলেই সকল অভাব কমিল। অন্য-রূপে বলিলে ঈশ্বর (জ্ঞান) প্রাপ্তিই মুক্তির রহস্য। সমগ্র জগৎ (বিষয়) জানিলে মুক্তি হয়। অর্থাৎ সকল বিষয়ের (জগতের) জ্ঞান (ঈশ্বর) লাভ করিলে দুঃখের মূল (অজ্ঞান) ছিন্ন হয়। এখন বুঝাগেল জগৎ ভগবানের পরিচায়ক কি প্রকারে। এদিকে শাস্ত্রবচনেই পাওয়া গেল 'বিষয়' ভগবান্‌কে পশ্চাতে রাখে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলিয়াছেন—"লেকচার দিয়ে

বিষয়ী লোকদের কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌বেনা; পাথরের দেওয়ালে পেরেক্ মারা যায় না।" পাঠক মহাশয়! বিষয়ী লোক পাথরের দেওয়াল, চূড়ামণির বক্তৃতা পেরেকের মত প্রবেশ সমর্থ হইলেও, এ দেওয়ালে লাগিয়া ফিরিয়া আসিবে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না। পরমহংস মহোদয় "বিষয়ী লোক" বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা জানা গেল। তাঁহার 'বিষয়ী' বিষয়ের যথার্থতত্ত্ব গ্রহণ করেন না। বিষয় সমুদ্রের মধ্যে বাস করিয়াও বিষয়ের মহিমার, সে সাগরের রত্নরাজীর কোনও ধার ধারেন না। ইনি প্রকৃত বিষয়ী নহেন, ভণ্ড মাত্র। ময়ূরপুচ্ছশোভিত বায়স শাবক। বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে 'বিষয়ী' নামে। বস্তুতঃ কার্য্যে বিষয় জ্ঞানের পরিচয় চাই। 'বিষয়' জানিতে হইলে, সঙ্গে ২ বিষয়ীর (আত্মার, জ্ঞানের, ভগবানের) স্বরূপও জানিতে হইবে, তবেই 'বিষয়ী' হওয়া গেল। নিজের 'বিষয়ের' কোনও সংবাদ যিনি রাখেন না, এমন কি, নিজের (বিষয়ীর) কথাটাও ভালরূপ জানা নাই, তিনি কিরূপ বিষয়ী? এখন লোকে 'বিষয়ী' বলিলে বিষয়কাণ্ডে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝে। বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞকে 'বিষয়ী' বলিতে হইলে, দৃষ্টান্ত পৌরাণিক জনকরাজা। শ্লোকস্থ "বিষয়াবিষ্ট" শব্দের অর্থ—বিষয়ের বাহ্যভাবমাত্রপরিজ্ঞাতা এবং উহার রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। বিষয়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে, গৃহস্থ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী গৃহস্থ। গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন, কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মযোগীই সন্ন্যাসী, কর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন, কর্ম্মযোগীও নহেন। বিষয়-নিন্দা শাস্ত্রে সহস্র সহস্র স্থলে দেখা যায়, তাহার কারণ 'বিষয়' বড় দুরবগাহ দুর্জ্ঞেয়। প্রকৃতরূপে জানিতে পারিলে সব যন্ত্রণার অবসান, অপব্যবহার করিলে বিপদ্ বদ্ধমূল হয়। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদিকে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত, চক্ষু থাকিলে দেখা যায়। যিনি প্রকৃত বিষয়ী, তিনি চিন্মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হন। যিনি 'বিষয়ী' নামধারী, অথচ বিষয় কাণ্ডে অকালকুষ্মাণ্ড(?) তিনি বিষয়ের রহস্য অবগত নহেন, এমন কি, আপনাকে (বিষয়ীকে) ও জানেন না। এই জন্য, করস্থকঙ্কণ শতযোজন দূরে, গলস্থহার সমুদ্রপারে, মনে করেন। তাই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ও পশ্চাতে পড়িয়া যান্। যথার্থ বিষয়ীর প্রতিবিষয়ে বিষয়তত্ত্ব (ঈশ্বরতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব) স্ফূরিত হয়। তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ সন্দর্শন করিয়া, যিনি বিশ্বপতির বিপুল মহিমার বিজয় বৈজয়ন্তী মনে করিয়া পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হন, সেই বিষয়রসাভিজ্ঞ ব্যক্তিই বিজ্ঞ। গগনমণ্ডলের অনন্ত নক্ষত্র নিকরে যিনি জগদীশ্বরের মহিমময় কিরণচ্ছটা অবলোকন করেন তিনিই বিষয়ী। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 'বিষয়ে' 'বিষয়ী'রই মহিমা প্রকটিত, এই রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন, 'বিষয়ে'র রহস্য দ্বার তাঁহারই সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত। তাঁহার কাছেই 'বিষয়' আ[illegible]প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার হৃদয়েই বিষয়ের শা[illegible] বিশ্রাম লাভ করিয়া, বহুজন্মের ক্লা[illegible] দূর করিতে পারিয়াছে। তাঁহার নয়নে এ[illegible] শান্তির নিভৃত নিবাস, তাঁহার[illegible] সংসার কথা অতুল অমিয়বর্ষী স্বর্গসঙ্গীত। তিনিই সংসারকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে

পারিয়াছেন, তিনিই ভগবানের পূজায় বিষয়োপচার নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই জগতে সুখী, শান্ত, সুন্দর, তিনিই যোগী, তিনিই বিরাগী, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই বিষয়ী।

যে সকল শক্তির সমবায় এ সমগ্র সংসার 'বিষয়', সেই শক্তি সকলও ভগবচ্ছক্তি। সেই শক্তিই তাঁহাকে বুঝাইতে জানাইতে পারে। আমাদের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এই সকলেরই প্রভব সেই চিদ্ঘন ভগবান্। চক্ষু আমাকে এই সংসার দেখাইতেছে, কত ফাঁদে ফেলিতেছে। কত কুদৃশ্যে আকৃষ্ট হইতেছি, কত বিপন্ন হইতেছি, ইহা কি নয়নেরই দোষ? তা নয়, দোষ আমারই অজ্ঞতার। চক্ষু আমাকে মন্দ দেখাইয়াছে, কিন্তু আমি যদি উহার উৎকর্ষ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতাম, তবে কি চক্ষু তাহাতে বাধা দিতে পারিত? কখনই নয়। অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার, কি কিছুই শিক্ষা দেয় না? যদি অগ্র পশ্চাৎ নিপুণভাবে অবলোকন করা যায়, তবে অনাচার ব্যভিচারের মধ্যে জীবন সংগ্রামের উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। বিষয়ের অপরাধ নাই, দোষ আপনার। 'বিষয়' সর্ব্বকালেই সময় বা অবস্থা অনুসারে [illegible] হইতে পারে। অর্থ সাধারণ, [illegible] উহার সদ্ব্যয়দ্বারা অশেষ মঙ্গল [illegible]ন করিতে পারি এবং সকলেই [illegible]। আবার ব্যবহার ভেদে, উহাই [illegible]কের পূতিগন্ধসঙ্কুলতোরণে উপস্থিত হইবার উপায় হইতে পারে। আমার মনের সহানুভূতি ব্যতীত আমার কাছে বিষয়ের কার্য্যকারিতা নাই। আমার মন তাহাকে (বিষয়কে) যে যে ভাবে চালিত করিবে, তদনুসারেই তাহার কার্য্যকারিণী শক্তির ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। বিষয় নিরপরাধ, মুগ্ধ আমরা—অজ্ঞ আমরা, তাহার মস্তকে নিজ দোষরাশি চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। শাস্ত্র, বয়স্যাকন্যার সহিত ও নির্জ্জনবাস নিষেধ করিয়াছেন, বস্তুগতি এবং অজ্ঞতাকৃতআত্ম-দোষ, ইহার মধ্যে কোনটি প্রবল তাহা এখানেই সুস্পষ্ট।

আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই কাল, দেশ, পাত্র অনুসারে [illegible]বিধ আকারও আবশ্যক গ্রহণ করে। অবস্থাভিজ্ঞ যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন। পীড়ার প্রকৃত অবস্থাপর্য্যবেক্ষণ না করিয়া, যদি অজ্ঞ চিকিৎসক উগ্রঔষধ প্রয়োগ করেন, তবে রোগীর জীবন লইয়াই গোলযোগ ঘটে। বিষয়ের ব্যবহার না বুঝিয়া, অস্থানে প্রয়োগ করায়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর বলিয়া উঠি "বিষয়বিষ"। মোহক্রমে ভ্রমের পক্ষ সমর্থন করিয়া কষ্ট পাই, অমনি চীৎকার করিয়া বলি "বিষয় মরীচিকা।"

আমাদের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মন, বুদ্ধি সবই যদি অপরাধী হয়, তবে কি আমরা অপরাধী নহি? এই সকল ভিন্ন বস্তুতঃ আমার অন্য কিছু নাই। এগুলি ছাড়িয়া দিলে আমাদের 'আমিত্ব' আত্মশূন্য হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং এগুলিকে মন্দ বলিলে বা দোষ দিলে আমাদের অসার আত্মভিরস্কারই সার হয়। পুত্র যদি প্রকৃত পক্ষে দুর্বৃত্ত হয়, তবে সে জন্য পিতাই কি দোষী নয়? প্রজা উচ্ছৃঙ্খল, রাজভক্তি নাই, রাজশক্তি তিরস্কৃত, এসকল কি রাজার কর্ত্তব্যপরতা বুঝায়? বিষয়,

ইন্দ্রিয়, কাহাকেও আমার প্রতি অমুচিত আধিপত্য দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কি? যথার্থই তাহাদের আধিপত্য অসম্ভব, আমার অজ্ঞতারই ঐরূপ বোধ হয়। আমি অক্ষম, সর্ব্বদাই মনে করি অপরে আমার উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে।

বিষয়কে সৎভাবে গ্রহণ করিলে, উহা আমার সহায়, অযথাভাবে গ্রহণ করিলে প্রবলশত্রু। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া স্ত্রী হাহাকার, সন্ন্যাসীর কুটীরমধ্যে পাপঅগ্নির আবির্ভাব। পরমপূত গীতাশাস্ত্র এই অমূল্য সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তর্জগৎকে, বিষয়ের ব্যবহার, কর্ম্মের রহস্য, বিরাগের স্বরূপ, জ্ঞানের গরিমা বুঝাইয়াছেন। এই সংশয়িত মতের সমালোচনা করিবার জন্যই অবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত। সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য এই গীতারই সর্ব্বত্র দেখা যায়, এমন অতুল আলোচনা, অগাধ যুক্তির অবতারণা আর কোথাও একাধারে আছে কি না সন্দেহ। সেই জন্য ইহাকে শাস্ত্রের সার বলা হইয়াছে।

এখনও একটি কথা আছে, এই বিষয়ব্যবহার কোথায় শিখিব? বিষয়ের অন্তঃপুরে কে লইয়া যাইবে? বিশ্বগ্রন্থে মহেশের মহিমা আছে সত্য, কিন্তু সে গ্রন্থ কে পড়াইবে? ধরণীর নিকট ধীরতা শিক্ষা হয় বটে, কিন্তু সে ধীরতা অনুভব করিবার শক্তি নাই যে। বিশ্বব্যাপী ভগবান্ ঊর্দ্ধ অধঃ, পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বত্র, কিন্তু কে অন্ধের চক্ষু চিকিৎসা করিয়া দর্শনসামর্থ্য দান করিবে? শাস্ত্র অভয় দিতেছেন 'গুরু' আছেন। "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন" তিনি আছেন। আত্মশক্তি সংমূর্চ্ছিত হইয়াছে, তিনিই উদ্দীপিত করিয়া দিবেন। তিনি ভিন্ন আশ্রয় নাই। 'বিষয়ী' গুরুর চরণে শরণাগত হও, তুমি ও বিষয়কার্য্যে পণ্ডিত হইবে, 'বিষয়ী' হইবে। তখন তোমার বিষয় কামনার অধীর হইতে হইবে না। বিষয় আপনিই ধরা দিবে। বিষয়ীকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র গীতাশাস্ত্র বলিতেছেন।

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তি মাপ্নোতি ন কামকামী।"

কাম্যবস্তু যাহাকে কামনা করে, তিনিই তৃপ্ত, কাম্যবস্তু কামনায় যিনি অস্থির, অসুখী আত্মহারা, তাঁহার ভাগ্যে শান্তিলাভ অসম্ভব। অগাধবারিরাশি শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সেই সমুদ্রের দিকেই অগ্রসর হয়। বিষয় বারিধির দিকে, 'বিষয়ী'র দিকে, সমগ্র বিষয় অপ্রতিহত বেগে প্রধাবিত হইতেছে। সমুদ্র অসংখ্যজলরাশি গ্রহণ করিয়া বিক্ষোভপ্রাপ্ত হয় না,—বিষয়ীও অগণ্য বিষয় ভোগ করিয়াও বিচলিত হন না। বিষয় ও বিষয়ীর (আকার [illegible]) চিরন্তন অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ দর্শনের মতে "ভোগ্য [illegible] ভাব"। দর্শনের সূক্ষ্মদর্শন সফল, বিষয়ী বি[illegible] ভোগে আত্মানন্দ অনুভব করুন, আমরা "বি[illegible]র" চরণে অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক অদ্যকার বিদায় গ্রহণ করি। অবসরে 'বিষয়ী'র আর একটু নিবেদন করিব।

দীন-শ্রীকেদারনাথ ভারতী
যশোহর বেদ বিদ্যালয়।

স্বপ্ন কি অতিদৃষ্টি ?

দেখিলাম দুই পার্শ্বে অভ্রান্ত পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে কূপসম অতিগভীর অন্ধকারময় সংকীর্ণ উপত্যকা নদীগর্ভসদৃশ। তলদেশে অনেক প্রাণীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছিল, সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তখন নিকটস্থ নির্ঝর সলিলে চক্ষু প্রক্ষালন করিলাম, সেই নির্ঝরণীর নাম প্রজ্ঞা। তখন চক্ষুর অপূর্ব্ব শক্তি হইল। সে নিজের আলোকে নিজে দেখিতে লাগিল। দূর নিকট রহিল না। দেখিতে পাইলাম সেই উপত্যকা, অসীম নিম্নে কালনদী প্রবাহিতা; তত্তীরে অসংখ্য প্রাণী সুখ ক্রয় করিবার জন্য স্বর্ণান্বেষণে ব্যাপৃত। আহা! কালনদীর বন্যা হইতে রক্ষার জন্য তাহারা কতই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। কিন্তু অল্পদৃষ্টিগণ জানিতেছে না, যে অদূরে যে পর্ব্বতপ্রমাণ বন্যা-তরঙ্গ আসিতেছে তাহা সমস্তই ধৌত করিয়া লইয়া যাইবে। আহা! কৃপণগণ যাহা স্বর্ণ বলিয়া অন্ধকারে সঞ্চয় করিতেছে তাহা চাক্‌চিক্‌শালিনী মৃত্তিকা মাত্র। কি ভীষণ দৃশ্য! কি মর্ম্মস্পৃক্ আর্ত্তনাদ!! যেখানে দাড়াইয়া আছি, তাহা হইতে দূরে বন্যাতরঙ্গ-নিমগ্ন প্রাণীগণের কি শোচনীয়া দুর্দ্দশা! কালবারির সংস্পর্শে তাহাদের সঞ্চিত মৃত্তিকার পরিণত হইতে দেখিয়া, জীর্ণ আবসথ ভগ্ন হইতে দেখিয়া, কি ঘোর হাহাকার করিতেছে!! [illegible] দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিকটে দেখিতে লাগিলাম। একজন পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ লইল। কিন্তু [illegible]কর্দ্দমে এমনি আবৃত যে ঠিক চিনিতে পারি না। তাহাকেই দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার শীর্ণ শরীর কিন্তু আশা অতি বৃহৎ। নিজ চেষ্টায় অন্নই আহরণ করিতেছে, কাল-বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষার উপায় করিবে বলিয়া মধুর স্বরে নিজগুণগান করিয়া পরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। কোথাও নিকার জাতীয় কুকুরের দংশনে স্বর্ণ লাভ করিয়া সুখের কল্পনায় উৎফুল্ল হইতেছে। তাহার সেই গান তাহার নিজেকে খুব মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু অপরে কেহ উপসনা করিতেছে, কেহ গানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কিছু দিতেছে, আবার কেহ দূর ২ করিতেছে। সে গান শুনিয়া গায়ককে ঠিক চিনিলাম। সে সচ্চিদানন্দ। তখন দুঃখ হইল। বলিলাম ওহে ভাই সচ্চিদানন্দ! তুমি কিরূপে এই কূপে পতিত হইয়া জীবনের ধ্রুবতারা হারাইলে। দেখিতেছ না অদূরে কালবন্যা তরঙ্গ আসিতেছে, তোমার ওই সঞ্চিত স্বর্ণ মিথ্যা তাহা কি বুঝিতেছ না। কেন ঐ ধনাশা ভারে ক্লিষ্ট হইয়া কাল স্রোতের অন্ধকারময় তলে নিমগ্ন হইবে? কাল তরঙ্গে আশা ভগ্ন হইলে কি দুঃখই না পাইবে? তুমি মোহ কর্দ্দমে আবৃত হইলে কিরূপে? আহা কিরূপে তোমার এই ভীষণ দুর্দ্দশা হইল! পূর্ব্বে তুমি যে সব আচরণকে হেয় জ্ঞান করিতে, এখন সেই আচরণে ঐ মিথ্যা স্বর্ণ সঞ্চয় করিতেছ? ইহাতে তাহার যেন ঈষৎ প্রবোধ হইল। সে দেখাইল। ঐ দেখ আমার অবতরণের সোপান। দেখিলাম সুন্দর সোপান, কিন্তু তাহা মোহকর্দ্দমে অতীব পিচ্ছিল। অবতরণ করা একরূপ বিনা প্রযত্নেই হয়, কিন্তু সেই পিচ্ছিলে উত্তরণ করা অতীব দুরূহ। সেই সোপানের প্রথমটিতে লেখা আছে,—পরিগ্রহ পরে, ক্রমশঃ গৃহ, সুখ, সঙ্গলিপ্সা, ক্ষুদ্র পুরুষার্থ, অবিরতি ইত্যাদি। বলিলাম ভ্রাতঃ! কি তুমি এই সাধন-প্রাপ্তারের উপকণ্ঠে ছিলে? কেন এত দূর নিম্নে পতিত হইলে? দেখ আমি বিশেষ উচ্চে না উঠিলেও, তুমি নিম্নাভিমুখে গমন করাতেই এতদূর। এস একত্রে পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করি, তথায় শান্তিরাজ্য, কালবন্যা তথায় কখনও যাইতে পারে না। ধনাশা নামক ঐ মিথ্যাস্বর্ণভার পৃষ্ঠ হইতে নামাও, তাহা হইলে লঘুশরীরে এই

পিচ্ছিল সোপান অক্লেশে আরোহণ করিতে পারিবে। ঐ দেখ সন্তোষশৃঙ্গ, উহাতে অনুত্তম সুখ নামক ফল জন্মে, তাহার স্বাদ অনির্ব্বচনীয় মধুর। দেখ তাহার কিঞ্চিৎ ত্বক্ মাত্র আমি পাইয়াছি। এই লও তোমাকে ফেলিয়াদিতেছি—এই বলিয়া আমি সেই অনুত্তম সুখ ফলের কিঞ্চিৎ ত্বক্ ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু তাহা নীচের আকাঙ্ক্ষা গাঁতে নষ্ট হইয়া গেল। সচ্চিদানন্দ না পাইয়া সাক্ষেপে বলিল, এ সংসার কূপে সন্তোষ ফল কোথায়? আবার বলিল আমাদের এখানেও সুন্দর ফল জন্মে এই দেখ—দেখিলাম তাহা কিম্পাক ফল—বলিলাম তুমি কি সব বিস্মৃত হইয়াছ? ঐ কিম্পাকফলকে সন্তোষবৃক্ষ ফলের সহিত তুলনা করিলে? মোহ মার্জ্জিত কর, উঠিয়া আইস। সন্তোষ ফল খাইলে অতি অল্পমাত্র বাহ্যোপকরণের প্রয়োজন হয়। তখন সুখে অভ্যাস বৈরাগ্য যষ্টি লইয়া ভার শূন্য হইয়া এই সাধনপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া শান্তি রাজ্যে যাওয়া যায়। শীঘ্র এস, আমি দেখিতেছি ঐ কালবন্যা সমাগত প্রায়। এই লও রজ্জু, এই বলিয়া আমি রজ্জু খুজিতে লাগিলাম, দেখিলাম একটা পত্র রজ্জুরূপ ধারণ করিল, তাহার পংক্তি সকল রজ্জুর সূত্র স্বরূপ হইল। তাহা লইয়া বলিলাম—হে সচ্চিদানন্দ! ঐ শুন তোমাকে কি বলিয়া উপহাস করিতেছে। একজন বলিতে ছিল, বাবাজি! বড় পরার্থ-পরায়ণ, অর্থাৎ পরের যে অর্থ বা ধন বাবাজি কেবল তৎপরায়ণ। আর একজন বলিতে ছিল,—বাবাজির নিঃস্বার্থ দান, অর্থাৎ দানের ভিতর নিজের অর্থ কিছুই নাই সবই পরের ধন। আর একজন বলিতে ছিল, বাবাজি যে দেশশুদ্ধ শঠলম্পটের আশ্রয়স্থল দেখিতেছি। ভ্রাতঃ! উহা শুনিয়াও কি নির্ব্বেদ হয় না? এস এই লও রজ্জু———এখানে ধাঁধাঁ ভাঙ্গিয়া গেল।

আহা এমন ধাঁধাঁ ভাঙ্গিল! শেষটা কি হইল জানিতে পারিলাম না! লোকের স্বভাব হীনআচরণ করিয়া তাহাকেই ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া। তাহাতে নিজেকে আরও অধঃপতিত করে এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান হারায়। সদাচরণ না করিতে পারিলেও অন্ততঃ যদি লোকে—ইহা আমার কর্ত্তব্য নহে অশক্তিবশতই এইরূপ আচরণ করিতেছি, এই ভাবে হীনাচরণ করে, তবে একদিন শুধরাইতে পারে। যাহ'ক্ কেহ কি আমায় ঐ অতিদৃষ্টির শেষটা জানাইতে পারে? বোধ হয় সচ্চিদানন্দই উহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক বার বার পাঠ করিলে শেষটা ঠিক করিয়া বলিতে পারে।

যোগিশঙ্কর গীতিঃ।

রাজসে যোগিহৃদি জ্ঞানসরোরুহদলঃ
নিবাতস্থিত-দীপকইবাচলঃ।
শঙ্কর! ধৃত যোগি শরীর!
জয় পরমেশ হর! ॥ ১॥

দহসি নয়নজে পাবকে কামশলভং
বন্দে দেবং ত্যাগিজনসুলভং।
শঙ্কর! ধৃত যোগি শরীর!
জয় পরমেশ হর! ॥ ২ ॥

ছলয়সি তাপসী গিরিজাং বটুকবেশঃ
তদ্গতহৃদয়াং ত্বং পরমেশঃ।
শঙ্কর.........॥ ৩ ॥

[illegible]য়া যাসি সমাধৌপরমে
প্রজ্ঞ [illegible]সি ভুবনোপরমে।
শঙ্কর.........

ভজে পরহিত হেতু [illegible]লকূটং
ভুবনতত্বং স্বযোব স্ফুটং।
শঙ্কর.........॥৫

গৃহাণ সর্ব্বাত্মনা শরণমুপগতং
সাংনিবেদিতং ত্বয়ি প্রপন্নং।
শঙ্কর......॥৬

ইয়ং শিবাধীনজীবিত হরিহর কৃতিঃ
গেয়া শুভদা শঙ্কর গীতিঃ।
লীলাধৃত রূপাক্ষপ!
জয় পরমেশ হর! ॥ ৭

শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা

৮ম বর্ষ, ৮ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৮ সাল, ১৮২৩ শকাব্দা

সাম্যে মুক্তি।

-•:০:•-

সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অতি অপরিচিত অনাদি অনন্ত অব্যক্ত অপূর্ব্ব দেশ হইতে যে দিন জগতে আসিলাম, তন্মুহূর্ত্তে ভাবুকের মনে ভাবের, কবির চিত্তে কাব্যের, সংসারীর হৃদয়ে সংসারের, আর ভক্তের অন্তরে ভক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষারূপ বীজ বপিত হইল। একদিন এই বীজ উপ্ত হইয়া জীবনমহা-শ্মশানে মহামহীরুহ কল্পবৃক্ষের সৃষ্টি করিবে তাহা কেহ জানিত না! জীবনের স্রোত দ্রুত মন্দ গতিতে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল, কালের সঙ্গে হৃদয়নিহিত বীজটিও উপ্ত হইবার আয়োজন হইল। জীবের গুণ অথবা স্বভাব এই বীজ;—ইহারই অপর নাম জীবাত্মাসম্পর্কীয়ধর্ম্ম। অগ্নির উত্তাপ বায়ুর প্রবাহ, জলের শৈত্য বা আর্দ্রতা, যেমন ইহাদের স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ, মানবেরও তদ্রূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-স্বাভাবিক তাপবিহীন বহ্নি, প্রবাহ শূন্য পবনের ন্যায়, ধর্ম্মাসনচ্যুতআত্মা-মানব জড় বা মৃত। সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষা করাই জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জীবের আত্মার উন্নতি অবনতি, বন্ধনমুক্তি, সকলই এই একমাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।"
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যত্তু গচ্ছতি॥

নশ্বর শরীরের সহিত সকলই ধ্বংশ পায়, কেবল ধর্ম্মই সত্য সনাতন। যে ধর্ম্মবলে জীব পরমাগতি লাভে সমর্থ, সে ধর্ম্ম আবার সাম্যসংশ্লিষ্ট; সুতরাং সাম্যেই মানবের পরম মুক্তি।

সাম্য বলিতে পাঠক যেন সহসা পাশ্চাত্য সাম্যবাদকে আধুনিক রুচিগত ভাবে সম্মুখে দাঁড় করাইবেন না! আধুনিক রুচি ছাড়িয়া দিলে, বাস্তবিক আমাদের সাম্য ও, পাশ্চাত্য-

সাম্যবাদের একার্থবোধক। 'সম' এই শব্দ হইতেই সাম্যের উৎপত্তি। 'সম' পদের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে ;—এক, সহ এবং প্রবৃত্তি। এক বলিলে একত্ব বুঝায়। জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম এক—একত্র। সারাটি জীবন সংসার সংগ্রামে পরস্পরের একতায় জীবনের (যদি পারি) কার্য্যোদ্ধার করিয়া আবার চলিলাম একা! সুতরাং এক হইতে আসিলাম, আবার চলিলাম এক, মাঝে কয়টা রহিলাম একত্র। এই একত্রই একত্ব, অর্থাৎ একতা। একতার বল অসামান্য,—একতার বলে তৃণগুচ্ছ মত্তকরি বাঁধিয়া রাখে, একতার বলে এই বিপুলবপু জগৎ সংসারটা চলিয়া আসিতেছে ; বাল্য-কালে শিশু পাঠের পৃষ্ঠায় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল, আজ তাহার শক্তি অনে-কটা অনুভূত হইয়াছে। 'এক' কথাটা বড়ই গুরুতর। তুমি আমি এক—বলিতে পারি বটে, কিন্তু বিষয়টা ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়, যখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে জগৎ সংসার ভুলিয়া শুধু বলিবেন 'এক' ; তখন বুঝিব মুক্তি। তখন তুমি আর আমি এক।

সহ,—সহবাস। ধর্ম্ম সাধনের প্রথম ও প্রকৃষ্ট উপায় সাধু সহবাস, সাধু ও শাস্ত্র সংশ্রব। সহবাসের গুণ অনেক ;—নীচের সহবাসে নীচ, সমানে সমান এবং বিশিষ্টের সংসর্গে জীব বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, ইহা হিতোপদেশে শিখিয়াছি। এক দিন ছিলাম তাঁর সহবাসে, জগতে আসিয়া দিন কাটাইলাম জীবের সহবাসে, আবার যে দিন তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারিব, সেই দিন জীবনের সহজ মুক্তি।

প্রবৃত্তি,—ইহাই সম ও দম। সম মুক্তি-সোপান, দম তাহার সোপান। যে প্রবৃত্তি লইয়া জগতে আসিয়াছি, তাহার দমন করিতে পারি ভালই, অন্ততঃ সম রাখিতেই হইবে ; তা'পর যে দিন সকল সংস্কার লইয়া প্রবৃত্তি-ময়ে যুক্ত হইতে পারিব, সেই দিন জীবনের নিবৃত্তি।

জাহ্নবী জলাঙ্গী সঙ্গমে পূতভটে দাঁড়াইয়া প্রেমাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে দিন জগৎ সংসারকে প্রেম-প্লাবনে ভাসাইয়া শিক্ষা দিলেন—

"নামে রুচি, জীবে দয়া"—

সেই দিন সাম্যবাদ জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রকম্পিত হইল ; প্রতীচ্য ক্ষেত্রে ধ্বনি মিশিল।

"Love your neighbour !"

জীবে দয়ার নাম সাম্য। চণ্ডালে ব্রাহ্মণে এক হইবে, কুক্কুরে মনুষ্যে এক হইবে, ইহা সংসারবাসীর পক্ষে প্রকৃত সাম্যবাদ নহে। দৈত্যপুরোহিতগৃহে বসিয়া ভক্তাবতার শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

"অসার সংসার বিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধন মচ্যুতস্য।"

এই সমত্বই তোমার সাম্য। ভগবান কহিয়াছেন,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য,—পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থে তোমাকে সমদর্শী হইতে হইবে, কিন্তু সকলে সমানত্ব ঘটাইবার আবশ্যকতা

নাই। জীবনের মার্গে অগ্রসর হইতে আমি ধর্মের প্রসার করিয়া যাইব, পরস্পর প্রতিকূল ধর্ম্মাবলম্বীকে বাহ্যে একত্র করিতে যাইয়া, ঘাত প্রতিঘাতের উৎপাদন অনর্থক। আমিত্বে লীন হইলে পার্থিব বস্তু টানিয়া এক করিতে হয় না, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ জনিত তেজোবলে নিজ আত্মার নিকট সমস্তই সাম্যে সংলগ্ন হইয়া যায়। ভগবান তজ্জন্যই বলিয়াছেন,—

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"
"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥"

এই সাম্যের পথ বহিয়া যুগযুগ তপস্যার ফলে যে দিন মুক্তপুরুষ হইবে, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণে, কুক্কুর মনুষ্যে, সাম্য সংঘটন সে দিন আপনা হইতেই হইবে;—হে নির্ব্বিকার নিবৃত্ত! সে সাম্য অচ্যুতের আরাধনা নহে, সে সাম্যে অচ্যুত স্বয়ং সমতা-প্রাপ্ত [illegible] হৃদয়ে সন্দেহের লেশ [illegible] থাকিবে, তত দিন মুক্তির [illegible] করা বৃথা। নদী পর্ব্বত হই[illegible] নির্গত হইয়াই যদি সমস্ত বাধাবি[illegible] করিয়া সরল পথে চলিতে থাকে, সাগরে বড়ই শীঘ্র মিশিয়া যায়। আর যদি উচুনীচু বহিয়া, বাধাবিঘ্নে প্রতিহত হইতে হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, তবে সাগরে পড়িতে তাহার অনেক সময় লাগে। মানুষের মনও একটি মাত্র; জীবের পরমায়ুও অকিঞ্চিৎকর। তোমার ভাগ্য ফলে জগতে প্রথম আসিয়াই যে পথে দাঁড়াইয়াছ সেই পথ বাহিয়া চলিলেই ত হয়? অদ্য হিন্দুধর্ম্মে সুখের কিছু স্বাদ বুঝিলে না, কল্য ঈশাই শাস্ত্রে কোন সত্য পাইলে না, পরশ্ব কোরাণে মুক্তি তত্ত্বের নির্দ্দেশ হইল না এরূপে জীবনের কয়টা দিবস বিবিধ 'খেয়ালে' কাটাইয়া দিলে, সাধনার সময় পাইবে কোথায়? প্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"অবোধ মন,
অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মেশামেশি,
ওরে, একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করো না দ্বেষাদ্বেষী!"

মহিম্নে ধ্বনিত হইয়াছিল—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

নানাস্থানে উৎপন্ন নদী সকল, নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই অনাদি অনন্ত এক সাগরেই মিশিয়া যায়। সকলেরই উৎপত্তি বিভিন্ন আধারে, কিন্তু পরিণাম এক; মূল মন্ত্রও এক। কিন্তু কয়জনে সৃষ্টির এই অপূর্ব্ব সমতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? ভবের ভাব এই সমত্ব জ্ঞান, যে দিন হৃদয়ে উদয় হয়, 'সব দিনের এক দিন সে!'

সংসারে আসিয়াই প্রথমে জীব মুক্তির আয়োজন করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাধনা ত তাহার নিত্য সহচর। সাধনায় সাম্য রক্ষা করিলেই নিদান পর্য্যন্ত মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। কথাটা ভগবান পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন,—

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥"

এই প্রবৃত্তিই যখন উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করে, তখনই জীব "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" দেখিতে পান।

আমাদের জীবন অভ্যাসের সমষ্টি। অভ্যাসের অপর সংজ্ঞা যোগ। স্বভাব অভ্যাসের পরিণাম। শৈশব হইতে উশৃঙ্খল জীবন পরিচালনে অভ্যস্ত ব্যক্তির স্বভাব অতীব উশৃঙ্খল হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আবার প্রকৃত সাধননিরত যোগযুক্তের আত্মা যে স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন, তাহা বিশুদ্ধ ও সংযত। আত্মার উদ্দেশ্য সৎস্বভাব প্রাপ্তি, ইন্দ্রিয় তাহার বিঘ্ন এবং সমত্ব তাহার উপায়। ভগবান ধনঞ্জয়কে এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন ;—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে।"

আবার ; Trinity—ত্রিনীতি অর্থাৎ প্রণব সাম্যবাদের মূল মন্ত্র। ইহাই বীজ। শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, এই ত্রিমূর্ত্তি ত্রিনীতি। ত্রিনীতি ভজনায় মুক্তি, ইহাই সাম্যে মুক্তি ;—সেই ত্রিনীতিই ওঁ তৎসৎ। সাম্যবাদের সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আর্য্যঋষিগণ যে মহামন্ত্র চয়ন করিয়াছিলেন তাহারই উপর ব্রহ্মাণ্ডের (ধর্ম্মজগতের) মেরু সংস্থাপিত ;—তজ্জন্যই জগতে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন। হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেক উপদেশের প্রত্যেক অক্ষরে নির্ম্মল সাম্যবাদ, বিশুদ্ধ স্বার্থত্যাগ, কায়মনঃপ্রাণে পরহিত সাধন এবং সত্য সনাতন নিষ্কাম পরধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, আমরা নিতান্ত স্থূল বুদ্ধি, তাই—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বংনিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃস পন্থাঃ—"

এই অমূল্য মহামন্ত্র নির্দ্দেশ স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা মৃগতৃষ্ণিকার আশায় বৃথা তৎপর। তত্ত্বজ্ঞানী গাহিয়াছেন—

জগমে আয়েকে সম আচরণ, সবে শ্যাম
যায় মিল্।
জাঁতে ন ভই' পাপ পরসন, আনন্দে মগন
রহে দিল্!!"

আমরা বুঝিলাম না, তাই অবনতির অতল গর্ত্তে পড়িয়া মনুষ্যত্ব লোপ করিতে বসিয়াছি। কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে— 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগকে পাপস্পর্শ করিবে না, এবং আমরা সমত্ব-যোগাশ্রয় করিয়া পরম অক্ষয়ানন্দ ভোগে সমর্থ হইব ?

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তম খণ্ড

অথৈনামাগ্নেয়েন স্থালী[illegible]ন যাজয়তি ।১

অনন্তর ঐ নববিবাহিতাবধুকে স্থালী-পাক দ্বারা যাজন করাইবে। 'অথ' শব্দের অর্থ এখানে আনন্তর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনুষ্ঠিত হইলে পরে, এই স্থালীপাকযজ্ঞ বধূ

দ্বারা অনুষ্ঠান করাইবে। পূর্ব্বে অর্থাৎ ষষ্ঠখণ্ডের শেষে ধ্রুব ও অরুন্ধতী দর্শন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সায়ংকালে নক্ষত্রোদয় হইলে অরুন্ধতীদর্শন করিতে হয়, তদনন্তর অর্থাৎ রাত্রিতে স্থালীপাক করা উচিত, "অথ" শব্দ এই কথাই বুঝাইতেছে। হরদত্ত বলেন,—"তস্যামেব রাত্র্যাং স্থালী পাকো ভবতি, অথ ইতি বচনাৎ"। এই স্থালীপাক কার্য্যের দেবতা অগ্নি। "আগ্নেয়" শব্দ স্থালীপাকের বিশেষণ। স্থালীপাক কিরূপ? না' আগ্নেয়। যে স্থালীপাকের দেবতা অগ্নি, তাহাই আগ্নেয় স্থালীপাক। এই স্থালীপাক বধূকার্য্য। বর ও বধূর সাহচর্য্য এখানে অভিপ্রায় নহে। যাজয়তি এই নিচ্ প্রয়োগের দ্বারা বরের ঐ কার্য্যে ঋত্বিগ্‌ভাবে প্রযোজকত্ব বলা হইতেছে। হরদত্ত বলিয়াছেন, "বরস্যাত্ত্বিজ্যমেব"। এক্ষণে অবগত হওয়া গেল এই স্থালীপাক বধূর কর্ত্তব্য। বর ইহার ঋত্বিক মাত্র; অতএব এই স্থালীপাকের ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্য ও দক্ষিণা বধূধন হইতেই দিতে হইবে। টীকাকার মহাশয়েরা ও তাৎপর্য্যতঃ [illegible] কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি স্থালীপাকা[illegible] [illegible]হিকে তণ্ডুলে পরিণত করা [illegible] বিধায়, তণ্ডুল নিষ্পত্তির [illegible] অবঘাত (উদূখল মুষল সংযোগে [illegible]ঘাত করতঃ কুট্টন) কার্য্য বি[illegible]চিত হইতেছে। সূত্র যথা,—

পত্ন্যবহন্তি।২

পত্নী অর্থাৎ যিনি স্থালী পাক করিবেন সেই নববধূ অবঘাত কার্য্য করিবেন। এইটী অবঘাত কার্য্যে কর্ত্তৃনিয়ম। উদূখল মুষলাদির সাহায্যে ব্রীহিকে তণ্ডুলে পরিণত করিতে সকলের সামর্থ্য আছে। বধূও পারেন, বরও পারেন, অথবা অন্য যে কেহও এই কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যিনিই ঐ কার্য্য করুন, তাহাতে তণ্ডুলের কোনও হানি হইতে পারে না। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াই নিরস্ত নহেন, অনেক স্থলে আদেশ করিয়া থাকেন। বধূ অবঘাত সম্পন্ন করিলে, যদি তণ্ডুল মন্দও হয় অর্থাৎ কণতুষও অপরিষ্কৃত হয়, তাহাও গ্রাহ্য; তবুও অপরের দ্বারা সুপরিষ্কৃত তণ্ডুলনিষ্পাদন অন্যায়, ইহা শাস্ত্রকার মহর্ষির আদেশ। মীমাংসাচার্য্যগণ এখানে নিয়মাদৃষ্ট কল্পনা করেন। যে কার্য্য নানাপ্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তদৃশ কার্য্যে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে বলাই সে কার্য্যের "নিয়মকরা"। নিয়মস্থলে, আদেশানুরূপ কার্য্য উপেক্ষা করিয়া, অন্য প্রকারে সম্পাদন করিলে, ঐ কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে না, ইহাই নিয়মাদৃষ্ট স্বীকারের মর্ম্ম। "পত্নী অবঘাত করিবেন" এই নিয়মে কার্য্য করিলে তৎকার্য্যজনিত

সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ! বহুদিন আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র প্রকাশ করিতে পারি নাই, বাধাবিঘ্ন বিপৎপাত অতিক্রম করিতে না পারিলে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার ক্রমশঃ কমাইতে হয়, কাজেই আপনাদের প্রতি আত্মকর্ত্তব্যের গণ্ডীও এতদিন সঙ্কীর্ণ রাখিতে হইয়াছিল, অতঃপর আশা করি আপনাদিগকে যথানিয়মে গৃহ্যকর্ম্মেররহস্য যথাসাধ্য জানাইতে পারিব

দীন লেখক।

অদৃষ্টই নিয়মাদৃষ্ট। নিয়ম ত্যাগ করিলে সুতরাংই ক্ষতি। নিয়ম রক্ষার জন্য নববধূ স্বয়ংই অবহনন কার্য্য করিবেন, কদাচ অন্য দ্বারা করাইবেন না।

উহার পর যাহা কর্ত্তব্য, সূত্রে মহর্ষি তাহা বলিতেছেন।

শ্রপয়িত্বভিঘার্য্য প্রাচীনমুদীচীনং বা উদ্বাস্য প্রতিষ্ঠিতমভিঘার্য্য অগ্নে-রূপ সমাধানাদাজ্যভাগান্তেহস্বা-রন্ধায়াং স্থালীপাকাজ্জুহোতি।৩

শ্রপণ (উষ্ণকরণ অর্থাৎ সিদ্ধ করা) করিয়া, অভিঘারণ (ঘৃত প্রক্ষেপ) করিয়া, পূর্ব্বভাগে অথবা উত্তরভাগে নামাইয়া, অপর দ্বারা অগ্নিপ্রতিষ্ঠাপন পূর্ব্বক অভিঘারণ করিয়া, অগ্নির উপসমাধান (প্রজ্জ্বলন বা সন্দীপ্তীকরণ) হইতে আজ্যভাগ নামক হোম পর্য্যন্ত কার্য্য (শ্রৌতসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে) বধূ সম্পাদন করিলে, স্থালীপাক হইতে হোম করিবে। স্থালী শব্দের অর্থ বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, স্থালী এখানকার পাকপাত্র। স্থালীতে ব্রীহিতণ্ডুল নিষ্পন্ন অন্নপাক করিয়া তদ্দ্বারা হোম করাই এখানকার কার্য্য। দেশে চরু বাঁধিয়া হোম করা অপ্রচলিত নহে, ইহা বুঝিতেও সুতরাং বিশেষ কষ্ট না হইবার কথা।

সকৃদুপস্তরণাভিঘারণে দ্বিরবদানং।৪

উপস্তরণ ও অভিঘারণ কার্য্য এক একবার করা উচিত, কিন্তু অবদান-কার্য্য দুইটী। যাগাদিতে প্রতিপাদিত ও প্রদর্শিত পৌরো-ডাশিক (পুরোডাশ নামক যজ্ঞীয় পিষ্টক-সম্বন্ধে) অবদান কল্প এখানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। শ্রৌতসূত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য। গৃহ্য-কর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক ও অবকাশ নাই। যথাস্থানে ঐ সকল বিষয় ক্রমশঃ হিন্দু-পত্রিকার পাঠকমহোদয়েরা প্রাপ্ত হইবেন। সুদর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন, এই সকৃৎ উপস্তরণ হোমদর্ব্বী (হোমসাধন হাতা) দ্বারা অথবা অন্য দর্ব্বি দ্বারা, কিম্বা স্রুব (ইহা স্রুব-নামেই পরিচিত, এই যজ্ঞোপকরণটী বোধ হয় উপনয়নাদিতে সকলেই দর্শন করিয়া থাকেন) দ্বারাও করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সূত্রে কিছু বিশেষ বলা না থাকায়, সম্ভব ও সুবিধা অনুসারে কার্য্য করিবার পক্ষই প্রকারান্তরে সমর্থিত হইয়াছে।

অগ্নির্দেবতা স্বাহাকারপ্রদানঃ।৫

এই স্থালীপাক হোমের দেবতা অগ্নি ও ইহার প্রদান মন্ত্র 'স্বাহা'কার। স্পষ্টার্থে-সংশয় বিনাশ জন্য বলিতেছেন, স্থালীপাকের উভয় (পূর্ব্ব ও উত্তর) হোমই, অগ্নিদেবতা ও স্বাহাকার মন্ত্রে করিতে হইবে। 'স্বাহা-কার' শব্দের সহিত দেবতাসম্বন্ধ করিতে হইলে, দেবতাবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া [illegible]গ করিতে হয়, যথা,—অগ্নয়ে স্বাহা বায়বে [illegible] ইত্যাদি। হোম, প্রদান ও প্রক্ষেপ শব্দ [illegible] প্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব প্রদান [illegible] প্রক্ষেপ করিবার সময় 'স্বাহা' যুক্ত মন্ত্র করিতে হইবে।

অপিবা সকৃদুপহত্য জুহুয়াৎ।৬

অথবা একবার গ্রহণ করিয়াই হোম

করিবে। এপক্ষে উপস্তরণ ও অভিঘারণের দরকার নাই। যে দর্ব্বী দ্বারা হোম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই একবার স্থালীপাক হইতে গ্রহণ করিয়া হোম করা কর্ত্তব্য, বৃত্তিকার মহোদয়ের ইহাই অভিপ্রায়।

অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃদ্দ্বিতীয়ঃ ।৭

দ্বিতীয় হোমে স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নিই দেবতা। যজমানের ইষ্টসম্পাদন করেন বলিয়া অগ্নিরই স্বিষ্টকৃৎ এই নামে অভিহিত হইতে হইয়াছে। স্বিষ্টকৃত্ব অগ্নির গুণ।

প্রধান হোমের অবশিষ্ট যে কিছু হোমার্থ দ্রব্য থাকে, সেই শেষ দ্বারাই স্বিষ্টকৃৎ হোম করা হইয়া থাকে। যাগযজ্ঞাদিতেও বহুস্থলে স্বিষ্টকৃতের এইরূপ নিয়ম। এই স্বিষ্টকৃৎ হোমকে "দ্বিতীয়" বলায় প্রথমোক্ত হোমের "স্বাহাকার প্রদান" ইত্যাদি ধর্ম্ম স্বিষ্টকৃৎ হোমেও প্রতিপালন করিতে হইবে। সমধর্ম্মী না হইলে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি নাম নির্দ্দেশ অযৌক্তিক হইয়া উঠে। স্থালীপাক শেষ হইতে এই হোম করা উচিত, সুদর্শনাচার্য্যও এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্বিষ্টকৃৎকে কেহ কেহ স্বিষ্টকৃৎ বলিয়া থাকেন।

সকৃদুপস্তরণাবদানে দ্বিরভিঘারণম্ ।৮

উপস্তরণ ও অবদান এক একবার, অভিঘারণ দুইটী। পূর্ব্বে ছিল অবদান দুইটী অভিঘারণ এক, এখানে অবদান একটী অভিঘারণ দুই। এখানে পৌরোডাশিক স্বিষ্টকৃতের অবদানকল্প প্রদর্শিত হইল। শ্রৌতসূত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য।

মধ্যাৎ পূর্ব্বস্যাবদানং ।৯

হবির (হোমদ্রব্যের) মধ্য হইতে পূর্ব্বদৈবত অবদান করিতে হইবে। ইহা অভিঘারতপক্ষে জানিতে হইবে বলিয়া, সুদর্শন ও হরদত্ত বলিয়াছেন। মধ্য হইতে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র অবদান করিতে হইবে। চতুরবত্ত-(চারি অবদান করা হইয়াছে যাহার, সে চতুরবত্ত) পক্ষীয় উপস্তরণাদি এখানে প্রবর্ত্তিত হইবে না, এইরূপ অভিপ্রায় সুদর্শনাচার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্যে হোমঃ ।১০

অগ্নির মধ্যে হোম করিতে হইবে। হোম শব্দের এখানে অর্থ প্রক্ষেপ। এখানেও পৌরোডাশিক হোমদেশ (যেখানে হোম করিতে হইবে সেই স্থানকে দেশ বলা হইতেছে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পৌরোডাশিক কাণ্ডের অনুসরণ এখানে আবশ্যক।

উত্তরার্দ্ধাদুত্তরস্য ।১১

হবির উত্তরার্দ্ধ হইতে উত্তর অর্থাৎ স্বিষ্টকৃৎ দেবতার জন্য অবদান করিতে হইবে।

উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে হোম ।১২

সেই স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নির উত্তরার্দ্ধপূর্ব্বার্দ্ধে হোম করিতে হইবে। এখানেও পৌরোডাশিক স্বিষ্টকৃতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

লেপয়োঃ প্রস্তারবৎ তুষ্ণীমক্তা অগ্নৌ প্রহরতি ।১৩

যে বর্হিতে হবি ও আজ্য (ঘৃত) স্থাপিত, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া, আজ্য ও অন্ন (এখানকার হবি) এতদুভয়ের যে লেপ,

তদ্দ্বারা প্রস্তরবৎ তুষ্ণীম্ভাবে অঞ্জন করিয়া প্রস্তরের (সম্মার্জ্জনার্থ কুশমুষ্টির নাম প্রস্তর, পাথর উহার অর্থ নহে; মীমাংসা শাস্ত্রে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তর প্রহরণ প্রতিপত্তিকর্ম্ম। মীমাংসাশাস্ত্রের যে কোনও গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) ন্যায় তুষ্ণীম্ভাবেই অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। "লেপ" অর্থ দর্ব্বীদ্বয়ে যাহা লাগিয়াছিল তাহা। বর্হি-(তৃণবিশেষ, যাহা পাত্রস্থাপনের জন্য আবশ্যক হয়।) প্রহরণ ইত্যাদি সংস্রাবান্ত কর্ম্ম সকল শ্রৌত বিধানের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাবে করিতে হইবে, অর্থাৎ ইহাতে মন্ত্রের কোনও আবশ্যক নাই। অগ্নির অন্য দিকে বর্হি-স্তরণ ও তাহাতে হবিঃস্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ উপদেশ হরদত্তের নিকট পাওয়া যায়, অবশ্য পূর্ব্বস্থাপিত বর্হি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে পর ইহা কর্ত্তব্য।

সিদ্ধমুত্তরং পরিষেচনম্ ।১৪

উত্তর কর্ম্ম জয়াদিহোম যেরূপ সিদ্ধ আছে, অর্থাৎ শ্রৌতসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিতে হইবে। পরি-ষেচনান্তকর্ম্ম করিয়া তৎপরে ঐরূপ কর্ত্তব্য। উপহোম সকলের পরে বর্হির অনুপ্রহরণ করিতে হইবে, ইহা হরদত্তের মত। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, প্রধান হোমের পরবর্ত্তি-কার্য্য সমূহের মধ্যে, প্রাপ্ত পরিষেচনই সিদ্ধ অন্য সকল অসিদ্ধ। এই মতে উপহোম-গুলির লোপই হইয়া যায়। অনুষ্ঠান অস্মদ্দেশে বিরল; যেখানে প্রচলিত আছে, অনুসন্ধিৎসু তথায়ই কোন পক্ষ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইবেন।

তেন সর্পিষ্মতা ব্রাহ্মণং ভোজয়েৎ ।১৫

সেই হবির অবশিষ্টভাগে বহুল পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে। দক্ষিণভাগে দর্ভোপরি উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভোজন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। সর্পিষ্মত্ শব্দের মতুপ্ প্রত্যয় অতিশয়ার্থ। শব্দতত্ত্ববিৎ বলেন, ভূম-নিন্দা-প্রশংসাসু নিত্যযোগে হতিশায়নে। সংসর্গে হস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ। এই অতিশয় ঘৃতসম্মিশ্রণে শাস্ত্রীয়সংস্কারযুক্ত-ঘৃতের আবশ্যকতা, বা মন্ত্রের অপেক্ষা নাই। লৌকিক ঘৃত মিশাইয়া দিলেই হইবে।

যোঽস্যাপচিতস্তস্মা ঋষভং দদাতি ।১৬

বরের যে পূজ্য, তাহাকে বধূ একটী বৃষভ স্থালীপাকের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবেন। এখানে "অস্য" এই পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ থাকায় বরের পূজ্যই বুঝিতে হইবে। বধূর পূজ্য বুঝা সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে, লেখা আবশ্যক হইত। আর অপচিত শব্দের অর্থ পূজ্য হইলেও, এখানে "আচার্য্য" বলিয়া বুঝিতে শাস্ত্র বলিয়াছেন সুতরাং মুখ্যতঃ আচার্য্য বরের ই হইতে পারে, বধূর গৌণ।

এবমত ঊর্দ্ধং দক্ষিণাবর্জ্জমুপোষিতাভ্যাং পর্ব্বসু কার্য্যঃ ।১৭

এই বৈবাহিক স্থালীপাক সমাপনের পর, প্রতি পর্ব্বে (অমাবস্যা পূর্ণিমায়) উপবাস পূর্ব্বক বরবধূ আগ্নেয় স্থালীপাক করিবেন; কিন্তু তাহাতে দক্ষিণা দিতে

হইবে না। প্রথম স্থালীপাকে পত্নী অধিকারিণী, বর ঋত্বিক মাত্র একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; পর্ব্বকর্ত্তব্য এই স্থালীপাকে উভয়েরই কর্ত্তৃত্ব আছে। সূত্রে 'উপোষিতাভ্যাং' এই দ্বিবচন নির্দ্দেশ দ্বারা উহা সমর্থিত হয়। কর্ত্তৃত্ব একজনের এবং দুইজনের, সময় অরুন্ধতীদর্শনের পর সেই রাত্রিতে ও পর্ব্বদিনে, দক্ষিণা—ঋষভ এবং এখানে দক্ষিণা লাগিবে না, ইহাই প্রথম ও পরবর্ত্তিস্থালীপাকের পার্থক্য।

পূর্ণপাত্রস্তু দক্ষিণাইত্যেকে।১৮

কেহ কেহ বলেন, পর্ব্বকর্ত্তব্য এই পরবর্ত্তিস্থালীপাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণপাত্র কি? তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ণপাত্র প্রদান সর্ব্বদা সমাজে সর্ব্বকার্য্যে দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটু মতামতের পার্থক্য প্রদর্শন মানসে আমরা কিছু বলিতেছি। হরদত্তের মতে "ধান্য-মুষ্টিশতস্য পূর্ণং পাত্রং পূর্ণপাত্র ইত্যাহুঃ" শতমুষ্টি ধান্য দ্বারা কোনও পাত্র পূর্ণ করিলে তাহাই পূর্ণপাত্র নামে কথিত হয়। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "ধান্যাদে পূর্ণং যৎকিঞ্চিৎ পাত্রং" ধান্য অথবা তণ্ডুলাদির দ্বারা যে কোনও পাত্র পূর্ণ করা হইলে, তাহাকে পূর্ণপাত্র বলা যায়। পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট, কারণ পাত্রও অনির্দ্দিষ্ট, তবে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। পাত্রের ছোট বড়তে কিছু আসে যায় না, তবে পূর্ণতা অপূর্ণতাই লক্ষ্য করিবার জিনিষ। কেহ কেহ বলেন "অষ্টমুষ্টি ভবেৎ কি (কু) ঞ্চি কিঞ্চিচ্চত্বারি পুষ্কলং। পুষ্কলানিচ চত্বারি পূর্ণপাত্রং প্রচক্ষতে।" ধান্যাদির আট মুষ্টি পরিমাণ লইলে, তাহার নাম কিঞ্চি বা কুঞ্চি। চারি কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কল এক পূর্ণপাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। অষ্টাবিংশত্যধিকশত মুষ্টির নাম সুতরাং পূর্ণপাত্র। ইহাতে পাত্র পূর্ণ হউক্ বা না হউক্ তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এপক্ষে পূর্ণপাত্র শব্দটী পারিভাষিক। যৌগিক পক্ষও প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগরূঢ় পক্ষই এখানকার প্রথম পক্ষ। এই পূর্ণপাত্র দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। বরের আচার্য্যকে দিতে হইবে না। এরূপ সিদ্ধান্তে হরদত্ত উপনীত হইয়াছেন। প্রমাণ তিনিই জানিতেন।

সায়ং প্রাতরত ঊর্দ্ধং হস্তেনৈতে আহুতী তণ্ডুলৈর্যবৈর্ব্বা জুহুয়াৎ।১৯

এই বৈবাহিক স্থালীপাকের পর হইতে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হস্তদ্বারা, তণ্ডুল অথবা যব কর্ত্তৃক এই দুইটী আহুতি প্রদান করিবে। সায়ং প্রাতঃ এই দুই শব্দ দ্বারা এখানে অগ্নিহোত্র কালই উপলক্ষিত হইয়াছে। এ বিধান আজীবন অনুবৃত্ত হইতে থাকিবে। এই আহুতিতে দর্ব্বী বা স্রুব ইত্যাদির আবশ্যকতা নাই, হস্ত এখানে ঐ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্থালীপাকবদ্দৈবতম্।২০

স্থালীপাকে যে দেবতা এখানেও তাহাই। অর্থাৎ প্রথমাহুতিতে অগ্নি ও উত্তরাহুতিতে স্বিষ্টকৃৎ সংজ্ঞক অগ্নি দেবতা। প্রথমে মন্ত্র "অগ্নয়ে স্বাহা"। পরটীতে "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" এইরূপ মন্ত্র।

সৌরী পূর্ব্বাহুতিঃ প্রাতরিত্যেকে।২১

কেহ কেহ বলেন প্রাতঃকালে প্রথ-

আহুতির দেবতা সূর্য্য। "সূর্য্যায় স্বাহা" এই মন্ত্র এতৎস্থলে ব্যবহৃত হইবে।

উত্তরতঃ পরিষেচনং যথা পুরস্তাৎ। ২২

এই উত্তর আহুতির উত্তরদিকে অর্থাৎ পূর্ব্বেক্তপথে অগ্নির পরিষেচন করা কর্ত্তব্য। "পূর্ব্বযথ" এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্তস্থলীয় প্রকারেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে এইরূপ বুঝা যাইতেছে।

পার্ব্বণেনাতোঽন্যানি কর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি আচারাদ্ যানি গৃহ্যন্তে। ২৩

পার্ব্বণ প্রয়োগ দ্বারা অন্যান্য সকল আচার প্রাপ্ত কর্ম্মের ও ব্যাখ্যা করা হইল। এই স্থলে "পার্ব্বণ" শব্দে পর্ব্বেবিহিত (অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিহিত। পর্ব্বণিভবঃ পার্ব্বণঃ।) স্থালীপাকাত্মক কর্ম্ম বুঝা যাইতেছে। আচার গৃহীত কর্ম্মের কথা বলায়, এতৎশাস্ত্রে অনুপদিষ্ট ও শাখান্তরে দৃষ্ট সর্পবলি প্রভৃতি আচারানুগত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। উপবাস পূর্ব্বক পর্ব্বদিনে নিত্যই এই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক এবম্বিধায় "পার্ব্বণ" শব্দে বৈবাহিক স্থালীপাক বুঝা অন্যায় নহে। এই বৈবাহিক কর্ম্মই প্রকৃতি, যেহেতু এখানে সমস্ত অঙ্গ কর্ম্মের উপদেশ আছে। ভিক্ষুক পরকে ভিক্ষা দিতে অসমর্থ, সম্পন্ন ব্যক্তিই সক্ষম; অতএব এই কর্ম্মই অন্তকর্ম্মকে অঙ্গ প্রকারের উপদেশ দিতে পারে, সুতরাং ইহার প্রকৃতিত্ব অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে বৈবাহিক স্থালীপাককে 'পার্ব্বণ' শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পার্ব্বণ ব্যাখ্যার দ্বারা অন্ত আচার প্রাপ্ত কর্ম্ম ব্যাখ্যা করা হইল বটে, কিন্তু এই পার্ব্বণ কার্য্যে উপবাস করা বিধেয়, সর্পবলি প্রভৃতিতে উহার আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হইবে না।

যথোপদেশং দেবতা অগ্নিং স্বিষ্টকৃতং চান্তরেণ। ২৪

অগ্নি ও স্বিষ্টকৃৎ ইহার মধ্যে তন্ত্রোক্ত দেবতার হোম করিতে হইবে। সর্পবল্যাদিতে যে যে প্রকারে যজন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই রূপে সেই দেবতারই হোম করা উচিত। পার্ব্বণ দেবতার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ এই যে, তাহারা অন্তরাল স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব্বঅগ্নি ও পরবর্ত্তিস্বিষ্টকৃতের সংযোগ সম্পাদন করিবে। এখানে এই স্থান নির্দ্দেশের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তত্তৎকর্ম্মে যে সকল দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা অতিদিষ্ট পার্ব্বণ দেবতার বাধ হইবে কি না? ইহাই প্রথম চিন্তার বিষয়। উপদিষ্ট এবং অতিদিষ্টের, বাধ বিকল্পাদি বহুপ্রকার ব্যবস্থা মীমাংসাদর্শনে হইয়াছে, এখানে তাহা স্মরণ করিয়াই চিন্তার উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পার্ব্বণ ঐ সকল ক্রিয়ার প্রকৃতি ভূত। "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা" এই চোদক বাক্যানুসারে পার্ব্বণদেবতার, এই সকল বিকৃতিভূতকর্ম্মে প্রাপ্তি হয়। চোদক বাধিত হইবে কি না, ইহাই বিচার্য্য। যদি উপদিষ্ট দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পূরণ স্বীকার করা যায়, তবে চোদক বাক্য পার্ব্বণদেবতা সমর্পণ করিতে সক্ষম হয় না। কোনও স্থানে উপদিষ্ট অতিদিষ্টের বিকল্প প্রয়োগও দেখা যায়। এখানে নিয়ন্ত্রিত

সমুচ্চের বুঝাইতেই এই সূত্রের অবতারণা। পার্ব্বণে দুইটী দেবতা প্রথম অগ্নি, অনন্তর স্বিষ্টকৃৎ। এই অগ্নির পরে, ও স্বিষ্টকৃতের পূর্ব্বে, উপদিষ্ট দেবতার হোম করিতে হইবে। ইহাতে বাধা বিপত্তি নাই। দোষ বহুল (অষ্টদোষ) বিকল্প স্বীকারও করিতে হয় না। অতএব এই সূত্রের আবশ্যকতা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

অবিকৃতমাতিথ্যং ।২৫

আতিথ্য অর্থাৎ অতিথি আসিলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবিকৃত ভাবে করিতে হইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "অতিথির্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তং তৎআতিথ্যং, গবালম্ভ ইত্যর্থঃ। তদ্‌বদপোপদিষ্টং এব স্যাৎ।" আতিথ্য অর্থে গবালম্ভ বুঝা হয়। শাস্ত্রে আছে—গোমধুপর্কাহো বেদাধ্যায়ঃ" যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাকে গোমাংস দ্বারা মধুপর্ক দিতে হইবে। এ নিয়ম অবশ্য অতিথির প্রতি অবাধে খাঁটিবে। শাস্ত্রদৃষ্ট-গোবধের তত্ত্ব আমরা বিবাহ প্রস্তাবে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি; যাঁহার অভিপ্রায় হয় তিনি তত্তৎসংখ্যার হিন্দু-দর্শন করিতে পারেন। অধুনা নিয়মের বিষয়-বিশেষ বিচার করিবার আবশ্যক বোধ করি না।

বৈশ্বদেবে বিশ্বেদেবাঃ ।২৬

বৈশ্বদেব নামক কর্ম্মে বিশ্বেদেব নামক দেবতা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দেবতোপদেশ "নির্ব্বাপ সময়ে সকলার্থ" বলিয়া হরদত্ত বুঝিয়াছেন। "আর্য্যাঃ প্রবক্তা বৈশ্বদেবঃ" এই বেদবাক্য দ্বারা বৈশ্বদেব নামক কর্ম-বিশেষের বিদ্যমানতা আমরা বুঝিতে পারি।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় সূর্য্য অস্তগেলে "শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যামস্তমিতে স্থালীপাকঃ" এই বাক্য দ্বারা যে (স্থালীপাক) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে পৌর্ণমাসীই দেবতা। শ্রাবণী পৌর্ণমাসী কর্ম্মানুষ্ঠান কাল, সুতরাং এখানে শ্রাবণীপৌর্ণমাসীই দেবতা। এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ঐ স্থালীপাক হোমে "শ্রাবণ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈস্বাহা" ইত্যাকার মন্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হইবে। দেবতার পরে চতুর্থী প্রয়োগ করাই নিয়ম, এখানে কেবল পৌর্ণমাসী দেবতা নহে। "যস্যাং তৎক্রিয়তে" বলায় বুঝা গেল, যে (শ্রাবণী) পৌর্ণমাসীতে তৎকর্ম্ম করিতে হইবে, সেই (শ্রাবণী) পৌর্ণমাসী দেবতা হইবে। কাজেই ঐরূপ মন্ত্র পাঠ সুসঙ্গত।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম খণ্ড।

উপাকরণে সমাপনেচ ঋষির্যঃ প্রজ্ঞায়তে ।১

উপাকরণ ও সমাপনে যে ঋষি প্রজ্ঞাত অর্থাৎ অবগত, অগ্রে তাহারই হোম করিতে হইবে। উপাকরণ দুই প্রকার। কাণ্ডোপাকরণ এবং অধ্যায়োপাকরণ। ঐরূপ সমাপন ও দ্বিবিধ। কাণ্ডসমাপন ও অধ্যায়-সমাপন, কাণ্ডানুক্রমণীতে তৎকাণ্ডের "ঋষি" বলিয়া যাহাকে জানা হইয়াছে, তিনিই সেখানে দেবতা। প্রথমে তাহার হোম ও তৎপরে সদসস্পতির হোম করিতে হয়।

অধ্যায়োপাকরণের সময়, সেই অধ্যায়ান্তর্গত কাণ্ডসমূহের সমস্ত ঋষির হোম করিয়া, পরে সদসস্পতির জন্ত হোম করিতে হইবে। জয়াদিহোম করা বা না করায় বিশেষ কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই, একথা বৃত্তিকার বলেন। বস্তুতঃ ও উহার কর্ত্তব্যতাবিষয়ে এখানে শাস্ত্র উদাসীন।

সদসস্পতির্দ্বিতীয়ঃ ।২

প্রথম ঋষি (কাণ্ড পরিপঠিত ঋষি দেবতা) ও তৎপরে সদসস্পতির হোম দ্বিতীয় স্থানে করিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হয়,—সদসস্পতি অধ্যায়োপাকরণ সমাপনে নবম, এবং কাণ্ডোপাকরণসমাপনে ষষ্ঠ; এখানে তাহাকে দ্বিতীয় বলিবার হেতু কি? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, দ্বিতীয় স্বিষ্টকৃতের স্থানে 'সদসস্পতি' বিহিত হওয়ায়, তাঁহাকে দ্বিতীয় বলা হইয়াছে। 'সদসস্পতি'র দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্তিতে "সদসস্পতি দ্বিতীয়ঃ" এই আপস্তম্ববচনই যথেষ্ট প্রমাণ। কাণ্ড, অধ্যায়, মণ্ডল, খণ্ড, অনুবাক, বর্গ, প্রপাঠক, পাঠ্য ইত্যাদি নামগুলি বৈদিকগ্রন্থের উপবিভাগ, বিভাগ, অনুবিভাগ ইত্যাদি ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রন্থ দেখিলে সাধারণে অবগত হইতে পারিবেন, পরিচিত অধ্যায় পরিচ্ছেদ, খণ্ড ইত্যাদির ন্যায়, কাণ্ড, মণ্ডল ইত্যাদি ও ক্ষুদ্র বৃহৎ যথাসম্ভব এক একটী বিভাগ মাত্র।

স্ত্রিয়ানুপেতেন ক্ষারলবণাবরান্নসংসৃষ্টস্য চ হোমং পরিচক্ষতে ।৩

এই হোমাদিকার্য্যে স্ত্রীসহবাস, ক্ষার, লবণ, অবরান্ন ইত্যাদি পরিত্যাগ করা উচিত; যেহেতু শিষ্ট আচার্য্যগণ ওগুলিকে বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। আহার্য্যদ্রব্য রস রুধিরাদিক্রমে এই দেহকে পোষণ করে। আমাদের এই স্থূল দেহের নাম অন্নময়শরীর। ভক্ষ্য বস্তু দ্বারাই প্রধানতঃ ইহার প্রকৃতি, প্রণালী পরিপুষ্টি লাভ করে; সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি পর্য্যন্তও অনেকাংশে আহারের অধীন। ভক্ষ্যশক্তি, পিতৃমাতৃশক্তিও পূর্ব্বকর্ম্ম এই তিন ব্যতীত জীবজীবনের নিয়ামিকাশক্তি আর অধিক নাই, তবে কালশক্তি প্রভৃতিও পরিহরণীয় নহে। মোটের উপর, আহারের দ্বারা দৈহিক, মানসিক বল বীর্য্য, শুদ্ধি, মলিনতা ইত্যাদি নিত্যই জীবদেহে অল্লাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত এবং সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ। কার্য্যবিশেষে আবার রাজসিক সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদ্রেক আবশ্যক হয়। তজ্জন্যই কার্য্যবিশেষে রজঃশক্তিসমুৎপাদকদ্রব্য ত্যাগ ও, সত্ত্বশক্তি সম্বর্দ্ধক দ্রব্য আহার্য্যরূপ গ্রহণ করিতে শাস্ত্র আদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের অনন্ত আকর। ভিন্নকর্ম্মে ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী নির্ব্বাচন এবং বিভিন্ন ভাবের আহারাদির বিধিনিষেধ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গৌরবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্ত্রীসহবাস, ক্ষার লবণ ও কুলথাদি ভোজন কি জন্য বেদ্যাকর্ম্মে নিষিদ্ধ হইল, এখন তাহার কারণানুসন্ধান করিলে বোধ হয় নিরাশ হইতে হইবে না। অতি উত্তেজন ও অতিশয় অবসাদ, রজঃশক্তি ও তমঃশক্তির কার্য্য, উহা মানবের পবিত্র প্রবৃত্তির বিক্ষেপ করায়, কাজেই ঐরূপ গুণবর্দ্ধক খাদ্যাদি গ্রহণ অবিধেয়। ইহাতে

মন অস্বস্থ, ও প্রকৃতির অস্বাভাবিকতা উপস্থিত হয়। যাঁহারা এই বিস্তৃতগভীর বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহারা গীতার গুণবিভাগ পাঠ করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন। এখানে বাহুল্য ভয়ে এবিষয়ে বিরতি লাভ করা গেল। এখানকার এই নিষেধ পাকযজ্ঞাধিকারে ই বুঝা উচিত। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও বটে।

যথোপদেশং কাম্যানি বলয়শ্চ ।৪

কাম্যকর্ম্মে যথোক্ত শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করিতে হইবে, এ নিয়ম মানিবার দরকার নাই। কাম্যকর্ম্মে যাহা বিধান আছে, তাহা এখানকার নিষেধের অন্তর্ভূত হইলেও পরিত্যাগ করিতে হইবে না, অপিচ প্রতি-পালনই করিতে হইবে। বলিপ্রদানাদি কর্ম্মেও যেরূপ উপদেশ আছে, তাহাই করিবে। কাম্য কর্ম্ম কামের (ইচ্ছার) অধীন। না করিলে দোষ নাই, ইচ্ছা হইলেই করে, না হইলে করে না; অতএব তাদৃশ ইচ্ছাধীন বিষয়ে এই নিয়ম করা আবশ্যক নহে। নিত্যে (পাকযজ্ঞাধিকারে) ইহার আদর।

সর্ব্বত্রে স্বয়ম্প্রজ্বলিতে ইধ্মৌ সমি-ধাবাদধ্যাৎ ।৫

সর্ব্বত্র স্বয়ম্প্রজ্বলিত অগ্নি মিলিলেই, "উদ্দীপ্যস্ব মা হিংসীঃ" (অর্থাৎ উদ্দীপিত হও, হে অগ্নে! আমাদের হিংসা করিও না) ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া দুইটী সমিধ্ (বোধ হয় সকলেই হোমের উপকরণ জীবিত-শাখাগ্র স্বরূপ সমিধ্ দেখিয়া থাকিবেন।) অনলে প্রদান করিবে। "সর্ব্বত্র" বলায় সকল পাকযজ্ঞেই এই নিয়ম, কেবল মাত্র বৈবাহিকপাক-যজ্ঞেই, এমন নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। একথা না বলিলে, কেবল বিবাহসম্বন্ধিপাকযজ্ঞেই এ বিধান হয়, যে হেতু প্রকরণ প্রমাণ বলে তাহাই বুঝিতে হয়। সর্ব্বত্র' 'শব্দের অর্থ কাহারও মতে "আচারলক্ষণসকলকর্ম্মে।" স্বয়ং প্রজ্বলিত অর্থে বিনাযত্নে প্রজ্বলিত অগ্নিই বুঝিতে হইবে।

আপন্মা শ্রীর্ম্মাগাৎ ইতিবা ।৬

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত সমিধ্ প্রদানে 'উদ্দীপ্যস্ব' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এসূত্রে মন্ত্রের বিকল্প প্রতিপাদন করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সমিধ্ না দিয়া, "আপন্মা শ্রীর্মাগাৎ" (আমাদের আপদ্ না হউক শ্রী না যাউক।) ইত্যাদি মন্ত্রেও দেওয়া যাইতে পারে। 'উদ্দীপ্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র ঋক্, 'আপন্মা' ইত্যাদি মন্ত্র যজুঃ, এইরূপ দেখা যায়। কোন পুস্তকে "আপন্মা শ্রীঃ শ্রীর্মাগাৎ" এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ শ্রী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন্, অপিচ শ্রী (লক্ষ্মী) না যাউন্।

এতদহর্বিজানীয়াদ্ যদহর্ভার্য্যা-মাবহন্তে ।৭

যে দিনে (যে নক্ষত্রে) ভার্য্যাকে তাহার পিতৃকুল হইতে আনয়ন করিবে, অর্থাৎ যে নক্ষত্রে পাণি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা মনে করিয়া রাখিবে, কদাচ বিস্মৃত হইবে না। প্রতি সম্বৎসরই ঐ নক্ষত্রে উপস্থিত বিশেষ কর্ম্ম করিতে হইবে। "বক্ষ্যমাণয়োঃ

প্রিয়ংস্যাৎ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ আচারিক কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। কোনও টীকাকার বলেন, অহন্ শব্দের অর্থ "নক্ষত্র" হইতে পারে না, উহার অর্থ দিন। "এতদহঃ" বলিতে পাণিগ্রহণের নক্ষত্র বুঝা অতিশয় অসঙ্গত। 'যদহর্ভার্য্যামাবহতে' বলিতে যে দিন ভার্য্যাকে পিতৃকুল হইতে আনয়ন করা হয় সেই দিন অর্থাৎ বিবাহের দিন বুঝা যায় না, পরন্তু বরের বাটী আনিয়া যে দিন স্থালীপাকাদি কর্ম্ম করা হইল, সে দিনই বুঝিতে হয়। ঐ দিন জানিবে (বিজানীয়াৎ) অর্থাৎ ঐ দিন হইতেই ত্রিরাত্রব্রত পালনআরম্ভ, এটা জানিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইবে। এ ব্যাখ্যা মন্দ নয়।

ত্রিরাত্রমুভয়োরধঃ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণবর্জ্জনং চ।৮

সেই হইতে তিন রাত্রি বর বধূ উভয়ে অধঃ (ভূমিতে) শয়ন করিবেন, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ রতিরঙ্গ পরিহার করিবেন। ক্ষার লবণ বর্জ্জিত ভোজন করিবেন। এখানে সংযম শিক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে। ত্রিরাত্র পতিপত্নী একত্র একশয়নে থাকিয়াও মৈথুন ত্যাগ করিবেন, ধৈর্য্য শিক্ষা করিবেন। এই শিক্ষা গৃহস্থের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা। যথেচ্ছ উপগমনে শাস্ত্রের সম্মতি নাই, সংযম না শিখিলে শেষে যথেচ্ছরূপ উপগমন দ্বারা ক্ষীণবীর্য্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রথমতঃই শিক্ষার বন্দোবস্ত। মৈথুনবর্জ্জনের জন্যই অধঃশয়নের উল্লেখ। সুকোমল শয্যায়, সুসজ্জিত খট্টায় রাখিলে, উহা উদ্দীপন কারণ হইতে পারে, এই জন্যই অধঃশয্যা। ক্ষার লবণ, মধু, মাংস, ইত্যাদি খাদ্যও উত্তেজক, সুতরাং শাস্ত্র ঐ গুলির পরিত্যাগ বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বলেন, সূত্রস্থ 'চ'কারের দ্বারা মধু, মাংস ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য, গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন ও নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য পদে ঐ গুলির পরিত্যাগ সহকারে মৈথুন ত্যাগ বুঝিলেও ক্ষতি নাই, ইহা সুদর্শনাচার্য্যের অভিপ্রায়। যেরূপ হউক, সংযম শিক্ষা লক্ষ্য।

তয়োঃশয্যামন্তরেণ দণ্ডোগন্ধলিপ্তো বাসসাসূত্রেণ বা পরিবীতস্তিষ্ঠতি।৯

শয্যায় বর ও বধূর মধ্যস্থানে চন্দনলিপ্ত বস্ত্র বা সূত্র পরিবীত দণ্ড স্থাপিত হইবে। এই দণ্ড ক্ষীরিবৃক্ষ জাত হইবে এরূপ অনেকের মত। হরদত্ত বলেন, পরস্পরের সংস্পর্শ না হয় এই জন্য মধ্যে দণ্ডস্থাপন। স্পর্শশক্তি ও মনোবিকারের কারণ বটে।

তং চতুর্থ্যাপররাত্রে উত্তরাভ্যাং উত্থাপ্য প্রক্ষাল্য নিধায় অগ্নেরুপসমাধানাদ্যাজ্যভাগান্তে হুত্বারক্কায়াঃ মন্ত্ররা অহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে পরিচেনান্তে কৃত্বাপরেণাগ্নিং প্রাচীমুপবেশ্য তস্যাঃ শিরস্যাজ্যশেষাদ্ ব্যাহৃতিভিরোঙ্কারচতুর্থাভিরানীয় উত্তরাভ্যাং যথালিঙ্গং মিথঃ সমীক্ষ্য উত্তরয়া আজ্যশেষেণ হৃদয়দেশৌ সমজ্য উত্তরাস্তিস্রো জপিত্বা শেষংসমাবেশনে জপেৎ।১০

চতুর্থরাত্রির (চতুর্থ অহোরাত্রির) অপর রাত্রে "উদীর্ষাত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া,

ঐ শয্যায় দণ্ড উঠাইয়া, জলদ্বারা ধৌত করিয়া, স্থাপনকরণান্তর, অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্যভাগহোম পর্য্যন্ত করিয়া, সপ্ত উত্তর (প্রধান) আহুতি প্রদান করিয়া জয়াদিহোম করিবে। পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া, অগ্নির পশ্চাৎদিকে পূর্ব্বাভিমুখী বধূকে উপবেশন করাইয়া, হোমাবশিষ্ট ঘৃত হইতে দর্ব্বীদ্বারা গ্রহণ করিয়া, ব্যাহৃতী দ্বারা বধূর মস্তকে আনয়ন করিবে। (ওঁকার যে ব্যাহৃতীর চতুর্থ সেই তিন 'ভূ' 'ভুব' 'স্ব' ব্যাহৃতী দ্বারা স্বাহান্ত ভাবে অর্থাৎ ভূ স্বাহা ইত্যাদিরূপে আনয়ন কর্ত্তব্য।) পরে "অপশ্যং ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা বর ও বধূ পরস্পরকে দেখিয়া ('যথালিঙ্গ' বলায়, পূর্ব্বমন্ত্র দ্বারা বধূ এবং পরমন্ত্র দ্বারা বর দেখিবে এইরূপ বুঝা যায়।) 'সমঞ্জন্তু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘৃতশেষ দ্বারা বধূ ও বরের হৃদয়দেশ মার্জ্জন করণানন্তর, "প্রজাপতে" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় জপ করিয়া, অনুবাকশেষ সমাবেশন কালে জপ করিবে। সমাবেশন অর্থ সঙ্গমার্থশয়ন। এই সমাবেশন ব্যতীত অন্য সমাবেশনে মন্ত্র পাঠ অনাবশ্যক। এই অপররাত্রে সহবাস শাস্ত্রবিহিত।•

অন্যো বৈতৈরভিমন্ত্রয়েত ১১

দম্পতী নিজে ঐ অনুবাক শেষ মন্ত্র পাঠ না করিলে, কোনও ব্রাহ্মণ সমাগমশীল দম্পতীকে ঐ অনুবাক শেষ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন। পক্ষান্তর প্রতিপাদনার্থ 'বা' শব্দ ব্যবহৃত।

যদা মলবদ্বাসাঃ স্যাদথৈনাং ব্রাহ্মণপ্রতিষিদ্ধানি কর্ম্মানি সংশাস্তি যাং মলবদ্বাসসমিত্যেতাম্মি।১২

অনন্তর যে সময় বধূ মলবদ্বাসা হইবে, তখন পতি ঐ রমণীকে বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-প্রতিপাদিত নিষিদ্ধকর্ম্ম বিষয়ে সাধারণ ভাষায় শিক্ষা দিবেন। মলবদ্বাসা বলিতে রজস্বলা বুঝায়। কালনির্গত রজঃ সংযোগে যাহার পরিধেয় বসন মলিন হইয়াছে সে 'মলবদ্বাসা'। প্রথম ঋতুমতী ভার্য্যাকে পতি ব্রাহ্মণোক্ত উপদেশগুলি শিক্ষা দিবেন বলা হইল, সেই উপদেশগুলি যথা—স্নানের পূর্ব্বে রতিক্রিয়া করিবে না। স্নানের পরেও অরণ্যে মৈথুন কার্য্য নিষিদ্ধ। স্নাতা রমণীও অনিচ্ছায় বা পরাঙ্মুখ ভাবে কামক্রীড়া করিবে না। তিন রাত্রি অতীত না হইলে, স্নান, তৈলমাখা, মাথাআঁচড়ান, চক্ষুতে কজ্জল দেওয়া, দন্তধাবন করা, নখকাটা, কার্পাসসূত্র প্রস্তুত করা (টেঁকো বা চরখায় সুতাকাটা) ও রজ্জু প্রস্তুত করা অকর্ত্তব্য। এই একাদশ নিষেধ ঋতুমতীর সর্ব্বদা পালনীয়। হরদত্ত বলেন, "যদেতদ্বচনং বিবাহাদূর্দ্ধং প্রাপ্ত্যর্থং অন্যথা বিবাহমধ্যে এব স্যাৎ।" বিবাহের পূর্ব্বে রজস্বলা হইলে বিবাহ-মধ্যে তৎকৃত্য (দ্বিতীয় বিবাহ) করা উচিত। ইহাতে তাৎকালিক সমাজে রজস্বলার বিবাহ বিরল ছিল না অনুমান হয়।

রজসঃ প্রাদুর্ভাবাৎস্নাতামৃতুসমাবেশন উত্তরয়াভি মন্ত্রয়েতে।১৩

ঋতুস্নাতা পত্নীকে ঋতু বিহিত স্পর্শকালে, (চতুর্থ রাত্রিতে) "বিষ্ণু যোনিং" ইত্যাদি

ত্রয়োদশ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। কালোপগমন বিধানে যাহা অতঃপর মহর্ষি বলিতেছেন, তাহা বারান্তরে আলোচ্য।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কস্যচিৎ
ব্রহ্মচারিণঃ—
যশোহর।

শঙ্করগীতা।

হিন্দুরশাস্ত্র অনন্ত—মুনি ঋষিও অনন্ত, এই জন্ত এক ব্যক্তির জীবনে কখন হিন্দু-শাস্ত্র অধীত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম শিক্ষার জন্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—তাহার শিক্ষা হিন্দুর বেদবেদান্তে গিয়া সমাপ্তিতে দাঁড়ায়—পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্, গীতার জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—কিন্তু এই পরিণতির একটা সামাঞ্জস্য অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞান না জন্মিলে সম্ভবেনা—তন্ত্র শাস্ত্র এবং অন্তবিধ প্রচলিত সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া ষড় দর্শন, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে ধর্ম্ম জ্ঞানীর জ্ঞান নিহিত আছে।

আর যাহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পরের নিকট পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী তাহারা—পল্লবগ্রাহী মাত্র। তাহাদের পক্ষে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গ্রন্থগুলির সারাংশের বিকৃত অথবা চর্ব্বিত অন্তান্ত শাস্ত্রও অধ্যয়নের অন্তর্ভূত। ধর্ম্মতত্ত্বের মূলভিত্তি এক—এবং উপরোক্ত শাস্ত্রগুলিতেই তাহা সংবদ্ধ। অথচ হিন্দুজাতির নিকট যাহারা আবহমানকাল পূজ্য শাস্ত্র সংজ্ঞা পাইয়া আসিতেছে—তাহা আমরা অমান্য বা অবহেলা করিয়া অশাস্ত্র জ্ঞানে উড়াইয়া দিতে পারিনা। চর্ব্বিত চর্ব্বণই হউক, অথবা বিকৃতাংশই হউক, উহাও শাস্ত্র, উহাও হিন্দুর পাঠ্য, উহার কার্য্যও হিন্দুর অনুষ্ঠেয়। এই জন্ত অদ্য আমরা পরম পূজ্য সর্ব্ব জাতির আদরণীয়, মানবজীবনের একমাত্র ধর্ম্ম জ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল "শ্রীশ্রীমদ্ভগবদগীতায়" মথিত, সংগৃহীত, উদ্গীরিত এই "শঙ্করগীতায়" আশ্রয়ে জীবনকে ধর্ম্ম জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতিতে লইবার জন্ত উপস্থিত হইলাম। ভরসা শ্রীভগবান্।

সাধারণের নিকট শ্রীশঙ্কর গীতার বহুল প্রচলন নাই। এই জন্ত অগ্রেই আমরা শঙ্করগীতার একটি আনুষ্ঠানিক ইতিবৃত্ত অথবা পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিতেছি। শিক্ষিত পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করগীতার লেখক বা প্রচারক একটি "আষাড়ে গল্পের" অবতরণা করিয়া সর্ব্বজন আদৃত, সর্ব্বজন বন্দিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারসঙ্কলন কেমন সুন্দর ভাবে করিয়া গিয়াছেন। এই ইতিবৃত্ত বা পূর্ব্বভাষ হিন্দুর শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের কর্ণকণ্ডূয়ণ পীড়ায় একটি উপসর্গ বিশেষ। যে মহাপণ্ডিত বা মহামুনি এই শিবগীতার প্রণেতা বা প্রচারক তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান অসীম—ধর্ম্ম জ্ঞান একৈব অদ্বৈত ব্রহ্মে সংবদ্ধ। সর্ব্বরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান পথের মধ্যে আনিয়া এই শঙ্করগীতার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদ্, গীতা সম্পূর্ণরূপ কথিত আছে।

অতঃপর আমরা শঙ্করগীতার ইতিবৃত্ত বলিব। আমি যশোহর জেলার এক অংশে একটি দেশ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন শক্তি লঘু হইলেও বংশগত শক্তির অতি আধিক্য আছে। আমাদিগের গৃহে অনেক হস্ত-লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে—এই শঙ্করগীতা তাহার মধ্যে অন্যতর। হস্তলিখিত পুঁথি হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিব—উহা হিন্দু-পত্রিকার পাঠকগণ দেখিয়া যদি অন্যরূপ "পাঠ" মনে করেন, তবে তাহা আমাদের জানাইলে আপ্যায়িত হইব। ভুল ভ্রান্তি সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়া দিবেন—সেভরসাও আছে।

এক সময় দাশরথি রাম সীতাবিরহ-শোকে অতি মাত্র কাতর হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট কৈবল্য প্রদ বিশুদ্ধ শিব (ব্রহ্ম) ভক্তির যে মহামূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন—উহাকেই সাধারণতঃ "শঙ্করগীতা" কহে। এই শঙ্করগীতা ঋষিশ্রেষ্ঠ সূত, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের নিকট মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আসিয়া কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু পরাশর তনয় ইহা আবার দেবসেনাপতিকার্ত্তিকেয় কর্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট শ্রবণ করেন যথা—

পুরা সৎকুমারায় স্কন্দেনাভিহিতা হিসা—
সনৎকুমারঃ প্রোবাচব্যাসায় মুনি সত্তমাঃ।
মহ্যং কৃপাতিরেকেণ প্রদদৌ বাদরায়ণঃ।

কিন্তু আবার আরেকস্থানে উল্লেখ আছে যে দণ্ডকারণ্যবাসী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট স্বয়ং ত্র্যম্বক শিবই ইহা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন যথা—

রামায় দণ্ডকারণ্যে পার্ব্বতীপতিনা পুরা
যা প্রোক্তা শিবগীতাখ্যা গুহ্যাৎ গুহ্যতমা-
হিসা।

এই ভাবে শঙ্করগীতার আরম্ভ হইয়া কীর্ত্তন পর্য্যন্ত আরেকটি কথার অবতারণা করা হইয়াছে। সূত যখন নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের নিকট শঙ্করগীতা কীর্ত্তন করেন, তখন তিনি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! মহামুনি ব্যাস দেব আমাকে এই মুক্তিপ্রদ শঙ্করগীতা শিক্ষা দিয়া আবার অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। যেহেতু এই কৈবল্য-প্রদ শঙ্করগীতা মানব জ্ঞানের গোচরী ভূত হইলে দেবগণের কল্যাণপ্রদ ক্রিয়া হয় না বলিয়া, তাঁহারা নাকি মানবগণের উপর ক্রোধ করিয়া মানবের অহিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শঙ্করগীতা মানবগণ পরি-জ্ঞাত হইলে সহজে ব্রহ্ম প্রাপ্তির মূল-কৈবল্য লাভ করেন, সুতরাং আর তাহারা ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় প্রভৃতি বস্তু দ্বারা ঘৃত মধু সহযোগে দেবকল্যাণপ্রদ যজ্ঞ করেন না—দেবগণ অনাহারে, অপানে, গার্হস্থাশ্রমবাসী অগ্নিহোত্রী সদাচার ব্রাহ্মণগণের প্রশস্ত ক্রিয়া অভাবে, কষ্ট ভোগ করেন—তাই তত্ত্বজ্ঞানী নরের উপর ক্রোধিত হন। ক্ষীরবতী গাভী অপহৃতা হইলে গৃহস্থের যেরূপ দুঃখ হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণও দেব দুঃখের মহাকারণ। এইরূপ একটি অলৌকিক ঘটনার ইতিবৃত্ত পদ্মপুরাণের ন্যায় প্রসিদ্ধ পুরাণে ব্রহ্মকল্প বাদরায়ণ কর্তৃক গ্রথিত হইবে, ইহা সহজে নিষ্ঠাবান্ শিক্ষিত হিন্দু বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয়না। এই জন্যই বলি যে, যে সময় হিন্দুশাস্ত্রে

ব্রাহ্মণগণের একদেশদর্শীচক্ষুমাত্র সংবদ্ধ ছিল—তখন অনেক শ্লোক প্রণয়ন-কারী ব্রাহ্মণ মস্তিষ্ককণ্ডূয়ণ পীড়ার লক্ষণ স্বরূপ কতগুলি শ্লোক পুরাণাদিতে সংবদ্ধ করিয়াছিলেন যথা—

অথপৃষ্টো ময়া বিপ্রাঃ! ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ভগবন্ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিং ভুঞ্জন্তি শপন্তিচ॥
আগামত্রান্তি কাহানির্গয়া কুপ্যন্তি দেবতাঃ।
পারাশর্য্যো হ্প মামাহ যৎ পৃষ্টং শৃণু বৎম তৎ
ত এব সর্ব্ব ফলদাঃ সুরাণাং কামধেনবঃ
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্ যদিষ্টং সুপর্ব্বণাং।
অগ্নৌহুতেন হবিষা তৎসর্ব্বং লভতে দিবি।
ন্যান্তদন্তি সুরেশানামিষ্টসিদ্ধিপ্রদংদিবি।
দোগ্ধ্রী ধেনুর্যথানীতা দুঃখদাগৃহমেধিনাং।
তথৈব জ্ঞাতবান বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো-
ভবেৎ॥

মহামুনি সুত ঋষিগণকে এইরূপ কহিলে পরে তাঁহারা কহিলেন, ঋষিপুঙ্গব, তবে আমরা পরম পূজ্য শঙ্করগীতা কি শুনিতে পাইব না? তখন সুত কহিলেন—না, ব্রাহ্মণগণ! ভয় নাই, মুক্তিপ্রদশঙ্করগীতা মহামতি পরাশরতনয় মানবগণের কল্যাণে জন্য আবার আমাকে ব্যাখ্যা করিবার উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। যদি মানব—"জ্ঞান শক্তি: সর্ব্বক্রিয়াঃ[illegible]শিবায়] তুভ্যংনমঃ" বলিয়া সংসারে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ কোটি জন্মের কৃত পুণ্য বলে মানবহৃদয়ে শিবভক্তি যদি সঞ্জাত হইয়া "সমস্তই শঙ্করকে অর্পণ করিলাম" এই জ্ঞান উৎপত্তি হয়, তবে দেবদেব শূলপাণি সন্তুষ্ট হইয়া মানবের মঙ্গল সাধন করেন—দেবগণ সেই স্থানে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। হে তাপসগণ! এই জন্যই জগতের লোকের মঙ্গলজনক শঙ্করগীতা আমি কীর্ত্তন করিব। আপনারা ইষ্টপূর্ত্তাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সময়ে সমস্তই শঙ্করকে অর্পণ করিয়া এই পরম কল্যাণ-প্রদ-ভবতাপনাশক সংসার ব্যাধির মহৌষধ শঙ্করগীতা শ্রবণ করুন যথা—

সূত উবাচ

কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈ শিবভক্তিঃ
প্রজায়তে।
ইষ্ট পূর্ত্তাদিকর্ম্মাণি তেনাচরতি মানবঃ।
শিবার্পণধিয়া কামান্ পরিত্যজ্য যথা বিধি।
অনুগ্রহাত্তেন শম্ভোর্জায়তে সুদৃঢ়ো নরঃ।
ততোভীতাঃ পলায়ন্তে বিঘ্নংহিত্বা সুরেশ্বরাঃ।

এইরূপ দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া ঋষিপ্রবর সূত অতঃপর শঙ্করগীতার ফলশ্রুতি বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া নৈমিষকাননে তাপস-গণের মনের সন্দেহ তিরোহিত করিলেন, কিন্তু মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সূত মুখ হইতে ভক্তির একটানা স্রোত যেন কিছু প্রতি-কূলাঘাতে প্রতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সূত বলিলেন যথা—

[illegible]ন জায়তে ভক্তিঃ শিবে৺কস্যাপি দেহিনঃ
তস্মাদ[illegible]বাং নৈব জায়তে শূলপাণিঃ।
যথা কপক্ষি[illegible]মধ্যে বিচ্ছিদ্যতে মৃণাং
জাতং বাপি শিবজ্ঞানং [illegible]শাসং ভজত্যলং।

তাহার পর যেরূপ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, তাহা যে পুরাণকার ঋষিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত ইহা যেন বিশ্বাস করিতে স্বাভাবিক বিবেকশক্তি কেমন থতমত খাইয়া যায়। কারণ যে তাপসগণ পরম পূজ্য বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া দিবায় সন্ধ্যায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্ম

প্রাপ্তির সুগমপথ ব্রহ্মচর্যাব্রত অবলম্বন করিয়া, জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের নিকট আপাতমুগ্ধকর সরল সহজ ভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া শিবত্ব-লাভের আসক্তি জন্মান যেন একরূপ "ছেলেভুলান" ক্রিয়া। মাহাত্ম্য বর্ণনে উক্ত হইয়াছে যে—

"জায়তে তেন শুশ্রূষা চরিতে চন্দ্রমৌলিনঃ
শৃন্বতো জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবে দৃঢ়া
মহাপাপোহপিপাপৌঘ কোটি গ্রস্তোঽপি মুচ্যতে
অনাদরেণ শাঠ্যেন পরিহাসেন মায়য়া
শিবভক্তিরতশ্চেৎ স্যাদন্ত্যজোপিঽপি
বিমুচ্যতে।
এবং ভক্তিশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী
তস্যাং তু বিদ্যমানায়াং যস্ত মর্ত্ত্যো নমুচ্যতে।
সংসার বন্ধনাত্তস্মাদন্যঃ কো নাস্তি মূঢ়ধীঃ।
নিয়মাদ্ যস্ত কুর্ব্বীত ভক্তিং বা দ্রোহমেব বা॥
তস্যাপি চেৎ প্রসন্নোঽসৌ ফলং যচ্ছতি
বাঞ্ছিতং
পত্রং কিঞ্চিৎসমাদায় ক্ষুদ্রকং জল মেববা।
যোদদ্যান্নিয়মেনাসৌ তস্মৈ দদ্যাজ্জগত্রয়ং
তত্রা পাশক্তো নিয়মান্নমস্কারং প্রদক্ষিণং।
যঃ করোতি মহেশস্য তস্মৈ তুষ্টো ভবেচ্ছিবঃ
প্রদক্ষিণেষ্ শক্তোঽপি যঃ স্বান্তে চিন্তয়েচ্ছিবং
গচ্ছন্ সমুপবিষ্টো বা তস্যাভীষ্টং প্রযচ্ছতি।
চন্দনং বিল্ব কাষ্ঠস্য—পত্রং পুষ্পং বনোদ্ভবং
কন্দানি বনজাতানি বস্য প্রীতিকরাণি বৈ।
দুষ্করং তস্য সেবায়াং কিমস্তি ভুবনত্রয়ে।
ইত্যাদি।

ইহার পর শিবারাধনার স্থান, দ্রব্য, পূর্জা অনাস্তবাদ, প্রভৃতির উল্লেখ সহ কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ আশ্বাসের আভাষ দিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী তাপসগণকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। যথা:—

* * * যস্যাস্তি দুরিতং কোটিজন্মস্ব
সঞ্চিতং
তস্য প্রকাশতে নায়মর্থো মোহান্ধচেতসঃ
ন কালনিয়মোযত্র ন দেশস্য স্থলস্যচ
যত্রাস্য রমতে চিত্তং তস্য ধ্যানেন কেবলং
ইত্যাদি।

সূত মুখ পদ্ম হইতে এইরূপে শঙ্করগীতার পূর্ব্বাভাষ আরম্ভ হইয়া "শিবজ্ঞান" লাভের উপায় শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে "বিরজা" দীক্ষা অবলম্বন করা এবং রুদ্রাক্ষ ধারণরূপ শৈব ভক্তিতে উপদিষ্ট করা হইয়াছে। যথা

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষানাং পারং যাস্যথ যেন বৈ
মুনয়স্তং প্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাশুপতাভিধং
কৃত্বা তু বিরজা দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাক্ষধারিণঃ
জপন্তো বেদসারাখ্যং শিবনাম সহস্রকং
সন্ত্যক্তা তেন মর্ত্যত্বং শৈবীং তনু মবাপ্স্যথ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবাঞ্ছঙ্করো লোক শঙ্করঃ।
ভবতাং দৃশ্যতামেত্য কৈবল্যং বঃ প্রদাস্যতি।
ইত্যাদি।

ইহার পর প্রকৃত কথা আরম্ভ হইল। তাপসগণ একমনে হর্ষচিত্তে সূতমুখে শঙ্করগীতা শুনিতে লাগিলেন।

এখন কথা হইতেছে যে, এই শঙ্করগীতা প্রকৃতই পদ্মপুরাণের প্রণেতা মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক রচিত, কি উহাতে "প্রক্ষিপ্ত"; এই মহাতত্ত্বের পূর্ণ মীমাংসা সহজে হইবার কথা নহে। কেন না পুরাণ গুলিতে প্রায়ই অনেক হাতগড়া শ্লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মূল পদ্মপুরাণ

এখন সহজে মিলে না। যখন দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত ছিল না, তখন যাহার নিকট যে শাস্ত্র গ্রন্থখানি থাকিত, সে ব্যক্তি লেখক কি কবি হইলে প্রায়ই তাহাতে নিজের রুচি অনুযায়ী শ্লোক প্রস্তুত করিয়া সংযোগ করিত। এই কারণে কোনটি মূল, কোনটি প্রক্ষিপ্ত ইহা নির্ণয় করিতে প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র এবং শ্লোকের বাক্যবিন্যাস-প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা স্থির করিতে হয়।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, এই শঙ্করগীতা রামগীতা প্রভৃতি গীতাগুলি প্রক্ষিপ্ত। তবে তাহা স্থির ধারণা কি না ইহা শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন—কিন্তু মূলই হউক, শঙ্করগীতা যে ধর্ম্মপিপাসীগণের তৃষ্ণা নিবারণের একটি সুশীতল বারিধারা তাহার দ্বিতীয় সন্দেহ নাই। এইজন্য আমরা উহা অনুবাদসহ সাধারণের নিকট উপস্থিত করিব—শ্রীভগবান শঙ্করই আমাদের ভরসাস্থল।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
মাগুরা।

ওঁ তৎসৎ
সামবেদীয়া

কেনোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মূলম্)

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মন্যসে সুবেদেতি
দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ
ব্রহ্মণোরূপং।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥
॥১॥

নাহং মন্যে সুবেদেতি
নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ
নো ন বেদেতি বেদ চ ॥২॥
যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাত মবিজানতাম্ ॥৩॥
প্রতিবোধ বিদিতং মত-
মমৃতত্বং হি বিন্দতে
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং
বিদ্যয়া বিন্দতে হমৃতং ॥৪॥
ইহ চেদবেদীদথ সত্য মস্তি
ন চে দিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫॥

(অনুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মনে কর "ব্রহ্মে জেনেছি সম্যক্"
তা'হ'লে নিশ্চয় অল্প সে ব্রহ্মস্বরূপ
জানিয়াছ তুমি; যদি দেবগণ মাঝে
সে ব্রহ্ম স্বরূপ বলি জান তাহাকেও
তা'হ'লেও অল্প তুমি বুঝেছ ব্রহ্মের;
বিদিত হলেও ব্রহ্ম বিচার্য্য তোমার ॥১॥
"সম্যক্ জেনেছি ব্রহ্ম" ভাবিনা এমন
ভাবিনা "জেনেছি তাঁরে;" ভাবিনা "জানিনা"
জানেন তিনিই তাঁরে,—জানেন যে জন
"জানিনা—" "জেনেছি তাঁরে"—অর্থ
এ বাক্যের ॥২॥

"জানিনা"—ভাবেন যিনি, জানেন সেজন,
জানেন—ভাবেন যিনি না জানেন তিনি;
অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতার জ্ঞাত অজ্ঞাতার
(হয়েন সে ব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব মূলাধার) ॥৩॥
যখন হয়েন ব্রহ্ম, প্রতিবোধজ্ঞাত
সম্যক্ দর্শন তাঁর হয় সে সময়;
তাহে অমৃতত্ব লাভ হয় পুনরায়।
আত্মাতেই বীর্য্য লাভ অমৃত বিদ্যায় ॥৪
ইহলোকে ব্রহ্মে যদি পারে জানিবারে
তবেই সকল জন্ম; নাজানিলে এঁরে
মহান্ বিনাশ ঘটে; তাই ধীরগণ
সে পরমাত্মারে চিন্তা করি সর্ব্ব ভূতে।
হয়েন অমর যেয়ে ইহলোক হ'তে ॥৫

(মূলম্)

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে
দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়ো
ঽস্মাক মেবায়ং মহিমেতি ॥ ১॥
তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ
প্রাদুর্ব্বভূব। তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং
যক্ষমিতি ॥২
তেঽগ্নি মব্রুবন্ জাতবেদ!
এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি ॥৩
তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা
বা অহমস্মীতি ॥৪
তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং
যদিদং পৃথিব্যা মিতি ॥৫
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।
তদুপ প্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন
শশাক দগ্ধুং, স তত এব
নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥৬
অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজা-
নীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি
তথেতি ॥৭
তদভ্যদ্রবৎ কোঽসীতি।
বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা
বা অহমস্মীতি ॥৮
তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥৯
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি
তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্ব জবেন তন্ন শশাকাদাতুং।
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি। ১০
অথেন্দ্র মব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্
বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥১১
সতস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয় মাজগাম
বহুশোভমানা মুমাং হৈমবতীং
তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥১২

(অনুবাদ)

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্মই করেন জয় দেবতার তরে,
ব্রহ্মের বিজয়ে দেবগণের মহিমা—
কিন্তু ভাবিলেন তাঁরা, এই যে বিজয়—
আমাদেরই; মহিমাও আমাদেরি হয় ॥১

জানিলেন ব্রহ্ম তাহা; তাঁদের সম্মুখে
হইলেন প্রকাশিত; "এই যক্ষ কেবা"
নাহি জানিলেন কিন্তু তাহা দেবগণ ॥২
অগ্নিরে কহেন তাঁরা "ওহে জাতবেদ
বিশেষিয়া জান তুমি এই যক্ষ কেবা"
"তথাস্তু" বলিয়া অগ্নি করিলা গমন ॥৩
গেলা অগ্নি যক্ষ কাছে; জিজ্ঞাসেন তিনি
—"কে তুমি?" কহিলা অগ্নি "অগ্নি জাতবেদা" ॥৪
"এমন যে তুমি—কহ কিবীর্য্য তোমাতে?"
"পৃথিবীর যাহা কিছু পারিপোড়াইতে।"॥৫
"দগ্ধ কর ইহা" বলি তৃণ এক গাছি—
অগ্নিরে দিলেন ব্রহ্ম; অগ্নি সে তৃণের
কাছে গিয়ে সর্ব্ববলে না পারি পোড়া'তে
হইলেন প্রত্যাবৃত্ত তার কাছ হ'তে ॥৬
বায়ুরে কহেন তাঁরা "জান ওহে বায়ো,
বিশেষরূপেতে, কে বা এই যক্ষ হ'ন।"
"তথাস্তু" বলিয়া বায়ু করিলা গমন ॥৭
গেলা বায়ু যক্ষ কাছে; জিজ্ঞাসেনতিনি
"কে তুমি?" কহিলাবায়ু—"বায়ু-মাতরিশ্বা" ॥৮
এমন যে তুমি কহ—কি বীর্য্য তোমাতে?"
"পৃথিবীর যাহা কিছু পারি উড়াইতে ॥৯"
"লও তবে ইহা"—বলি তৃণ একগাছি
বায়ুরে দিলেন ব্রহ্ম; বায়ু সে তৃণের
কাছে গিয়ে সর্ব্ববলে না পারি নড়াতে,
হইলেন প্রত্যাবৃত্ত তাঁর কাছ হ'তে।
ফিরে এসে বায়ু, দেবগণ কাছে ক'ন
না পারি জানিতে কেবা এই যক্ষ হ'ন ॥১০
ইন্দ্রেরে কহেন তাঁরা "ওহে মঘবন্,
বিশেষিয়া জান কেবা এই যক্ষ হ'ন।"
"তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র করিল গমন;
ব্রহ্ম সমীপস্থ ইন্দ্র হয়েন যখন।
ব্রহ্মেরও তিরোধান অমনি তখন ॥১১
সেই আকাশেই দেখি বহুশোভমানা
উমা হৈমবতী স্ত্রীবে, তাহার সমীপে
যান ইন্দ্র; জিজ্ঞাসেন "এই যক্ষ কেবা?" ॥১২

(মূলম্)
চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥১
তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥২
তস্মাদ্বা ইন্দ্রো ঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, সহ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥৩
তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতম্। ৪
অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ ॥৫
তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বন মিত্যুপাসিতব্যং স য এত দেবং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥৬
উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাবত উপনিষদমব্রূমেতি ॥৭
তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য
পাপ্মান মনন্তে স্বর্গে লোকে
জ্যেয়ে প্রতি তিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৯
ইতি কেনোপনিষৎ সমাপ্তা।

(অনুবাদ)

চতুর্থ খণ্ড

উমা ক'ন "ব্রহ্ম ইনি ; ব্রহ্মের বিজয়ে
এরূপ মহিমান্বিত হয়েছে তোমরা ;"
তা'হ'তে জানেন ইন্দ্র "ব্রহ্ম হ'ন ইনি।"১
অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এই সকল দেবতা
ব্রহ্ম সমীপস্থ হ'ন ; তাঁরাই প্রথমে
"ব্রহ্ম ইনি" এইরূপ, হ'ন অবগত—
অতএব এঁরা শ্রেষ্ঠ অন্য দেব হ'তে ॥২
যেহেতু হয়েন ইন্দ্র সকলের আগে
ব্রহ্ম সমীপস্থ ; পুনঃ জানেন তাঁহারে
তাই ইন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা মাঝারে ॥৩
বিদ্যুৎ প্রকাশবৎ সে ব্রহ্ম প্রকাশ ;
দেবতা সমীপে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ
চক্ষুর নিমেষবৎ (দ্রুত অতিশয়) ।৪
অনন্তর উপদেশ আত্মবিষয়ক—
এই মনঃ যায় যেন তাঁহার নিকটে
স্মরণ তাঁহারে যেন করে বারবার ॥৫
সেই ব্রহ্ম সকলেরি হ'ন ভজনীয়
তিনিই উপাসিতব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে।
এরূপে তাঁহারে যিনি হ'ন অবগত,
সকল পরাণী তাঁরে চায় বিশেষতঃ ॥৬
"বলুন উপনিষদ্ ভগবন্, মোরে"
বলেছিলে তুমি, তাই তোমার নিকটে
ব্রাহ্মী উপনিষদের হইল কথন ॥৭
তপোদম কর্ম্ম বেদ বেদাঙ্গ সকল
প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম বিদ্যার ; সত্যই আশ্রয় ।৮
যেই জন ব্রহ্মবিদ্যা হ'ন অবগত।
তাঁহা হতে পাপচয় হয় অপগত ॥
অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত।
অনন্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বর্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ৯

শ্রীমনোরঞ্জন সরস্বতী।

আমাদের নাই কি ?

জীবজীবন চিরদিনই পরাপেক্ষী। সংসার-সংগ্রামে অশেষবিধ উপকরণের আবশ্যকতা। দেহরক্ষার জন্য আহার, বিহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি কত কি চাই, আর মনোবল, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বুদ্ধিবল বর্দ্ধিত করিবার জন্য আহারাদি ভাতীত শিক্ষা, দীক্ষার ও বহুল-প্রয়োজন।

বর্ত্তমানভারতে উন্নতি, অবনতি, সফলতা, বিফলতা, উদ্যম অনুদ্যমের একটা বিপুল আলোচনা চলিতেছে, স্ব স্ব শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যক্তিগত স্বাধীনমত প্রতি গৃহে বিভিন্ন। কেহ বা স্বীয় রাজনৈতিক শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া আকুল, আর কেহ জ্ঞানগরিমার প্রকৃতপুরস্কার না পাইয়া ব্যাকুল। কাহারও আহারে রুচি নাই, নিদ্রায় শ্রান্তিনাশ ঘটে না, ভ্রমণেও মনের জ্বালা জুড়ায় না, কারণ—"উপযুক্ত অধিকার লাভে বঞ্চিত হইতে হইতেছে।" সর্ব্বত্রই হা হুতাশ! দীর্ঘনিঃশ্বাস—নয়নবারি—বিষাদরোদন বিদ্যমান!! কিন্তু হায়! কেন কাঁদি ? একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছি কেন কাঁদি ? অতীত সুখস্মৃতির বিমল-আলোকে দুর্ব্বল নয়নে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করিতে

পারিতেছি না। অতীতগৌরব স্মরণ পথে আসিলে, বর্ত্তমান রৌরবকেও সুরপুরী স্বরূপ মনে করিতেছি। এ মোহস্বপ্ন সহজে ভাঙ্গিবে কি না, ভগবান্ জানেন। স্মৃতির কুহকে বর্ত্তমানকর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়া, মনে মনে গৌরবের বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিতেছি, কিন্তু হায়! ঐ পতাকা শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ, কীটদষ্ট, নিষ্প্রভ ও অগৌরবসূচকই হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমাদের মোহান্ধনয়ন দেখিল না, জগৎ উপহাসে ত্রুটী করিল না। আমাদের মানসিক আশা মরুতলে তরুর মত শুকাইয়া গেল। এখন আমাদের আর্ত্তনাদ ব্যতীত আর অবলম্বন কি? বৃথা এ আড়ম্বরে অহমিকারজনিত ক্ষোভই সার হয়। ভাবিয়া দেখি—আমরা চাই কি? এবং আমাদের নাই কি? যাহা নাই তাহাই চাই, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমরা চাইবার বেলায় ভ্রমে পতিত হই। পীড়াপ্রকোপে ঔষধ নাই, কিন্তু হায়! আমরা ঔষধ চাই না, ঔষধ বড় তিক্ত; রসগোল্লা চাহিয়া ফেলি পাই না, পাইলেও পীড়াবৃদ্ধি ব্যতীত: অন্য কিছু লাভ হয় না। পিপাসার শীতলজল নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই! আমরা তাহা চাহি না, চাহি এক পিয়ালা'চা'—আর একটী 'সিগারেটের চুরুট্'। শীতের বস্ত্র নাই, তখন চাহিয়া ফেলি কাঁচের বাসন! অভাবের মূর্ত্তি কাজেই শতসহস্র বাহুবিস্তার করিয়া আমার কাছে আসিতে থাকে, আর আমরা উদরান্নের অসংস্থানে ম্রিয়মান হইয়া কাতরক্রন্দনে গগণতল বিদীর্ণ করি, বলি—'কেহই আমাকে দেখিল না বাঁচাইল না।' নিস্ফলরোদনে জগতের উপর অভিশাপ অর্পণ করি, জগতের সর্ব্বংসহবক্ষে তাহা নীরবে লুকাইয়া যায়। আমরা ভাবি না, বুঝি না, জানি না—"তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

সিংহের অধিকার শৃগালের দ্বারা সংরক্ষিত হয় না। ভারতে যে দিন উন্নতির বিজয়-ভেরী কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হইত, সেই দিন পূর্ব্বপিতৃগণ অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি ঐশীশক্তিকে দেবতাজ্ঞানে সসম্মানে পূজা করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই সকল দেব-শক্তি যে জাতির করে ক্রীড়াপুত্তলিকা, সেই জাতির উপর আমাদের রক্ষাভার সংরক্ষিত। আমাদের অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি দেবতা, যাহাদের অনুজ্ঞাপালনে আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমরা তাহাদেরই আদেশাধীনে। গর্ব্বিত হইবার কি আমা-দের এখন কিছু আছে? ধনহীন—জ্ঞানহীন—ব্যক্তির কি গৌরব শোভা পায়? অভাব-অর্ণবে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কি কোটি-পতির প্রতি কটাক্ষ করা চলে? অনেক সময় আমরা মনে করি, "আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের পদতলে বসিয়া অনেকে ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা করিয়া গিয়াছে, আজ তাহাদের পরবর্ত্তিরাই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এটী আমাদের গৌরব জ্ঞাপক!" হা দুরদৃষ্ট! ইহা ও কি গৌরব! যে সন্তান পৈত্রিক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, সে ও কি গৌরবান্বিত? যাহার বিন্দুমাত্র সঞ্চয় করিয়া কতলোক কীর্ত্তিমন্দিরে প্রবেশ করিল, সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের অযথাব্যবহারে অনুচিত উপেক্ষায়—আমরা আজ সর্ব্বস্বান্ত! ধিক্ এ গৌরব! যথার্থই আমরা "স্মৃতির কুহকে বর্ত্তমান ভুলে" এত বিপন্ন। ব্যাস,

বাল্মীকি, কপিল, পতঞ্জলি, আত্রেয়, কণাদ গৌতমের গরিমা কি আমরা কিছুই বুঝিয়াছি? না পরাশর, আর্য্যভট, ভাস্করাদির পূজায় জীবন সমর্পণ করিতে পারিয়াছি? অমূল্য-জ্ঞান বিজ্ঞান রাশি অযত্নসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া আজ আমরা "সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ" দেশাচারকে, মহত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞানের সুফল বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। আজ যথার্থ শাস্ত্রের—প্রকৃত বেদ, বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতের অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত নহি। বৈদিকউপাসনা প্রণালীর শত দোষ দেখিতে পাই, আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ মোহমূলক লোকাচারের পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি! ইহাপেক্ষা শোচনীয় দশা আর কি? ধর্ম্মবলে ভারত চিরদিন প্রশান্ত, চিরদিন বলীয়ান্; সে ধর্ম্ম এখন কেবল লাঞ্ছিত এমন নহে, বিকৃত বিতাড়িত! এ দুর্দ্দিনে কে বলিয়া দিবে "আমাদের নাই কি?" দিকেকের শরণ গত হইলে উত্তর পাওয়া যাইবে "নাই কর্ত্তব্যজ্ঞান।" আছে—অভিমান। নাই বল, আছে—বলবান্ বলিয়া অভিমান। নাই জ্ঞান আছে জ্ঞান বলিয়া অভিমান। নাই গৌরব—মোহমূলক গৌরবাভিমান। নাই ধর্ম্ম, আছে—উপধর্ম্মের মনোরমপরিচ্ছদে আবৃত পূতিগন্ধময় ব্যভিচার বা দেশাচার। পাঠক মহোদয়গণ! বলে "দেশাচার" বলিতে কি বুঝায়, একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

শ্রী———ভারতী।
যশোহর।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

টেঁয়ার ঠাকুর বংশই সীতারামের গুরুবংশ। সীতারামের অগ্রজ লক্ষ্মীনারায়ণের বংশে হরিচরনগরের দেবনাথ রায় নামক যে ব্যক্তি আছেন, তিনিও উক্ত ঠাকুর মহাশয়দের শিষ্য। উক্ত ঠাকুর মহাশয়দের বাটীতে সীতারামের কুল-বিবরণও রাজত্ব সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে লিখিত আছে।

মহম্মদপুর রাজধানীর অন্তর্গত গোকুলনগরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ সীতারামের পুরোহিত ছিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য্যগণই তাঁহার পুরোহিত বংশ।

সীতারামের রাজত্বকালে মুরসিদাবাদে মুরসিদ কুলি খাঁ নবাব ছিলেন। মদীয় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে নবাব আমাজা আবুতোরাব উল্লেখ আছে; তাঁহার নাম আবুতোরাব, সাধারণ লোকে আবুতারাই বলেন, তদনুসারে আবুতারাই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নাম প্রকৃত আবুতোরাব। তিনি নবাবের দৌহিত্রী পতি। সীতারামের আদেশে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া তৎসমীপে আনীত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে তদানীন্তন ইতিহাস "রিয়াজুস্ সালাতিন্" ইত্যাদি গ্রন্থে সীতারাম সম্বন্ধে কিছু লিখিত আছে, তাহাতে আবুতোরাবের বিষয় বর্ণিত আছে।

সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতীকে কেহ কেহ মুসলমান বলেন। তাঁহাকে অনেকে মেনাহাতীও বলেন। মদীয়

পক্ষ হইতে কতিপয় সৈন্য ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে, তাহা নিশ্চিত। প্রবাদ আছে যে, ছদ্মবেশী সৈনিকের গুপ্ত-অস্ত্রাঘাতে তিনি কাতর হইয়া পড়েন। তখন জীবনের আর আশা নাই বরং অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বিবেচনায় তিনি বলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বাহুতে শিকড় ইত্যাদি পূর্ণ আছে, তাহা না ফেলাইলে তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব হইবে এবং যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তদনুসারে তাঁহার বাহু হইতে শিকড় ইত্যাদি কাটিয়া বাহির করা হয়, পরে তাঁহার জীবন-বায়ু কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া যায়। মহম্মদপুরে উদয়গঞ্জের হাটখোলার ধারে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়, অদ্যাপি তাঁহার ঐ কবর স্থান তথায় দৃষ্ট হয়।

সীতারামের অপর সেনাপতি রামনা- বাথার প্রকৃত নাম আমলবেগ ইনি জাতিতে পাঠান ও অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার বীরত্বও অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু অবগত হওয়া যায় না।

মহম্মদপুরের বর্ত্তমান-বাজার হইতে কানাইনগর পর্য্যন্ত যে একটী সুদীর্ঘ-গড় বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রথম প্রস্তাবে উহা ৺রাণী ভবানীর কৃত" লিখিত হইয়াছে দ্বিতীয় প্রস্তাবে "সীতারাম কৃত" স্থানীয় অনেকে বলেন যে ৺রাণী ভবানী কৃত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই গড় সীতারামের কৃত। সীতা- রামের রাজবাড়ীর সদর গড় এইটী।

ঐ গড়ের উত্তর দিয়াই সীতারামের রাজ- বাড়ীর রথ টানিবার রাস্তা কানাইনগরের ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত চলিয়াগিয়াছে অদ্যাপি উহা বর্ত্তমান আছে এবং রায়েরবাড়ীর রথ এই রাস্তার উপর দিয়াই চলিত হয়।

সীতারামের রাজত্বের অনেক দিন পরে নাটোরের ৺রাণী ভবানীর কন্যা ৺তারা ঠাকুরাণী বিশেষ কোন কারণে কিছু দিন মহম্মদপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি বাল্য বিধবা ছিলেন, তাঁহার পুত্র সন্তান কিছু ছিল না। তাঁহার স্বামীর নাম ৺রামচন্দ্র লাহিড়ী। ৺তারা ঠাকুরাণী তাঁহার স্বামী রামচন্দ্রের নাম অনুসারে মহম্মদপুরে ৺রাম- চন্দ্র বিগ্রহ স্থাপন করেন; শত্রুগণ সহসা নগরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য তিনিই সীতারামের উক্ত সদর গড়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়াদেন। তাহাতে গড়ের গভী- রতা বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমানে গড়ে সর্ব্বদা বেশী পরিমাণে জল থাকিবার কারণ ইহাই দৃষ্ট হয়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকে মূল ঘটনা সম্পূর্ণ জ্ঞাত না থাকায়, বিশেষতঃ উল্লিখিত বিগ্রহে সেবা ইত্যাদি নাটোরের বড় তরফের মহারাজার তত্ত্বাবধানে চলিতেছে দেখিয়া মনে করেন যে, উক্ত বিগ্রহ দুইটী ৺রাণী ভবানীর স্থাপিত এবং উল্লিখিত সদর গড়টীও ৺রাণী ভবানীর কৃত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সমস্তই মিথ্যা। গড়টী যে সীতারাম কৃত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৺রাণী ভবানী কখনও মহম্মদপুরে আগমন করেন নাই, তাঁহার কোন কীর্ত্তিও মহম্মদপুরে নাই। প্রথম প্রস্তাবে লিখিত ৺রাণী ভবানী স্থাপিত দুইটী বিগ্রহ ও তৎকৃত গড় এখানে রহিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। মূল ঘটনা এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইল।

সীতারাম নবাব সরকার হইতে প্রথমে

চাকলা ভূষণার কার্য্যকারক "রায় রাঁয়া" হইয়া আসেন, তাহাই প্রকৃত, অন্য প্রবাদ অমূলক।

সীতারামের রাজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, সীতারামের পিতা উদয় নারায়ণ যখন চাকলাভূষণার কার্য্যকারক ছিলেন, তখন একদিন কোন কার্য্যবশতঃ তিনি অশ্বারোহণে বর্ত্তমান মহম্মদপুরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। মহম্মদপুর তখন জঙ্গলময় ছিল। তিনি অশ্বারোহণে যাইতেছেন, হটাৎ তাঁহার অশ্বটী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, অশ্বের পদে একখান লৌহ বিদ্ধ হইয়াছে; অনেক কষ্টে অশ্বের পদমুক্ত করিয়া সমভিব্যাহারী লোকদিগকে লৌহ খণ্ড খুঁড়িয়া উঠাইয়া ফেলাইতে আদেশ করেন। কিয়দংশ মৃত্তিকা খননের পরে তিনি দেখিলেন যে, উক্ত লৌহ খণ্ড একখানা ত্রিশূলের অগ্রভাগ। তখন উদয় নারায়ণ বিস্ময়াতিশয় সহকারে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ খনন করিতে আদেশ দেন। ক্রমান্বয়ে খনন করিতে করিতে একটী ছোট ইষ্টক-নির্ম্মিত-মন্দির দৃষ্ট হইল। উদয়নারায়ণ সেই মন্দিরের মধ্যে একটী শালগ্রাম চক্র দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত যত্ন ও ভক্তি সহকারে স্বয়ং তুলিয়া লইয়া ভূষণায় গমন করেন। তথায় গমনান্তর তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত শালগ্রাম চক্র পরীক্ষা করিতে দেন। ব্রাহ্মণগণ শালগ্রাম চক্র দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ সহকারে এক বাক্যে কহেন যে, এইটী "লক্ষ্মীনারায়ণ" চক্র। এইরূপ চক্র প্রায়ই দৃষ্ট হয় না; ব্রাহ্মণগণ তখন লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রের মাহাত্ম্য এবং এই চক্র যে স্থানে থাকেন, তথায় রাজকার্য্য নিয়মিত ভাবে সুসিদ্ধ হয়, সে স্থানের অবনতি হয় না ইত্যাদি বিশেষরূপে উদয়নারায়ণকে বুঝাইয়া দেন। তচ্ছ্রবণে উদয়নারায়ণ আন্তরিক প্রগাঢ়-ভক্তি পূর্ব্বক অতি যত্নে এই চক্রটী নিজে রাখেন; কিন্তু তিনি নিজে স্থাপনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপুত্র সীতারাম রাজত্ব লাভ করিয়া নিজের রাজবাড়ীর উপরেই লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপনা করেন এবং ১৬২৬ শকে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির উৎসর্গ করেন। এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয় না। এই মন্দিরে যে প্রস্তরাঙ্কিত কবিতাটী প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, তাহার তৃতীয় চরণে "নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে" খোদিত ছিল, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, উদয়নারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রাপ্ত হইয়া স্থাপন করিয়া যাইতে না পারায় তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্টে ছিলেন, শেষে নিজে রাজা হইয়া পিতৃপুণ্যার্থে পিতৃপ্রাপ্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন ও মন্দির উৎসর্গ করিয়া যান। বস্তুতঃ এইরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ-চক্র অন্যত্র প্রায় দৃষ্ট হয় না।

সীতারাম কৃত প্রধান জলাশয় রামসাগর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, সীতারাম মহম্মদপুরের সর্ব্ব সাধারণের উপকার মানসে একটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিতে মনস্থ করেন এবং প্রকাশ করেন যে, তদীয় প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে যত দূরে সেই তীর নিক্ষিপ্ত হইবে, তত দূর দীর্ঘ

জলাশয় খনন করা হইবে। তদনুসারে রামসাগরের উত্তরের তীর হইতে মেনাহাতী দক্ষিণাভিমুখে একটী তীর নিক্ষেপ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, সীতারামের স্থানীয় কয়েকটী কর্ম্মচারীর কৌশলে মেনাহাতী এই স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করেন, কারণ উক্ত কর্ম্মচারীদের সীতারামের দেওয়ানের সহিত মনোবিবাদ ছিল, তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইস্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে দেওয়ানের বাটী জলাশয়ের মধ্যে পড়িবে। দেওয়ানের বাটী রামসাগরের বর্ত্তমান দক্ষিণ সীমা হইতে কিছুদূরে ছিল, অদ্যাপি তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে। মেনাহাতী নিক্ষিপ্ত তীর রামসাগরের দক্ষিণ সীমা হইতে দূরে উক্ত দেওয়ানের বাটী অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে পতিত হয়। রামসাগরের দক্ষিণ তীরে তখন অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। দেওয়ানও ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন। এরূপ সুদীর্ঘ জলাশয় খনন করা হইলে ব্রাহ্মণগণের স্থানান্তরিত হইতে হয়, মনে করিয়া তৎপর দিন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সীতারাম সমীপে জানাইলেন যে, তাঁহারা তাঁহারই প্রদত্ত জমিতে তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে এরূপ জলাশয় খনন করাইলে তিনি দত্তাপহারী হইবেন এবং ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইবেন। ব্রাহ্মণের উপর সীতারামের যথেষ্ট ভক্তি ছিল; তিনি সন্তোষ-চিত্তে ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি বাদ দিয়া জলাশয় খননের আদেশ দেন। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ রাত্রিতে তীর উঠাইয়া রামসাগরের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া যান, কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়! এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজার তীর উঠাইতে সাহসী হওয়া অসম্ভব। মেনাহাতীর তীর যতদূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের ; এক-চতুর্থাংশে বর্ত্তমান রামসাগরের দৈর্ঘ্য। যদি প্রকৃত মেনাহাতী নিক্ষিপ্ত শরের দূরত্ব পর্য্যন্ত রামসাগর খনন করা হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ জলাশয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। বর্ত্তমান রামসাগর আনুমানিক ১৬০০ ষোল শত হাত দীর্ঘ ও ৬০০ ছয়শত হাত প্রস্থ হইবে। রামসাগর সীতারামের রাজত্বের শেষ-অংশে কাটান হয়। শ্রুতি পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, সীতারাম রামসাগর উৎসর্গ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি রামসাগর উৎসর্গের শুভদিন ইত্যাদি স্থির করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছেন, এই সুমহৎব্যাপার সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইবার কথা, তদনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক ছিল। শুভদিনে শুভকার্য্যে ব্রতী হইবেন, মনস্থ করিয়া সীতারাম রামসাগরের উত্তর তীরে সদর বান্ধাঘাটের উপর বসিয়াছিলেন; এদিকে রাজবংশে সেই দিন একটী বালক ভূমিষ্ঠ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রাজার পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। রাজপুরোহিত, তদীয় গুরুদেব, দেওয়ান ইত্যাদি সকলেই এ সংবাদ শুনিয়াছেন কিন্তু রাজার কর্ণগোচর তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অশুচি অবস্থায় রাজা এরূপ শুভ কার্য্য করিতে পারেন না, এরূপ উৎসবের দিনও রাজার নিকট এ সংবাদ প্রদান করিতে কেহই সাহসী হন না; অবশেষে

দেওয়ান, পুরোহিত ও গুরুদেব সকলে পরামর্শ করিয়া অগ্রে কতিপয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরে রাজপুরোহিত, তৎপরে রাজগুরুদেব তাঁহার পশ্চাতে দেওয়ান রাজ সমীপে বিমর্ষ চিত্তে গমন করিলেন। সীতারাম তদীয় গুরুদেবকে পশ্চাতে ও অগ্রে অন্য ব্রাহ্মণ কয়েকটীকে ম্রিয়মাণ অবস্থায় আগমন করিতে দেখিয়া কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলেন। সীতারাম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণামানন্তর সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, অগ্রগামী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অশ্রুবিমোচন পূর্ব্বক শঙ্কিত চিত্তে অস্ফুট স্বরে সীতারামকে বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ বলেন। সীতারাম এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সংবাদদাতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পুরস্কার স্বরূপ কিছু সম্পত্তি নিষ্কর দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি অন্যান্য কার্য্যের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করেন। এই উৎসবের সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হয়েন এবং প্রকাশ করেন যে, এইরূপ শুভ কার্য্যের বিঘ্নকারী এই সন্তান নিতান্ত হতভাগ্য। যখন এরূপ মহৎ কার্য্যের সমস্ত আয়োজন করিয়াও কার্য্যোদ্ধার হইল না, তখন রাজলক্ষ্মী নিতান্তই চঞ্চলা হইয়াছেন, রাজ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিবে। তৎপরেই নবাব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় রামসাগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামসাগরের উত্তর দিকে সদর ঘাট ও পূর্ব্বদিকের একটী ঘাট ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান ছিল, এক্ষণ দুই একখানা ভগ্ন ইষ্টক দৃষ্ট হয় মাত্র। রামসাগরের জল যাহাতে খারাপ না হইতে পারে, এজন্য পুণ্যাত্মা সীতারাম একটী তাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহার ভিতর পারদ পূরিয়া রামসাগরে ফেলাইয়া দেন। বস্তুতঃ রামসাগরের জল পূর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট ছিল, এক্ষণ নানাকারণে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রামসাগরে দেবমাহাত্ম্য আছে ফলতঃ সহসা রামসাগর দর্শন করিলে প্রথমে দেবকীর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মে; সবিশেষ ১ম ও ২য় প্রস্তাবে লিখিত আছে।

সীতারামের রাজধানী ও রাজবাড়ী অতীব মনোহর ছিল। প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি শ্রেণী শোভিত বাজার। রাজবাড়ীর চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত গড়। রাজবাড়ী দ্বিতল, ত্রিতল ও নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত সৌধমালায় পরিশোভিত। সদর রাস্তার উভয়দিকে বাজার, পরে দেউড়ী মালখানা কারাগার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকা। একটী মাত্র প্রবেশ দ্বার; সহসা কোন শত্রু ইত্যাদি নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইত না। রীতিমত নগর রক্ষক ইত্যাদি প্রহরিগণ সর্ব্বদা নগর রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিত। রাজধানীতে দৈনিক অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। কেহ রাজদরবারে, কেহ বা ধন বাঞ্ছায় কেহ বা ভিক্ষার্থ, কেহ বা ক্রয় বিক্রয়ার্থ, কেহ বা নগর সন্দর্শনার্থ ইত্যাদি নানাকারণে প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক যাতায়াত করিত। অতি সংক্ষেপে রাজবাড়ীর বিবরণ দেওয়া গেল।

রামসাগরের উত্তর ভাগের সদর ঘাট হইতে রাজবাড়ীর সদর তোরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে সীতারাম কৃত সুদৃশ্য পদ্ম পুষ্করিণীর ধার পর্য্যন্ত বহুবিধ বিপণিশ্রেণি বিরাজিত বাজার। বাজারের মধ্য দিয়া সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম উত্তরাভিমুখে কিছু দূর গিয়া পদ্মপুষ্করিণীর ধার হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। পদ্ম-পুষ্করিণী হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পশ্চিম দিকে গেলেই সীতারামের সদর রাজ তোরণ। তথা হইতে একটু পশ্চিম দিকে গেলেই সিংহদ্বার, সিংহদ্বারের পরেই ৺দশভূজার প্রাঙ্গণ। ৺দশ ভূজার মন্দির পাকা যোড়-বাঙ্গলা ছিল, এক্ষণ ভগ্ন হওয়ার পুনর্ব্বার অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৺দশ ভূজার বাটীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অট্টালিকা। দক্ষিণ পশ্চিমে নানাবিধ শিল্প কার্য্যে সুশোভিত-মন্দিরে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব এবং ঠিক এই কৃষ্ণ শিব মন্দিরের সম্মুখে দক্ষিণ অংশে একটী মন্দিরে শ্বেত-প্রস্তরনি-র্ম্মিত শিব স্থাপিত ছিলেন। উভয় শিব মন্দিরের মধ্যে রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা দিয়া ৺লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাঙ্গণ ও সীতারামের সদর কাছারী যাইতে হইত। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর দক্ষিণে দ্বিতল অট্টালিকায় তাঁহার সদর কাছারী ছিল। ৺লক্ষ্মনারায়ণের বাটীর ঠিক পশ্চিম দিকে উত্তরের পার্শ্বে সীতারামের ত্রিতল বৈঠক-খানা, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই ত্রিতল অন্দর মহল ও অন্দরের পুষ্করিণী ইত্যাদি, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই সুদীর্ঘ গড়। পদ্মপুষ্করিণী হইতে যে সদর রাস্তা রাজবাড়ীতে গিয়াছে, তাহার দক্ষিণ দিকে মহম্মদ আলি ফকিরের আশ্রম ও কবর এবং ৺কালীবাড়ী এবং নাটোরের ৺রাণী ভবানীর কন্যা ৺ তারা-ঠাকুরাণী প্রতিষ্ঠিত ৺ রামচন্দ্র বিগ্রহের মন্দির প্রকাণ্ড অট্টালিকা ইত্যাদি, উত্তর দিকে পাকা প্রকাণ্ড দোলমঞ্চ; দোলমঞ্চের উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে কেল্লাবাড়ী বা সেনা-নিবেশ। সদর তোরণ হইতে সিংহদ্বার পর্য্যন্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে দেউড়ী, মালখানা ইত্যাদি অট্টালিকা, এই রাস্তার কিয়দ্দূরে উত্তরে কারাগার, তাহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে পণ্ডিতগণের থাকিবার স্থান ছিল। সিংহদ্বারের পূর্ব্ব পার্শ্বেই একটী রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে ছিল। সেই রাস্তা দিয়া সীতারামের গোলাবাড়ী যাইতে হইত। গোলাবাড়ীর পার্শ্বেই গড়। গড়ের অপর পার্শ্ব হইতেই বাজার রাধানগর, কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৺রাধারাণী বিগ্রহের বাজার বলিয়া এই বাজারের নাম বাজার রাধানগর। রাজ-বাড়ীর চতুঃপার্শ্বেই গড়, গড়ের দুই পার্শ্বেই বাজার। রামসাগরের কিয়ৎ পরিমাণ উত্তর দিক হইতেই সদর গড় কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ৺ দশ ভূজার মন্দিরের পশ্চিম দিকেই। ৺লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ৺দশ ভূজার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগেই লক্ষ্মীনারায়ণের বৃহৎ পুষ্করিণী নিম্নদেশ হইতে চারিধার সমস্তই ইষ্টক দিয়া পাকা করিয়া বান্ধান। এই পুষ্করিণীই সীতারামের গুপ্ত কোষাগার ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অস্থায়িত্বর প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরের উপর সীতা-

রামের অন্দরমহল, ইহার উত্তর পূর্ব্ব তীরের উপর পণ্ডিতদিগের বাসস্থান ছিল।

রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গড় একেবারে রামসাগরে আসিয়া মিশিয়াছে বিপরীত দিকে সদর গড় কানাইনগর পর্য্যন্ত চলিয়াগিয়াছে। রামসাগরের সদর ঘাট হইতে প্রশস্ত রাজ পথ বাজারের মধ্য দিয়া পদ্মপুষ্করিণীর নিকট রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকের গড় অতিক্রম করিয়া সিংহদ্বার পর্য্যন্ত চলিয়াগিয়াছে। রাজবাড়ী যাইতে হইলে সদর রাস্তা ব্যতীত অন্য পথ ছিল না। এক্ষণও বর্ষাকালে সীতারামের রাজবাড়ীতে যাইতে হইলে সদর রাস্তা ব্যতীত অন্য পথে যাওয়া যায় না। অন্য পথে যাইতে হইলে নৌকারোহণে যাইতে হয়। পরে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বতন্ত্র কাগজে দেওয়ার ইচ্ছা আছে, তদ্দৃষ্টে রাজবাড়ীর অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। দুঃখের বিষয় এক্ষণ প্রায় সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। এক্ষণে রাজবাড়ীর অবস্থা দেখিলে হৃদয় শোক, দুঃখে অভিভূত হয়। ভয়ানক জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে স্থানে ইষ্টক রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের কিছুই নয়নগোচর হয় না। কেবল দুইটা দেব মন্দির অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রহিয়াছে। রীতিমত তাঁহাদিগের পূজা ইত্যাদি হইতেছে বলিয়া সেই স্থানটী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত রহিয়াছে। যে স্থানে স্বাধীন রাজা দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, যে স্থান রাজকুল বধূগণের বিচরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি ছিল; আজ সেই স্থান শার্দ্দূল, বরাহ ইত্যাদি বন্য জন্তুর রঙ্গভূমি। হায়! কালের কি অপ্রতিহত প্রভাব। কালে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। কালকে কেহই পরাজয় করিতে পারেন না: অতিপ্রবল প্রতাপান্বিত ভূপতি কালের নিকট যেমন, একজন দীনহীন চির ভিখারীও তাঁহার নিকট সেইরূপ। কালের চক্ষুতে ধনী, দরিদ্র রাজা, প্রজা, সুখী দুঃখী, বিদ্বান্ মূর্খ, সকলেই সমান। সকলেই কালের করাল-কবলে নিপতিত হয়েন। যে সীতারাম সামান্য অবস্থা হইতে নিজে রাজা হইয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যিনি এই সংসার জীবনে বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সীতারাম কোথায়? কোথায় তাঁহার সেই রাজ সিংহাসন? কালে সমস্তই অপহরণ করিয়াছে।

এই নশ্বর জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। আমরা অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিয়া বৃথা কুহকজালে আবদ্ধ হইয়া কত কষ্টই পাইতেছি। সংসারের অনিত্যতা প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিয়াও মায়ার মোহিনী শক্তিতে সমস্তই বিস্মৃত হইয়া অজর অমর ভাবে কাল যাপন করিতেছি। রাজত্বই হউক, বা ধন জন ইত্যাদিই হউক, এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত কালে লয় প্রাপ্ত হইবে। মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি" শুদ্ধ সেই কীর্ত্তির জন্য মহাত্মা, স্বাধীন চেতা, পরোপকারী ও স্বধর্ম্মানুরাগী সীতারামের নাম অদ্যাপি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল তাঁহার নাম নিরবচ্ছিন্ন

স্থানে স্থানে ঘোষিত হইবে। সীতারাম ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ ছিলেন। ধর্ম্মই জগতে একমাত্র সহায়, এক ধর্ম্ম বলেই মনুষ্য ইহ জীবনে সুখ শান্তিতে ও পরকালে শান্তি রাজ্যে গিয়া চির শান্তিতে থাকিতে পারেন।

সীতারাম প্রতিষ্ঠিত ৺ হরেকৃষ্ণ রায়ের আবাসস্থান কানাইনগর ইত্যাদি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজে প্রতীতি জন্মে যে, মহাত্মা সীতারাম কানাইনগরকে ব্রজধাম সদৃশ স্থাপনা করিয়াগিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অংশ সম্ভূতা আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি শ্রীমতী রাধিকা সহ গোপকুলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লীলাচ্ছলে কিছু দিন বাস করিয়া-ছিলেন। সীতারাম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্র-হকে ব্রজধামের কানাই সাজাইয়া গ্রামের নাম কানাইনগর রাখিয়াছিলেন। কানাই-নগরে পঞ্চরত্ন মন্দিরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, অনঙ্গ মোহন ভবজলধিতারণ, বংশীবদন, শ্যাম-সুন্দর নন্দনন্দন পূর্ণব্রহ্ম মুরলীহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে আদ্যাশক্তি মহামায়া পরমাপ্রকৃতি জগৎজননী বরাভয় প্রদায়িনী বৃকভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা বিরাজিতা। ভক্তে যে মূর্ত্তি দেখিতে, পূজা করিতে, সেবা করিতে ও ধ্যান করিতে সতত ভালবাসে, সেই মূর্ত্তিতেই পরম পুরুষ পরমা প্রকৃতি সহ বিরাজিত। এই মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তের হৃদয় প্রেমরসে দ্রবীভূত হয়। পাষণ্ডের হৃদয় ও অনেক সময়ে বিগলিত হয়। ব্রজধামে গোপ গোপীগণের অব্যভিচারিণী ভক্তি ছিল, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সখ্য দাস্যভাবে ভক্তি পূর্ব্বক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা সাধনাদি করিতেন। সীতারামও ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ) বাটীর চতুঃপার্শ্বে গোয়ালাদিগকে উক্ত বিগ্রহের চাকর খান-সামা ইত্যাদি রূপে চাকরা জমি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি গোয়ালাগণ সেই জমিতে বাস করিয়া বিগ্রহের দাসত্ব করিতেছে। কানাইনগরের একটী পাড়ার নাম গোকুলনগর। গোকুলেই গোয়ালাগণ ছিল, এক্ষণে সীতারামের পুরোহিত বংশ তথায় বাস করিতেছেন। কানাই বাড়ীর পশ্চিমে অনতিদূরে কালীয় হ্রদ সদৃশ সীতা-রাম কৃত বৃহৎ কৃষ্ণসাগর। ৺ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জলাশয় বলিয়া ইহার নাম কৃষ্ণ-সাগর। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর নিকট হইতেই মহম্মদপুরের বর্ত্তমান বাজার পর্য্যন্ত পুণ্যসলিলা যমুনা নদীর ন্যায় অনূ্যন এক মাইল দীর্ঘ সীতারামের সদর গড়। গড়ের অত্যুচ্চ তীরই কানাইনগর বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন। ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর পূর্ব্বেই বাজার রাধানগর সীতারামের রাজবাড়ীর গড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৺রাধারাণীর বিগ্রহের এই বাজার। কানাইনগরের পার্শ্বেই মথুরানগর, উত্তরে শ্যামনগর দক্ষিণে ৺গোপালপুর। প্রকৃত পক্ষে সীতারাম কানাই নগরকে বৃন্দাবনই সাজাইয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া একপদও কোথাও গমন করেন না। নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে মহারাসেশ্বরী বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা সহ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উক্তি আছে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছামি। কানাই-

গাছটি কেটে পোতা শাখা,
বাঘ ছেড়ে যে ছাগল রাখে,
চতুর যে সে এমনি ঠকা—
ঠকায় অনায়াসে।

১০

গোলক ধাঁধাঁয় রেখে ফেঁসে,
লুকো চুরি খুব যাচ্ছ খেলে;
বলছ তবায় আসবে চলে,
ঠক্‌বো অবশেষে;
ভুলিসনে আর মোহের ছলে
পড়্‌বি আটক্‌ দেরী হলে,
মায়ার ফাঁসী লাগ্‌বে গলে,
কাট্‌বি বল কিসে ?

১১

কোন পথেতে তোমায় পাব—
জানব বল কিসে ?
(আমি) মহামায়ার মায়ার ঘোরে-
হইছি হারা দিশে।

১২

(তোমার) পথের কোন (ও) নাইকো ঠিক্
কোন্‌টায় বল যাই;
চিরকালটা কর'ছ বাস—
(কিন্তু) আবাসের ঠিক নাই।

১৩

প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড মাঝে—
কোথায় হেন স্থান.—
(তোমার) তিলেকতরে যেই স্থানেতে
নাহয় অবস্থান ?

১৪

সর্ব্বদেশে বাড়ী তোমার,
সব্‌ দিকে পথ তা'র,
কোন্‌টা বাঁকা কোন্‌টা সোজা
চিনে লওয়া ভার।

১৫

(বাড়ীর) পাঁচীল গুলো ঠিক যেন সব—
ভোজবেজী মত;
(তারা) দেখায় ফাঁকা লাগায় ধোঁকা,
ঘুরায় অবিরত।

১৬

যে জন সোজা বিষম ঠকা
ঠকে অনায়াসে;
চুক্‌তে গিয়ে গুঁতোটী খেয়ে—
পিছু হ'টে আসে।

১৭

দরজাগুলি লুকিয়ে থাকে—
বহুরূপীর সাজে;
চতুর হ'লে (ও) চিনে লওয়া
যায় নাকো সহজে।

১৮

যে মহাজন তোমার পথে
হয়েছেন গত,
(তাঁর) চরণ চিহ্ন স্মরণ ক'রে'
যাত্রী চলে কত।

১৯

(চলে) মহা আশায় বাঁধিয়ে বুক
রাখিয়ে সঠিক তাক্;
(শেষে) বাড়ীর কাছে হাজির হ'য়ে
পায়না পায়ের দাগ।

২০

এম্নি তোমার স্থপতিগিরি,
এমন গড়া দ্বার,
হাজার লোক হাঁটিগেলেও
দাগ থাকেনা পা'র।

২১

দ্বারবান্‌টা (ও) তোমার মত,—
পথটা না দেয় ব'লে;
(বলে) দেখে শুনে লওগে যাদু
হইয়ে চালাক ছেলে।

২২

(তখন) অজপথিক শ্রান্ত হ'য়ে,
আশা নাটি ধরে',—

বিবেক ছেলের হাত ধরিয়ে
কাঁদে দ্বারে দ্বারে।

২৩

(তুমি) কাঁদাতে বড় ভাল বাস,
কান্নাই তুমি চাও ;
অন্ধ হ'লেও কেঁদে কেঁদে
দেখাটী না দেও।

২৪

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
চারটি যুগ ধ'রে',
কাঁদায়ে মারলে কত জনে
দেখ মনে করে,।

২৫

(আমার) চিরকালটী কাঁদ্‌তে গেল,
তবু তোমার দয়া না হ'ল ;
চক্ষেতে নাই অশ্রু জল,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নিঃসম্বল।
উপার্জ্জনের নাই শকতি,
নিজের কেবল হচ্ছে ক্ষতি।

২৬

(আবার) ছটা ডাকাত ঢুক্‌লো ঘরে,
(তারা) জ্ঞান আলোটী নির্বাণ ক[illegible]
ধৈর্য্য খোঁটা ভেঙ্গে জোরে,
ধ'রে আমার কেশে,
মোহের গর্ত্তে ফেলে মোরে',
যা কিছু সব নিল হ'রে,'
কেমন করে যাব পারে—
চরণ ভেলায় ভেসে?

২৭

তুমিতো সও তেমন নেয়ে,—
(দিবে) বিনা দানে পার করিয়ে ;
জানি কড়া হিসেব ক'রে,
তুলে নিবে নায়ের' পরে।

একটি কড়া কমতি হ'লে,
মাঝ দরিয়ায় দিবে ফেলে।
কেমন করে ত'রব শেষে,
পার ঘাটে তাই ভাব্‌ছি ব'সে।

শ্রীচন্দ্রভূষণ লাহিড়ী
ছাত্র, আগর দাঁড়া সংস্কৃত-
চতুষ্পাঠী।
(খুলনা)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গপরিবার। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। বঙ্গপরিবারের চাকচিক্যই এই উপন্যাসের উপকরণ। গ্রন্থখানিতে নূতনলেখকের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, নবীন-লেখকগণ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য সংরক্ষণে সর্ব্বদা যেরূপ অকৃতকার্য্য হন, সুরেন্দ্র বাবু অনেকাংশে সেই অসম্পূর্ণতাস্পর্শ হইতে নির্ম্মুক্ত। চরিত্রচিত্রণেও নবীনগ্রন্থকার কথঞ্চিৎ প্রবীণতার পরিচয় দিয়াছেন। "বঙ্গ-পরিবার" পাঠে বঙ্গপরিবার শিক্ষা, সাধুতা, নীতি ও শক্তি লাভ করিবে, আশা করা যায়। অতএব বঙ্গপরিবারের এই নূতন-লেখক বঙ্গপরিবারের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অকৃতার্থ হইলে, উহা উপন্যাস-পাঠক পাঠিকার কলঙ্কের কথা। সুরেন্দ্র বাবুর নিকট আমরা আরও অধিকতর আশা রাখি, অনুশীলন অভ্যাস থাকিলে তিনি ভবিষ্যতে ঔপন্যাসিক কুলের মধ্যে উপযুক্ত আসন অধিকার করিতে পারিবেন। মুদ্রাঙ্কণ পরিষ্কৃত, কাগজ ভাল।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। পণ্ডিত প্রবর পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু, সাংখ্যভূষণ

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা, সংস্কৃত কারিকার সরল ব্যাখ্যা, বাঙ্গলাভাষায় কারিকার তাৎপর্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী, তত্ত্বকৌমুদীর ক্রমিক সরল অবিকল অনুবাদ, এবং প্রতি কারিকায় ভাবপ্রকাশের উপযোগী গভীর দার্শনিক সমালোচনাপূর্ণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পরিচায়ক সুবিস্তৃত মন্তব্য আছে; মন্তব্যভাগ পাঠ করিলে বস্তুতঃই কঠোর দার্শনিকতত্ত্বের সহজ সুখবোধ্য সমাবেশ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইতে হয়। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বঙ্গীয় সমাজে সম্পূর্ণ পরিচিত; তাঁহার সাংখ্যদর্শন ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় পাঠকের দর্শন পাঠ পিপাসার সুশীতল জলরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, সাংখ্য ও তদনুরূপ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ইহাতে বিশেষরূপে বিচারিত ও বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ প্রকারে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকলের প্রচার অত্যধিক অভিলষিত। এই মহৎকার্য্যের দ্বারা পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বাস্তবিকই বঙ্গীয়-সমাজের পরমোপকার সাধন করিতেছেন। আমরা আশা করি, স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু-মহাত্মাদের নিকট এই পুস্তক পরমাদরে গৃহীত হইবে, না হইলে সমাজের কলঙ্কের কথা সংশয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য, পণ্ডিত-পূর্ণচন্দ্রের নিকট এজন্য অবশ্য ঋণী। মুদ্রাঙ্কণও কাগজ উৎকৃষ্ট। বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তন্ত্রসার। কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসার বহুবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এসংস্করণটী মন্দ নয়। ইহাতে অনেকগুলি তান্ত্রিক-যন্ত্র ও মুদ্রাদির চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা উত্তম। বঙ্গানুবাদটী তত সরল বুঝিবার পথ পরিষ্কৃত হয় নাই। অনেক স্থলে মূলের শব্দটী অনুবাদে অবিকল লিখিত আছে, ইহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ-পাঠকের একটু অসুবিধা হইবার কথা। বস্তুতঃ শাস্ত্রগ্রন্থের অধিক মুদ্রণ ও প্রচলন আনন্দের কথা। নবাঁজনগণঃ সচিত্রকা [illegible] চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের ও [illegible] শ্রীআশুতোষ

নব্য ভারতে আর্য্য ধর্ম্ম। প্রথম ভাগ। ছাত্রধর্ম্ম। কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ বিরচিত। মূল্য ॥০ আনা। বাঁধাই ৷৵০ আনা। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে প্রাচীন আর্য্য প্রথাপদ্ধতি কিরূপ ভাবে প্রচলিত হইলে মঙ্গলদায়ক হয়, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রই তাঁহার লক্ষ্যস্থান। কোনও প্রথা অধিক দিন অপরিবর্ত্তিতরূপে থাকিলে সমাজের মঙ্গলকর হয় না, যেহেতু সমাজ কালধর্ম্মের অধীন, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানকালে নানাকারণে অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অন্যথা হওয়ায় সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কাজেই প্রথার ও সংস্কার আবশ্যক। এ পুস্তকে অতি অল্প বিষয়ই সামান্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কথা আলোচ্য ও বিবেচ্য বটে। তাঁহার মত সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য না হইলেও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হইবে নিঃসন্দেহ। ইহা পাঠ্য হইলে মন্দ হয় না। প্রধানতঃ স্নান, আহার ইত্যাদির স্বাস্থ্যনীতি, সুকর্ম্ম কুকর্ম্মাদির ধর্ম্ম বা সমাজ-নীতি, ও ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য ইহাতে সংক্ষেপরূপে আলোচিত। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আষাঢ়-শ্রাবণের হিন্দুপত্রিকা গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইল, যাঁহারা বর্ত্তমান ১৩০৮ সালের মূল্য এপর্য্যন্ত পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংখ্যা প্রাপ্তির পর স্বীয়২ মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। ৺শারদীয় পূজা নিকটবর্ত্তী; এই সময়ে আমাদের অনেক ব্যয়; আশা করি, গ্রাহকগণের নিকট এই মূল্যের জন্য আর স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে হইবে না।

ঋগ্বেদভাষ্যোপদ্‌ঘাৎপ্রকরণম্।

যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হিন্দু-পত্রিকার মূল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট উপরোক্ত পুস্তক কেবল ।০ আনা মূল্য লইয়া উপহার স্বরূপে পাঠান হইয়াছে। এই পুস্তক আর কাহাকেও উপহার স্বরূপে দেওয়া হইবে না; ইহার মূল্য সমেত ডাক মাসুল ২৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে হিন্দু-পত্রিকার ও Brahmacharin এর গ্রাহকগণ ১৲ টাকায় পাইবেন।